কাকাবাবু সমগ্র ১
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবু সমগ্র ১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৩
পঞ্চদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7215-208-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

KAKABABU SAMAGRA: Volume I
[Adventure]
by
Sunil Gangopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২৫০.০০

স্নেহের টাপুর ও টুপুরকে
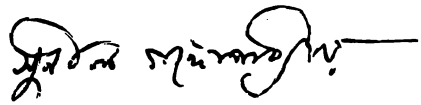
এই লেখকের অন্যান্য বই

আঁধার রাতের অতিথি
আগুন পাখির রহস্য
আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে
আ চৈ আ চৈ চৈ
উদাসী রাজকুমার
উল্কা রহস্য
এবার কাকাবাবুর প্রতিশোধ
কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ
কলকাতার জঙ্গলে
কাকাবাবু আর বাঘের গল্প
কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী
কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া
কাকাবাবু ও চন্দনদস্যু
কাকাবাবু ও বজ্র লামা
কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার
কাকাবাবু ও মরণফাঁদ
কাকাবাবু ও শিশুচোরের দল
কাকাবাবু ও সিন্দুক-রহস্য
কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি
কাকাবাবু সমগ্র (২-৫)
কাকাবাবু হেরে গেলেন
কাকাবাবুর প্রথম অভিযান
কাকাবাবুর চোখে জল
কালোপর্দার ওদিকে
খালি জাহাজের রহস্য
জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল
জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ
জলদস্যু
জোজো অদৃশ্য
ডুংগা
তিন নম্বর চোখ
দশটি কিশোর উপন্যাস
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
বিজয়নগরের হিরে
ভয়ংকর সুন্দর
মা, আমার মা
মিশর রহস্য
রাজবাড়ির রহস্য
সন্তু কোথায় কাকাবাবু কোথায়
সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ
সবুজ দ্বীপের রাজা
হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি

ভূমিকা

একবার আমি একজন খোঁড়া মানুষকে খুব উঁচু পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলাম। তাঁর যেন একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি ছোট, সন্তুরই বয়েসী। সেই মানুষটিকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে মানুষ যে-কোনো বাধাকেই জয় করতে পারে। সেই মানুষটিই কাকাবাবু। সন্তুও কাকাবাবুর কাছ থেকে তেমনই মনের জোর পেয়েছে, যে-জন্য কোনো বিপদেই সে ভয় পায় না। কাকাবাবু ডিটেকটিভ নন, খুন-ডাকাতির তদন্ত করেন না। রহস্যময় দুঃসাহসী অভিযানেই তাঁর আগ্রহ, সন্তুও তাতেই মেতে ওঠে। কাকাবাবু ও সন্তুর অভিযানের কাহিনীগুলি এবার একসঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে, প্রথম খণ্ডে রয়েছে ছ'টি কাহিনী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সূচী

ভয়ংকর সুন্দর

লীদার নদীর তীরে

আর সবাই পাহাড়ে গিয়ে কত আনন্দ করে, আমাকে সারাদিন বসে থাকতে হয় গজ ফিতে নিয়ে। পাথর মাপতে হয়। ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন কাকাবাবু, আর একটা দিক ধরে টানতে টানতে আমি নিয়ে যাই, যতক্ষণ না ফুরোয়।

আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই। ঝকঝক করছে আকাশ। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ, রোদ্দুর লেগে চোখ ঝলসে যায়। ঠিক মনে হয় যেন সোনার মুকুট পরে আছে। যখন রোদ্দুর থাকে না, তখন মনে হয়, পাহাড় চূড়ায় কত কত আইসক্রিম, যত ইচ্ছে খাও, কোনওদিন ফুরোবে না।

আমার ডাক নাম সন্তু। ভাল নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমি বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনসটিটিউশানে ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার একটা কুকুর আছে, তার ডাক নাম রকু। ওর ভাল নামও অবশ্য আছে একটা। ওর ভাল নাম রকুকু। আমার ছোটমাসীর বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল আছে। আমি সেটার নাম রেখেছি লড়াবি। আমি ওকে তেমন ভালবাসি না, তাই ওর ডাক নাম নেই। আমার কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়। আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছি, কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম। কাকাবাবু এই জন্য আমাকে খুব ভালবাসেন।

আজ চমৎকার বেড়াবার দিন। কিন্তু আজও সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, চলো সন্তু, আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক্। ব্যাগ দুটোতে সব জিনিসপত্তর ভরে নাও!

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাকাবাবু, সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম। আবার ওখানেই যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ঐ জায়গাটাই বেশি ভাল। ঐখানেই কাজ করতে হবে।"

আমি একটু মন খারাপ করে বললাম, "কাকাবাবু, আমরা শ্রীনগর যাব না ?"

কাকাবাবু চশমা মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন, "না, না, শ্রীনগরে গিয়ে কী হবে ? বাজে জায়গা। খালি জল আর জল ! লোকজনের ভিড় !"

আজ চোদ্দ দিন হল আমরা কাশ্মীরে এসেছি। কিন্তু এখনও শ্রীনগর দেখিনি। একথা কেউ বিশ্বাস করবে ? আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় দীপঙ্কর ওর বাড়ির সবার সঙ্গে গত বছর বেড়াতে এসেছিল কাশ্মীরে। দীপঙ্করের বাবা বলে রেখেছেন, ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে, ওকে প্রত্যেকবার ভাল ভাল জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সেইজন্যই তো দু' নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়েও আমার দুঃখ হয়নি। কাশ্মীর থেকে ফিরে গিয়ে দীপঙ্কর কত গল্প বলেছিল। ডাল হ্রদের ওপর কতরকমের সুন্দরভাবে সাজানো বড় বড় নৌকো থাকে। ওখানে সেই নৌকোগুলোর নাম হাউস বোট। সেই হাউস বোটে থাকতে কী আরাম ! রাত্তিরবেলা যখন সব হাউস বোটে আলো জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় জলের ওপর মায়াপুরী বসেছে। শিকারা নামে ছোট ছোট নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, তাইতে চড়ে যাওয়া যায় যেখানে ইচ্ছে সেখানে। মোগল গার্ডেনস, চশমাসাহী, নেহরু পার্ক—এইসব জায়গায় কী ভাল ভাল সব বাগান।

দীপঙ্করের কাছে গল্প শুনে আমি ভেবেছিলাম যে শ্রীনগরই বুঝি কাশ্মীর। এবার কাকাবাবু যখন কাশ্মীরে আসবার কথা বললেন, তখন কী আনন্দই যে হয়েছিল আমার ! কিন্তু এখনও আমার কাশ্মীরের কিছুই প্রায় দেখা হল না। চোদ্দ দিন কেটে গেল। কাকাবাবুর কাছে শ্রীনগরের নাম বললেই উনি বলেন, ওখানে গিয়ে কী হবে ? বাজে জায়গা ! শুধু জল ! জলের ওপর তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। তাই বোধ হয় কাকাবাবুর পছন্দ নয়। সত্যি কথা বলতে কী, কেন যে কাকাবাবু ফিতে দিয়ে পাহাড় মাপছেন তা আমি বুঝতে পারি না।

অবশ্য এই পহলগ্রাম জায়গাটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু যে-জায়গাটা এখনও দেখিনি, সেই জায়গাটাই কল্পনায় বেশি সুন্দর লাগে। পহলগ্রামে বরফ মাখা পাহাড়গুলো এত কাছে যে মনে হয় এক দৌড়ে চলে যাই। একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে পহলগ্রাম দিয়ে। ছোট হলেও নদীটার দারুণ স্রোত, আর জল কী ঠাণ্ডা !

পহলগ্রামে অনেক দোকানপাট, অনেক হোটেল আছে। এখান থেকেই তো তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের দিকে যায়। অনেক সাহেব মেমেরও ভিড়। যারা আগে শ্রীনগর ঘুরে পহলগ্রামে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকে বলে যে শ্রীনগরের থেকে পহলগ্রাম জায়গাটা নাকি বেশি সুন্দর। কিন্তু আমি তো শ্রীনগর দেখিনি, তাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। শ্রীনগরের মতন এখানে তো হাউস বোট নেই। আমরা কিন্তু এখানেও হোটেলে থাকি না। আমরা থাকি নদীর এপারে, তাঁবুতে ! এই তাঁবুতে থাকার ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ।

দীপঙ্কররা শ্রীনগরে জলের ওপর হাউস বোটে ছিল, কিন্তু ওরা তো তাঁবুতে থাকেনি ! দমদমের ভি-আই-পি রোড দিয়ে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি, মাঠের মধ্যে সৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে আছে। আমারও খুব শখ হত তাঁবুতে থাকার।

আমাদের তাঁবুটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। পাশাপাশি দুটো খাট, কাকাবাবুর আর আমার। রাত্তিরবেলা দু' পাশের পর্দা ফেলে দিলে ঠিক ঘরের মতন হয়ে যায়। আর একটা ছোট ঘরের মতন আছে এক পাশে, সেটা জামাকাপড় ছাড়ার জন্য। অনেকে তাঁবুতে রান্না করেও খায়, আমাদের খাবার আসে হোটেল থেকে। তাঁবুতে শুলেও খুব বেশি শীত করে না আমাদের, তিনখানা করে কম্বল গায়ে দিই তো ! ঘুমোবার সময়েও পায়ে গরম মোজা পরা থাকে। কোনও কোনও দিন খুব শীত পড়লে আমরা কয়েকটা হট ওয়াটার ব্যাগ বিছানায় নিয়ে রাখি। কত রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পাই। আর কী একটা রাত-জাগা পাখি ডাকে চি-আও ! চি-আও !

মাঝে মাঝে অনেক রাত্তির তাঁবুর মধ্যে মানুষজনের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আমার বালিশের পাশেই টর্চ থাকে। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দেখি। কাশ্মীরে চোর-ডাকাতের ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। টর্চের আলোয় দেখতে পাই, তাঁবুর মধ্যে আর কেউ নেই। কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন। কাকাবাবুর এটা অনেক দিনের স্বভাব। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে যেন তর্ক করেন। তাই ওঁর দু'-রকম গলা হয়ে যায়। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আমার এই সময় একটু ভয় ভয় করে। তখন উঠে গিয়ে কাকাবাবুর গায়ে একটু ঠেলা মারলেই উনি চুপ করে যান।

আমার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে। পরীক্ষার আগে আমি অনেক রাত জেগে পড়তে পারি, কিন্তু ভোরে উঠতে খুব কষ্ট হয়। আর এখানে এই শীতের মধ্যে তো বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছাই করে না। কাকাবাবু খুব ভোরে উঠতে পারেন। আমি জেগে উঠেই দেখি, কাকাবাবুর ততক্ষণে দাড়ি কামানো, স্নান করা সব শেষ। বিছানা থেকে নেমেই আমি তাঁবুর মধ্যে লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি শুরু করি। তাতে খানিকটা শীত কাটে। আজ সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তাঁবুতে থাকার একটা সুবিধে এই দরজায় তালা লাগানো হয় না। তাঁবুতে তো দরজাই থাকে না। দরজার বদলে শক্ত পর্দা, সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয়। আমাদের কোনও জিনিসপত্তর কোনওদিন চুরি হয়নি, কাশ্মীরে নাকি চোর নেই। অবশ্য ডাকাত আছে। সেটা আমরা পরে টের পেয়েছিলুম।

ছোট্ট ব্রিজটা পেরিয়ে চলে এলুম নদীর এদিকে। এই সকালেই রাস্তায় কত মানুষজনের ভিড়, কত রকম রং-বেরঙের পোশাক। যে-দেশে খুব বরফ থাকে,

সে দেশের মানুষ খুব রঙিন জামা পরতে ভালবাসে। ঝাঁক ঝাঁক সাহেব মেম এসেছে আজ। ঘোড়াওয়ালা ছেলেরা ঘোড়া ভাড়া দেবার জন্য সবাই এক সঙ্গে চিল্লিমিল্লি করছে। আমরা কিন্তু এখন ঘোড়া ভাড়া নেব না। আমরা বাসে করে যাব সোনমার্গ। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ভাড়া নিয়ে পাহাড়ে উঠব।

কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয়। তাই আমরা ঘোড়ায় বেশি চড়ি না। প্রথম ক'দিন আমাদের একটা জিপ গাড়ি ছিল। এখানকার গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছিল। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন। কিন্তু আমার কাকাবাবু ভারী অদ্ভুত। তিনি কোনও লোকের সাহায্য নিতে চান না। দু' তিন দিন বাদেই তিনি জিপ গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে তখন বলেছিলেন, সব জায়গায় তো গাড়ি যায় না। যে-সব জায়গায় গাড়ি যাবার রাস্তা নেই—সেখানেই আমাদের বেশি কাজ। খোঁড়া পা নিয়েই তিনি কষ্ট করে চড়বেন ঘোড়ায়। এই যাঃ, বলে ফেললাম! আমার কাকাবাবুকে কিন্তু অন্য কেউ খোঁড়া বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি তো শুধু একবার মনে মনে বললাম। কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন্। মাত্র দু' বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওঁর গাড়ি উল্টে যায়। তখনই একটা পা একেবারে চিপ্‌সে ভেঙে গিয়েছিল।

কাকাবাবুকে এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। এখন আর একলা একলা নিজে সব কাজ করতে পারেন না বলে কোথাও গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমারও বেশ মজা, কত জায়গায় বেড়াই। গত বছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম মথুরা, সেখান থেকে কালিকট। হ্যাঁ, সেই কালিকট বন্দর, যেখানে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম এসেছিলেন। ইতিহাসে-ভূগোলে যে-সব জায়গার নাম পড়েছি, সেখানে সত্যি সত্যি কোনওদিন বেড়াতে গেলে কী রকম যে অদ্ভুত ভাল লাগে, কী বলব!

আগে চাকরি করার সময় কাকাবাবু যখন বাইরে বাইরেই ঘুরতেন, তখন আমরা ওঁকে বেশি দেখতে পেতাম না। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকেন। বই পড়েন দিনরাত, আর বছরে একবার দু'বার নানান ঐতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে যান—তখন আমাকে নিয়ে যান সঙ্গে। কাশ্মীরে এর আগেও কাকাবাবু দু' তিন বার এসেছেন—এখানে অনেকেই চেনেন কাকাবাবুকে।

ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। দু' হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি এসেও কিন্তু আমরা বাস ধরতে পারলুম না। সোনমার্গ যাবার প্রথম বাস একটু আগে ছেড়ে গেছে। পরের বাস আবার একঘণ্টা বাদে। অপেক্ষা করতে হবে।

কাকাবাবু কিন্তু বিরক্ত হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন কী সন্তু, জিলিপি হবে নাকি ?

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলুম। কাকাবাবু যে এক এক সময় মনের কথাটা ঠিক কী করে বুঝতে পারেন! পহলগ্রামে যারা বেড়াতে যায়নি, তারা বুঝতেই পারবে না, এখানকার জিলিপি'র কী অপূর্ব স্বাদ! খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মস্ত বড় মৌচাক সাইজের জিলিপি। টুসটুসে রসে ভর্তি, ঠিক মধুর মতন। ভেজাল ঘি কাশ্মীরে যায় না, ডালডা তো বিক্রিই হয় না।

সোনার খোঁজে, না গন্ধকের খোঁজে ?

বাস স্ট্যান্ডের কাছেই সোহনপালের বিরাট মিষ্টির দোকান। ভেতরে চেয়ার টেবিল পাতা, দেয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া। খাবারের দোকানের ভেতরে কেন যে আয়না দেওয়া বুঝি না। খাবার খাওয়ার সময় নিজের চেহারা দেখতে কারুর ভাল লাগে নাকি ? জিলিপিতে কামড় বসাতেই হাত দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ল।

কাকাবাবু নিজে খুব কম খান, কিন্তু আমার জন্য তিন চার রকমের খাবারের অর্ডার দিয়েছেন। এক ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে তো! কাশ্মীরে এসে যতই পেট ভরে খাও, একটু বাদেই আবার খিদে পাবে। এখানকার জলে সব কিছু তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়।

"কী প্রোফেসার সাহেব, আজ কোনদিকে যাবেন ?"

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এঁকে, নাম সূচা সিং। প্রায় ছ' ফিট লম্বা, কব্জি দুটো আমার উরুর মতন চওড়া, মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি। সূচা সিং এখানে অনেকগুলো বাস আর ট্যাক্সির মালিক, খুব জবরদস্ত ধরনের মানুষ। কী কারণে যেন উনি আমার কাকাবাবুকে প্রোফেসার বলে ডাকেন, যদিও কাকাবাবু কোনওদিন কলেজে পড়াননি। কাকাবাবু আগে দিল্লিতে গভর্নমেন্টের কাজ করতেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কাশ্মীরে এসে প্রথম কয়েকদিনই অবাক হয়ে লক্ষ করেছিলুম, এখানে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে, আশ্চর্য ব্যাপার, না ? কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এর কারণ। কাকাবাবু বলেছিলেন, ভ্রমণকারীদের দেখাশোনা করাই তো কাশ্মীরের লোকদের প্রধান পেশা। আর ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি—বাঙালিরা খুব বেড়াতে ভালবাসে—তাই বাঙালিদের কথা শুনে শুনে এরা অনেকেই বাংলা শিখে নিয়েছে। যেমন, সাহেব মেম অনেক আসে বলে এরা ইংরাজিও জানে বেশ ভালই। এখানেই একটা ঘোড়ার সহিসকে দেখেছি, বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে, সে কোনওদিন

ইস্কুলে পড়েনি, নিজের নাম সই করতেও জানে না—অথচ ইংরেজি, বাংলা, উরদু বলে জলের মতন।

সূচা সিং ভাঙা ভাঙা উরদু আর বাংলা কথা মিলিয়ে বলেন। কিন্তু উরদু তো আমি জানি না, তন্দুরস্তি, তাকাল্লুফ এই জাতীয় দু' চারটে কথার বেশি শিখতে পারিনি—তাই ওর কথাগুলো আমি বাংলাতেই লিখব।

কাকাবাবু সূচা সিংকে পছন্দ করেন না। লোকটির বড্ড গায়ে পড়া ভাব আছে। কাকাবাবু একটু নির্লিপ্তভাবে বললেন, "কোনদিকে যাব ঠিক নেই। দেখি কোথায় যাওয়া যায়!"

সূচা সিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, "চলুন, কোনদিকে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি!"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, তার দরকার নেই। আমরা একটু কাছাকাছি ঘুরে আসব।"

"আমার তো গাড়ি যাবেই, নামিয়ে দেব আপনাদের।"

"না, আমরা বাসে যাব।"

"সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন। আমার একটা ভ্যান যাচ্ছে। ওটাতে যাবেন, আবার ফেরার সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন।"

প্রস্তাবটা এমন কিছু খারাপ নয়। সূচা সিং বেশ আন্তরিকভাবেই বলছেন, কিন্তু পাত্তা দিলেন না কাকাবাবু। হাতের ভঙ্গি করে সূচা সিং-এর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "না, কোনও দরকার নেই।"

কাকাবাবু যে সূচা সিংকে পছন্দ করছেন না এটা অন্য যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সূচা সিং-এর সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। চেয়ারটা কাকাবাবুর কাছে টেনে এসে খাতির জমাবার চেষ্টা করে বললেন, "আপনার এখানে কোনও অসুবিধা কিংবা কষ্ট হচ্ছে না তো? কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন!"

কাকাবাবু বললেন, "না না, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।"

"চা খাবেন তো? আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খান।"

কাকাবাবু সংক্ষেপে বললেন, "আমি চা খেয়েছি, আর খাব না!"

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন। আমি এর মানে জানি। আমি লক্ষ করেছি, সূচা সিং সিগারেট কিংবা চুরুটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য করতে পারেন না। কাকাবাবু ওঁকে সরাবার জন্যই চুরুট ধরালেন। সূচা সিং কিন্তু তবু উঠলেন না—নাকটা একটু কুঁচকে সামনে বসেই রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রোফেসার সাব, কিছু হদিস পেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "কী পাব?"

"যা খুঁজছেন এতদিন ধরে?"

কাকাবাবু অপলকভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সূচা সিং-এর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না, কিছুই পাইনি। বোধহয় কিছু পাওয়া যাবেও না!"

"তাহলে আর খোঁড়া পা নিয়ে এত তকলিফ করছেন কেন?"

"তবু খুঁজছি, কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা।"

"আপনারা বাঙালিরা বড় অদ্ভুত। আপনি যা খুঁজছেন, সেটা খুঁজে পেলে তা তো গভর্নমেন্টেরই লাভ হবে। আপনার তো কিছু হবে না। তাহলে আপনি গভর্নমেন্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন? গভর্নমেণ্টকে বলুন, লোক দেবে, গাড়ি দেবে, সব ব্যবস্থা করবে— আপনি শুধু খবরদারি করবেন।"

কাকাবাবু হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সূচা সিং-এর দিকে। তারপর বললেন, "এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয়! গভর্নমেন্ট সব ব্যবস্থা করবে, তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তখন সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না?

"লজ্জা কী আছে, গভর্নমেন্টের তো কত টাকারই শ্রাদ্ধ হচ্ছে; কম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল্!"

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন সিংজী! বাঙালিরা ভারি অদ্ভুত। তারা নিজেদের ভাল মন্দ বোঝে না।

সূচা সিং বললেন, আপনাকে দেখেই বুঝেছি, আপনি ভাল আদমি, কিন্তু একদম চালাক নন্।

একটা কথা আগে বলা হয়নি, কাকাবাবু কাশ্মীরে এসেছেন গন্ধকের খনি খুঁজতে। কাকাবাবুর ধারণা, কাশ্মীরের পাহাড়ের নীচে কোথাও প্রচুর গন্ধক জমা আছে। কাশ্মীর সরকারকে জানিয়েছেন সে কথা। সরকারকে না জানিয়ে তো কেউ আর পাহাড় পর্বত মাপামাপি করতে পারে না—বিশেষত কাশ্মীরের মতন সীমান্ত এলাকায়। আমি আর কাকাবাবু তাই গন্ধকের খনি আবিষ্কার করার কাজ করছি।

সূচা সিং বললেন, "প্রোফেসারসাব, ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এখানে পাহাড়ের নীচে সোনার খনি আছে। সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

কাকাবাবু খানিকটা নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "আপনি জানেন, এখানে সোনা পাওয়া যাবে?"

"ডেফিনিটলি। আমি খুব ভালভাবে জানি।"

"আপনি যখন জানেনই যে এখানে সোনা আছে, তাহলে আপনিই সেটা আবিষ্কার করে ফেলুন না!"

"আমার যে আপনাদের মতন বিদ্যে নেই। ওসব খুঁজে বার করা আপনাদের কাজ। আমি তো শুনেছি, টাটা কম্পানির যে এত বড় ইস্পাতের কারখানা,

সেই ইস্পাতের খনি তো একজন বাঙালিই আবিষ্কার করেছিল !"

কাকাবাবু চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন, "কিন্তু সিংজী, সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কী লাভ হবে! সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেন্টের হয়। গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবে।"

সূচা সিং উৎসাহের চোটে টেবিলে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, "নিক না গভর্নমেন্ট ! তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি ! আমি আপনাকে সাহায্য করব। এখানে মুস্তফা বশীর খান বলে একজন বুড়ো আছে, খুব ইমানদার লোক। সে আমাকে বলেছে, মার্তণ্ডের কাছে তার ঠাকুর্দা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল।"

"আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান।"

"আরে শুনুন, শুনুন, প্রোফেসারসাব—"

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, "ওঠ্ সন্তু। আমাদের বাসের সময় হয়ে এসেছে ! তোর খাওয়া হয়েছে ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। একটু জল খাব।"

"খেয়ে নে। ফ্লাস্কে জল ভরে নিয়েছিস তো ?"

তারপর কাকাবাবু সূচা সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কি ধারণা, মাটির তলায় আস্ত আস্ত সোনার চাঁই পাওয়া যায় ? পাথরের মধ্যে সোনা পাওয়া গেলেও তা গালিয়ে বার করা একটা বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া সাধারণ লোক ভাবে সোনাই সবচেয়ে দামি জিনিস। কিন্তু তুমি ব্যবসা করো—তোমার তো বোঝা উচিত, অনেক জিনিসের দাম সোনার চেয়েও বেশি—যেমন ধরো কেউ যদি একটা পেট্রোলের খনির সন্ধান পেয়ে যায়—সেটার দাম সোনার খনির চেয়েও কম হবে না। তেমনি, গন্ধক শুনে হেলাফেলা করছ, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি প্রচুর পরিমাণে সালফার ডিপোজিটের খোঁজ পাওয়া যায়—"

"সে তো হল গিয়ে যদি-র কথা। যদি গন্ধক থাকে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কাশ্মীরে সোনা আছেই !"

"তাহলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও ! আয় সন্তু—"

সূচা সিং হঠাৎ খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, "কী খোকাবাবু, কোনদিকে যাবে আজ ?"

সূচা সিং-এর বিরাট হাতখানা যেন বাঘের থাবা, তার মধ্যে আমার ছোট্ট হাতটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবু বললেন, "আজ আমরা দূরে কোথাও যাব না, কাছাকাছিই ঘুরব।"

সূচা সিং আমাকে আদর করার ভঙ্গি করে বললেন, "খোকাবাবুকে নিয়ে একদিন আমি বেড়িয়ে আনব। কী খোকাবাবু, কাশ্মীরের কোন কোন জায়গা দেখা হল ? আজ যাবে আমার সঙ্গে ? একদম শ্রীনগর ঘুরিয়ে নিয়ে আসব !"

শ্রীনগরের নাম শুনে আমার একটু একটু লোভ হচ্ছিল, তবু আমি বললাম, "না।"

সূচা সিং-এর হাত ছাড়িয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সূচা সিং-ও এলেন পেছনে পেছনে। আমরা তখন বাস স্ট্যান্ডের দিকে না গিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যদিকে।

কাকাবাবু সূচা সিংকে মিথ্যে কথা বলেছেন। আমরা যে আজ সোনমার্গে যাব, তা তো সকাল থেকেই ঠিক আছে। কাকাবাবু সূচা সিংকে বললেন না সে কথা। গুরুজনরা যে কখনও মিথ্যে কথা বলেন না, তা মোটেই ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বলেন। যেমন, আর একটা কথা, কাকাবাবু অনেককে বলেছেন বটে যে তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন—কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। কাকাবাবু হয়তো ভেবেছেন, ছেলেমানুষ বলে আমি সব কিছু বিশ্বাস করব। কিন্তু আমি তো ততটা ছেলেমানুষ নই। আমি এখন ইংরিজি গল্পের বইও পড়তে পারি। কাকাবাবু অন্য কিছু খুঁজছেন। সেটা যে কী তা অবশ্য আমি জানি না। সূচা সিংও কাকাবাবুকে ঠিক বিশ্বাস করেননি। সূচা সিং-এর সরকারি মহলের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা, সেখান থেকে কিছু শুনেই বোধহয় সূচা সিং সুযোগ পেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন। সূচা সিং-এর কি ধারণা, কাকাবাবু গন্ধকের নাম করে আসলে সোনার খনিরই খোঁজ করছেন ? আমরা কি সত্যিই সোনার সন্ধানে ঘুরছি ?

সূচা সিং-এর দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা চলে এসেছি খানিকটা দূরে। রোদ উঠেছে বেশ, পথে এখন অনেক বেশি মানুষ। আজ শীতটা একটু বেশি পড়েছে। আজ সুন্দর বেড়াবার দিন।

বাসের এখনও বেশ খানিকটা দেরি আছে। সূচা সিং-এর জন্য আমরা বাস ডিপোতে যেতেও পারছি না। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কাকাবাবু আপনমনে চুরুট টেনে যাচ্ছেন। আমি একটা পাথরের টুকরোকে ফুটবল বানিয়ে সুট দিচ্ছিলাম—

হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "আরেঃ, স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিণি—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওরা ?"

উত্তর না দিয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, "এই স্নিগ্ধাদি !"

এক ডাকেই শুনতে পেল। ওরাও আমাকে দেখে অবাক। এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। আমি কাকাবাবুকে বললাম— "কাকাবাবু, তুমি ছোড়দির বন্ধু স্নিগ্ধাদিকে দেখোনি ?"

উৎসাহে আমার মুখ জ্বলজ্বল করছে। এতে দূরে হঠাৎ কোনও চেনা মানুষকে দেখলে কী আনন্দই যে লাগে। কলকাতায় থাকতেই অনেকদিন স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়নি—আর আজ হঠাৎ এই কাশ্মীরে ! বিশ্বাসই হয়

না ! কাকাবাবু কিন্তু খুব একটা উৎসাহিত হলেন না। আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখলেন।

স্নিগ্ধাদি আমার ছোড়দির ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে। ছোড়দির বিয়ে হবার ঠিক এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল স্নিগ্ধাদির। স্নিগ্ধাদির বিয়েতে আমি ধুতি পরে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে সেই প্রথম ধুতি পরা। সিদ্ধার্থদাকেও আমরা আগে থেকে চিনি, ছোড়দিদের কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমাদের পাড়ার ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন। স্নিগ্ধাদির সঙ্গে সিদ্ধার্থদার বিয়ে হবার পর একটা মুস্কিল হল। স্নিগ্ধাদিকে স্নিগ্ধা বৌদি বলে ডাকতে হয়, কিংবা সিদ্ধার্থদাকে জামাইবাবু। আমি কিন্তু তা পারি না। এখনও সিদ্ধার্থদা-ই বলি ! আর রিণি হচ্ছে স্নিগ্ধাদির বোন আমারই সমান, ক্লাস এইট-এ পড়ে। পড়াশুনোয় এমনিতে ভালই, কিন্তু অঙ্কে খুব কাঁচা। কঠিন অ্যালজেব্রা তো পারেই না, জিওমেট্রি এত সোজা—তাও পারে না। তবে রিণি বেশ ভাল ছবি আঁকে।

স্নিগ্ধাদি কাছে এসে এক মুখ হেসে বললেন, "কী রে সন্তু, তোরা কবে এলি, আর কে এসেছে ? মাসীমা আসেননি ? বনানীও আসেনি ?"

আমি বললাম, "ওঁরা কেউ আসেনি। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছি।"

কাকাবাবুর কথা শুনে ওরা তিনজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল কাকাবাবুকে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে কাকাবাবু তো দিল্লিতেই থাকতেন বেশির ভাগ— তাই স্নিগ্ধাদি দেখেননি আগে।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে বললেন, "আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনি তো আরকিওলজিক্যাল সারভে-তে ডাইরেকটর ছিলেন ? আমার এক মামার সঙ্গে আপনার—"

কাকাবাবুর কথাবার্তা বলার যেন কোনও উৎসাহই নেই। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করো ?"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমি কলকাতায় একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই।"

কাকাবাবু সিদ্ধার্থদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ইতিহাস পড়াও ? তোমার সাবজেক্ট কী ছিল ? ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ?"

সিদ্ধার্থদা বিনীতভাবে বললেন, "হ্যাঁ। আমি বৌদ্ধ আমল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ও, বেশ ভাল। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগল। এবার আমাদের যেতে হবে। চল্ সন্তু—"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আপনারা কোনদিকে যাবেন ? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক্।"

আমি অধীর আগ্রহে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। কাকাবাবু যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে কী ভালই যে হয় ! রোজই তো পাথর মাপামাপি করি,

আজ একটা দিন যদি সবাই মিলে বেড়ানো যায় ! তা ছাড়া, হঠাৎ স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "নাঃ, তোমরাই ঘুরে-টুরে দ্যাখো। পহলগ্রাম বেশ ভাল জায়গা। আমরা অন্য জায়গায় যাব, আমাদের কাজ আছে।"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "তা হলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে !"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "সন্তু, তুই তো এখানে কয়েকদিন ধরে আছিস। তুই তা হলে আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে-টুরে দ্যাখা। আমরা তো উঠেছি শ্রীনগরে, এখানে একদিন থাকব—"

আমি উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "স্নিগ্ধাদি, শ্রীনগর কী রকম জায়গা ?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "কী চমৎকার, তোকে কি বলব। এত ফুল, আর আপেল কী শস্তা ? তোরা এখনও যাসনি ওদিকে ?"

"না !"

"এত সুন্দর যে মনে হয়, ওখানেই সারা জীবন থেকে যাই।"

আমি একটু অহংকারের সঙ্গে বললাম, পহলগ্রামও শ্রীনগরের চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। এখানে কাছাকাছি আরও কত ভাল জায়গা আছে !

রিণি বলল, "এই সন্তু, তুই একটু রোগা হয়ে গেছিস কেন রে ? অসুখ করেছিল ?"

আমি বললাম, "না তো !"

"তা হলে তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?"

"ভ্যাট ! মোটেই না !"

নদীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিণি জিজ্ঞেস করল, "এই নদীটার নাম কি রে ?"

আমি বললাম, এটার নাম হচ্ছে লীদার নদী। আগেকার দিনে এর সংস্কৃত নাম ছিল লম্বোদরী ! লম্বোদরী থেকেই লোকের মুখে মুখে লীদার হয়ে গেছে। আবার অমরনাথের রাস্তায় এই নদীটাকেই বলে নীল গঙ্গা।

স্নিগ্ধাদি হাসতে হাসতে বললেন, "সন্তুটা কী রকম বিজ্ঞের মতন কথা বলছে ! ঠিক পাকা গাইডদের মতন..."

আমি বললাম, "বাঃ, আমরা তো এখানে দুঃ সপ্তাহ ধরে আছি। সব চিনে গেছি। আমি একা একা তোমাদের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।"

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুমি কি তাহলে এদের সঙ্গে থাকবে ? তাই থাকো না হয়—"

আমি চমকে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবুর গলার আওয়াজটা যেন একটু অন্য রকম। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা কান্নাকান্না ভাব এসে

গেল। কাকাবাবু নিশ্চয়ই আমার ওপরে অভিমান করেছেন। তাই আমাকে থাকতে বললেন। আমি তো জানি, খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা একলা কোনও কাজই করতে পারবেন না। সাহায্যও নেবেন না অন্য কারুর।

আমি বললাম, "কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।"

কাকাবাবু তবু বললেন, "না, তুমি থাকো না! আজ একটু বেড়াও ওদের সঙ্গে। আমি একলাই ঘুরে আসি।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব!"

কাকাবাবুর মুখখানা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন, "চলো তাহলে। আর দেরি করা যায় না।"

আমি সিদ্ধার্থদাকে বললাম, "আপনারা এখানে কয়েকদিন থাকুন না। আমরা তো আজ সন্ধেবেলাতেই ফিরে আসছি—"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাব—"

"সেই অমরনাথ মন্দির পর্যন্ত যাবেন? সে তো অনেকদিন লাগবে!"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "ঐ রাস্তায় যাব, যতটা যাওয়া যায়—খুব বেশি কষ্ট হলে যাব না বেশিদূর। ফিরে এসে তোদের সঙ্গে দেখা হবে। তোরা কি এখানেই থাকছিস?"

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা এখানে কতদিন থাকবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক নেই।"

বাস এসে গেছে। আমি আর কাকাবাবু বাসে উঠে পড়লাম। চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি আর রিণি হেঁটে যাচ্ছে লীদার নদীর দিকে। রিণি তরতরিয়ে এগিয়ে গিয়ে নদীটার জলে পা ডোবাল।

আকাশ পুরনো হয় না

সোনমার্গেও আজ বেশ ভিড়। প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। বরফের ওপরে স্কেটিং করছে, লাফাচ্ছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে অনেকে। বরফের ওপর লাফালাফি করার কী মজা, পড়ে গেলেও একটুও ব্যথা লাগে না, জামা কাপড় ভেজে না। এমনকী শীতও কম লাগে। এখানকার হাওয়াতেই বেশি শীত। একটা মেয়ে-ইস্কুল থেকে দল বেঁধে বেড়াতে এসেছে, এক রকম পোশাক পরা গোটা চল্লিশেক মেয়ে, কী হুড়োহুড়িই করছে সেখানে। আর দু'জন সাহেব মেম মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে অনবরত।

আমরা অবশ্য ওদিকে যাব না। আমাদের খেলাধুলো করার সময় নেই। কাকাবাবু কাশ্মীরের ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আমাকে বললেন, "চলো।"

কাশ্মীরে এসে একটা লাভ হয়েছে, আমি বেশ ভাল ঘোড়ায় চড়তে-পারি এখন ! প্রথম দু' একদিন অবশ্য ভয় ভয় করত, গায়ে কী ব্যথা হয়েছিল ! এখন সব সেরে গেছে। এখন ঘোড়া গ্যালপ করলেও আমার অসুবিধে হয় না। প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গেই একটা করে পাহারাদার ছেলে থাকে, আমি আমার সঙ্গের ছেলেটাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যাই।

সেই নির্জন পাহাড়ের ওপর দিয়ে একলা একলা ঘোড়া চালাতে চালাতে নিজেকে মনে হয় ইতিহাসের কোনও রাজপুত্রের মতন। অন্য কারুকে অবশ্য এ কথাটা বলা যায় না, নিজের মনে মনেই ভাবি। যেন আমি কোন এক নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা করেছি।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোড়া চালিয়ে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলুম। এখানে কিছু নেই, সব দিক ফাঁকা, এদিকে ওদিকে থোকা থোকা বরফ ছড়ানো, মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। তিনদিক ঘিরে আছে বিশাল বিশাল পাহাড়—মেঘ ফুঁড়ে আরও উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চূড়া। এক দিকে ঢালু হয়ে বিশাল খাদ, অনেক নীচে দেখা যায় কিছু গাছপালা আর একটা গ্রামের মতন।

এই পাহাড়টাতেও আমরা আগে একবার এসেছি, দিন আষ্টেক আগে। পাহাড়টা বেশি উঁচু নয়, অনেকটা ঢিপির মতন—আরও দুটো পাহাড় পেরিয়ে এটায় আসতে হয়। দু' চারটে বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ আছে এ পাহাড়ে—পাইন গাছগুলোর ওপর বরফ পড়ে আছে, ঠিক যেন বরফের ফুল ফুটেছে। এখানে আবার নতুন করে মাপামাপি করার কী আছে কে জানে। সব দিকেই তো শুধু বরফ ছড়ানো। বরফ না খুঁড়লে কী করে বোঝা যাবে নীচে কী আছে ? আর এই বরফের নীচে কি গন্ধক পাওয়া সম্ভব ? কিংবা সোনা ?

কাকাবাবু ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে ছুটি দিয়ে দিলেন। বললেন বিকেলবেলা আসতে। ঘোড়া দুটো বাঁধা রইল। আমাদের সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর ফ্লাস্কে কফি আছে—আমাদের আর খাবারদাবারের জন্য নীচে নামতে হবে না।

ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে কাকাবাবু তার ওপর বসলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা হলদেটে, পোকায়-খাওয়া পুরনো বই বার করে দেখতে শুরু করলেন। আমাকে বললেন, "সন্তু, তুমি ততক্ষণ চার পাশটা একটু দেখে নাও—একটু পরে কাজ শুরু করা যাবে।"

আমার মন খারাপ ভাবটা তখনও যায়নি। একটু ক্ষুণ্ণভাবে বললাম, "কাকাবাবু, এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি। আজ আর নতুন করে কী দেখব ?"

কাকাবাবু বই থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, "তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল ঐ সিদ্ধার্থদের সঙ্গে

বেড়াতে ? তা তো হবেই, ছেলেমানুষ—”

আমি থতমত খেয়ে বললাম, “না, না, আমি কাজ করতেই চাই। এখন কাজ শুরু হবে না ?”

কাকাবাবু আমার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, “কোনও কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভাল করে দেখে নিতে হয়। শোনো, দেখার জিনিসের কোনও শেষ নেই। কোনও জায়গাতে গিয়েই কখনও ভাববে না, দেখার কিছু নেই সেই জায়গায়। খোলা চোখ নিয়ে তাকালেই অনেক কিছু দেখতে পাবে। যেমন ধরো আকাশ। আকাশ কি কখনও পুরনো হয় ? কোনও মানুষ সারাজীবনে এক রকমের আকাশ দু'বার দেখে না। প্রত্যেকদিন আকাশের চেহারা অন্যরকম। এই পাহাড়ও তাই। কখনও রোদ্দুর, কখনও ছায়া—অমনি পাহাড়গুলোর চেহারা বদলে যায় না ? একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো—তাহলেই বুঝতে পারবে।”

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা আজ সত্যিই খুব সুন্দর। হালকা তুলোর মতন মেঘ বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছে। সেই মেঘগুলোর চেয়ে আরও উঁচুতে আবার ঘন কালো রঙের মেঘ— অথচ রোদ্দুরও হয়েছে। রিণিদের সঙ্গে যদি দেখা না হত, বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে না জাগত—তাহলে এই আকাশের দিকে তাকালে ভালই লাগত।

কাকাবাবু বইটা পড়তে লাগলেন, আমি পাহাড়ের উল্টোদিকে একটুখানি নেমে গেলাম। এখানে একটা ছোট্ট গুহা আছে। গুহার মুখটা বেশ বড়, কিন্তু বেশি গভীর নয়। আগে বইতে পাহাড়ের গুহার কথা পড়লেই মনে হত, সেটা হবে অন্ধকার-অন্ধকার, বাদুড়ের গন্ধ আর হিংস্র পশুর বাসা। সেদিক থেকে এই গুহাটা দেখলে নিরাশই হতে হয়। কাশ্মীরে হিংস্র জীবজন্তু বিশেষ নেই। গুহাটা বেশ ঝকঝকে তকতকে। এক জায়গায় একটা ভাঙা উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ। মনে হয় এইখানে এক সময় কেউ ছিল। এতদূরে কেউ তো আর পিকনিক করতে আসবে না। বোধহয় কোনও সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন কোনও সময়।

গুহাটার মধ্যে একটু বসেছি অমনি বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে লাগল। আমিও ছুটে বাইরে এলাম। বরফ পড়ার সময় ভারী মজা লাগে। ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতন হালকা বরফ; গায়ে পড়লেও জামাকাপড় ভেজে না—হাতে জমিয়ে-জমিয়ে শক্ত বলের মতনও বানানো যায়। বরফের মধ্যে খানিকটা দৌড়োদৌড়ি করে আমি শীত কমিয়ে নিলাম। তারপরে হাঁটুগেড়ে বসে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমিয়ে মন্দির বানাতে লাগলাম একটা।

কাকাবাবুও নেমে এসেছেন। বললেন, “এসো এবার কাজ শুরু করা যাক। খানিকটা কাজ করে তারপরে আমরা খেয়ে নেব। তোমার খিদে পায়নি তো ?”

"না, এক্ষুনি কী খিদে পাবে !"

"বেশ। ফিতেগুলো বার করো।"

ব্যাগ দুটো আমি গুহার মধ্যে রেখেছিলাম। সেগুলো নিতে এলাম, কাকাবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। গুহার চার পাশটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, "এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ। এইটার জন্যই এখানে আসি।"

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, "কাকাবাবু, আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না ? তাহলে বেশ মজা হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে কি থাকা যায় ? শীতে মরে যাব। সামনেটা তো খোলা—যখন বরফের ঝড় উঠবে—"

"কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো এই রকম গুহাতেই থাকে !"

"সন্ন্যাসীরা যা পারে, তা কি আমরা পারি ! সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে।"

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে গুহার দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন। চিন্তিতভাবে বললেন, "এই গুহার কোনও জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে ? মনে তো হচ্ছে না।"

আমি কিছু বললাম না। পাথর আবার কখনও ফাঁপা হয় নাকি ?

কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ গুহাটা পরীক্ষা করলেন। মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন। তারপর নিরাশ ভাবে বললেন, "নাঃ, এখানে কিছু আশা নেই।"

কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে কী যে পাবার আশা করেছিলেন, তা-ও বুঝতে পারলাম না আমি।

আর সময় নষ্ট না করে আমরা মাপার কাজ শুরু করলাম। এই মাপার কাজটা ঠিক যে পর পর হয় তা নয়। কাকাবাবু ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন, আর একটা দিক ধরে আমি নেমে যাই, যতক্ষণ না ফিতেটা শেষ হয়। সেখানে আমি পা দিয়ে একটা দাগ কাটি। কাকাবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, এবার ডান দিকে যাও ! ডানদিকটা হয়ে গেলে কাকাবাবু হয়তো বলেন, এবার বাঁ দিকে যাও অর্থাৎ, কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি চারদিকে ঘুরতে থাকি। তারপর কাকাবাবু আবার খানিকটা এগিয়ে যান, আমি আবার মাপতে শুরু করি !

সত্যি কথা বলতে কী, এরকমভাবে মাপায় যে কোনওরকম কাজ হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি ! আমি ক্লান্ত হয়ে যাই, কাকাবাবু কিন্তু ক্লান্ত হন না। দিনের পর দিন এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ফেরার পর স্কুলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে এতদিন কাশ্মীরে থেকে কী করলি ? আমি যদি বলি, আমি শুধু কাকাবাবুর সঙ্গে পাথর মেপে এলাম—তা হলে কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে ? কিংবা হয়তো হাসবে !

ঘণ্টা দু-এক বাদে আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম। পাহাড়টার চূড়া থেকে আমরা অনেকটা নীচে চলে এসেছি। পাহাড়ের নীচের গ্রামটা এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, রুপোর তারের মতন একটা নদী !

কাকাবাবু বললেন, "ডানদিকে দ্যাখো। উপত্যকা দেখতে পাচ্ছ ?"

ডানদিকে আর একটা খাড়া পাহাড়, তার নীচে ছোট্ট উপত্যকা। সেই উপত্যকায় অনেকটা বেশ পরিষ্কার জমি। ঠিক যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সেখানে কয়েকটা কী যেন জন্তু নড়াচড়া করছে। এত দূরে যে ভাল করে দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, "ওগুলো কি জন্তু বুঝতে পারছ ?"

না, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কুকুর। নাকি হরিণ ওগুলো ? কাকাবাবুর কাছে সব সময় ছোট একটা দূরবীন থাকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "ভাল করে দ্যাখো।"

দূরবীন চোখে দিয়েই দেখতে পেলাম, কুকুর কিংবা হরিণ না, কতগুলো ঘোড়া সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে একটাও মানুষজন নেই।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "কাকাবাবু, ওগুলো কি বুনো ঘোড়া ? ওদের কখনও কেউ ধরেনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ঠিক তার উল্টো।"

আমি অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। ঘোড়ার উল্টো মানে কি ? মেয়ে-ঘোড়া ? মেয়ে ঘোড়াকে কি ঘুড়ী বলে ? ঠিক জানি না। ইংরেজিতে বলে মেয়ার ?

"কাকাবাবু, ওগুলো কি তবে মেয়ার ?"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "না, তা বলিনি। ওগুলো বুনো ঘোড়া নয়, ওগুলো বুড়ো ঘোড়া। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেতো ঘোড়া।"

"ওগুলো সব বুড়ো ঘোড়া ? এক সঙ্গে এত বুড়ো ঘোড়া কোথা থেকে এল ? তুমি কী করে জানলে ?"

"আমি আগেও দেখেছি। এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায়। এইগুলো হচ্ছে ঘোড়াদের কবরখানা। এই সব পাহাড়ী জায়গাতে তো বুড়ো ঘোড়া কোনও কাজে লাগে না, তাই ঘোড়াগুলো খুব বুড়ো হয়ে গেলে এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে উঠে আসতে পারবে না। ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন !"

—"ইস, কী নিষ্ঠুর ! কেন, বাড়িতে রেখে দিতে পারে না ?"

"নিষ্ঠুর নয় ! বাড়িতে রেখে দিলে তো খেতে দিতেও হয়। এরা গরিব মানুষ, কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কারুকে খাওয়াতে পারে ? তাই চোখের আড়ালে যাতে মরে যায়, তাই ছেড়ে দিয়ে আসে। নিজের হাতে

মারতে হল না। বুড়ো ঘোড়ার কোনও দাম নেই, কেউ কিনবেও না। এদেশে তো কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না—তাহলে বাজারে বিক্রি হতে পারত। ফ্রান্সে ঘোড়ার মাংস খায়—"

ঘোড়াগুলো ওখানে থেকে মরার জন্য প্রতীক্ষা করছে—একথা ভেবেই আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ততদিন ওদের যত্ন ছিল। মানুষ বড় স্বার্থপর ! মানুষও তো খুব বুড়ো হয়ে গেলে আর কাজ করতে পারে না। তখন কি তাদের কেউ ওরকমভাবে ছেড়ে দিয়ে আসে ?

আমি দূরবীনটা নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। এবার দেখতে পেলাম, ঐ উপত্যকার এখানে-সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে। আগে যারা মরেছে। যে-ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলোও খুব রোগা রোগা। খাবার কিছুই নেই বোধহয়। ঘোড়ারা কি আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝতে পারে ?

কাকাবাবু বললেন, "নাও, আবার কাজ শুরু করা যাক্।"

আমি ফিতের বাক্স নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

এর পরেই একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই বরফে ক্রাচ পিছলে গেল। কাকাবাবু মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবুকে ধরার জন্য আমি হাতের জিনিস ফেলে ছুটতে যাচ্ছিলাম ; কাকাবাবু সেই অবস্থায় থেকেই আমাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই সন্তু দৌড়বি না ! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়তে নেই। আমি নিজেই উঠছি !

আমি থমকে দাঁড়ালাম। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। ক্রাচটা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আবার পড়ে গেলেন। এবার পড়েই গড়াতে লাগলেন নীচের দিকে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। এবার আমি দৌড়তেও সাহস পেলাম না। নীচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। কাকাবাবু গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন— সেই ঘোড়াদের কবরখানার দিকে। কাকাবাবু দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে কিছু একটা চেপে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরার কিছু নেই, একটা গাছ বা লতাপাতাও নেই। আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে লাগল। কী হবে ? এখন কী হবে ? আমি একবার পাঁচ ছ'টা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছিলাম আমার বাড়িতে···। কিন্তু এ তো হাজার হাজার সিঁড়ির চেয়েও নিচু···

খানিকটা দূরে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। সেখানেও গাছপালা কিছু নেই, কী ধরে কাকাবাবু থামলেন জানি না। থেমে গিয়ে কাকাবাবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। এবার আর কিছু না ভেবে আমি দৌড় লাগালাম কাকাবাবুর দিকে। সব সময় তো আর সাবধান হওয়ার কথা মনে থাকে না ! দৌড়েই

বুঝতে পারলাম, কী দারুণ ভুল করেছি ! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়তে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না। আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে !

কাকাবাবুর কাছাকাছি গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। ওঁর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কাকাবাবু !"

কাকাবাবু মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "বললাম না, পাহাড়ের নীচের দিকে দৌড়তে নেই ! আর কক্ষনো এ রকম করবে না !"

সে কথা অগ্রাহ্য করে আমি বললাম, "কাকাবাবু, তোমার লাগেনি তো ?"

"তোমার লেগেছে কি না বলো !"

"না, আমার কিছু হয়নি। তুমি···তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে···"

"ও কিছু না। ওতে কিছু হয় না।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেলাম। কাকাবাবু আমার হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা, কিন্তু মনের জোর অসাধারণ। এমন ভাব করলেন, যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু চোখে হাত দিয়েই কাকাবাবু বললেন, "এই যা ! আমার চশমা ?"

চশমা ছাড়া কাকাবাবু চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। খুব কাছ থেকেও মানুষ চিনতে পারেন না। গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবুর চশমাটা কোথাও হারিয়ে গেছে। কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

হারিয়ে গেলে যদি অসুবিধেয় পড়তে হয়, সেই জন্য কাকাবাবুর এক জোড়া চশমা থাকে। আর একটা আছে তাঁবুতে। আমি বললাম, "যাক গে, কাকাবাবু, তোমার তো আর একটা চশমা আছে !"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু এখন আমি এতটা রাস্তা ফিরব কী করে ? তা ছাড়া সেটাও যদি কোনওরকমে হারিয়ে যায়, তা হলে তো সব কাজই বন্ধ হয়ে যাবে ! তুমি দাঁড়াও আমি চশমাটা খুঁজে দেখি !"

সেই ঢালু পাহাড়ে এক পা উঠতে বা নামতেই ভয় করে—সেখানে চশমা খোঁজা যে কী শক্ত ব্যাপার, তা বলে বোঝানো যাবে না। কাকাবাবু আর আমি দু'জনে দু'জনকে ধরে রইলাম, তারপর খুঁজতে লাগলাম চশমা। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দেখা গেল, বরফের মধ্যে সেটা গেঁথে আছে, একটা ডাঁটি ভাঙা—আর কোনও ক্ষতি হয়নি।

হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। কাকাবাবু যদি তখন সত্যি সত্যি পড়ে যেতেন, আমি একলা এখানে কী করতাম ? কাকাবাবুকে ফেলে আমি ফিরেও যেতে পারতাম না, কিংবা একলা একলা···

আমি আবার বসে পড়ে বললাম, "কাকাবাবু, আমার এই কাজ ভাল লাগে না !"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল লাগে না ? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ?"

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজা করে বসে রইলাম। সত্যি আমার চোখে

জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু কাকাবাবুকে আমি তা দেখতে দিইনি।

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও !"

"আর তুমি কী করবে ? তুমি এখানে একলা একলা থাকবে ?"

"হ্যাঁ। আমি থাকব। আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি, সেটা শেষ না করে যাব না।"

সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে যাবার কথা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবুকে একলা ফেলে যেতেও ইচ্ছে করে না। কাকাবাবু একলা একলা পাহাড়ে ঘুরবেন— কাকাবাবু কি ভাবছেন, আমি নিজের কষ্টের কথা ভেবে চলে যেতে চাইছি ? মোটেই তা নয় ! কাকাবাবুর জন্যই তো আমার চিন্তা হচ্ছে।

আমি বললাম, "কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব তোমার সঙ্গে ফিরব। কিন্তু ফিতে মাপার কাজ আমার ভাল লাগে না।"

"ঠিক আছে, কাল থেকে অন্য একটা কমবয়সী ছেলেকে ঠিক করব— সে ফিতে ধরবে, আর তুমি আমার পাশে থাকবে।"

"কিন্তু কাকাবাবু, আমরা কী খুঁজছি ? কী হবে এই রকম ফিতে মেপে ?"

কাকাবাবু একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "সন্তু, তুমি তো এখনও ছেলেমানুষ, এখন সব বুঝবে না। বড় হলে বুঝবে, আমরা যা খুঁজছি, যদি পাই, সেটা কত বড় আবিষ্কার !"

"তাহলে আরও লোকজন নিয়ে এসে ভাল করে খুঁজলে হয় না ?"

"আমি বিশেষ কারুকে বলতে চাই না। কারণ যা খুঁজছি তা যদি শেষ পর্যন্ত না পাই, লোকে শুনে হাসাহাসি করবে। পাবই যে তারও কোনও মানে নেই। সুতরাং চুপচাপ খোঁজাই ভাল, যদি হঠাৎ পেয়ে যাই, তখন সবাই অবাক হবে। তখন তোমাকেই সবাই বলবে বাহাদুর ছেলে !"

"কাকাবাবু, আমরা আসলে কী খুঁজছি ? সোনা ?"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "কী বললে, সোনা ? না, না, সোনাটোনা কিছু নয়। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কেউ সোনা পায় নাকি ? যত সব বাজে কথা !"

"তাহলে ?"

"আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুয়ো। চৌবাচ্চাও বলতে পারো। কিন্তু সাধারণ চৌবাচ্চার থেকে অনেক গভীর। চলো, আজকের মতন ফেরা যাক।"

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাস্তায়

সেদিন সন্ধেবেলা পহলগ্রামে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে টের পেলাম, আমার বাঁ পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। কখন একটু মচকে গেছে টের পাইনি।

আয়োডেক্স মালিশ করলাম বেশ করে। কাকাবাবু যদিও বললেন, তাঁর কিছু হয়নি, তবুও আমি ওঁর দু' পায়ে মলম মালিশ করে দিলাম।

বলতে ভুলে গেছি, এখানে সন্ধে হয় নটার সময়। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিকেলের আলো থাকে। প্রথম প্রথম ভারী অদ্ভুত লাগত। আমাদের রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও বাইরে তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো। আমাদের দেশেই কত জায়গায় কত যে আশ্চর্য সব ব্যাপার আছে। বই পড়ে এই পৃথিবীটাকে কিছুই চেনা যায় না।

সিদ্ধার্থদারা বলেছিলেন, ওঁরা আজকের রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকবেন। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব। কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্য যাওয়া হল না। হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। বিছানায় শুয়ে লীদার নদীর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা উঠে কাকাবাবুকে কিছু না বলেই আমি বেরিয়ে পড়লাম একলা-একলা। আজ কাকাবাবুর থেকেও আমি আগে উঠেছি। লীদার নদী পহলগ্রামে যেখানটায় ঢুকেছে, সেখানে একটা ছোট্ট কাঠের ব্রিজ। আমি ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধার্থদারা অমরনাথে যাবেন, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে।

একটু পরেই দেখা গেল ওঁদের। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আছেন, আর দুজন গাইড। সবাই ঘোড়ার পিঠে। স্নিগ্ধাদি আর রিণিকে তো চেনাই যায় না। ব্রীচেস, ওভারকোট, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, চোখে কালো চশমা। সিদ্ধার্থদাকেও বেশ মানিয়েছে, তবে সিদ্ধার্থদার ঘোড়াটা ওঁর তুলনায় বেশ ছোট।

স্নিগ্ধাদি আমাকে দেখেই বললেন, "ওমা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আমরা ভাবলুম বুঝি তোর সঙ্গে আর দেখাই হল না। কাল সারাদিন কোথায় ছিলি?"

"সোনমার্গে ছিলাম।"

"ওখানে কী করলি? ওখানে তো দেখার কিছু নেই।"

আমি চট্ করে একটু আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যিই, আকাশটা রোজই নতুন হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থদা বললেন, "সন্তু, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে!"

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "আমাদের এখানে অনেক কাজ আছে।"

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, "ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কী? এখানেও স্কুলের হোম-টাস্ক করছ নাকি?"

উত্তর দিলাম না। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। রিণিকে বললাম, "শোন, মুখে অনেকটা করে ক্রিম মেখে নে। না হলে কিন্তু ভীষণ

চামড়া ফাটে !”

রিণি খিলখিল করে হেসে বলল, “দিদি, দেখছ, সন্তু কী রকম বড়দের মতন কথা বলতে শিখেছে !”

“আহা, আমি তোদের থেকে বেশিদিন আছি না ! আমি তো এসব জানবই !”

“তুই সত্যি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। তুই বেশ গাইড হতিস আমাদের ! জানিস, আমি অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। তোকে দেখানো হল না।”

আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি ওদের সঙ্গে চলে যাই। যে-পোশাক পরে আছি. সেইভাবেই। কিন্তু তা হয় না। আমি একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললাম, “অমরনাথে এমন কিছু দেখবার নেই। ওসব মন্দির-টন্দির দেখতে আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি তো চন্দনবাড়ি আর কোহলাই পর্যন্ত গিয়েছি একবার !”

স্নিগ্ধাদি বললেন, “হ্যাঁরে, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবি তো ? আমাদের তো যাওয়া-আসা নিয়ে বড়জোর সাতদিন ! কিংবা রাস্তা খারাপ থাকলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি !”

আমি জোর দিয়ে বললাম, “হ্যাঁ, থাকব। থাকব।”

রিণি ঘোড়ার ওপর একটু ভীতু ভীতু ভাবে বসে ছিল। আমি ওকে বললাম, “এই, ঠিক করে শক্ত হয়ে বোস্ ! প্রথম দিন একটু গায়ে ব্যথা হবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে !”

রিণি বলল, “যা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না ! এলি না তো আমাদের সঙ্গে !”

আমি বললাম, “তোরা অমরনাথ থেকে ফিরে আয়—তখন অন্য কোথাও আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে বেড়াতে যাব।”

তারপর ওরা এগিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলাম।

ক্যাম্পে ফিরেই আবার সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম বলে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একমনে ম্যাপ দেখছিলেন। এক সময় মুখ তুলে বললেন, “সন্তু, আমি ঠিক করলাম, পহলগ্রামে আমাদের আর থাকা হবে না। এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় যায়। সোনমার্গ থেকে কাল পাহাড়ের নীচে যে ছোট্ট গ্রামটা দেখলাম, ওখানে গিয়েই দিন দশেক থাকা যাক্ !”

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। পহলগ্রাম থেকেও চলে যেতে হবে ? সিদ্ধার্থদা, রিণি, স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না ?

আমি মুখ শুকনো করে জিজ্ঞেস করলাম, “ঐ গ্রামে থাকব ? ওখানে থাকার

জায়গা আছে ?

কাকাবাবু আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, "সে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালকে ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও ঐ গ্রামে থাকে। এটাই বেশ ভাল হবে। চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হবে না—নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে।"

চেনাশুনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই খুশি হয়। কাকাবাবুর সব কিছুই অন্যরকম। ঐ ছোট্ট গ্রামে থাকতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। তবু পহলগ্রামে কত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। এখন এ জায়গা ছেড়ে আবার কোন্ ধাদ্দাড়া গোবিন্দপুরে যেতে হবে! কিন্তু কাকাবাবু একবার যখন ঠিক করেছেন, তখন যাবেনই!

কাকাবাবু বললেন, "জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। বেশি দেরি করে আর লাভ কী ?"

বাস-স্টপের কাছে আজও সূচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হল। বিশাল একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, "কী খোকাবাবু, কাল সোনমার্গ কী রকম বেড়ানো হল ?"

তারপর হা-হা করে হেসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী প্রোফেসারসাব, কাল যে বললেন সোনমার্গ যাবেন না ? আমি তো কাল দেখলাম, আপনারা সোনমার্গ থেকে ফিরছেন বিকেলে !"

কাকাবাবু নীরসভাবে বললেন, "আমরা কবে কোথায় যাই কোনও ঠিক তো নেই।"

"তা এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার এত আপত্তি কেন ? আমি তো ঐদিকেই যাই !"

"তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না।"

"এতে তকলিফ কী আছে ? আপনি এত বড় পড়ালিখা জানা আদমি, আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি—আপনি আজ কোনদিকে যাবেন ?"

"আজও সোনমার্গই যাব !"

সূচা সিং একটু অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আবার সোনমার্গ ? ওখানে কিছু পেলেন ? জায়গাটা তো একদম ন্যাড়া। কিছু নেই।"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "সিংজী, তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছ ! আমি সোনা খুঁজছি না। সে সাধ্যও আমার নেই।"

সূচা সিং গলার আওয়াজ নিচু করে বললেন, "আপনি মার্টন-এর পুরনো মন্দিরে গেছেন ? সবাই যে সূরয দেবতার মন্দিরে যায় সেখানে নয়—পাহাড়ের ওপরে যে পুরনো মন্দির ? লোকে বলে ঐ মন্দির ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরনো। সিকন্দর বুত শিকন ঐ মন্দির ভেঙে দেয়। কেন অত কষ্ট

করে ঐ বিরাট মন্দির ভেঙে দিল জানেন ? ঐ মন্দিরের কোনও জায়গায় মণ মণ সোনা পোঁতা আছে। সিকন্দর বুত শিকন তা খুঁজে পায়নি। সেই সোনা এখনও আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাহলে সে কথা আমাকে বলে দিচ্ছ কেন ? সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে ? নিজেই খুঁজে দেখো না !"

সূচা সিং কাকাবাবুকে একটু তোষামোদ করার সুর করে বললেন, "আপনারা পণ্ডিত লোক, আপনারা জানেন রাজারা কোথায় কোন্ জায়গায় গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন। সাধারণ লোকেরা কি ওসব জানতে পারে ?"

"তাই যদি হত সিংজী, তাহলে পণ্ডিতরা এত গরিব হয় কেন ? পণ্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না ! আচ্ছা চলি !"

সূচা সিং বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ! কমসে কম এক পেয়ালা চা তো খান আমার সঙ্গে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি সকালে দু'কাপের বেশি চা খাই না। সেই দু' কাপ আজ খাওয়া হয়ে গেছে।"

"তা হলে খোকাবাবুকে কিছু খাইয়ে দিই ! খোকাবাবু জিলাবি খেতে খুব ভালবাসে !"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আমি কিছু খাব না। আমার পেট ভর্তি !"

তবু সূচা সিং আজ আর কিছুতেই ছাড়লেন না। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে এড়ানো গেল না। আজ জোর করে আমাদের তুললেন নিজের গাড়িতে। একটা বেশ মজবুত জিপ গাড়ি, সূচা সিং সেই গাড়িতেই ওদিকেই কোথায় যেন যাচ্ছেন কোনও একজন সরকারী হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করতে।

যাওয়ার পথে সূচা সিং অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমি অবশ্য সব বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। কী সুন্দর ছবির মতন রাস্তা। পাহাড় চিরে এঁকেবেঁকে উঠেছে। দু' পাশে পাইন আর পপলারের বন। মাঝে মাঝে চেনার গাছও দেখা যায়। চেনার গাছগুলো কী বড় বড় হয়, অনেকটা দেবদারু গাছের মতন—যদিও পাতাগুলো অন্যরকম। হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় আখরোট, খোবানি আর নাশপাতির গাছ। এগুলো অবশ্য আমার চোখে এখন নতুন লাগে না। আমি গাছ থেকে বুনো আপেল আর আঙুরও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছি। কলকাতায় বসে এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় ? কত যে গোলাপফুল রাস্তাঘাটে ফুটে আছে !

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সিংজী, তুমি এই কাশ্মীরে কতদিন আছ ?"

সূচা সিং বললেন যে, কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে, তখন তিনি এখানে এসেছিলেন লড়াই করতে। তখন সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর একটা আঙুল কাটা যায়।

সূচা সিং তাঁর বাঁ হাতটা দেখালেন, সত্যিই তাঁর কড়ে আঙুলটা নেই।

সূচা সিং হাসতে হাসতে বললেন, "আমি সবাইকে কী বলি জানেন ? এই কড়ে আঙুলের ধাক্কা দিয়েই আমি হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি।"

"তারপর, তুমি এখানেই থেকে গেলে ?"

"না। যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীর আমার এমন পসন্দ হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখানেই চলে এলাম ব্যবসা করতে। এখন আমি এখানকারই লোক। কাশ্মীরি মেয়েকেই শাদী করেছি। দু শো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম এখন দেখুন না, আমার নয়খানা গাড়ি খাটছে ! কাশ্মীরের মাটিতে সোনা আছে, বুঝলেন ! নইলে ইতিহাসে দেখুন না, সবারই লোভ ছিল কাশ্মীরের দিকে !"

কাকাবাবু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "তুমি লেগে থাকো। তুমি হয়তো একদিন এই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো সিংজী।"

সোনমার্গ পৌঁছে সূচা সিং তাঁর চেনা একজন লোককে ডেকে বললেন, "এই প্রোফেসার খুব বড়া আদমি। সব সময় এর দেখাশোনা করবে !"

তারপর সূচা সিং চলে গেলেন। কাকাবাবু অবশ্য সূচা সিং-এর চেনা লোকটিকে পাত্তাই দিলেন না। তার হাত এড়িয়ে সোজা চলে এলেন ঘোড়াওয়ালাদের জটলার দিকে। গত কালের সেই দুটো ছেলেকেই ঠিক করলেন আজ। কোনও রকম দরাদরি না করেই ঘোড়ায় চড়ে বসে বললেন, "চলো !"

একটু দূরে গিয়েই কাকাবাবু থামলেন। ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই তোমাদের নাম কী ?"

নাম জিজ্ঞেস করতেই ওদের কী লজ্জা। মেয়েদের মতন ওদের ফর্সা গাল লাল হয়ে গেল। কিছুতেই বলতে চায় না। কেউ বুঝি কখনও ওদের নাম জিজ্ঞেস করেনি। একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। তাই দেখে আমি আর কাকাবাবুও হাসতে লাগলাম। অনেক কষ্টে জানা গেল, একজনের নাম আবুতালেব। আর একজনের নাম তো বোঝাই যায় না। শুনে মনে হল, ওর নাম হুদ্দা। কী ? আর কিছু নেই ? শুধু হুদ্দা ? তা সে জানে না। নামটা যেন খুবই একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

কাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এরা হচ্ছে খশ্ জাতি। এদিককার পাহাড়ে এদের দেখা যায়।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এখানে না এলে কি জানতে পারতাম, খশ্ জাতি নামেও একটা জাতি আছে আমাদের দেশে ! যে-জাতের একটা ছেলে নিজের নামটাও ভাল করে জানে না। হুদ্দার মতন একটা বিদঘুটে নাম কে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়েই ও খুব খুশি। অথচ কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। আর বেশ চটপটে, বুদ্ধিমান।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে ?

আমাদের থাকতে দেবে ?”

ছেলে দুটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এ রকম প্রশ্ন ওরা কখনও শোনেনি। ওদের গ্রামে বোধহয় কোনও বাইরের লোক থাকেনি কখনও।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন, “যদি থাকতে দাও তাহলে রোজ দশ টাকা করে ভাড়া দেব। তাছাড়া খাবার খরচ আলাদা। যে-কোনও রকমের একটা ঘর হলেই আমাদের চলবে।”

টাকাটা দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটল। পরস্পর কী যেন আলোচনা করে নিয়েই ওরা রাজি হয়ে গেল। তা বলে, ওদের কিন্তু লোভী মনে করা উচিত নয়। ওরা বড্ড গরিব তো, টাকার খুব দরকার ওদের।

গলাঙ্গীর নামে একটা জায়গা আছে, সেইদিকে ওদের গ্রাম। আমরা উঠতে লাগলাম পাহাড়ি পথে। পাশ দিয়ে রুপোর পাতের মতন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু বললেন, “ওর নাম কঙ্গনা নদী। সন্তু ঐ যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছ, ঐ রাস্তাটা চলে গেছে লদ্দাকে। এমনিতে লোক যাকে বলে লাদাক। এই রাস্তাটা খুব ভয়ংকর। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!”

আস্তে আস্তে ঘোড়া চলছে, আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। কী সুন্দর জায়গাটা! এখানে এলে মরার কথা মনেই হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। দূরে একটা পাহাড়ের মাথা সব পাহাড়কে ছাড়িয়ে জেগে রয়েছে। সেটা দেখতে ঠিক মন্দিরের মতন।

“কাকাবাবু, মন্দিরের মতন ঐ পাহাড়টার নাম কী ?”

“ঠিকই বলেছিস, মন্দিরের মতন! সাহেবরাও ঐ পাহাড়ের নাম দিয়েছে ক্যাথিড্রাল পীক। সব পাহাড় ছাড়িয়ে উঠেছে ওর মাথা। দেখলেই মনে হয় না, এক সময় দেবতারা থাকত এখানে ? ঐ যে রাস্তাটার কথা বললাম, ওটাকে ওয়াঙ্গাথ নালাও বলে। ঐ রাস্তা শুধু লদ্দাকে নয়, ওটা দিয়ে সমরখন্দ, পামীর, বোখারা, তাসখন্দ যাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে থেকেও মানুষ ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছে। ঐ রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কাকাবাবু, এই রাস্তা দিয়েই কি আর্যরা ভারতে এসেছিল ?”

কাকাবাবু বললেন, “তা ঠিক বলা যায় না। আর্যদের বোধহয় রাস্তা কিছু কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছিল। ইন্দ্র কাশ্মীরে পাহাড় ফাটিয়ে বদ্ধ জলাশয়ের মুক্তি দিয়েছিলেন—এ রকম একটা কাহিনীও আছে।”

যেতে যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়ল। বন্দুকধারী মিলিটারি এসে আমাদের আটকাল। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। দেখালেন কাগজপত্র। যে কোনও জায়গায় ঘোরাফেরা করার অনুমতিপত্র কাকাবাবুর আছে। কাকাবাবুর কাছে একটা রিভলবার থাকে।

সেটা আর তার লাইসেন্সও দেখালেন বার করে।

মিলিটারির লোকেরা আমাদের চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রায় জোর করে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। আমাদের দেখে ওরা হঠাৎ যেন খুব খুশি হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু বললেন, "ওরা তো কথা বলার লোক পায় না। মাসের পর মাস এখানে এমনি পড়ে আছে, আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে। তাই কথা বলার লোক পেলে ওদের ভাল লাগে।"

সেখানে দুধে সেদ্ধ করা চা আর হালুয়া খেলাম। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। আমাকে একজন মিলিটারি বলল, "খোকাবাবু, হরিণের শিং নেবে? এই নাও!"

বেশ একটা হরিণের শিং উপহার পেয়ে গেলাম। মিলিটারি দুজনেই পাঞ্জাবী শিখ। ভারী ভাল লোক। ঠিক আত্মীয়-স্বজনের মতন ব্যবহার করছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা একটা পাহাড়ি গ্রামে থাকব শুনে ওরা তো অবাক। কত রকম অসুবিধের কথা বলল। কাকাবাবু সে সব হেসে উড়িয়ে দিলেন। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উঠতে লাগলাম পাহাড়ি রাস্তায়। কাকাবাবু বললেন, "আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশি উঁচুতে এসেছি।"

আবু তালেব আর হুদ্দাদের গ্রাম পাশাপাশি। কোন গ্রামে থাকব, তাই নিয়ে ওরা দুজনে আমাদের টানাটানি করতে আরম্ভ করল। কেউ ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত সব দেখেশুনে কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবু তালেবদের গ্রামটাতেই থাকবেন। তবে, হুদ্দা আমাদের জন্য রান্নাটান্নাও অন্যান্য ব্যাপার দেখাশুনোর কাজ নেবে—এ জন্য সে-ও রোজ দশ টাকা করে পাবে।

ওদের গ্রামে পৌঁছুনো-মাত্র গ্রামের সব লোক ভিড় করে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল। ওদের গ্রামের বাচ্চারা কিংবা মেয়েরা আমাদের মতন জামাকাপড়-পরা মানুষই কখনও দেখেনি।

আবু তালেব নিজস্ব ভাষায় ওদের কী সব বোঝাল। ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করল খানিকক্ষণ। তারপর আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। একখানা ছোট কাঠের ঘর, বোধহয় অন্য কেউ থাকত, আমাদের জন্য এইমাত্র খালি করা হয়েছে। কাকাবাবু একবার দেখেই ঘরটা পছন্দ করে ফেলেছেন।

গ্রামখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। পাহাড়ের নীচের দিকে খুব ঘন জঙ্গল। শুনলাম, এই গ্রামে একটাই শুধু অসুবিধে, খুব জলের কষ্ট। পাহাড়ের একেবারে নিচু থেকে জল আনতে হয়। হোক, এই শীতে বেশি জল তো লাগবে না আমাদের!

আমাদের ঘরখানার পেছনেই খানিকটা সমতল জায়গা। তার পর খাদ নেমে গেছে। খাদের ওপারে আর একটা পাহাড়, সেই পাহাড়টা ভর্তি জঙ্গল। জানলা দিয়ে তাকালে মনে হয়, ঠিক যেন বিরাট একটা পাহাড়ের ছবি আকাশের গায়ে ঝোলানো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঘরটা ভাল করে গুছিয়ে ফ্যাল। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানে থাকতে পারবি তো ?"

আমি ঘাড় কাৎ করে বললাম, "হ্যাঁ। কতদিন থাকব এখানে ?"

"দিন দশ-বারো। এর মধ্যে যদি কিছু না হয়, তাহলে এবারকার মতন ফিরে যেতে হবে। তোরও তো ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে আসবে।"

"আমার ইস্কুল খুলতে এখনও কুড়ি দিন বাকি।"

"ঠিক আছে। এবার ভাল করে কাজ শুরু করতে হবে।"

আমার শুধু একবার মনে হল, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণিরা জানতেও পারবে না, আমরা কোথায় আছি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দু চোখে আগুন, এক অশ্বারোহী

এখানে আমাদের চার দিন কেটে গেল। সারাদিন কাকাবাবু আর আমি ঘুরে বেড়াই, ফিতে নিয়ে মাপামাপি হয়। জঙ্গলের ভেতরেও চলে যাই। কাজ অবশ্য কিছুই হচ্ছে না, তবে বেড়ানো তো হচ্ছে। কাশ্মীরে অনেকেই বেড়াতে যায়, কিন্তু কেউ তো গুজর আর খশ্ জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের গ্রামে থাকেনি।

এই জায়গার লোকেরা যে কী ভাল তা কী বলব! আমাদের সঙ্গে ওরা অসম্ভব ভাল ব্যবহার করে। ওরা অনেকেই আমাদের ভাষা বোঝে না, আমিও ওদের ভাষা বুঝি না, তবু কোনও অসুবিধে হয় না। হাত পা নেড়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একদিন আমার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা শেলাই করার জন্য আমি সূঁচ-সুতো চেয়েছিলাম। কিছুতেই আর সেটা ওরা বুঝতে পারে না। একবার নিয়ে এলো একটা গামলা, একবার নিয়ে এলো বঁটি। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল, তখন কোটটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। একটু বাদেই ওদের বাড়ি থেকে বোতাম শেলাই করে আনল।

সন্ধেবেলাই বাড়ি ফিরে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয়। শীত এখানে বড্ড বেশি। খুব হাওয়া, সেইজন্য। ঘরের মধ্যে আমরা আগুন জ্বেলে রাখি। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হয়। গরম গরম মোটা মোটা চাপাটি আর মুরগী ঝোল। হুদা তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের একটি মেয়েও দিনের বেলা আমাদের রান্নাটান্না করে দেয়। কাশ্মীরের লোকেরা ভাল রান্না করে, তবে নুন দেয় বড্ড বেশি। বলে-বলেও কমানো যায় না। এরা সবাই এত বেশি নুন খায় যে আমাদের কম নুন খাওয়ার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না। এরা ঝালও বেশি খায়, তবে সেটা এতদিনে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

সারাদিনটা আমার বেশ ভালই কাটে। সন্ধের সময়ও মন্দ লাগে না, তখন

গ্রামের দু' চারজন বুড়ো লোক আসে, আগুনের ধারে বসে গল্প হয়।

কিন্তু রাত্তিরটা আমার কাটতেই চায় না। ঘুম আসে না, খুব ভয় করে। চারদিক নিঝুম। মনে হয়, নিজের বাড়ি থেকে কোথায় কতদূরে পড়ে আছি। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাবা-মার কাছ থেকে কোনও চিঠি পাইনি। আমারও লেখা হয়নি। পহলগাম থেকে লিখতাম। কিন্তু এখানে ধারেকাছে পোস্টাফিস নেই। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে। একটু একটু, বেশি না।

আমার কুকুরটার কথাও মনে পড়ে। এতদিন পর ফিরে গেলে ও কি আমায় চিনতে পারবে? মোটে তো দু' সপ্তাহ হল এসেছি, অথচ মনে হয় যেন কতদিন কলকাতাকে দেখিনি। এইটাই বেশ মজার—বেড়াতে আসতেও খুব ভাল লাগে, আবার কয়েকদিন পরই কলকাতার জন্য মন ছটফট করে। রাত্তির বেলা ঘুম আসবার আগে যতক্ষণ একলা জেগে থাকি, তখনই কষ্ট হয় বেশি।

রাত্তিরে রোজ একটা শব্দ শুনতে পাই, সেটাই সবচেয়ে বেশি জ্বালায়। কী রকম অদ্ভুত শব্দ—অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে যায় না। মনে হয় যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়বার ভান করছে। কিন্তু আমি ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু বুঝেছি, তারা তো ওরকম কক্ষনো করে না।

জানলা খুলেও দেখার উপায় নেই। মাঝরাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। তাছাড়া একলা একলা জানলা খুলতে আমার ভয় করে। এদিকে ওর মধ্যে কাকাবাবু আবার ঘুমের ঘোরে কথা বলতে শুরু করেছেন। কার সঙ্গে যেন তর্ক করছেন কাকাবাবু। উঠে গিয়ে যে কাকাবাবুর গায়ে ধাক্কা দেব তা-ও ইচ্ছে করে না। বালিশে মুখ গুঁজে কান বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। আমার কান্না পাচ্ছিল।

প্রথম রাত্তিরে কাকাবাবুকে আমি ডাকিনি, দ্বিতীয় রাত্তিরে আর না ডেকে পারলাম না। কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, "কী? কী হয়েছে?"

আমি বিবর্ণ মুখে বললাম, "একটা কী রকম বিচ্ছিরি শব্দ।"

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। তারপর বললেন, "কেউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"আপনি শুনুন। অনেকক্ষণ ধরে, ঠিক একই জায়গায় ঐ এক রকম শব্দ।"

কাকাবাবু আর একটু শুনলেন। হাল্‌কাভাবে বললেন, "ঘোড়ারই তো শব্দ, আর তো কিছু না! ঘুমিয়ে পড়ো—"

"আমাদের জানলার খুব কাছে।"

কাকাবাবুর সাহস আছে খুব। উঠে গলায় কমফর্টার জড়ালেন। আর একটা কমফর্টার দিয়ে কান ঢাকলেন—ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার

করলেন। তারপর দেখলেন জানলা খুলে। টর্চ জ্বেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। আবার জানলা বন্ধ করে এসে বললেন, "ওটা কিছু নয়। নিশ্চিন্তে ঘুমো—"

কাকাবাবু জানলা খুলে টর্চটা যখন জ্বেলেছিলেন, তক্ষুনি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলা বন্ধ করতেই আবার শুরু হল।

আমার গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বললাম, "কাকাবাবু, আবার শব্দ হচ্ছে!"

"হোক না। শব্দ হলে ক্ষতি কী আছে? যা চোখে দেখা যায় না, তার থেকে ভয়ের কিছু নেই।"

"কিন্তু—"

"আরে, এরকম পাহাড়ি জায়গায় অনেক কিছু শোনা যায়। রাত্তিরে সব আওয়াজই বেশি মনে হয়—তাছাড়া পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে কতরকম শব্দ হয়, কত রকম প্রতিধ্বনি—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই শোনা যায় না।"

আমি বললাম, "কাকাবাবু, আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না!"

কাকাবাবু আমার খাটের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, তুই চোখ বুজে শুয়ে থাক্—আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—তাতেই ঘুম এসে যাবে।"

কিন্তু একথা শুনে আমার লজ্জা করল। আমি কি ছেলেমানুষ নাকি যে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে? তা ছাড়া কাকাবাবু আমার জন্য জেগে বসে থাকবেন! আমি বললাম, "না, না, তার দরকার নেই। এবার আমি ঘুমোতে পারব।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, সেই ভাল। ভয়কে প্রশ্রয় দিতে নেই। এ তো শুধু একটা শব্দ, এতে ভয় পাবার কী আছে?"

আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক মনে হচ্ছে না ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ? আমাদের জানলার খুব কাছে?"

কাকাবাবু আবার রিভলভারটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কৌন হ্যায়?"

কোনও সাড়া নেই। তবে শব্দটা এবার আর থামল না।

কাকাবাবু বললেন, "এমনও হতে পারে—শব্দটা অনেক দূরে হচ্ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হচ্ছে খুব কাছে। এত শীতে বাইরে বেরুনো উচিত নয়, না হলে বাইরে বেরিয়ে দেখা যেত। আচ্ছা দেখা যাক্, কাল কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না!"

পরদিন সন্ধেবেলা গ্রামের বৃদ্ধরা এলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। বড়

বড় মগে চা ঢেলে খাওয়া হতে লাগল। ঘরের এক কোণে আগুন জ্বলছে, মাঝে মাঝে আমি তার মধ্যে একটা দুটো কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছি। কাকাবাবু এ কথা সে কথার পর দুজন বৃদ্ধকে ঐ শব্দটার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

একজন বৃদ্ধ শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "বুঝেছি বাবুসাহেব, কাল তা হলে হাকো এসেছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "হাকো কে?"

"কোনও কোনওদিন মাঝরাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। তবে ও কারুর ক্ষতি করে না।"

"অত রাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যায়?"

বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গেলেন। কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তাছাড়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় না তো কোথাও! এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তো ঘোড়া দাবড়ায়!"

"ও ঐ রকমই।"

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, 'নিশ্চয়ই এবার একটা ভূতের গল্প শোনাবে। গ্রামের লোকেরা এইসব অনেক গল্প বানায়—তারপর শুনতে শুনতে ঠিক বিশ্বাস করে ফেলে।"

কাকাবাবু বৃদ্ধদের আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, হাকোকে দেখতে কী রকম? কমবয়েসী ছোকরা, না, বয়স্ক লোক? দিনের বেলা তার দেখা পাওয়া যায় না?"

বৃদ্ধ দু'জন চুপ করে গিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর ফস্ করে লম্বা লম্বা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া টানতে লাগলেন। যেন তাঁরা ও বিষয়ে আর কিছুই বলতে চান না।

কাকাবাবু তবু ছাড়বেন না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে আপনারা হাকো না কার কথা বললেন, রাত্তির বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়—তাকে দেখতে কী রকম?"

একজন বৃদ্ধ বললেন, "বাবু সাহেব, ও কথা থাক। হাকো আপনার ক্ষতি করবে না, শুধু শব্দই শুনবেন। আপনার ভয়ের কিছু নেই।"

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, "শুধু শব্দ কেন, তার চেহারা দেখলেও আমি ভয় পাব না। আমি তো তার কোনও ক্ষতি করি নি! দিনের বেলা কেউ দেখেছে?"

"না, দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেনি।"

"আপনি তাকে কখনও দেখেছেন? রাত্তিরে?"

বৃদ্ধটি চমকে উঠে বললেন, "বাবুসাহেব, তাকে কেউ দেখতে চায় না। হাকো-কে দেখলে কেউ বাঁচে না। হাকো-র চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়—তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে দিনের বেলা সে

আসে না, ইচ্ছে করে কারুর কোনও ক্ষতি করে না—”

কাকাবাবু বললেন, “হুঁ ! চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। তাকে দেখতে কি মানুষের মতন না জন্তুর মতন ? কোনও গল্প-টল্প শোনেননি ? চোখের দিকে না তাকিয়ে পেছন দিক থেকে যদি কেউ দেখে ?”

বৃদ্ধ বললেন, “আমার ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, একবার একটি মেয়ে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল। হাকো তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দেয়। মেয়েদের সে খুব সম্মান করে। সেই মেয়েটি দেখেছিল, হাকো খুব সুন্দর দেখতে একজন যুবাপুরুষ, তিরিশের বেশি বয়েস নয়— খুব লম্বা, মাথায় পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার—”

“তা সে বেচারা রোজ রাত্তিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন ?”

“এ তো শুধু আজকালের কথা নয় ! কত শো বছর ধরে যে হাকো এ রকমভাবে যাচ্ছে, কেউ জানে না। হাকো ছিল একজন রাজার সৈন্য—লদ্দাকের রাস্তা দিয়ে সে রাজার খৎ নিয়ে যাচ্ছিল। এক দুশমন তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে। সেই থেকে প্রায় রাত্তিরে…”

কাকাবাবু চুরুট টানতে টানতে হাসিমুখে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, “কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে ? এখানে কুয়ো কোথায় ? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?”

বৃদ্ধ বললেন, “না, সে আমরা কখনও দেখিনি। শুনেছি এসব ঠাকুর্দা-দিদিমার কাছে—”

আর একজন বৃদ্ধ বললেন, “হ্যাঁ, আমিও শুনেছি ঐ সব জঙ্গল-টঙ্গলের দিকে বড় বড় কুয়ো আছে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত চলে যায়—”

কাকাবাবু বললেন, “আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে ? অনেক বকশিস দেব।”

প্রথম বৃদ্ধ বললেন, “না, বাবুসাহেব, আমি কোনওদিন কুয়োটুয়োর কথা শুনিনি। এদিকে জলই পাওয়া যায় না, তা কুয়ো থাকবে কী করে ? পাহাড়ের গর্ত-টর্ত হয়তো আছে, তাই লোকে বলে—”

আমি হাকো সম্পর্কে আরও গল্প শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু কাকাবাবুর আর কোনও উৎসাহ নেই ওর সম্পর্কে। কাকাবাবু উত্তেজিত হয়ে বারবার সেই কুয়োর কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। বৃদ্ধ দু'জনকে জেরা করতে লাগলেন, সারা গ্রামের কেউ কোনওদিন জঙ্গলের মধ্যে সেই কুয়ো দেখেছে কি না ! বৃদ্ধ দু'জন আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। বকশিসের লোভ দেখিয়েও জানা গেল না কিছুই। মনে হলো, হাকো-র সম্পর্কে ওঁদের খুবই ভয় আছে— হাকোর ধারেকাছে যাবার ইচ্ছেও নেই ওঁদের।

সেদিন রাত্তিরবেলা কাকাবাবু টর্চ আর রিভলভার হাতে নিয়ে জানলার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন কিন্তু কোনও শব্দই শোনা গেল না।

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আজ আমাদের ভূতমশাই বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। রোজ কি আর সারারাত ঘোড়া চালানো যায়! তাছাড়া রিভলভার থাকলে ভূতও ভয় পায়।"

পরের দিনও প্রথম রাত্তিরে কিছু শোনা যায়নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সেই রহস্যময় ঘোড়সওয়ারকে—যার দু চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, তার নাম হাকো—কী করে যে লোক তার নাম জানল! আমি হঠাৎ হাকোর সামনে পড়ে গেছি···। হাকো আগুন-জ্বালা চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। আমি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে···। ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুনলাম বাইরে সেই শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুললাম। কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে দেখার অনেক চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখা গেল না। আওয়াজ অনবরত চলল। যতক্ষণ জেগে রইলাম, সেই খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ। হাকো যদি ভূত হয়, তাহলে ঘোড়াটাও কি ভূত! ঘোড়ারা মরলে কি ভূত হয়? আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। মনে হল, আর একদিনও এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। হাকোর গল্প শোনবার পরই কাকাবাবুর এই জায়গাটা সম্পর্কে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে।

সকালবেলা উঠলে কিন্তু ঐ সব কথা আর তেমন মনে পড়ে না। কতরকম পাখির ডাক শোনা যায়। নরম রোদ্দুরে ঝকমক করে জেগে ওঠে একটা সুন্দর দিন। আবু তালেব আর হুদ্দা দুটো ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হয়। মুখে সরল হাসি। তখন সব কিছুই ভাল লাগে।

আজকাল আর আমি ঘোড়া চালাবার সময় ওদের কারুকে সঙ্গে নিই না। নিজেই খুব ভাল শিখে গেছি। এক এক সময় খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। খানিকটা নিচে নেমে গেলে বেশ ভাল রাস্তা— সেখানে আর কোনও রকম ভয় নেই।

কাকাবাবু বললেন, "এদিকটা তো মোটামুটি দেখা হল। চলো, আজ বনের ভেতরটা ঘুরে আসি।"

আমি উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। বনের মধ্যে বেড়াতে আমার খুব পছন্দ হয়। এদিককার বনগুলো বেশ পরিষ্কার। ঝাউ আর চেনার গাছ—ভেতরটা অন্ধকার হলেও রাস্তা করে নেওয়া যায় সহজেই।

সেদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতেই সেই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডটা হল। তারপর থেকেই আমাদের সব কিছু বদলে গেল। জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরছিলাম। কাকাবাবু এখানেও ফিতে বার করে মাপতে শুরু করেছেন। এতদিনে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এক একজন লোকের যেমন এক এক রকম বাতিক থাকে—তেমনি এই ফিতে মাপার ব্যাপারটাও কাকাবাবুর বাতিক। নইলে, এই জঙ্গলে ফিতে দিয়ে জায়গা মাপার কোনও মানে হয়?

জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাৎসেঁতে। কাল রাত্তিরেও বরফ পড়েছিল, এখন বরফ বিশেষ নেই, কিন্তু গাছগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়। ফিতেটা ধরে দৌড়চ্ছিলাম, হঠাৎ আমি একটা লতা-পাতার ঝোপের কাছে পা পিছলে পড়ে গেলাম। বেশি লাগেনি, কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না উঠতে। জায়গাটা কী রকম নরম নরম। দূর থেকে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, সন্তু, লেগেছে ?" আমি উত্তর দিলাম, "না, না, লাগেনি।" কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না কিছুতেই। পায়ের তলায় শক্ত কিছু নেই। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি। জায়গাটা আসলে ফাঁপা—ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল।

চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই লতা-পাতা ছিঁড়ে আমি পড়ে যেতে লাগলাম নীচে। কত নীচে কে জানে।

ভয়ের চোটে নিশ্চয়ই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নীচে গিয়ে পড়লাম টের পাইনি। চোখ খুলে প্রথমেই মনে হল, আমি কি মরে গেছি না বেঁচে আছি ? আর কি কোনওদিন মাকে, বাবাকে দেখতে পাব ? মরে যাবার পর কী রকম লাগে তাও তো জানি না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা পচা পচা গন্ধ। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগল। কিন্তু ওপর থেকে পড়ার সময় খুব বেশি লাগেনি—কারণ আমার পায়ের নীচেও বেশ ঝোপের মতন রয়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। তাহলে নিশ্চয়ই মরিনি ! আমি একটা বড় গর্ত বা লুকনো কোনও কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। ভয়ের চেয়েও, বেঁচে যে গেছি—এই জন্য একটু আনন্দই হল সেই মুহূর্তে। আরও গভীর গর্ত যদি হত, কিংবা তলায় যদি শুধু পাথর থাকত—তাহলে এতক্ষণে··· । আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, "কাকাবাবু, কাকাবাবু—"

কাকাবাবু অনেকটা দূরে আছেন। হয়তো শুনতে পাবেন না। নীচ থেকে কি আমার গলার আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে ? ওপর দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় অন্ধকার। লতা-পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় সামান্য যা একটু ফাঁক হয়েছে, তাতেই একটু একটু আলো।

তবে একটা খুব আশার কথা, ফিতের একটা দিক আমার হাতে তখনও ধরা আছে। অন্য দিকটা কাকাবাবুর হাতে। এইটা দেখে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

শক্ত করে ফিতেটা এক হাতে চেপে রেখে আমি আর এক হাতে চার পাশটায় কী আছে দেখার চেষ্টা করলাম। গর্তটা বেশ বড়। একটা কুয়োর মতন, কিন্তু জল নেই। এই কুয়োতেই কি হাকো-কে মেরে ফেলা হয়েছিল ? এটা কি হাকো-র বাড়ি ?

ভয়ে আমার সারা গা শিরশিরিয়ে উঠলো। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, "কাকাবাবু ! কাকাবাবু !"

চেঁচাতে চেঁচাতেই মনে হল, কাকাবাবু এসেও কি আমাকে তুলতে পারবেন এখান থেকে ? খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা কী করবেন ? কেন যে আবু তালেব আর হুদ্দাকে আজ সঙ্গে আনিনি। কাকাবাবু এখান থেকে ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ওদের ডেকে আনতে আনতেই যদি আমি মরে যাই ? মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পচা পচা গন্ধটা বেশি করে নাকে লাগছে। আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না ! আমি মরে গেলে আমার মায়ের কী হবে ? মা-ও যে তাহলে কাঁদতে-কাঁদতে মরে যাবে !

গলা ফাটিয়ে আরও কয়েকবার আমি কাকাবাবুর নাম ধরে চেঁচালাম। এখনও আসছেন না কেন ? হয়তো এখানকার কোনও শব্দ ওপরে পৌঁছয় না।

একটু বাদে আমার হাতের ফিতেয় টান পড়ল। কাকাবাবুর গলা শুনতে পেলাম, "সন্তু ? সন্তু ?"

"এই যে আমি, নীচে—"

ওপরে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ শব্দ হতে লাগল, আমার গায়ে গাছ লতাপাতার টুকরো পড়ছে। কাকাবাবু ছুরি দিয়ে ওপরের জঙ্গল সাফ করছেন। খানিকটা পরিষ্কার হবার পর কাকাবাবু মুখ বাড়ালেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, "সন্তু, তোমার লাগেনি তো ? সন্তু, কথা শুনতে পাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, পাচ্ছি। না, আমার লাগেনি।"

"উঠে দাঁড়াতে পারবে ?"

"হ্যাঁ। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।"

"তোমার আশেপাশে জায়গাটা কী রকম ?"

"কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। ভীষণ অন্ধকার এখানে।"

"আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—"

কাকাবাবু আবার ছুরি দিয়ে গাছপালা কেটে সাফ করতে লাগলেন। গর্তের মুখটা প্রায় সবই পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াও। তোমার কোটের সামনের দিকটা পেতে ধরো, আমি আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি।"

কোট পাততে হল না, এখন আমি গর্তের ওপর দিকটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কাকাবাবু লাইটারটা ফেলে দিতেই আমি লুফে নিলাম।

"লাইটারটা জ্বালিয়ে দেখো, ওখানে কী আছে !"

কাকাবাবু এই লাইটারে চুরুট ধরান। বেশ অনেকটা শিখা হয়। জ্বেলে চারপাশটা দেখলাম। গর্তটা বহু পুরনো, দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড়। দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত। একদিকে একটা সুড়ঙ্গের মতন। তার ভেতরটা এত অন্ধকার যে তাকাতেই আমার গা ছমছম করল। বোঁটকা গন্ধটা সেদিক থেকেই আসছে মনে হল।

সে-কথা কাকাবাবুকে বলতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, "ঠিক আছে। কোনও ভয় নেই। আমি একটা দড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে আর এক দিক নীচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি শক্ত করে ধরবে!"

তখন আমার মনে পড়ল, আমাদের ব্যাগের মধ্যে তো নাইলনের দড়ি আছে। ভীষণ শক্ত, কিছুতেই ছেঁড়ে না। তাহলে আর ভয় নেই। দড়ি ধরেই আমি ওপরে উঠে যেতে পারব।

দড়িটা নীচে এসে পড়তেই আমি হাতের সঙ্গে পাক দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। তারপর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বললাম, "কাকাবাবু, অতি উঠছি ওপরে—"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, উঠো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি আসছি।"

কাকাবাবুর তো খোঁড়া পা নিয়ে নীচে নামবার দরকার নেই। তাই আমি চেঁচিয়ে বললাম, "না, না, তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই উঠতে পারব।"

কাকাবাবু হুকুম দিলেন, "তুমি চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি এক্ষুনি আসছি।"

সেই দড়ি ধরে কাকাবাবু নেমে এলেন। মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ফিসফিস করে বললেন, "সন্তু, এই গর্তের মুখটা চৌকো—এই সেই চৌকো পাতকুয়ো! আমরা যা খুঁজছিলাম বোধহয় সেই জায়গা।"

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। এই গর্তটা আমরা খুঁজছিলাম—এতদিন ধরে? কিন্তু কী আছে এখানে? এখানে কি গুপ্তধন আছে?

কাকাবাবু সুড়ঙ্গটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, "এর ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্তু, তুমি ভিতরে ঢুকতে পারবে?"

কাকাবাবু এমনভাবে কথা বলছেন যেন এই গর্তটা তাঁর বহুদিনের চেনা। আমরা যে বিপদে পড়েছি, কাকাবাবুর ব্যবহার দেখে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। বরং বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করার বদলে তিনি ঐ বিচ্ছিরি সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢকুতে চান!

আমি কাকাবাবুর গা ঘেঁষে ওভারকোটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি মরে গেলেও ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে পারব না। কাকাবাবু একলা ঢুকলেও ভয়, কাকাবাবুর যদি কোনও বিপদ-টিপদ হয়ে যায়! কাকাবাবু নীচে নামবার সময় ক্রাচ দুটো আনেননি। ওঁর এমনি দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উনি কিছু গ্রাহ্য করছেন না এখন।

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও, আগে দেখে নি, সুড়ঙ্গটা কত বড়।"

কাকাবাবু লাইটারটা জ্বালালেন। তাতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। শুধু জমাট অন্ধকার।

"সন্তু, দ্যাখ তো, শুকনো গাছটাছ আছে কি না, যাতে আগুন জ্বালা যায় !"

শুকনো গাছও নেই। বরং সব কিছুই ভিজে স্যাঁতসেঁতে। পাথরের দেয়ালে হাত দিলেও হাতে জল লাগে।

কাকাবাবু অধীর হয়ে বললেন, "কী মুস্কিল, আগুন জ্বালাবার কিছু নেই ? টর্চটা আনলে হত—বুঝবোই বা কী করে, দিনের বেলা—"

আমি বললাম, "কাকাবাবু, এখন-আমরা ওপরে উঠে পড়ি বরং। পরে লোকজন ডেকে এনে দেখলে হয় না ?"

কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "না ! এসব লোকজন ডেকে এনে দেখার জিনিস নয়।"

আমি বললাম, "কাকাবাবু ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ !"

কাকাবাবু নাকে বড় রকম নিঃশ্বাস টেনে বললেন, "গন্ধ ? কই, আমি পাচ্ছি না তো ! অবশ্য, আমার একটু সর্দি হয়েছে। গন্ধ থাক না, তাতে কী হয়েছে ?"

কাকাবাবু ঝট করে পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করলেন। তারপর সেটাতেই লাইটার থেকে একটু পেট্রোল ছিটিয়ে অগুন ধরিয়ে দিলেন। রুমালটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আলোতে দেখা গেল গুহাটা বেশি বড় নয়। কাকাবাবু মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আমি দারুণ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কাকাবাবু, দ্যাখো, দ্যাখো—"

গুহার একেবারে শেষ দিকে দুটো চোখ আগুনের মতন জ্বলজ্বল করছে। আমার তক্ষুনি মনে হল, হাকো বসে আছে ওখানে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম, এটা হাকোর বাড়ি। ও বেরিয়ে এসেই আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, "হাকো ! নিশ্চয়ই হাকো ! ওরা বলেছিল কুয়োর মধ্যে..."

কাকাবাবু বললেন, "ধ্যাৎ ! হাকো আবার কী ? তোর মাথার মধ্যে বুঝি ঐ সব গল্প ঢুকেছে !"

"তা হলে কী ? চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে—"

"আগুন কোথায় ? আলো পড়ে চকচক করছে।"

"তবে কি বাঘ ?"

"এত ঠাণ্ডা জায়গায় বাঘ থাকে না। খুব সম্ভব পাহাড়ি সাপ। পাইথন-টাইথন হবে। ভয়ের কিছু নেই। পাইথন তেড়ে এসে কামড়ায় না !"

রুমালটা ততক্ষণে সবটা পুড়ে এসেছে। বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটা থেকে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, ধোঁয়ার জন্য আবার কাশি পেয়ে গেল।

কাকাবাবু হুকুম করলেন, "সন্তু, তোমার পকেট থেকে রুমাল বার করো। আমি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি ধরে থাকো ওটা। এক পাশে সরে গিয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দাও গুহাটার দিকে।"

কাকাবাবু রিভলভারটা বার করে বললেন, "বেচারাকে মারা উচিত নয়, ও চুপ করে বসে ছিল, আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। কিন্তু সাপকে তো বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।"

"যদি সাপ না হয়?"

"সাপ ছাড়া আর কোনও জন্তু এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না।"

কাকাবাবু সেই চোখ দুটো লক্ষ্য করে পর পর দুবার গুলি করলেন। হঠাৎ গুহাটার মধ্যে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকারে টুঁ শব্দটিও ছিল না। এখন গুহাটার ভেতরে কে যেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাপাদাপি করছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপটার বীভৎস মুখখানা গুহা থেকে বেরিয়ে এল। অনেকটা থেঁতলে গেছে। কাকাবাবু আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

আস্তে আস্তে থেমে গেল সব ছটফটানি। আমি উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি পিছু হটতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। এত জোরে বুক টিপটিপ করছে যে মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখলেন সাপটার তখনও প্রাণ আছে কিনা। সেটা আর নড়ল না। আমি বললাম, "কাকাবাবু, যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে? সাপ কিংবা অন্য জন্তুজানোয়ার সব একসঙ্গে দুটো করে থাকে না?"

"আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসত।"

তারপরেই কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি বারণ করার সময় পেলাম না। তখন দিশেহারা হয়ে গিয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম পেছন পেছন।

এই রুমালটাও প্রায় পুড়ে এসেছে। হাতে ছেঁকা লাগার ভয়ে আমি সেটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে। সেই আলোতে দেখা গেল গুহার মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কালের টুকরো পড়ে আছে। শুধু মুণ্ডু আর কয়েকখানা হাড়। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, একটা মস্ত বড় লম্বা বর্শা। আর একটা চৌকো তামার বাক্স।

কাকাবাবু সেই তামার বাক্সটা তুলে নিয়েই বললেন, "সন্তু, শিগগির বাইরে চলে এসো। এই বদ্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে, এখানকার অক্সিজেন ফুরিয়ে আসেছ। এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে আসবে। চলে এসো শিগগির।"

ঝোলানো দড়ি ধরে দেয়ালের শিকড়-বাকড়ে পা দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলাম। আগে আমি, তারপর কাকাবাবু। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে কত কষ্ট

করে যে উঠলেন, তা অন্য কেউ বুঝবে না। কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের কোনও চিহ্ন নেই। আমিও তখন বিপদ কিংবা কষ্টের কথা ভুলে গেছি। বাক্সটার মধ্যে কী আছে তা দেখার জন্য আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। কত অ্যাডভেঞ্চার বইতে পড়েছি, এইরকমভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবার কথা। আমরাও ঠিক সেই রকম···বাক্সটার মধ্যে মণিমুক্তো, জহরৎ যদি ভর্তি থাকে—

কাকাবাবু টানাটানি করে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। তালা বন্ধও নয়, কিন্তু কীভাবে যে আটকানো তা-ও বোঝা যায় না। আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এলাম। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোণ ভেঙে ফেলা হল। বাক্সটা অবশ্য বহুকালের পুরনো, জোরে আছাড় মারলেই ভেঙে যাবে। ভাঙা দিকটা ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা উঠে এল।

বাক্সটার ভেতরে তাকিয়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম। মণি, মানিক্য, জহরৎ কিছুই নেই। কেউ যেন আমাদের ঠকাবার জন্যই বাক্সটা ওখানে রেখে গেছে। বাক্সটার মধ্যে শুধু একটা বড় গোল পাথর, গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কেউ বোধহয় আমাদের আগে ঐ গুহাটায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্তো সব নিয়ে তারপর অন্যদের ঠকাবার জন্য পাথর ভরে রেখে গেছে।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলাম, কাকাবাবুর মুখে দারুণ আনন্দের চিহ্ন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি। কাকাবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন। আমি ভাবলাম চশমার কাচ মুছবেন। কিন্তু তা তো নয়? মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

মূর্তি রহস্য

চোখ মুছে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, এতদিনের কষ্ট আজ সার্থক হল। কতদিন ধরে আমি এর স্বপ্ন দেখেছি। নিজেরও বিশ্বাস ছিল না, সত্যিই কোনওদিন সফল হব। তোর জন্যই এটা পাওয়া গেল, তোর নামও সবাই জানবে।"

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কাকাবাবুর পাশে বসে পড়লাম। কাকাবাবু খুব সাবধানে পাথরটা তুললেন। এবার আমি লক্ষ করলাম, ওটা ঠিক সাধারণ পাথর নয়, অনেকটা মানুষের মুখের মতন। যদিও কান দুটো আর নাক ভাঙা। সেই ভাঙা টুকরোগুলোও বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে। বোধহয় অজগরটার লেজের ঝাপটায় বাক্সটা ওলটপালট হয়েছে, সেই সময় ভেঙে গেছে। কিংবা আগেও ভাঙতে পারে। কাকাবাবুর রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করে ফেলার পর মুখচোখ ফুটে উঠল। গলার কাছ থেকে

ভাঙা। গোটা মূর্তি থেকে শুধু মুণ্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে। বহুকালের পুরনো মূর্তি, এমন কিছু দেখতে সুন্দরও নয় যে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়। এটার জন্য কাকাবাবু এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন ?

কাকাবাবু ছুরি দিয়ে মুণ্ডুটার গলার কাছে খোঁচাতে লাগলেন। ঝুরঝুর করে মাটি খসে পড়ছে। অর্থাৎ মুণ্ডুটা ফাঁপা, মাটি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। এখনও ভাবছি, তাহলে বোধহয় এই মুণ্ডুটার ভেতরে খুব দামি কোনও জিনিস লুকানো আছে। হীরে মুক্তো যদি না-ও থাকে, তবুও কোনও গুপ্তধনের নক্সা অন্তত পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই বেরুল না, শুধু মাটিই পড়তে লাগল। একেবারে সাফ হয়ে যাবার পর, ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে কাকাবাবু আর একবার খুশি হয়ে উঠলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, "সব মিলে যাচ্ছে। ভেতরে কী সব লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস তো ? আমি অবশ্য এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারব না—কিন্তু পণ্ডিতরা দেখলে…। আমি সোনার খনি কিংবা গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে আসিনি, এটা খুঁজতেই এসেছিলাম। এটার কাছে সোনা, রুপো তুচ্ছ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাকাবাবু, এটা কার মুণ্ডু ?

"সম্রাট কণিষ্কর নাম শুনেছিস ? পড়েছিস ইতিহাস ?"

"হ্যাঁ, পড়েছি।"

"সম্রাট কণিষ্ককে দেখতে কী রকম ছিল, কেউ জানে না। কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রায় তাঁর মুখের খুব ঝাপসা ছবি দেখা গেছে—কিন্তু তাঁর কোনও পাথরের মূর্তিরই মুখ নেই। এই সেই মুখ। তুই আর আমি প্রথম তার মুখ আবিষ্কার করলাম। শুধু মুখ নয়—তার জীবনের সব কথা। ইতিহাসের দিক থেকে এর যে কী বিরাট মূল্য, তুই এখন হয়তো বুঝবি না, বড় হয়ে বুঝবি। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যাবে !"

"কিন্তু এটা যে সত্যিই কণিষ্কর মাথা, তা কী করে বোঝা যাবে ?"

"ঐ যে মাথার ভেতরে সব লেখা আছে।"

ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিছুই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি বললাম, "যদি কেউ যে-কোনও একটা মুণ্ডু বানিয়ে তার মধ্যে কিছু লিখে দ্যায়, তাহলেই কি সবাই বিশ্বাস করবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "লেখার ধরন দেখে, ভাষা দেখে, মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতরা তার বয়েস বলে দিতে পারে। ওসব বোঝা খুব শক্ত নয়।"

"কিন্তু মূর্তির মাথার মধ্যে কিছু লেখা থাকে—আগে তো কখনও শুনিনি। তা ছাড়া, কণিষ্কর মাথা এই গুহার মধ্যে এল কী করে ?"

"শোন, তা হলে তোকে গোটা ব্যাপারটা বলি, একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পৃথিবীতে এরকম চমকপ্রদ ঐতিহাসিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। পিরামিডের লিপি কিংবা হিট্টাইট সভ্যতা আবিষ্কারের সময় যে-রকম হয়েছিল,

অনেকটা সেই রকম।

কাকাবাবু পাথরের মুণ্ডুটা সাবধানে রাখলেন সেই বাক্সের ভেতরে। আরাম করে একটা চুরুট ধরালেন। মুখে সার্থকতার হাসি। বললেন, "তুই পাইথনটা দেখে খুব ভয় পেয়েছিলি, না ?"

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করলাম। ভাবতে গেলেই এখনও বুক কাঁপে।

"রিভলভার-বন্দুক থাকলে পাইথন দেখে ভয় পাবার বিশেষ কারণ নেই। বাঘ, হায়না হলেই বরং বিপদ বেশি। বেচারা ওখানে নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছিল, বসে বসে রাজার মুণ্ডু পাহারা দিচ্ছিল। মরণ ছিল আমার হাতে।"

"কাকাবাবু, তুমি কী করে জানলে যে মুণ্ডুটা এই রকম একটা গুহার মধ্যে থাকবে ?"

"বছর চারেক আগে আমি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছিলাম, তোর মনে আছে তো ?"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"ফেরার পথে আমি হংকং-এ নেমেছিলাম। হংকং-এ আমি কিছু বইপত্তর আর পুরনো জিনিস কিনেছিলাম—সেখানে একটা দোকানে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বহু পুরনো বই পেয়ে যাই। বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চীনা ডাক্তারের লেখা। ডাক্তারটির সুনাম ছিল পাগলের চিকিৎসায়। ডাক্তারি বই হিসেবে বইটার এখন কোনও দাম নেই, কারণ যে-সব চিকিৎসার কথা তিনি লিখেছেন, তা শুনলে লোকে হাসবে। যেমন, এক জায়গায় লিখেছেন, যে-সব পাগল বেশি কথা বলে কিংবা চিৎকার করে তাদের পরপর কয়েকদিন পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে পাগলামি সেরে যায় ! আর এক জায়গায় লিখেছেন, পাগলরা উল্টোপাল্টা কথা বললেই তাদের কানের সামনে খুব জোরে জোরে ঢাক ঢোল পেটাতে হবে। সেই আওয়াজের চোটে তাদের কথা শোনা যাবে না। বেশিদিন কথা না বলতে পারলেই তাদের পাগলামি আপনি আপনি সেরে যাবে।"

চুরুট নিভে গিয়েছিল বলে কাকাবাবু সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। আমি এখনও অগাধ জলে। চীনে ডাক্তারের লেখা বইয়ের সঙ্গে সম্রাট কণিষ্কের মুণ্ডু উদ্ধারের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাকাবাবু চুরুটে কয়েকবার টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, "যাই হোক, ডাক্তারি বই হিসেবে দাম না থাকলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে, সেগুলো পড়তে বেশ মজা লাগে। তারই মধ্যে একটা গল্প দেখে আমার মনে প্রথম খটকা লেগেছিল। ঐ ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু-এক শো বছর আগে চীনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি তাঁর নথিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা

লিখে গেছেন—কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকত, আর সর্বক্ষণ চেঁচাত— সম্রাট কণিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইঁদারায় বসে আছে, আমাকে সেখানে যেতে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও !' পাগলের কল্পনা কত উদ্ভট হতে পারে সেই হিসেবেই ডাক্তার-লেখকটি এই গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—চার পাঁচ পাতা জুড়ে আছে সেই বর্ণনা। ঘটনাটি সত্যি অদ্ভুত। সম্রাট কনিষ্ক মারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে—তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর যদি কেউ বলে তাঁর এক বন্ধু কণিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে একটা চৌকো ইঁদারায় বন্দী হয়ে আছে—তাহলে তার কল্পনা শক্তি দেখে অবাক হবারই কথা। পাগলদের মধ্যে এ খুব উঁচু জাতের পাগল। চীনা ডাক্তার তাই ওর কথা সবিস্তারে লিখেছেন। ঘটনাটা যেভাবে ঐ বইতে আছে সেটা বললে তুই বুঝবি না। চীনে ভাষায় নামটাম অনেক বদলে গেছে, জায়গার নাম ওলোট পালোট হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ লেখাটার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমার কাছে যেভাবে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেটাই তোকে বলছি।

"কণিষ্কর কথা তো ইতিহাসে একটু একটু পড়েছিস। কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন এই প্রথম কণিষ্ক। খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উনি রাজত্ব করেছিলেন। এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ছিল ওঁর অধীনে, আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রায় দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কণিষ্কর শাসন। অন্যান্য রাজারা ওঁকে এমন ভয় পেত যে বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের সম্রাট কণিষ্ক নিজের রাজ্যে নজরবন্দী করে রাখতেন বলে শোনা যায়। শুধু যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল সে রাজ্যে তাই-ই নয়, সম্রাটের নিজেরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে তখনকার লোকে বিশ্বাস করতো। পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি কনিষ্ক সম্পর্কে এই রকম একটা উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। আল বেরুনি-ও প্রায় একই রকম একটা কাহিনী বলেছেন তাঁর তাহকিক-ই-হিন্দ বইতে। চীনে ডাক্তারের সেই পাগলের গল্পের সঙ্গেও এসবের মিল আছে। তাই আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম।

"গল্পটা হচ্ছে এই। গান্ধারের সম্রাট কণিষ্ক ভারত আক্রমণ করে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে চলেছেন। প্রবল তাঁর প্রতাপ, প্রাচ্য দেশের প্রায় সব রাজাই তাঁর নামে ভয় পায়। এ দিকে তিনি রাজ্য জয় করে চলেছেন—আবার ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি বৌদ্ধদের একটা মহা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন—এমন কথাও শোনা যায়। প্রজাদের কাছ থেকে তিনি ভয় ও ভক্তি এক সঙ্গে আদায় করে নিতে জানতেন। যাই হোক, এই সময় একদিন কেউ একজন তাঁকে খুব সুন্দর দুটি কাপড় উপহার দেয়। কাপড় দুটো দেখে সম্রাট কণিষ্ক মুগ্ধ হলেন, একটা নিজের জন্য রেখে আর একটা পাঠিয়ে দিলেন রানীকে।

"তারপর একদিন রানী সেই কাপড়খানা পরে সম্রাটের সামনে এসেছেন, সম্রাট তাকে দেখেই চমকে উঠলেন। রানীর ঠিক বুকের মাঝখানে কাপড়টার ওপরে গেরুয়া রঙে মানুষের হাত আঁকা।

"রাজা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রানী! এ কী রকম শাড়ি পরেছ তুমি? ঐ হাতটা আঁকার মানে কী?'

"রানী বললেন, 'মহারাজ, এই কাপড়টা আপনিই পাঠিয়েছেন, আপনাকে খুশি করার জন্যই আমি আজ এটা পরেছি। আগে থেকেই কাপড়টাতে এই রকম হাত আঁকা ছিল।'

শুনেই সম্রাট খুব রেগে গেলেন। তবে কি কেউ সম্রাটকে পুরনো কাপড় উপহার দিয়ে গেছে? কারুর এতখানি স্পর্ধা হবে, এ তো ভাবাই যায় না! রাজকোষের রক্ষককে ডেকে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মানে কী? কে এই হাতের ছাপ এঁকেছে?'

"রাজকোষের রক্ষক বললেন, 'মহারাজ, এই ধরনের সব কাপড়ের ওপরেই এই রকম হাতের ছাপ আঁকা থাকে।"

"সম্রাট হুকুম দিলেন, 'এই কাপড় যে উপহার দিয়েছে, তাকে ডাকো!"

"ডাকা হল তাকে। সে বেচারী এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। একজন বিদেশি বণিকের কাছে এই কাপড় দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই উপহার এনেছিল সম্রাটের জন্য।'

"সম্রাট কণিষ্ক ব্যাপারটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যেমন করে পারো, ধরে আনো সেই বণিককে।

অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে গেল। দুদিনের মধ্যেই সেই বণিককে ধরে এনে হাজির করলে সম্রাটের সামনে। দেখা গেল, বণিকের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে, কিন্তু সবগুলিতেই ঐ রকম গেরুয়া রঙের হাতের ছাপ আঁকা রয়েছে।

"সম্রাট বললেন, 'বণিক, যদি সত্যি কথা বলো, তোমার ভয় নেই। কোথা থেকে এমন সুন্দর কাপড় পেয়েছ? কেনই বা এতে মানুষের হাতের ছাপ আঁকা।'

"বণিক ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বলল, 'মহারাজ, এই কাপড় আমি এনেছি দক্ষিণ ভারত থেকে। সেখানে সাতবাহন নামে এক রাজা আছেন। প্রত্যেক বছর এই কাপড় তৈরি করার পর সেই রাজার কাছে আনা হয়। তিনি সমস্ত কাপড়ের ওপরে নিজের হাতের ছাপ এঁকে দেন। ছাপটা ঠিক এমনভাবে পড়ে যে কোনও পুরুষ এই কাপড় পরিধান করলে ছাপটা থাকবে ঠিক তার পিঠে, আর কোনও মেয়ে পরিধান করলে থাকবে তার বুকে।'

"সম্রাটের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, রাগে থমথমে হল মুখ। রাজসভার অমাত্যদের বললেন, কাপড়গুলো পরে দেখতে। বণিকের কথাই সত্যি, প্রত্যেকের পিঠেই

হাতের ছাপ।

"সম্রাট কণিষ্ক কোষ থেকে তলোয়ার খুলে মেঘ গর্জনের মতো গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঐ হাত কাটা অবস্থায় আমি দেখতে চাই। এখুনি দূত চলে যাক দাক্ষিণাত্যে, গিয়ে সেই উদ্ধত রাজা সাতবাহনকে বলুক, সে তার দুটো হাত ও দুটো পা কেটে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার রাজ্য আক্রমণ করব না। যদি না দেয়, তাহলে শীঘ্রই আমি আসছি।

"দূত ছুটে গেল সাতবাহনের রাজ্যে। তখন সম্রাট কণিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন কোনও রাজা নেই। কণিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার কোনও আশা নেই সাতবাহনের। কিন্তু সাতবাহনের মন্ত্রীরা রাজাকে খুব ভালবাসতেন। রাজাকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা সবাই মিলে একটা বুদ্ধি বার করলেন! তাঁরা দূতকে বললেন, "আমাদের রাজা সাতবাহন বড্ড ভাল মানুষ, তিনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না। তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাও জানা যায় না। আমরা মন্ত্রীরাই রাজ্য চালাই। সম্রাটকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমরা কি আমাদের সবার হাত পা কেটে পাঠাব?"

"সম্রাট কণিষ্ক দূতের মুখে সেই কথা শুনে বললেন, "সৈন্য সাজাও। আমি নিজে ওদের শিক্ষা দিতে যাব।" হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে কনিষ্কর বিরাট সৈন্যবাহিনী চলল দাক্ষিণাত্যে।

"সাতবাহন রাজার মন্ত্রীরা সেই খবর শুনে রাজাকে লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায় একটা গোপন গুহায়। তারপর সোনা দিয়ে অবিকল সাতবাহনের মতন একটা মূর্তি বানিয়ে তাতেই রাজার পোশাক পরিয়ে নিয়ে গেলেন বাহিনীর সামনে। কনিষ্ক সেই মূর্তিটাকে বন্দী করে ছলনা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বক্রহাস্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীদের বললেন, 'তোমরা শুধু আমার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দেখেছ, আমার নিজস্ব ক্ষমতা এখনও দেখোনি। এইবার সেটা দেখো।"

"সম্রাট কণিষ্ক নিজের তলোয়ার দিয়ে সেই সোনার মূর্তির হাত ও পা দুটো কেটে ফেললেন। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অলৌকিক উপায়ে মাটির নীচে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতবাহন রাজার হাত ও পা দুটোও কেটে পড়ে গেল।

"আল বেরুনি যে কাহিনী বলেছেন, সেটা একটু অন্যরকম। কিন্তু তাতে সম্রাট কণিষ্কর আরও বেশি অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে। সেখানে কণিষ্ককে বলা হয়েছে পেশোয়ারের রাজা কণিষ্ক আর সাতবাহনের জায়গায় আছে কনৌজের রাজা। এবং কাপড়ের ওপরে হাতের ছাপের বদলে পায়ের ছাপ। যাই হোক, এটাও যে কণিষ্ক সম্পর্কে উপাখ্যান তা ঠিক বোঝা যায়। এতেও দেখা যায়, কনৌজের রাজার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রেখে, বিশ্বাসঘাতকের ভান করে কণিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে

যায় মরুভূমির মধ্যে। সেখানে জলের অভাবে সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগল, যুদ্ধে হেরে যাবার মতন অবস্থা। তখন মহাপরাক্রান্ত সম্রাট কণিষ্ক সেই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'তোমার ধারণা, আমি শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এতবড় সাম্রাজ্য গড়েছি? এইবার আমার নিজের ক্ষমতা দেখো!"

"সম্রাট কণিষ্ক তখন প্রকাণ্ড এক বর্শা নিয়ে সাঙ্ঘাতিক জোরে সেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ঝরনার জলের ধারা বেরিয়ে এল। কণিষ্ক সেই মন্ত্রীকে বললেন, "যাও, এবার তোমার রাজার কাছে যাও। গিয়ে দেখে এসো, সেই রাজা এখন কেমন আছে।" মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, লুকিয়ে থাকা অবস্থাতেই কনৌজের রাজার হাত পা কেটে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কণিষ্ক যে আগেও অনেকরকম এরকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে। তখনকার দিনে লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কণিষ্ক শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধে জেতেন না। তাঁর মাথাটাই সব—আশ্চর্য তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা।"

আবার চুরুট জ্বালিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এর পরের ঘটনা আমি পেয়েছি চীনে ডাক্তারের লেখা সেই পাগলের কাহিনী থেকে। অর্থাৎ কিছু কিছু ঘটনা পেয়েছি সেই পাগলের গল্প থেকে—তার সঙ্গে অন্য উপাদান মিলিয়ে আমি ব্যাপারটা জুড়ে নিয়েছি। সাতবাহন রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বংশের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু রাজপরিবার ও মন্ত্রীপরিবারের কয়েকজন পুরুষ ঐ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে। তারা ঠিক করে, ছদ্মবেশ ধরে বা যে-কোনও উপায়েই হোক, তারা কণিষ্ককে গুপ্তহত্যা করবে—এজন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। এই জন্য একদল লোক ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে, এমন কী ভারতের বাইরেও তারা যায়। কণিষ্ক যখন যেখানে যাবেন, তারা তাঁকে সেখানেই খুন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কণিষ্কর মতন এতবড় একজন সম্রাটের রক্ষীবাহিনীকে অতিক্রম করে তাঁকে খুন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তারা শেষ পর্যন্ত কণিষ্ককে খুন করতে পারেনি। এদিকে অহংকারী সম্রাট কণিষ্ক তাঁর জীবিতকালেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর মস্তিষ্কের অলৌকিক শক্তির জন্যই তাঁর এত প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশে তাঁর মূর্তির মাথার ভেতরে তাঁর কীর্তিকাহিনী সব খোদাই করে রাখা হয়। সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষরা কণিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে তাঁর মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিয়ে যায়। কণিষ্কর যে দুটি মূর্তি পাওয়া গেছে, দুটিরই মাথা এই জন্য ভাঙা।

"চীনে ডাক্তার সেই পাগলের কাহিনীতে ভেবেছিলেন বুঝি পাগলটা সত্যিকারের কণিষ্কর কাটামুণ্ডুর কথা বলত। কিন্তু কণিষ্ক যে সেভাবে মারা যায়নি, তা সেকালের সবারই জানা ছিল। পড়ে আমার মনে হল, আসলে পাথরের মূর্তির মাথার কথাই বলেছিল সে।

“ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। সাতবাহন বংশের সেই পুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তক বাহিনী। মহাভারতে যেমন সংসপ্তকদের কথা আছে—অর্থাৎ যারা নিজের জীবন দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করতে চায়। সেই সপ্তক বাহিনীর দুজন লোক চলে যায় কান্দাহার পর্যন্ত। সেখান থেকে কণিষ্ক মূর্তির মাথাটা ভেঙে নেয়। তাদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুণ্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানীর পায়ের কাছে রাখবে। তিনি সেটাতে পদাঘাত করে শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়োবেন। কিন্তু কাশ্মীরের কাছে এসে তারা আটকে যায়। এটাই ছিল তখন যাতায়াতের রাস্তা। ফেরার পথে যখন তারা কাশ্মীরে এসে পৌঁছয়, তখন এখানে দারুণ গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে, কাশ্মীরেও একজন রাজার নাম ছিল কণিষ্ক। সেই কণিষ্ক আর আমাদের কণিষ্ক যদি এক হয় তা হলে কণিষ্কর মৃত্যুর পর এখানে হানাহানি শুরু হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এখানে তখন বিদেশি দেখলেই বন্দী কিংবা হত্যা করা হচ্ছে। সপ্তক বাহিনীর লোক দুটি পড়ল মহাবিপদে। তারা দক্ষিণ ভারতের মানুষ, তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যাবে। গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় তারা এখানে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

“কতদিন তাদের সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল, তা বলা শক্ত। কাশ্মীরে তখন চরম অরাজকতা চলছিল, তার মধ্যে বিদেশি মানুষ হিসেবে তাদের বিপদ ছিল খুবই। কিন্তু দিনের পর দিন তো মানুষ আর গর্তের মধ্যে বসে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পালা করে বেরুত রাত্তিরবেলা। খাবারদাবার সংগ্রহ করত, খোঁজখবর আনত। আমার কী মনে হয় জানিস, এখানকার গ্রামে যে হাকো সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে—সেটা ঐ সপ্তক বাহিনীর একজন সম্পর্কে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। রাত্তিরবেলা এই শীতে এখানে কেউ ঘোড়া চালায় না। সেকালে কেউ হয়তো মধ্য রাত্রে একজন অশ্বারোহীকে দেখে ফেলেছিল, তার হাতে থাকত মশাল— অমনি এক অলৌকিক গল্প। প্রাকৃতিক কারণে এখানকার পাহাড়-টাহাড়ে কোথাও বোধহয় ঘোড়ার ক্ষুরের মতন শব্দ হয়—তার সঙ্গে ঐ কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছে। সপ্তক থেকে হাকো হওয়া অসম্ভব নয়। মুখে মুখে উচ্চারণ এ রকম অনেক বদলে যায়। এখানে যে-জায়গাটার নাম এখন বানীহাল, আগে নাকি সেটার নাম ছিল বনশালা।

“সেই দুজনের মধ্যে একজন এক রাত্তিরবেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যুদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। একা সে লড়াই করেও নিজেকে ছাড়াতে পারেনি। দস্যুদল তাকে কালিকট বন্দরে নিয়ে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল জানিস তো? সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায়। আসলে তার সঙ্গী সেই গুহার মধ্যে সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে

আছে—সে কোথায় চলে গেল জানতেও পারল না—এই চিন্তাই তাকে পাগল করে দেয়। বিশেষত, সঙ্গী যদি ভাবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসেছে— এই চিন্তাই বেশি কষ্ট দিত তাকে। কারণ, তখনকার দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞার খুব দাম দিত। সেইজন্যই সে সব সময় চিৎকার করে করে ঐ কথা বলে সাহায্য চাইত পথের মানুষের কাছে। এমন কী অন্য কেউ যদি তার কথা শুনে সাহায্য করতে যায়—এইজন্য জায়গাটা এবং গুহার বর্ণনাও সে চেঁচিয়ে বলত। কিন্তু সবটাই গাঁজাখুরি কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একটা গুহার মধ্যে একজন লোক সম্রাট কণিষ্কর কাটা মুণ্ডু নিয়ে বসে আছে, একথা কে বিশ্বাস করবে!

"চীনে ডাক্তারের সেই লেখা আর ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান মিলিয়ে আমি এই ব্যাপারটা মনে মনে খাড়া করেছিলাম। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময়ও এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। কিন্তু আর কারুকে বলিনি। ইতিহাসে এ-রকম অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। কিন্তু প্রমাণিত না হলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমারও এক এক সময় মনে হত পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। আবার কোনও সময় মনে হত—যদি সত্যি হয়, তাহলে ইতিহাসের একটা মহামূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে? তাই আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।"

চুরুটটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই সামান্য পাথরের টুকরোটার কত দাম এখন বুঝতে পারছিস? এর ভেতরে খোদাই করা লিপির যখন পাঠোদ্ধার হবে—ইতিহাসের কত অজানা তথ্য যে জানা হয়ে যাবে তখন! সাধারণ মানুষের কাছে এর কোনও মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এর যা দাম, তা টাকা দিয়ে যাচাই করা যায় না। তবে, টাকার দামেও এর অনেক দাম আছে। বিদেশের অনেক মিউজিয়াম এটা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে। আমরা অবশ্য কারুর কাছে এটা বিক্রি করব না, কী বলিস? আমরা ভারতের জাতীয় মিউজিয়ামকে এটা দান করব। নানা দেশের মানুষ এটা দেখতে আসবে কলকাতায়। চল্, এবার আমাদের ফিরতে হবে।"

আমি অভিভূতভাবে কাকাবাবুর গল্প শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমি চলে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতের সেই সব জাঁকজমকের দিনে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম সম্রাট কণিষ্ককে। পুরু দুটি ঠোঁট, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অহংকার, চৌকো ধরনের চোয়াল। আর সপ্তক বাহিনীর সেই দুটি লোক। একজন মাটির তলার গুহায় পাথরের মূর্তিটি নিয়ে বসে আছে, আর একজন রাত্তিরবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, হাতে মশাল···। কাকাবাবুর কথায় ঘোর ভেঙে গেল।

খুব সাবধানে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "শোন সন্তু, এ সম্পর্কে এখন কারুকে একটা কথাও বলবি না। কারুকে না। আমরা আজই

পহলগ্রামে ফিরে যাবার চেষ্টা করব। যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়, কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে যাব দিল্লি। সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জানাব। তার আগে এটা সাবধানে জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে। সন্তু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। সারা জীবনে কখনও আমি এত আনন্দ পাইনি। মানুষ হয়ে জন্মালে অন্তত একটা কিছু মূল্যবান কাজ করে যাওয়া উচিত। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।"

বিপদের পর বিপদ

গ্রামে ফিরে গিয়েই আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম সোনমার্গের দিকে। কাকাবাবু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজি নন। খাবারদাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আমরা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কাকাবাবু বললেন, যে, পথে কোনও নদীর ধারে বসে খেয়ে নিলেই হবে।

গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এল। আমরা এ রকম হঠাৎ চলে যাব শুনে তারা তো অবাক! কেনই বা ওদের গ্রামে থাকতে এসেছিলাম, কেনই বা চলে যাচ্ছি এত তাড়াতাড়ি, তা ওরা কিছুই বুঝল না। ওরা আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা করছে কে জানে! ওরা কেউ বাংলা দেশের নাম শোনেনি, কলকাতা শহরের নাম শুনেছে মাত্র দুজন। ঐসব লোকেরা ইতিমধ্যে ভালবেসে ফেলেছিল আমাদের। একজন মুসলমান বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে কেঁদেই ফেললেন। আবু তালেব আর হুদ্দা তো এলই সোনমার্গ পর্যন্ত।

সোনমার্গে এসে আমরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বাসের আর পাত্তা নেই। বিকেল হয়ে এসেছে এর পর আর বেশিক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবেও না এ পথে। কাকাবাবু চেষ্টা করলেন কোনও জিপ ভাড়া করার জন্য। তাও পাওয়া গেল না। একটু বাদে একটা স্টেশন ওয়াগন হুস করে থামল আমাদের সামনে। সামনের সীট থেকে দাড়িওয়ালা একটা মুখ বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রোফেসারসাব, পহলগ্রাম ফিরবেন নাকি?"

সূচা সিং। আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা যখনই কোনও জায়গায় যাবার চেষ্টা করি, ঠিক সূচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওঁকে দেখে কাকাবাবু এই প্রথম একটু খুশি হলেন। নিজেই অনুরোধ করে বললেন, "কী সিংজী, আমাদের একটু পহলগ্রাম পৌঁছে দেবে নাকি? আমরা গাড়ি পাচ্ছি না।"

সূচা সিং গাড়ি থেকে নেমে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আপনি আমার গাড়িতে চড়বেন এ তো আমার ভাগ্য! আসুন, আসুন! কী খোকাবাবু, গাল দুটো খুব লাল হয়েছে দেখছি। খুব আপেল খেয়েছ বুঝি?"

কাকাবাবু বললেন, "সিংজী, তোমার গাড়ির যা ভাড়া হয় তা আমি দেব। তোমার ব্যবসা, আমরা এমনি-এমনি চড়তে চাই না।"

সূচা সিং একগাল হেসে বললেন, "আপনার সঙ্গেও ব্যবসার সম্পর্ক ? আপনি একটা মানী গুণী লোক। তাছাড়া, আজ আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছি, আজ তো আমি ব্যবসা করতে আসিনি। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি কাশ্মীরি মেয়ে বিয়ে করেছি ? এইদিকেই বাড়ি—

গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির পেছনে নানান রকমের ফলের ঝুড়িতে ভর্তি। সূচা সিং বোধহয় ওসব উপহার পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র পেছনেই রাখলাম, কিন্তু সেই তামার বাক্সটা কাকাবাবু একটা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়েছিলেন, সেটা কাকাবাবু খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখলেন।

গাড়ি ছাড়ার পর সূচা সিং বললেন, "প্রোফেসারসাব, আপনার এদিককার কাজ কর্ম হয়ে গেল ? কিছু পেলেন ?"

কাকাবাবু উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, "না, কিছু পাইনি। আমি এবার ফিরে যাব।"

"ফিরে যাবেন ? এর মধ্যেই ফিরে যাবেন ? আর কিছু দিন দেখুন !"

"নাঃ, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বুঝতে পারছি। তাছাড়া গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাবার সম্ভাবনা নেই।"

"ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন ! আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, এখানকার মাটির নীচে সোনা আছে। মার্টন্-এর দিকে যদি খোঁজ করতে চান, বলুন, আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করব।"

"তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো সিংজী, আমাকে দিয়ে হবে না।"

"কেন প্রোফেস্যারসাব, আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন ? আপনাকে আমি লোকজন, গাড়ি-টাড়ি সব দেব—আপনি শুধু বাৎলাবেন !"

"আমি বুড়ো হয়ে গেছি। পায়েও জোর নেই। আমি একটু খাটাখাটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার দ্বারা কি ওসব হয় !"

"আপনার ঐ বাক্সটার মধ্যে কী আছে ?"

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বাক্সটার গায়ে ভাল করে হাত চাপা দিয়ে বললেন, "ও, কিছু না, দু একটা টুকিটাকি জিনিসপত্তর।"

"কী আছে, বলুন না ! আমি কি নিয়ে নিচ্ছি নাকি ? হাঃ হাঃ—"

আমি সূচা সিংকে নিরস্ত করবার জন্য বলে ফেললাম, "ওর মধ্যে একটা পাথর আছে। আর কিছু নেই !"

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। কাকাবাবু আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। সূচা সিং ভুরু কুঁচকে বললেন, "পাথর ? একটা পাথর অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন ? সোনাটোনার স্যাম্পেল নাকি ? সোনা তো পাথরের সঙ্গেই

মিশে থাকে !”

কাকাবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, “আরে ধ্যাৎ, সেসব কিছু না। তুমি খালি সোনার স্বপ্ন দেখছ। এটা একটা কালো রঙের পাথর, দেখে ভাল লাগল, তাই নিয়ে যাচ্ছি !”

“আলাদা বাক্সে কালো পাথর ? এদিকে কালো পাথর পাওয়া যায় বলে তো কখনও শুনিনি। প্রোফেসার, আমাকে একটু দেখাবেন ?”

“পরে দেখবে। এখন এটা খোলা যাবে না।”

“কেন, খোলা যাবে না কেন ? সামান্য একটা বাক্স খোলা যাবে না ? দিন, আমি খুলে দিচ্ছি ?”

এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সূচা সিং একটা হাত বাড়ালেন বাক্সটা নেবার জন্য।

কাকাবাবু বাক্সটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, “না এখন না। বলছি তো, এখন খোলা যাবে না !”

সূচা সিং তবু হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, “দিন না, একটু দেখি ! পাথর নিয়ে যাচ্ছেন, না লুকিয়ে লুকিয়ে সোনার স্যাম্পেল নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা একটু দেখব না ! ভয় নেই, ভাগ বসাব না। শুধু দেখে একটু চক্ষু সার্থক করব !”

কাকাবাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, “না, এ বাক্সে হাত দেবে না। বারণ করছি, শুনছ না কেন ?”

সূচা সিং কঠিন চোখে তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। স্থির ভাবে। তাকিয়েই রইলেন দু' এক মিনিট। আমি বুঝতে পারলাম, ওঁর মনে আঘাত লেগেছে। কাকাবাবুর দিকে থেকে মুখ ফেরালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, “প্রোফেসারসাব, আমার নাম সূচা সিং। আমাকে এ তল্লাটের অনেকে চেনে। আমাকে কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না।”

কাকাবাবু তখনও রাগের সঙ্গে বললেন, “আমি বারণ করলেও কেউ আমার জিনিসে হাত দেবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। তুমি আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলো না !”

সূচা সিং বাক্সটার দিকে একবার, কাকাবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। আমার ভয় হল, সূচা সিং যে-রকম রেগে গেছেন, যদি এখানেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন ! এখনও যে অনেকটা রাস্তা বাকি !

সূচা সিং কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, “প্রোফেসারসাব, আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন ? একটা সামান্য পাথরও আপনি আমায় দেখাতে চান না ! ঠিক আছে, দেখাবেন না। আমি কি আর জোর করে দেখব ? আমি আপনাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি ! আপনার মতন মানী গুণী লোক তো বেশি দেখি না। সারাদিন ব্যবসার ধান্দায় থাকি,

তবু আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে দুটো কথা বললে ভাল লাগে। আপনি আমার ওপর রাগ করছেন !"

কাকাবাবু তখনও রেগে আছেন, স্পষ্ট বোঝা যায়। তবু একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, "কেউ কোনও কিছু একবার না বললে, তারপর আর সে নিয়ে জোর করতে নেই। তাহলেই রাগের কোনও কারণ ঘটে না।"

"ঠিক আছে, আমার গোস্তাকি হয়েছে। আমাকে মাপ করে দিন। তা প্রোফেসারসাব, সোনমার্গ ছেড়ে দিলেন, এবার কি অন্য কোনও দিকে কাজ শুরু করবেন !"

"না, আর কাজ-টাজ করার মন নেই। এবার কলকাতায় ফিরব !"

"সে কী, এত খাটাখাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের টুকরো নিয়ে ঘর যাবেন ?"

"ওটা একটা স্মৃতিচিহ্ন !"

এরপর কিছুক্ষণ কেউ আর কোনও কথা বলল না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কাকাবাবুর রাগ এখনও কমেনি, কাকাবাবু এমনিতে শান্ত ধরনের মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে সহজে রাগ কমে না। ঐ বাক্সটা তিনি আর কারুকে ছুঁতে দিতেও চান না।

একটু বাদে সূচা সিং আবার বললেন, "প্রোফেসারসাব, আপনার কোটের পকেট থেকে একটা রিভলভার উঁকি মারছে দেখলাম। সব সময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন নাকি ?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "জন্তু-জানোয়ার কিংবা দুষ্ট লোকের তো অভাব নেই। তাই সাবধানে থাকতে হয়।"

সূচা সিং হেসে হেসে বললেন, "সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক !"

পহলগ্রামে এসে পৌঁছুলাম সন্ধের পর। নটা বেজে গেছে। গাড়ি থেকে নামবার পর সূচা সিং কাকাবাবুর দেওয়া টাকা কিছুতেই নিলেন না। বরং কাকাবাবুর করমর্দন করে বললেন, "প্রোফেসারসাব, আমি আপনার দোস্ত। গোসা করবেন না। যাবার আগে দেখা করে যাবেন ! খোকাবাবু, আবার দেখা হবে, কী বলো ?"

আমার মনে হল, সূচা সিং মানুষটা তেমন খারাপ নয়। কাকাবাবু ওর ওপর অমন রাগ না করলেই পারতেন।

পহলগ্রামে লীদার নদীর ওপারে আমাদের তাঁবুটা রাখাই ছিল। যে রকম রেখে গিয়েছিলাম, জিনিসপত্তর ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে পৌঁছবার পর কাকাবাবু কাঠের বাক্সটা খুব সাবধানে তাঁর ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন। তারপর বললেন, "সন্তু, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটার কথা কারুকে বলবে না। আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না। আমি যখন তাঁবুতে থাকব না, তুমি তখন সব সময় এটার সামনে বসে থাকবে। আর তুমি না

থাকলে আমি পাহারা দেব। বুঝলে ?”

আমি বললাম, “কাকাবাবু, মুণ্ডুটা আমি তখন ভাল করে দেখিনি, আর একবার দেখব এখন ?”

কাকাবাবু উঠে গিয়ে আগে তাঁবুর সব পর্দাটর্দা ফেলে দিলেন। অন্য সব আলো নিভিয়ে শুধু একটা আলো জ্বেলে রেখে তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বার করলেন কাঠের বাক্সটা। কাঠের বাক্সটার মধ্যে সেই পুরনো তামার বাক্স, সেটার গায়েও এক সময় কী যেন লেখা ছিল— এখন আর পড়া যায় না।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে কাকাবাবু কণিষ্কর মুখ মুছতে লাগলেন। এখন তার কপাল, চোখ, ঠোঁটের রেখা অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। ভাঙা নাক ও কান দুটো জোড়া দিলে সম্পূর্ণ মুখের আদল ফুটে উঠবে। কাকাবাবু কী স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোচ্ছেন সেই পাথরের মূর্তিতে। আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, “সন্তু, এটার আবিষ্কারক হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে !”

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করে আমরা খুব সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। আজ রাত্তিরে আর কাকাবাবু ঘুমের ঘোরে কথা বলেননি একবারও। আজ তিনি সত্যিকারের শান্তিতে ঘুমিয়েছেন।

ভোরবেলা কাকাবাবুই আমাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যেই ওঁর দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। কাকাবাবু বললেন, “লীদার নদীর জলে রোদ্দুর পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, দ্যাখো ! কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে, না ?”

“কাকাবাবু, আমরা কি আজই ফিরে যাব ?”

“প্লেনে কবে জায়গা পাই সেটা দেখতে হবে। আজ জায়গা পেলে আজই যেতে রাজি। তুমি সব জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করে ঠিক করে রাখো।”

বেলা বাড়ার পর কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, তুমি তাঁবুতে থাকো, আমি সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। ব্যাসাম সাহেব আর ব্রতীন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে—ওঁরা কণিষ্ক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যাবে না।”

কাকাবাবু চলে গেলেন। আমি খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলাম। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। পড়তে পড়তে মনে হল, আমরা নিজেরাও কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি। গুহার মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, পাইথন সাপ—কলকাতায় আমার স্কুলের বন্ধুরা শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে। তখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে।

কাকাবাবু জিগ্যেস করছিলেন, কাশ্মীর ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করবে কি না ! সত্যি কথা বলতে কী, আমার আর একটুও ভাল লাগছিল না থাকতে। যদিও শ্রীনগর দেখা হল না, তাহলেও···। পৃথিবীর লোক কখন আমাদের

আবিষ্কারের কথা জানবে, সেই উত্তেজনায় আমি ছটফট করছিলাম।

কতক্ষণ বই পড়েছিলাম জানি না। হোটেলের বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে এলো তখন খেয়াল হল। ওপারের হোটেল থেকে আমাদের তাঁবুতে খাবার নিয়ে আসে কিন্তু কাকাবাবু তো এখনও এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কাকাবাবুর জন্য। তারপর খিদেয় যখন পেট চুঁই চুঁই করতে লাগল, তখন খেয়ে নিলাম নিজের খাবারটা। কাকাবাবুর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখলাম।

বিকেল গড়িয়ে গেল তখনও কাকাবাবু এলেন না। দুশ্চিন্তা হতে লাগল খুব। কাশ্মীরে এসে কাকাবাবু কক্ষনো একলা বেরোননি। সব সময় আমি সঙ্গে থেকেছি। কিন্তু এখন যে একজনকে তাঁবুতে পাহারা দিতে হবে! এত দেরি করার তো কোনও মানে হয় না। ছোট্ট জায়গা, পোস্ট আফিসে লাইন দিতেও হয় না কলকাতার মতন। কাকাবাবুর কোনও অ্যাকসিডেনট হয়নি তো? হঠাৎ জরুরী কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছে? কিন্তু তাহলে কি আমায় খবর দিয়ে যেতেন না? কাকাবাবু তাঁবু থেকে বেরুতে বারণ করেছেন, আমি খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না।

বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত নেমে এল। কাকাবাবুর দেখা নেই। এতক্ষণ একা-একা এই তাঁবুতে থেকে আমার কান্না পাচ্ছিল। কিছুই করার নেই, কারুর সঙ্গে কথা বলার নেই। কী যে খারাপ লাগে! আমার বয়সী কোনও ছেলে কি কখনও এতটা সময় একলা থাকে? সেই সকাল থেকে—এখন রাত সাড়ে ন'টা। মনে হচ্ছিল, তাঁবুর মধ্যে আমায় যেন কেউ বন্দী করে রেখেছে! কাকাবাবুর কাছে কথা দিয়েছি যে মুণ্ডুটাকে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাব না—তাই বেরুনোর উপায় নেই। যদিও, আমাদের কাছে যে এই মহা মূল্যবান জিনিসটা আছে সে কথা কেউ জানে না—তবু কাকাবাবুর হুকম, সব সময় ওটা চোখে চোখে রাখা। এখন আমি কী করব কে আমায় বলে দেবে?

রাত নিঝুম হবার পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর আগে কোনওদিন আমি একলা কোথাও ঘুমোইনি। আমার ভয় করে। কিছুতেই ঘুম আসে না। খালি মনে হয়, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কাদের যেন পায়ের দুপদাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলাম, আমার মাথার কাছে একটা বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হল চোখের ভুল। একবার চোখ বন্ধ করে আর একবার তাকাতেই দেখলাম তখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। প্রথমে মনে হল, ইতিহাসের আমল থেকে বোধ হয় কোনও আত্মা এসেছে প্রতিশোধ নিতে। তারপরই বুঝলাম, তা নয়, আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মস্ত বড় একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরল। আমি সে হাতটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে আরও দুজন লোক আছে। তাদের একজন আমার মুখের

মধ্যে খানিকটা কাপড় ভরে দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল। হাত আর পা দুটোও বাঁধল। তারপর তারা তাঁবুর সব জিনিসপত্তর লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। একটু বাদেই তারা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

ঘটনাটা ঘটতে দু'তিন মিনিটের বেশি সময় লাগল না। আমার মুখ বন্ধ, হাত পা বাঁধা, কিন্তু দেখতে পেলাম সবই। কারণ ওরা মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছিল। তাঁবুর সব জিনিস ওরা ওলোট পালোট করে গেল, কিন্তু ওরা একটা জিনিসই খুঁজতে এসেছিল।

এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল, কেউ কোনও জিনিস নেয়নি। আজ ডাকাতি হয়ে গেল। তবে, ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও যে-হাতটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল, সেই হাতটার একটা আঙুল কাটা ছিল। সূচা সিং-এর একটা আঙুল নেই।

ওরা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। যতক্ষণ ওরা তাঁবুতে ছিল, ততক্ষণ খালি মনে হচ্ছিল ওরা যাবার সময় আমাকে মেরে ফেলবে।

বেশ খানিকটা পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। হাত বাঁধা, চ্যাঁচাবারও উপায় নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তো সারারাত কাটানো যায় না।

আস্তে আস্তে নামলাম খাট থেকে। জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম। দুবার পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে, তবু এগুনো যায়। ইস্কুলের স্পোর্টসে স্যাক রেস-এ দৌড়েছিলাম আমি, অনেকটা সেই রকম, কিন্তু বুক এমন কাঁপছে যে ব্যালেন্স রাখতে পারছি না।

কোনও রকমে পৌঁছুলাম টেবিলের কাছে। ড্রয়ার খুলে বার করলাম ছুরিটা। কিন্তু ছুরিটা ঠিক মতন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতি কষ্টে ছুরিটা বেঁকিয়ে ঘষতে লাগলাম হাতের দড়ির বাঁধনে। প্রথমে মনে হল, এটা একটা অসম্ভব কাজ। এ ভাবে সারা রাত ঘষেও দড়ি কাটা যাবে না—কারণ আঙুলে জোর পাচ্ছি না। শীতে আমি বাঁশ পাতার মতন কাঁপছি। কিন্তু বিপদের সময় মানুষের এমন মনের জোর এসে যায় যে অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক সময়। একবার ছুরিটা পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তুলতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে গেলাম—একটুর জন্য আমার গালটা কাটেনি। সেই অবস্থায়, মাটিতে শুয়ে শুয়েই আমার মনে হল, ঘাবড়ালে কোনও লাভ নেই, কান্নাকাটি করলেও কোনও ফল হবে না—আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে, কাটতেই হবে হাতের বাঁধন। ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল কাটতে, ততক্ষণে আমার হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। এঃ, আমার মুখের মধ্যে এমন একটা ময়লা রুমাল ভরে দিয়েছিল যে দেখেই আমার বমি পেয়ে গেল, বমি করে ফেললাম মাটিতে।

এই সময় বমি করার কোনও মানে হয় ? কিন্তু রুমালটায় এমন বিশ্রী গন্ধ যে কিছুতেই সামলানো গেল না। ফ্লাস্কের গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম। তাও, ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম শীতে।

তাঁবুর মধ্যে এক নজর তাকিয়েই বোঝা যায়, ওরা সেই কাঠের বাক্সটা নিয়ে গেছে। পাথরের মুণ্ডুটার কোনও মূল্যই ওদের কাছে নেই—তবু কেন নিয়ে গেল ? হয়তো ওরা নষ্ট করে ফেলবে। ওরা কি কাকাবাবুকে মেরে ফেলেছে ! ওরা কি আমাকেও মারবে ?

ডাকাতের বউ আর ছেলেমেয়ে

বিপদের রাত্রি অনেক দেরি করে শেষ হয়। সারা রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। চোখ ঢুলে আসছিল, তবু ঘুমোইনি। আস্তে আস্তে যখন সকাল হল, তখন মনের মধ্যে একটু জোর পেলাম। দিনের আলোয় অনেকটা সাহস আসে। মনে মনে ঠিক করলাম, ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে কোনও লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু আমি একলা একলা কী করব ? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে ? বাচ্চা ছেলে বলে হয়তো আমার কথা উড়িয়ে দেবে। কাকাবাবুর মতন একজন বয়স্ক জলজ্যান্ত লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সূচা সিং-এর হাত আছে তাতে। কাকাবাবু থাকতে থাকতে মূর্তিটা নিতে সাহস করেননি। কাকাবাবুর সঙ্গে রিভলভার থাকে। তাই কাকাবাবুকে আগে সরিয়ে তারপর জিনিসটা নিয়ে যাওয়া হল ! সূচা সিং-এর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, ওঁর বিরুদ্ধে আমার কথা কে শুনবে ?

আমাদের পাশের তাঁবুতে কয়েকজন জার্মান ছেলেমেয়ে থাকে। একটু একটু আলাপ হয়েছিল। ওদেরও বলে কোনও লাভ নেই, ওরা বিদেশি, কী আর সাহায্য করতে পারবে ? চট করে মনে পড়ে গেল সিদ্ধার্থদার কথা। সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণি—ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে ? হয়তো এর মধ্যেই ফিরে শ্রীনগর চলে গেছে। এর মধ্যে ক'দিন কেটে গেল—অমরনাথ থেকে ফিরতে ক'দিন লাগে—সেটা আর কিছুতেই হিসেব করতে পারছি না। খালি মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অমরনাথ থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই প্লাজা হোটেলে উঠবে, সেখানে খবর পাওয়া যাবে।

কাকাবাবু বলেছিলেন, কোনওক্রমেই তাঁবু থেকে না বেরুতে। কিন্তু যে-জন্য বলেছিলেন, তার তো আর কোনও দরকার নেই। আসল জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে। আমাদের তাঁবুতে আর দামি জিনিস বিশেষ কিছু নেই। কাকাবাবু টাকা পয়সা কোথায় রাখতেন আমি জানি না—সেগুলোও বোধহয়

ডাকাতরা নিয়ে গেছে। হোটেলের বিল কী করে শোধ হবে কে জানে! সিদ্ধার্থদাদের না পেলে চলবেই না।

হেঁটে হেঁটে গেলাম প্লাজা হোটেলে। সেখানে কোনও খবরই পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদারা হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন অমরনাথ—ফিরে এসেছেন কিনা ওঁরা জানেন না। ফেরার পর রিজার্ভেশানও করা নেই। এর মধ্যে ফিরে এসে অন্য হোটেলেও উঠতে পারেন বা শ্রীনগরে চলে যেতে পারেন। আবার এখনও ফিরতে নাও পারেন, অর্থাৎ আমি কিছুই জানতে পারলাম না। তবে, পোপোটলাল নামে একজন পাণ্ডা গিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে—তার খোঁজ পেলে সব জানা যেতে পারে। পাণ্ডাজী যদি ফিরে থাকেন, তবে তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সব খবরাখবর। পোপোটলালের ঠিকানা? ঠিকানা কিছু নেই—বাজারের কাছে গিয়ে খোঁজ করলে লোকে বলে দেবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম প্লাজা হোটেল থেকে। কোথায় এখন পোপোটলালকে পাব? মানুষ হারিয়ে গেলে পুলিশকে খবর দিতে হয় শুনেছি। কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে।

পহলগ্রামের রাস্তা দিয়ে এখন কত মানুষজন হাঁটছে, কত আনন্দ সবার মুখে চোখে। আমার বিপদের কথা কেউ জানে না। আমাকে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করল না, খোকা, তোমার মুখটা এমন শুকনো দেখছি কেন? তোমার কি কিছু হয়েছে? আমারই বয়েসী কত ছেলে-মেয়ে হৈ চৈ করতে করতে যাচ্ছে বেড়াতে। আমার কেউ চেনা নেই। কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করব? বাবা আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততদিন আমি একা···

হাঁটতে হাঁটতে বাস ডিপোর দিকে চলে এসেছিলাম। দু' একটা দোকানে জিজ্ঞেস করেছি পোপোটলালের খবর। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এখন খুব টুরিস্ট আসার সময়—দোকানদাররা খদ্দের সামলাতেই ব্যস্ত—আমার কথা ভাল করে শোনার পর্যন্ত সময় নেই। হঠাৎ দেখলাম একটা বাসের জানলায় রিণির মুখ। এক্ষুনি বোধহয় বাসটা ছেড়ে দেবে। আমি প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম, হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে লাগলাম, "রিণি, রিণি!"

বাসটা ছাড়েনি। রিণি আর স্নিগ্ধাদি বসে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম, "সিদ্ধার্থদা কোথায়?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "ও আসছে এক্ষুনি। তুই ওরকম করছিস কেন রে, সন্তু?"

রিণি বলল, "কাল সারাদিন তোকে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। ভাবলাম তোরা চলে গেছিস। আমরা পরশু ফিরেছি অমরনাথ থেকে। এবার পহলগ্রামে আমরাও তাঁবুতে ছিলাম।"

কাল সারাদিন আমি তাঁবুতে বসে ছিলাম, আর ওদিকে ওরা আমাকে খুঁজছে। লীদার নদীর ধারে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা তাঁবু— হয়তো আমাদেরটার

কাছাকাছি ওরা ছিল, আমি টের পাইনি। এর কোনও মানে হয় ?

একটু দম নিয়ে আমি বললাম, "সিদ্ধার্থদাকে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুনি। স্নিগ্ধাদি, তোমাদের এই বাসে যাওয়া হবে না। নেমে পড়ো, শিগগির নেমে পড়ো।"

স্নিগ্ধাদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কী হয়েছে কী ? আমাদের তো বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, মালপত্র তোলা হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "তোমরা আগে নেমে পড়ো, তারপর সব কথা বলছি ! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন। আমাদের তাঁবুতে···"

রিণি হি-হি করে হেসে উঠে বলল, "কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন ? অতবড় একটা লোক আবার হারিয়ে যায় নাকি ? বল্ তুই-ই হারিয়ে গেছিস, তোর কাকাবাবুই তোকে খুঁজছেন।"

আঃ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না। রিণিটা একদম বাজে মার্কা। দরকারী কথার সময়েও হাসে। ভাগ্যিস এই সময় সিদ্ধার্থদা এসে গেলেন।

আমি সিদ্ধার্থদাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, "এ তো সত্যি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সব মালপত্র উঠে গেছে, শ্রীনগরে লোক অপেক্ষা করবে। অথচ তোমাকে একা ফেলে যাওয়া যায় না। কী করা যায় বলো তো ? এক্ষুনি ঠিক করতে হবে, দেরি করার সময় নেই ! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।"

ততক্ষণে বাসটা স্টার্ট নিয়েছে, কণ্ডাক্টর হুইসল বাজাচ্ছে ঘন ঘন। এ সব জায়গায় বাসে নিয়মকানুন খুব কড়া। সিদ্ধার্থদা জানলার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধাদিকে বললেন, "শোনো, তোমরা দুজনে চলে যাও শ্রীনগরে। এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—আমি সন্তুর সঙ্গে থাকছি—একদিন পর যাব।"

স্নিগ্ধাদি তো কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, "পাগল নাকি ! আমরাও থাকব তাহলে। কণ্ডাক্টরকে বলো—"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো। শ্রীনগরে তো সব ঠিক করাই আছে, তোমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। তোমরা এখানে থাকলেই বরং অসুবিধা হবে। আমি একদিন পরেই আসছি।"

বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, সিদ্ধার্থদা সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গেলেন বোঝাতে বোঝাতে। স্নিগ্ধাদি আমাকে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "কী হয়েছে বল তো সন্তু ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ! এই সন্তু, তুই চুপ করে আছিস কেন ?"

কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না ঐটুকু সময়ে—সিদ্ধার্থদা বললেন, "যা হয়েছে পরে শুনতে পাবে। চিন্তা করো না, আমি কালকেই যাচ্ছি !"

তারপর বাস জোরে ছুটল, রিণি হাত নাড়তে লাগল।

সিদ্ধার্থদা যে প্রথম থেকেই আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন, বেশি কিছু জিজ্ঞেস না করেই থেকে যাওয়া ঠিক করলেন, সে জন্য সিদ্ধার্থদার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। সময় এত কম ছিল— ওর মধ্যে কি সব বুঝিয়ে বলা যায় ?

বাসটা চলে যাবার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, "চলো, কাজ শুরু করা যাক্ ! তোমার কাকাবাবু কাল সকালবেলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি ? তোমাকে কোনও খবর না দিয়ে তিনি কোথাও চলে যাবেন, তা হতেই পারে না !"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "তা হতেই পারে না !"

"হুঁ ! একটা জলজ্যান্ত লোক তা হলে যাবেই বা কোথায় !"

"সূচা সিং…"

"সূচা সিং ? সে আবার কে ?"

"সূচা সিং নামের একজন লোকের সঙ্গে কাকাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল। সেই লোকটাই তাঁবুর মধ্যে রাত্তিরবেলা আমাকে…"

সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে সব শুনলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। আমার মনের ভেতরের ভয়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। সিদ্ধার্থদাকে যখন পিয়েছি, তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। যতক্ষণ একা ছিলাম, ততক্ষণ কী যে অসহ্য একটা অবস্থা… ।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "থানায় খবর দিয়েছ ? দাওনি ? চলো, আগে সেখানেই যাই।"

থানায় দুজন অফিসার ছিলেন, তাঁদের নাম মীর্জা আলি আর গুরুবচ্চন সিং। খাতির করে বসতে বললেন আমাদের, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর মীর্জা আলি বললেন, "বহুৎ তাজ্জবকী বাৎ ! এখানে এরকম ঘটনা কখনও ঘটে না। দিনেরবেলা একটা লোক উধাও হয়ে যাবে কী করে ? তাছাড়া সূচা সিং-এর নামে তো কেউ কোনওদিন কোনও অভিযোগ করেনি।"

গুরুবচ্চন সিং বললেন, "আপনাদের তাঁবু থেকে কী কী চুরি গেছে ? দামী জিনিস কী কী ছিল ?"

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কাকাবাবুর একটা রিভলভার ছিল, সেটা তিনি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কি না জানি না—সেটা পাচ্ছি না। আর কিছু টাকা পয়সা—"

"কত ?"

"আমি তা জানি না।"

"ক্যামেরা-ট্যামেরা ?"

"ছিল না। একটা দূরবীন ছিল, সেটা নেয়নি।"

“আশ্চর্য, এর জন্যই দিনেরবেলায় একটা লোককে···রাত্তিরবেলা তাঁবুতে ঢুকে···এখানে এ রকম কাণ্ড···ঠিক আছে, চলুন এনকোয়ারি করে দেখা যাক—”

পোস্ট অফিসে গিয়ে জানা গেল, কাকাবাবু সেখানে টেলিগ্রাম করতে যাননি। আগের দিন মাত্র তিনজন টেলিগ্রাম করতে এসেছিল, তার মধ্যে কাকাবাবুর মতন চেহারার কেউ ছিল না। দু'জনই তাদের মধ্যে মহিলা, আর একজন স্থানীয় লোক। অর্থাৎ, যা হবার তা এখানে আসবার আগেই হয়েছে। আমাদের তাঁবুতে তদন্ত করে পুলিশ বুঝতে পারলেন, সেখানে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, কিন্তু অপরাধীর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। সাধারণ চোর ডাকাত যে নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। বাইনোকুলার, অ্যালার্ম ঘড়ি, পেন—এসব কিছুই নেয়নি। যে-ট্রাঙ্কটা চোররা ভেঙেছে, সেটার মধ্যেই একটা মানি ব্যাগ ছিল কাকাবাবুর, সেটাও চোরদের চোখে পড়েনি। সূচা সিং-এর গ্যারেজে গিয়ে শোনা গেল, সূচা সিং বিশেষ কাজে মাটন্ গেছে, বিকেলেই ফিরবে। মীর্জা আলি হুকুম দিলেন সূচা সিং ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গুরুবচ্চন সিং বললেন, “আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল, খুব ভাল লোক—আমাদের সরকারের অনেকের সঙ্গে তাঁর চেনা জানা আছে, পহলগ্রামে তাঁর কোনও বিপদ হবে, এতে পহলগ্রামের বদনাম। সূচা সিং যদি দোষী হয়, তা হলে আমাদের হাত সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শাস্তি পাবেই। আপনারা বিকেলে আবার খবর নেবেন। আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।”

পুলিশদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সিদ্ধার্থদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “সন্তু, সকাল থেকে কিছু খেয়েছ? মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত চিন্তা করো না!”

এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। সিদ্ধার্থদার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, কী দারুণ খিদে পেয়েছে! সেই মিষ্টির দোকানটায় ঢুকলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার সময় আমরা প্রত্যেকবার এখানে জিলিপি খেতাম। কাকাবাবু আজ নেই! কাকাবাবু কোথায় আছেন, কে জানে! আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠল।

আমি সিদ্ধার্থদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কাকাবাবু বলেছিলেন, পাথরের মুণ্ডুটার কথা আমি যেন কোনও কারণেই কারুকে না বলি। সেইজন্য পুলিশকে বলিনি। কিন্তু সিদ্ধার্থদাকেও কি বলা যাবে না? সিদ্ধার্থদা তো আমাদের নিজেদের লোক। সিদ্ধার্থদার সাহায্য ছাড়া আমি একা কী করতে পারতাম? তাছাড়া সিদ্ধার্থদা ইতিহাসের অধ্যাপক, উনি ঠিক মূল্য বুঝবেন।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, “সিদ্ধার্থদা, পুলিশকে সব কথা আমি বলিনি।

আমাদের একটা দারুণ দামি জিনিস চুরি গেছে—"

"কী ?"

"আমরা সম্রাট কণিষ্ক-র মুণ্ডু আবিষ্কার করেছিলাম ।"

"কী বললে ? কার মুণ্ডু ?"

আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বললাম সিদ্ধার্থদাকে। সিদ্ধার্থদা অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সবটা। তারপর ছটফট করতে লাগলেন। বললেন, "কী বলছ তুমি, সন্তু ! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য যে কী দারুণ তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সেটা এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ? অসম্ভব ! যে-কোনও উপায়েই হোক, ওটা বাঁচাতেই হবে ।"

দোকানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা আবার বললেন, "তুমি ঠিক জানো, রাত্তিরবেলা সূচা সিং-ই ঢুকেছিল ? সে-ই ওটা নিয়ে গেছে ?"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "আঙুল কাটা দেখেই আমি চিনেছি। তাছাড়া, ওটার কথা আর কেউ জানে না। সূচা সিংও জানত না— ও কাঠের বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়েছিল, ওর ধারণা ওর মধ্যে দামি কিছু জিনিস আছে ।"

"সূচা সিং ঐ একটা পাথরের মুখ নিয়ে কী করবে ? ইতিহাস না জানলে, ওটার তো কোনও দামই নেই। সূচা সিং ওর মূল্য কী বুঝবে ? সে নিতে চাইবেই বা কেন ?"

"সেটা আমিও জানি না। কিন্তু সিদ্ধার্থদা, ওর সব সময় ধারণা, কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজ করতে এসেছেন। ওর সেই সোনার জন্য লোভ ।"

"কিন্তু যখন বাক্সটা নিয়ে দেখবে, ওতে দামি কিছু নেই, সোনা তো নেই-ই, তখন নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে। শুধু শুধু তো কেউ কোনও মানুষকে মারে না বা আটকে রাখে না ।"

"কাকাবাবু বলছিলেন, বিদেশের মিউজিয়ামগুলো জানতে পারলে নাকি ওটার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দাম দিতে চাইবে ।"

"তার আগে তো জানতে হবে, মুণ্ডুটা কার ! সেটা সূচা সিং জানবে কী করে ? সূচা সিংকে সে কথা জানাওনি তো ?"

"না। সেইজন্যই বোধহয় কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে ।"

"কাকাবাবু নিশ্চয়ই বলে দেবেন না !"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থদা আপনমনেই বললেন, "শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। ঐ পাথরের মুণ্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না। ওটাকে রক্ষা করতে না পারলে···সন্তু, তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবে ? আমি একটু দেখে আসি—"

"না, সিদ্ধার্থদা, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। একলা থাকতে আমার ভয় করবে ।"

"দিনেরবেলা আবার ভয় কি ?"

"না, আমি আপনার সঙ্গে যাব। আচ্ছা, সিদ্ধার্থদা, এমন হতে পারে না যে সূচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশকে ওর লোকরা মিথ্যে কথা বলেছে ?"

"তা মনে হয় না। পুলিশ তো যে-কোনও মুহূর্তেই সার্চ করতে পারে। তবু একবার গিয়ে দেখা যাক।"

দু-একটা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই সূচা সিং-এর বাড়িটা জানা গেল। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানে একজন মহিলা কাজ করছিলেন। কাশ্মীরি মেয়ে—কী সরল আর শান্ত তাঁর মুখখানা। দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে। মহিলা বোধহয় সূচা সিং-এর স্ত্রী। সূচা সিং-এর কাশ্মীরি বউ সেকথা শুনেছিলেন। বাড়িটা দেখলে মনে হয় না—এটা কোনও বদমাইস লোকের বাড়ি।

সিদ্ধার্থদা বাগানের গেটের সামনে গিয়ে খুব বিনীতভাবে বললেন, "বহিনজী, শুনিয়ে !"

মহিলা একবার চোখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। কোনও উত্তর দিলেন না !

সিদ্ধার্থদা আবার ডাকলেন, "বহিনজী একটা বাত শুনিয়ে !"

মহিলাটি এবারও কোনও উত্তর দিলেন না, আমাদের দিকে তাকালেন না। বুঝতে পারলুম, বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ওঁকে। বাচ্চা ছেলে দুটি জুল-জুল করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

সিদ্ধার্থদা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। এবার গলার আওয়াজ খুব করুণ করে বললেন, "বহিনজী, এক গিলাস পানি পিলায়েঙ্গে ? বহুৎ পিয়াস লাগা !"

জল খেতে চাইলে কেউ কোনওদিন না বলতে পারে না। বিশেষত মেয়েরা। মহিলা এবার আমাদের দিকে তাকালেন। বাড়ির ভেতর গিয়ে এক গেলাস জল এনে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থদার দিকে।

সিদ্ধার্থদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "হামকো নেই, এই লেড়কাকো দিজিয়ে !"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "নে খেয়ে নে ! মাথা ঘোরা কমেছে !"

আমি তো অবাক ! তবু কোনও কথা বললাম না। সেই ঠাণ্ডার মধ্যেই বাধ্য হয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিতে হল। সিদ্ধার্থদা সূচা সিং-এর বৌকে বললেন, "এই ছেলেটার মাথা ঘুরছে। এর খুব শরীর খারাপ লাগছে হঠাৎ। কী করি বলুন তো ? মাথায় জল ঢেলে দেব ?"

সূচা সিং-এর স্ত্রী-র দয়া হল। বাগানে একটা কাঠের বেঞ্চি ছিল, সেটা দেখিয়ে বললেন, "ওর ওপর শুইয়ে দিন !"

সিদ্ধার্থদা আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে

বললেন, "আজই শ্রীনগরে গিয়ে একে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। সূচা সিং যদি একটা গাড়ি দেন..."

মহিলা বললেন, "না, উনি বাড়ি নেই। গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারেজে গিয়ে দেখতে পারেন।"

"গ্যারেজে খালি গাড়ি নেই। একটা মাত্র আছে—কিন্তু সিংজীর হুকুম ছাড়া সেটা পাওয়া যাবে না।"

"কিন্তু উনি তো পহলগ্রামে নেই এখন !"

সিদ্ধার্থদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "আমাদের খুব দরকার ছিল। সিংজী কবে ফিরবেন ? আজ ফেরার কোনও চান্স নেই ? খুব দূরে কোথাও গেছেন কি ?"

"খুব দূর নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন সে কথা তো কছু বলেননি।"

"দেওগির গ্রামটা কোথায় যেন ? মাটন-এর কাছেই না ?"

"না, ওদিকে তো নয়। সোনমার্গের রাস্তায়। লীদার নদী ছাড়িয়ে বাঁ দিকে গেলেই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। দেওগির তো খুব সুন্দর জায়গা !" সিদ্ধার্থদা রীতিমত গল্প জমিয়ে নিলেন। ছেলেমেয়ে দুটো আমাদের কাছে এসে বড় বড় টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমার মনে হল, মানুষের লোভ জিনিসটা কী বিচ্ছিরি ! সূচা সিং-এর এই তো এত সুন্দর বাড়ি, আট-ন'খানা গাড়ি ব্যবসায় খাটাচ্ছে—তবু সোনার জন্য কী লোভ ! সোনার লোভেই কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে কোথাও। কাল রাত্তিরে আমাদের তাঁবুতে চুরি করতে গিয়েছিল। পুলিশ যখন ওকে ধরে ফাঁসি দেবে, তখন ছেলেমেয়েগুলো কাঁদবে কী রকম ! শুনেছি আগেকার দিনে কাশ্মীরে কেউ চুরি করলে তার নাক বা কান বা হাত কেটে দিত।

একটু বাদে আমরা সূচা সিং-এর স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। খানিকটা দূরে চলে আসার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, "সন্তু, একবার দেওগির গিয়ে দেখবে নাকি ? সূচা সিং-এর বউকে বেশ সরল মনে হল, বোধহয় মিথ্যে কথা বলেনি।"

"পুলিশের কাছে জানাবেন না ?"

"হ্যাঁ, জানাব। ওরা যদি গা না করে আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসব একবার।"

আবার আমরা থানায় গেলাম। পুলিশের লোকেরা সব শুনে বললেন, "আপনারা এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন ? আজ সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন।"

মীর্জা আলি বললেন, "সূচা সিংকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির

করাব, কোনও চিন্তা নেই।"

গুরুবচ্চন সিং বললেন, "কী খোকাবাবু, আংকল-এর জন্য মন কেমন করছে ?"

থানা থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা বললেন, "চলো আমরা নিজেরাই যাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।"

কিছুতেই আর গাড়ি পাওয়া যায় না। এখন পুরো সীজন্-এর সময়, গাড়ির খুব টানাটানি। শেষ পর্যন্ত একটা গাড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে আসবে। সিদ্ধার্থদা এত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, "ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই ! কী বলো, সন্তু ?"

দেওগির গ্রামের কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। রাস্তার দু পাশে ঘন গাছপালা। ফুল ফুটে আছে অজস্র। ময়না আর বুলবুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে। কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা সরু ঝরনা, তার জলের কল্‌কল্ শব্দ শোনা যায় একটানা।

দুজনে মিলে হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ। সূচা সিং-এর বাড়িটা কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না। কারুকে জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হতে লাগল, কাকাবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। এই রকম মনে হবার কোনও মানে নেই। তবু এক এক সময় মনে হয় না ? সিদ্ধার্থদা আর আমি দু'জন রাস্তার দু'দিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। খানিকটা বাদে হঠাৎ আমি রাস্তার পাশে একটা জিনিস দেখে ছুটে গেলাম। কাকাবাবুর একটা ক্রাচ পড়ে আছে। আমার শরীরটা কী রকম দুর্বল হয়ে গেল, চোখ জ্বালা করে উঠল। কাকাবাবু তো ক্রাচ ছাড়া কোথাও যান না। এটা এখানে পড়ে কেন ? তাহলে কি কাকাবাবুকে ওরা···

সিদ্ধার্থদা সেটা দেখে বললেন, "এটা তো অন্য কারুরও হতে পারে। ক্রাচ তো এক রকমই হয়। সন্তু, তুমি ঠিক চিনতে পারছ ?"

"হ্যাঁ, সিদ্ধার্থদা। কোনও ভুল নেই। এই যে মাঝখানটায় খানিকটা ঘষটানো দাগ ? সিদ্ধার্থদা, কী হবে ?"

"আরে, তুমি আগেই ভয় পাচ্ছ কেন ? পুরুষ মানুষের অত দুর্বল হতে নেই। শেষ না-দেখা পর্যন্ত কোনও জিনিস মেনে নেবে না। একখানা ক্রাচ পড়ে আছে, আর একটা কোথায় গেল ?"

আর একটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদা সেটাকে তুলে হাতে রাখলেন। তারপর বললেন, "আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে দিয়েছেন— চিহ্ন রাখবার জন্য। ওঁর খোঁজে যদি কেউ আসে, তাহলে এটা দেখে বুঝতে পারবে। পাশ দিয়ে এই যে

সরু রাস্তাটা গেছে, চলো এইটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক।"

সেই রাস্তাটা দিয়ে একটু দূরে যেতেই একটা বাড়ি চোখে পড়ল। দোতলা কাঠের বাড়ি। কোনও মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে আমরা এগোলাম বাড়িটার দিকে। সিদ্ধার্থদা খুব সাবধানে তাকাচ্ছেন চারদিকে। হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে ধরে সিদ্ধার্থদা বললেন, "ঐ দ্যাখো বলেছিলুম, ঐ যে আর একটা ক্রাচ।"

একটা গোলাপের ঝোপের পাশে দ্বিতীয় ক্রাচটা পড়ে আছে। সিদ্ধার্থদা সেটাও তুলে নিলেন। আর কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।

সিদ্ধার্থদা মুখখানা কঠিন করে বললেন, "হুঁ, একটা লোককে লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা! কেউ টের পাবে না।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "সিদ্ধার্থদা, এখন ফিরে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনলে হয় না?"

"এখন পুলিশ ডাকতে যাব? ততক্ষণে ওরা যদি পালায়? এসেছি যখন, শেষ না দেখে যাব না।"

"কিন্তু ওরা যদি অনেক লোক থাকে?"

"তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি সন্তু?"

"না, না, ভয় পাইনি—"

"ক্রাচ দুটো দুজনের হাতে থাক। বেশ শক্ত আছে, দরকার হলে কাজে লাগবে।"

কয়েকটা গাছের আড়ালে আমরা কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। পাশাপাশি তিনখানা ঘর, তার মধ্যে ডানদিকের কোণের ঘরটা তালাবন্ধ। আমি বললাম, "হয়তো সবাই এখান থেকে আবার অন্য কোথাও চলে গেছে।"

সিদ্ধার্থদা গম্ভীরভাবে বললেন, "তা হতেও পারে। কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না।"

"সিদ্ধার্থদা, প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। এরপর আমরা ফিরবই বা কী করে?"

"সে ভাবনা পরে হবে। ফিরতে না পারি ফিরব না। কণিষ্কর মাথাটা আমি একবার অন্তত দেখবই।"

একটু সন্ধে হতেই আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। এখনও কারুর দেখা নেই। পা টিপে টিপে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির পাশের ঘরটাই তালাবন্ধ, পাশের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না। মনে হল যেন একটা চৌপাই-তে একজন মানুষ শুয়ে আছে। চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যেতেই চিনতে পারলাম—কাকাবাবু!

সিদ্ধার্থদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, "চুপ!"

তারপর তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তালাটা পেল্লায় বড়। সিদ্ধার্থদা বললেন, "তালাটা বড় হলেও বেশি মজবুত নয়। সস্তা কোম্পানীর তৈরি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওরা এরকম একটা বাজে তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন ! বাড়িতেও আর কেউ নেই মনে হচ্ছে।"

সিদ্ধার্থদা ক্রাচের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দিলেন তালাটার মধ্যে। তারপর খুব জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই তালাটা খুলে এলো।

সিদ্ধার্থদা বললেন, "দেখে কি মনে হচ্ছে, আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে ? আমি কিন্তু জীবনে এই প্রথম তালা ভাঙলাম।"

ততক্ষণে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলেছি। ফিসফিস করে ডাকলাম, "কাকাবাবু, কাকাবাবু !"

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। সিদ্ধার্থদাও পড়লেন এসে আমার পাশে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থদা প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে টেনে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। দরজাটা ওপাশ থেকে কেউ টেনে ধরে আছে। একটু ফাঁকও হল না। ধাক্কাধাক্কি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থদা।

কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "কে ?"

ঘরের মধ্যে আলো বেশি নেই, কিন্তু মানুষ চেনা যায়। কাকাবাবু আমাদের চিনতে পারছেন না ! কাকাবাবুকে কি ওরা অন্ধ করে দিয়েছে ! পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কাকাবাবুর চোখে চশমা নেই। চশমা ছাড়া উনি অন্ধেরই মতন।

আমি বললাম, "কাকাবাবু, আমি সন্তু। আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থদা— ।"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, "তোমরা আবার এরকম বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন ?"

আমি দেখলাম কাকাবাবুর ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাকে মেরেছে ওরা ?"

কাকাবাবু বললেন, "ও কিছু না। তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে। এরা বিপজ্জনক লোক।"

সিদ্ধার্থদা বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ আমাদের পেছন পেছনই আসছে।"

জানলার বাইরে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। জানলায় দেখলাম সূচা সিং-এর বিরাট মুখ। সূচা সিং প্রথমেই বললেন··· । না, বললেন না, বলল। ওকে আমি মোটেই আর আপনি বলব না। একটা ডাকাত, গুণ্ডা !

আমার কাকাবাবুকে মেরেছে!

সূচা সিং বলল, "কী খোকাবাবু, তোমার বেশি লাগেনি তো? একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়েছি।"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমার কিন্তু খুব জোরে লেগেছে। আমাকে কী দিয়ে মারলে? লাঠি দিয়ে? অতবড় চেহারাটা নিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোথায়?"

সূচা সিং বলল, "এই ছোকরাটি কে খোকাবাবু? একে তো আগে দেখিনি।"

আমি কিছু বলার আগেই সিদ্ধার্থদা বলে উঠলেন, "আরও অনেককে দেখবে। পুলিশ আসছে একটু পরেই।"

সূচা সিং আবার হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "আসুক, আসুক! অনেক জায়গা আছে এ বাড়িতে খানাপিনা করুন, আরামসে থাকুন, কই বাত নেই! রাত্তিরে শীত লাগলে কম্বল নিয়ে নেবেন—ঐ খাটের নীচে অনেক কম্বল আছে।"

কাকাবাবু খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায় পায় হেঁটে গেলেন জানলার দিকে। গম্ভীরভাবে বললেন, "সূচা সিং, আমার চশমাটা দাও! চশমা নিয়ে তোমাদের কী লাভ!"

সূচা সিং খানিকটা অবাক হবার ভাব দেখিয়ে বলল, "চশমা? আপনার চশমা কোথায় তা আমি কী করে জানব! হয়তো আসবার সময় কোথাও পড়েটড়ে গিয়ে থাকবে!"

"না, তোমার লোক জোর করে আমার চশমা খুলে নিয়েছে।"

"তাই নাকি! খুব অন্যায়!"

"চশমাটা এনে দিতে বলো!"

"সে তো এখন এখানে নেই! এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনাকে তো এখন পড়ালিখা করতে হচ্ছে না!"

কাকাবাবু হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমার মনে হল, যেন কণিষ্কর মুণ্ডু কিংবা আর সবকিছুর থেকে চশমাটাই এখন ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা!

সিদ্ধার্থদা বললেন, "পুলিশকে আমি এই জায়গাটার নাম বলে এসেছি। আজ হোক কাল হোক পুলিশ এখানে ঠিক এসে পড়বে।"

সূচা সিং বলল, "আসুক না! পুলিশকে আমি পরোয়া করি না!"

কাকাবাবু বললেন, "সূচা সিং, তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছ। আমাদের ছেড়ে দাও।"

"প্রোফেসারসাব, আপনাকে ছেড়ে দিতে কি আমার আপত্তি আছে? আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি আমার কথাটা শুনুন।"

"তোমার ধারণা ভুল। আমি সোনার খবর জানি না।"

"ঠিক আছে। এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে, বাতচিত করুন। দেখুন, যদি আপনার মত পাল্টায়—"

"সূচা সিং, পাথরের মুণ্ডুটা আমার কাছে দিয়ে যাও। ওটা যেন কোনওরকমে নষ্ট না হয়। ওটা তোমার কোনও কাজে লাগবে না—"

"ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে।"

'তোমাকে আমি ছাড়বো না !'

সূচা সিং জানলা থেকে সরে যাবার পর কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "লোকটা পাগল হয়ে গেছে! একটা পাগলের জন্য আমার এত পরিশ্রম হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা কাছে এসে কাকাবাবুর পাশে খাটের ওপর বসলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কাকাবাবু, তোমাকে কী করে নিয়ে এল এখানে ?"

কাকাবাবু অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন, "আমাকে ধরে আনা খুবই সহজ। আমি তো দৌড়তেও পারি না, মারামারিও করতে পারি না। পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম, একটা গাড়ি আসছিল আমার গা ঘেঁষে। দুটো লোক তার থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। ঐখানে রাস্তাটা নির্জন, সকালে বিশেষ লোকও থাকে না—কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। আমিও চ্যাঁচামেচি করিনি, তাতে কোনও লাভও হত না—কারণ একজন আমার পাঁজরার কাছে একটা ছুরি চেপে ধরেছিল !"

"গাড়িতে করে সোজা এখানে নিয়ে এল ?"

"না। কাল সারাদিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারেজের পেছনে একটা ঘরে। সূচা সিং-এর বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমি কোনও গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেই যে কাঠের বাক্সটা ওকে দেখতে দিইনি, তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে। এমনিতে ও আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি, শুধু বারবার এক কথা—ওকে আমি গুপ্তধনের সন্ধান বলে দিলে ও আমাকে আধা বখরা দেবে।"

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার হাতে লাগল কী করে ?"

"একবার শুধু ওর একজন সঙ্গী আমার হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে। সূচা সিং বলেছিল কাছে এনে ভয় দেখাতে, লোকটা সত্যি সত্যি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। সূচা সিং তখন বকল লোকটাকে। সূচা সিং আমার ওপর ঠিক অত্যাচার করতে চায় না। ওর কায়দা হচ্ছে, ভাল ব্যবহার করে আমাকে বশে আনা, ভোরবেলা আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে।"

"কিন্তু আপনাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড করেও তো ও কিছুই খুঁজে পায়নি।

পাথরের মূর্তিটা দেখে ও তো কিছুই বুঝবে না। তাহলে এখনও আটকে রেখেছে কেন ?”

“বললাম না, ও পাগলের মতন ব্যবহার করছে। মুণ্ডুটার ভেতর দিকে কতকগুলো অক্ষর লেখা আছে। ওর ধারণা ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান। সিনেমা-টিনেমায় যে রকম দেখা যায় অনেক সময়! বিশেষত, মূর্তিটার জন্য আমার এত ব্যাকুলতাই ওর প্রধান সন্দেহের কারণ। আমার সামনে ও মুণ্ডুটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে গিয়েছিল, আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম !”

সিদ্ধার্থদা বললেন, “ও যদি মুণ্ডুটার কোনও ক্ষতি করে, আমি ওকে খুন করে ফেলব !”

কাকাবাবু বললেন, “ওকে দমন করার কোনও সাধ্য আমাদের নেই। ওর সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে।”

সিদ্ধার্থদা জানালার কাছে গিয়ে শিকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, “জানালাটা ভাঙা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি।”

কাকাবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, “ঐ মুণ্ডুটা ফেলে আমি কিছুতেই যাব না। তার বদলে আমি মরতেও রাজি আছি। তোমরা বরং যাও—”

কাকাবাবুকে ফেলে যে আমরা কেউ যাব না, তা তো বোঝাই যায়। সিদ্ধার্থদা ওভারকোট খুলে ভাল করে বসলেন। স্নিগ্ধাদি আর রিণি এতক্ষণে শ্রীনগরে পৌঁছে নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। আমরা কবে এখান থেকে ছাড়া পাব, ঠিক নেই। কিংবা কোনওদিন ছাড়া পাব কি না—

একটু রাত হলে সূচা সিং দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজনের হাতে একটা মস্ত বড় ছুরি, অন্যজনের হাতে খাবারদাবার। সূচা সিং বলল, “কী প্রোফেসারসাব, মত বদলাল ?”

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, “সিংজী, তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি কোনও গুপ্তধনের খবর জানি না !”

সূচা সিং ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বলল, “আপনারা বাঙালিরা বড্ড ধড়িবাজ ! এত টাকা পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে আপনি শুধু ঐ মুণ্ডুটা খুঁজতে এসেছিলেন ? এই কথা আমি বিশ্বাস করব ?”

“ওটার জন্য আসিনি। এমনি হঠাৎ পেয়ে গেলাম।”

“ঠিক আছে, ওটা কোথায় পেয়েছেন, সে কথা আমাকে বলুন। ওটা কীসের মুণ্ডু ? কোনও দেওতার মুণ্ডু ? আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোনও মন্দির নেই, আমি খোঁজ নিয়েছি। ওখানে পাথরের মুণ্ডু এল কোথা থেকে ? বাকি মূর্তিটা কোথায় ? বলুন সে কথা !”

ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না ভেবে কাকাবাবু চুপ করলেন। সিদ্ধার্থদা

তেজের সঙ্গে বললেন, "আমরা ওটা যেখানে পাই না কেন ? তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে ? দেশে আইন নেই ? পুলিশের হাত থেকে তুমি বাঁচাতে পারবে ?"

সূচা সিং-এর সঙ্গী ছুরিটা উঁচু করল। সূচা সিং তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বলল, "আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না। চুপচাপ থাকো। তোমার মতন ছোকরাকে আমি এক রদ্দা দিয়ে কাৎ করে দিতে পারি ! যদি ভাল চাও তো মুখ বুজে থাকো ! আমি শুধু প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলছি !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার আর কিছু বলার নেই !"

খাবার রেখে ওরা চলে গেল। আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। সিদ্ধার্থদা ঢাকনাগুলো খুলে চমকে গিয়ে বললেন, "আরে, বাস্ ! খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে ! বন্দী করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনও শুনিনি !"

বড় বড় বাটিতে করে বিরিয়ানি, ডিম ভাজা, মুরগীর মাংস, চিঁড়ের পায়েস রাখা আছে। কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমাদের ভাল ভাল খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ও কাকাবাবুকে দলে টানতে চাইছে। সেইসব খাবার দেখেই আমার খিদে বেড়ে গেল। সিদ্ধার্থদা তিনজনের জন্য ভাগ করে দিলেন। আমি সবে মুখে তুলতে গেছি, সিদ্ধার্থদা বললেন, "খাচ্ছ যে, যদি বিষ মেশানো থাকে ?"

শুনেই আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম। কাকাবাবু বললেন, "সূচা সিং সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। তোমরা আগে খেয়ো না, আমি খেয়ে দেখছি প্রথমে। আমি বুড়ো মানুষ, আমি মরলেও ক্ষতি নেই !"

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে বললেন, "বিষ মেশানো থাক আর যাই থাক, এ রকম চমৎকার খাবার চোখের সামনে রেখে আমি না খেয়ে থাকতে পারব না।"

টপ করে একটা মাংস তুলে কামড় বসিয়ে সিদ্ধার্থদা বললেন, "বাঃ, গ্র্যান্ড ! এ রকম খাবার পেলে আমি অনেকদিন এখানে থাকতে রাজি আছি !"

সত্যিই যদি আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হয়, তাহলে স্নিগ্ধাদি আর রিণির কী হবে ? সিদ্ধার্থদার যে সেজন্য কোনও চিন্তাই নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। খাটের তলায় আশ-দশটা কম্বল রাখা ছিল। কম্বলগুলো বেশ নোংরা, কিন্তু উপায় তো নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা না ঘুমিয়ে বিছানায় শুয়ে এখান থেকে উদ্ধার পাবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। কিন্তু কোনও পথই পাওয়া গেল না। কণিষ্কর মুণ্ডুটা না পেলে কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। সেটা সূচা সিং-এর কাছ থেকে কী করে উদ্ধার করা যাবে ? বেশি কিছু করতে গেলে ও যদি মুণ্ডুটা ভেঙে ফেলে !

ভোরবেলা উঠেই সিদ্ধার্থদা বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে বললেন, "কই, এখনও চা দেয়নি ?"

সকালবেলা বেড-টি খাওয়ার অভ্যেস, সিদ্ধার্থদা বোধহয় ভেবেছিলেন হোটেলের ঘরে শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসে সিদ্ধার্থদা বললেন, "ব্যাটারা আচ্ছা অভদ্র তো, এখনও চা দেয় না কেন ?"

দরজার কাছে গিয়ে দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "কই হ্যায় ? চা লে আও !"

আমি বললাম, "ওরা বোধহয় চা খায় না।"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "নিশ্চয়ই খায় ! পাঞ্জাবিরা বাঙালিদের মতনই চা খেতে খুব ভালবাসে।"

কিন্তু কারুর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। চা তো দূরের কথা, সকালবেলা কেউ কোনও খাবারও দিতে এল না। কাল রাত্তিরে অত খাইয়ে হঠাৎ আজ সকালবেলা এই ব্যবহার ! ভাগ্যিস ঘরটার সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম ছিল, নইলে আমাদের আরও অসুবিধে হত।

সিদ্ধার্থদা খানিকটা বাদে ধৈর্য হারিয়ে শিক ধরে টানাটানি করছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল। সিদ্ধার্থদা বললেন, "নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি।"

আমিও ছুটে গেলাম জানলার কাছে। কাকাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন খাটে। সকাল থেকে কাকাবাবু একটাও কথা বলেননি।

আমাদের নিরাশ করে গাড়ি থেকে নামল সূচা সিং আর একটা লোক। সূচা সিং একা গট গট করে উঠে এল ওপরে। তার হাতে সেই মহামূল্যবান কাঠের বাক্সটা।

সিদ্ধার্থদা হালকাভাবে বললেন, "কী সিংজী, সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলে ? আমাদের চা খাওয়ালে না ?"

সূচা সিং কঠোরভাবে বলল, "জানলাসে হঠ্ যাও ! আমি প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলব !"

কাকাবাবু তখনও খাটে বসে আছেন। সূচা সিং আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে খোকাবাবু, তোমার আংকেলের চশমাটা নিয়ে যাও ! দেখুন প্রোফেসারসাব, আপনি যা চাইছেন, তাই দিচ্ছি ! এবার আমার কথা শুনবেন !"

চশমাটা পেয়ে কাকাবাবু স্পষ্টভাবে খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, "সূচা সিং, তোমার সঙ্গে আমাদের তো কোনও ঝগড়া নেই। তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা পুলিশকে কিছু জানাব না তোমার নামে। আমি কথা দিচ্ছি !"

সূচা সিং বিরক্তভাবে বলল, "এক কথা বারবার বলতে আমি পছন্দ করি না ! আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি এর মধ্যে ঠিক করুন, আমার কথা শুনবেন কি না !"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ঘরের মধ্যে এসে বসুন, আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।"

সূচা সিং প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, "চোপ ! তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না !"

তারপর সে কাঠের বাক্স খুলে কণিষ্কর মুখটা দু আঙুলে তুলে উঁচু করে বলল, "কী প্রোফেসারসাব, কিছু ঠিক করলেন ?"

কাকাবাবু পাথরের মুখটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "সিংজী, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, তুমি ওটাকে ওভাবে ধরো না। সাবধানে ধরো। ওটা ভেঙে গেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে !"

"বটে ! বটে ! এটার তাহলে অনেক দাম !"

"সিংজী, তুমি ওটা ফেরত দাও, তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেব। তার বেশি দেবার সামর্থ্য আমার নেই।"

"পাঁচ হাজার ? একটা পাথরের মুণ্ডুর দাম পাঁচ হাজার ! এ রকম পাথরকা চীজ তো হামেশা পাওয়া যায়। আপনি পাঁচ হাজার রুপিয়া দিতে চাইছেন ! তাহলে এক লাখ রুপিয়ার কম আমি ছাড়ব না !"

"এক লাখ টাকা আমার নেই, থাকলে দিতাম। ও মূর্তিটার বাজারে কোনও দাম নেই। আমার কাছেই শুধু ওর দাম।"

"ওসব চালাকি ছাড়ুন। খাঁটি কথাটা কী বলুন !"

সিদ্ধার্থদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ করে পাথরের মুখটা চেপে ধরলেন। তাপর বললেন, "ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।"

কাকাবাবু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সিদ্ধার্থ ছেড়ে দাও, শিগগির ছেড়ে দাও ! ভেঙে যাবে ! ওটা তবু ওর কাছেই থাকুক !"

সূচা সিং দু হাতে চেপে ধরেছে সিদ্ধার্থদার হাত। আস্তে আস্তে পাথরের মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠের বাক্সে রাখল। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে দেড় গুণ বড় কণিষ্কর মুখটা। বেশ ভারী। কিন্তু সূচা সিং অনায়াসেই হাল্কা বলের মতন সেটা বাঁ হাতে ধরে মাটিতে রাখল। তারপর সিদ্ধার্থদার হাতটা ধরে মোচড়াতে লাগল। সিদ্ধার্থদা যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে ফেললেন। হাতটা বোধহয় ভেঙেই যাবে। আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে সূচা সিংকে অনুরোধ করলাম, ছেড়ে দিন ! ওঁকে ছেড়ে দিন ! আর কখনও এ রকম করবে না—

সূচা সিং ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "বেতমীজ ! আমার সঙ্গে জোর দেখাতে যায় ! খুলে নেব হাতখানা ?"

যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থদার মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করলেন না। শেষ পর্যন্ত সূচা সিং এক ধাক্কা দিয়ে সিদ্ধার্থদাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর কর্কশ গলায় বলল, "প্রোফেসার, শুনলে না আমার কথা। তাহলে থাকো এখানে ! আমি জম্মুতে চললাম, ওখানে আমার এক দোস্ত

পাথরের দোকানদার, তাকে দেখাব জিনিসটা ! তোমাদের মারব না—কাল আমার লোক এসে তোমাদের ছেড়ে দেবে।"

সূচা সিং গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িটাতে উঠল। কাকাবাবুও খাট থেকে নেমে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গাড়িটা ছাড়ার পর সূচা সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল। তারপর চলে গেল হুশ করে !

গাড়িটা চলে যাওয়া মাত্র কাকাবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থদার পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "সিদ্ধার্থ, তোমার হাত ভাঙেনি তো ?"

সিদ্ধার্থদা উঠে বসে বললেন, "না, ভাঙেনি বোধহয় শেষ পর্যন্ত ! শয়তানটাকে আমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেবই। এর প্রতিশোধ যদি না নিই—"

"শোনো, এখন এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শিগগির ওঠো ! দরজা ভাঙতে হবে—"

কাকাবাবু নিজেই খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। পুরু কাঠের দরজা—কেঁপে উঠল শুধু। সিদ্ধার্থদা উঠে এসে বললেন, কাকাবাবু, আপনি সরুন, আমি দেখছি !

"না, না, এসো, আমরা তিনজনে মিলেই এক সঙ্গে ধাক্কা দিই—"

সিদ্ধার্থদার দেখাদেখি আমিও অনেকটা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলাম দরজায়। প্রত্যেকবার শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে। কাকাবাবু বললেন, "হোক শব্দ, তাই শুনে যদি কেউ আসে তো ভালই !"

কেউ এল না। আমরা পর পর ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগলাম। বেশ খানিকটা বাদে একটা পাল্লায় একটু ফাটল দেখা দিল, তাই দেখে আমাদের উৎসাহ হয়ে গেল দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত যে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারলাম, সেটা শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোরে।

ঘর থেকে বেরিয়েই কাকাবাবু বললেন, "আমি দৌড়তে পারব না, তোমরা দুজন দৌড়ে যাও। বড় রাস্তায় গিয়ে যে-কোনও একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করো ! যে-কোনও উপায়ে থামানো চাই। আমি আসছি। পরে—"

প্রথমে একটা প্রাইভেট গাড়িকে থামাবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই থামল না। আর একটু হলে আমাদের চাপা দিয়ে চলে যেত। তারপর একটা বাস। এখানকার বাস মাঝরাস্তায় কিছুতেই থামে না। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও গাড়ি নেই। ততক্ষণে কাকাবাবু এসে পৌঁছেছেন। এবার দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল। কাকাবাবু বললেন, "এসো সবাই মিলে রাস্তার মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়াই। এটাকে থামাতেই হবে।

জিপটা প্রচণ্ড জোরে হর্ন দিতে দিতে কাছাকাছি এসে গেল। সিদ্ধার্থদা হতাশভাবে বললেন, "এটা মিলিটারির জিপ। এরা কিছুতেই থামে না।"

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, "থামাতেই হবে। না হলে চাপা দেয় দিক!"

জিপটা আমাদের একেবারে সামনে এসে ব্রেক কষল। একজন অফিসার রুক্ষভাবে বললেন, "হোয়াট্‌স দা ম্যাটার জেন্টেলমেন?"

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। অফিসারটির পোশাকের চিহ্ন দেখে বললেন, "আপনি তো একজন করনেল? শুনুন করনেল, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। একটুও সময় নেই!"

তারপর কাকাবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন করনেল। তারপর বললেন, হুঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমাকে জরুরি কাজে যেতে হচ্ছে।

কাকাবাবু গাড়ির সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "যতই জরুরি কাজ থাক, আপনাকে যেতেই হবে।"

কাকাবাবু গভর্নমেন্টের এক গাদা বড় বড় অফিসার, মিলিটারির অফিসারের নাম বললেন।

করনেল বললেন, "আপনি ওসব যতই নাম বলুন, আমার মিলিটারি ডিউটির সময় আমি অন্য কারুর কথা শুনতে বাধ্য নই।"

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, "মিলিটারি হিসেবে নয়, আপনাকে আমার দেশের একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি!"

করনেল একটুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, গেট ইন্!"

আমরা উঠে পড়তেই গাড়ি চলল ফুল স্পীডে। করনেল পুরো ব্যাপারটা আবার শুনলেন। তারপর বললেন, "ইতিহাস সম্পর্কে আমারও ইন্টারেস্ট আছে। সত্যি, এটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। এটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।"

করনেলের নাম রণজিৎ দত্তা। বাঙালি নয়, পাঞ্জাবি। প্রথমে তিনি আমাদের নিতে রাজি হচ্ছিলেন না, পরে কিন্তু বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। ওঁর কাছেও এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার।

গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে যে হাওয়ায় কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। করনেল বললেন, "ওদের গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে। পাহাড়ি রাস্তায় একটা মুস্কিল, কোনও গাড়িকে ওভারটেক করা যায় না। মাঝখানে যে-সব গাড়ি পড়ছে তাদের পার হব কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "উপায় একটা বার করতেই হবে।"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "একটা উপায় আছে। উল্টো দিকের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য মাঝে মাঝে যে কয়েক জায়গায় খানিকটা করে কাটা আছে—"

করনেল দত্তা বললেন, "হ্যাঁ, সেটা একটা হতে পারে বটে। অবশ্য, যদি মাঝখানের গাড়িগুলো জায়গা দেয়।

"আপনার মিলিটারির গাড়ি। আপনার গাড়ির হর্ন শুনলে সবাই রাস্তা দেবে। আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেছি।"

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, "সামনের গাড়ি দেখলেই দুবার করে জোরে হর্ন দেবে। আপনারা সূচা সিং-এর গাড়ি চিনতে পারবেন তো ?"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "হ্যাঁ, সাদা জীপ গাড়ি। নম্বরও আমি মুখস্থ করে রেখেছি।"

সিদ্ধার্থদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওঁর ডান হাতে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা এখনও।

পাহাড়ি রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। রাস্তাটা ওপরে উঠে গেলে নীচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। একটু বাদেই আমরা যখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছি, পাহাড় পেরিয়ে নীচের দিকের রাস্তায় দেখতে পেলাম খেলনার মতন তিনটে গাড়ি। তার একটাকে বাস বলে চেনা যায়।

করনেল দূরবীন বার করলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গাড়ির নম্বরটা বলো তো, দেখি এর মধ্যে আছে কি না !"

একটু দেখেই উত্তেজিতভাবে বললেন, "দ্যাটস ইট ! ঐ তো সাদা জীপ !"

আমরা সবাই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম। এবার আর সূচা সিংকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। কিন্তু পাহাড়ি রাস্তায় খুব জোরে তো গাড়ি চালানো যায় না, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে হর্ন দিয়ে গতি কমিয়ে দিতে হয়। একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের দেয়াল। খাদের নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা, ভিজে রাস্তা বেশি বিপজ্জনক।

কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "কী সুন্দর রামধনু উঠেছে দ্যাখো। এ পাশের সারাটা আকাশ জুড়ে আছে। অনেকদিন বাদে সম্পূর্ণ রামধনু দেখলাম—সাধারণত দেখা যায় না।"

আমাদের চোখ নীচের রাস্তার সেই খেলনার মতন গাড়ির দিকে আবদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থদা অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, আপনার এখন রামধনু দেখার মতন মনের অবস্থা আছে ? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না।"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "মনকে বেশি চঞ্চল হতে দিতে নেই, তাতে কাজ নষ্ট হয়। দণ্ডকারণ্যে রাম যখন সীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়ও তিনি পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।"

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, "বাসটা কাছাকাছি এসে গেছে। হর্ন দাও ! হর্ন দাও—দু বার !"

বাসটা সহজেই আমাদের পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু তার পরের গাড়িটা আর কিছুতেই জায়গা দিতে চায় না। আমরা সেটার পেছন পেছন এসে অনবরত

হর্ন দিতে লাগলাম। মাইল দুয়েক বাদে রাস্তাটা একটু চওড়া দেখেই বিপদের পুরো ঝুঁকি নিয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। সেই গাড়িটাতে শুধু একজন ড্রাইভার, আর কেউ নেই।

সিদ্ধার্থদা বললেন, "ও গাড়ির ড্রাইভারটা বোধহয় কালা—আমাদের এত হর্ন ও শুনতে পায়নি!"

করনেল বললেন, "কালা লোকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কালা নয়, লোকটা পাজি।"

এবার আমাদের ঠিক সামনে সূচা সিং-এর গাড়ি। বড় জোর সিকি মাইল দূরে। আমরা দেখতেও পাচ্ছি, গাড়িতে সূচা সিং আর তার একজন সঙ্গী বসে আছে। ওরাও নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের।

সিদ্ধার্থদা গাড়ির সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রায়। ছটফট করে বললেন, "ব্যাটার আর কোনও উপায় নেই, এবার ওকে ধরবই।"

আমাদের হর্নে ও-গাড়ি কর্ণপাতও করল না। দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে। ওরা মরিয়া হয়ে জোরে চালাচ্ছে। সূচা সিং খুব ভাল ড্রাইভার—আমরা আগে দেখেছি।

করনেল বেল্ট থেকে রিভলভার বার করে বললেন, "ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি। কিন্তু তাতে একটা ভয় আছে গাড়িটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে।"

কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, "খবরদার, সে কাজও করবেন না। আমি সূচা সিংকে শাস্তি দিতে চাই না, আমি আমার জিনিসটা ফেরত চাই।"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আর বেশি জোর চালালে আমাদের গাড়িই উল্টে একেবারে ঝিলম নদীতে পড়বে। ঐ দ্যাখো, সন্তু, ঝিলম নদী!"

আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অত নীচে তাকালে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আট দশ মাইল চলল দুই গাড়ির রেস। ক্রমশ আমরাই কাছে চলে আসছি। করনেল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন, "হল্ট!"

সূচা সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখল। কিন্তু গাড়ি থামাল না।

কাকাবাবু বললেন, "করনেল দত্তা, সাবধান! সূচা সিং-এর কাছে আমার রিভলভারটা আছে।"

করনেল বললেন, "মিলিটারির গাড়ি দেখেও গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারুর নেই।"

আর কয়েকমাইল গিয়েই ভাগ্য আমাদের পক্ষে এল। দেখতে পেলাম উল্টোদিক থেকে একটা কনভয় আসছে। এক সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা লরি। সূচা সিং-এর আর উপায় নেই। কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে, পাশ কাটিয়ে যাবার

রাস্তা পাবে না।

কর্নেল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, "আমাদের গাড়ির স্পীড কমিয়ে দাও। আগে দেখা যাক্—ও কী করে!"

সূচা সিং-এর গাড়ির গতিও কমে এল! এক জায়গায় ছোট একটা বাই পাস আছে, সেখানে গাড়ি ঘুরেই থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমেই দুদিকে দৌড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে আমরাও গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটে গেলাম। সূচা সিং-এর সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়চ্ছে উল্টো দিকের রাস্তায়। তার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না। সূচা সিং পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এক হাতে সেই কাঠের বাক্স।

সিদ্ধার্থদাই আগে আগে যাচ্ছিলেন। সূচা সিং হঠাৎ রিভলভার তুলে বলল, "এদিকে এলে জানে মেরে দেব!"

সিদ্ধার্থদা থমকে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু করনেল একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, "এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!"

আমি তাকিয়ে দেখলাম, করনেলের হাতে রিভলভার ছাড়াও, ওঁর গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তাঁর হাতে একটা কী যেন কিম্ভূত চেহারার অস্ত্র। দেখলেই ভয় করে। সূচা সিং সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিভলভারটা ফেলে দিল। কিন্তু তবু তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠল।

কাঠের বাক্সটা উঁচু করে ধরে বলল, "এটার কী হবে প্রোফেসারসাব? আমার কাছে কেউ এলে আমি এটা নীচে নদীতে ফেলে দেব।"

কাকাবাবু করনেলকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, "আর এগোবেন না। ও সত্যিই ফেলে দিতে পারে।"

তারপর কাকাবাবু হাতজোড় করে বললেন, "সূচা সিং, তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা ফিরিয়ে দাও!"

সূচা সিং আর একটা পাথর ওপরে উঠে গিয়ে বলল, "এটা আমি দেব না। কিছুতেই দেব না!"

"ফিরিয়ে দাও সূচা সিং! গভর্নমেন্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব। আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব বলেছি—"

"বিশ্বাস করি না। তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসেছ। এটা ফিরিয়ে দিলেই তোমরা আমাকে ধরবে।"

"না ধরব না। তুমি বাক্সটা ওখানে পাথরের ওপর রেখে যাও। আমরা আধঘণ্টা আগে ছোঁব না। তুমি চলে না গেলে—"

"ওসব বাজে চালাকি ছাড়ো!"

"না, সত্যি, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি—

সূচা সিং বাক্সটা হাতে নিয়ে দোলাতে লাগল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

হুকুমের সুরে বলল, "তোমরা এক্ষুনি গাড়িতে ফিরে যাও ! না হলে আমি এটা ঠিক ফেলে দেব !"

কাকাবাবু অসহায়ভাবে করনেলের দিকে তাকালেন। ভাঙা গলায় বললেন, "কী করা উচিত বলুন তো ? আমাদের বোধহয় ওর কথা মতন গাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত ! ও যদি ফিরে যায়—"

করনেল বললেন, "ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না। ওদিকে হয়তো নেমে যাবার রাস্তা আছে। ও পালাবে।"

কথার ফাঁকে ফাঁকে সিদ্ধার্থদা এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ লক্ষ করেনি। আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে সিদ্ধার্থদা একেবারে সূচা সিং-এর সামনে পৌঁছে গেলেন। বাক্সটা ধরার জন্য সিদ্ধার্থদা যেই হাত বাড়িয়েছেন, সূচা সিং ঠেলে দিতে গেল তাঁকে।

তারপর মরিয়ার মতন বলল, "যাক্, তাহলে আপদ যাক্ !"

সূচা সিং বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে !

আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে রইলাম। কাকাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

সিদ্ধার্থদা বাঘের মতন সূচা সিং-এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

ঝটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে।

হোক ভয়ংকর, তবু সুন্দর

তারপর মাস তিনেক কেটে গেছে। কলকাতায় ফিরে এসেছি, এখন আবার ইস্কুলে যাই। সামনেই পরীক্ষা, খুব পড়াশুনা করতে হচ্ছে। অনেকদিন পড়াশুনো বাদ গেছে তো !

তবু প্রায়ই কাশ্মীরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয় স্বপ্নের মতন। গল্পের বইতে যে রকম পড়ি, সিনেমায় যে-রকম দেখি—আমার জীবনেও সে-রকম ঘটনা ঘটেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

এক একবার ভাবি, সেই পাইথনটা গুহার একেবারে ভিতরের দিকে না থেকে যদি বাইরের দিকে থাকত ? যদি আমি পড়ে যাওয়া মাত্রই কামড়ে দিত ? তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম ? সেই কথা ভেবে নতুন করে ভয় হয়। কিংবা তাঁবুর মধ্যে সূচা সিং-এর দলবল যখন আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল, তখন ওরা তো আমাকে মেরে ফেলতেও পারত !

কী সব ভয়ংকর দিনই গেছে। হোক ভয়ংকর, তবু কত সুন্দর। আমাকে যদি আবার ঐ রকম জায়গায় কেউ যেতে বলে, আমি এক্ষুনি রাজি ! আবার ঐ রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হলেও আমি ভয় পাব না ! ঐ ক'টা দিনের

অভিজ্ঞতাতেই যেন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

রিণি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। আমরা ঐ রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলাম, আর ওরা বসে ছিল শ্রীনগরে—এই জন্য ওর রাগ। কেন আমরা ওকে সঙ্গে নিইনি ! আমি বলেছি, "যা যা ভাগ্। তোকে সঙ্গে নিলে আরও কত বিপদ হত তার ঠিক আছে ! সূচা সিং-এর রাগী মুখ দেখলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যেতিস !"

রিণি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে সূচা সিং-এর রাগী মুখের একটা ছবি এঁকেছে। সেটা মোটেই সূচা সিং-এর মতন দেখতে নয়, বক-রাক্ষসের মতন।

সিদ্ধার্থদার হাতে বুকে এখনও প্লাস্টার বাঁধা। সিদ্ধার্থদা পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলেন সূচা সিং-কে সঙ্গে নিয়ে। সূচা সিং-এর দেহের ভারেই সিদ্ধার্থদার বুকের তিনটে পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল, আর ডান হাতটা ছেঁচে গিয়েছিল খানিকটা ! সিদ্ধার্থদা এখন আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠছেন। সিদ্ধার্থদার গর্ব এই, তবু তো তিনি একবার অন্তত সেই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসটা ছুঁতে পেরেছিলেন।

সূচা সিং-ও বেঁচে গেছে। তারও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে— এখন সে জেলে। সূচা সিং-এর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। ওরা যখন বড় হয়ে শুনবে, ওদের বাবা একজন ডাকাত, তখন কি ওদের খুব দুঃখ হবে না ? চোর-ডাকাতের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী হয়।

কাকাবাবুও সেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁকে তখন ধরাধরি করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কুদ নামে একটা জায়গায়। সেখানে একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। করনেল দত্তা যে আমাদের কত সাহায্য করেছিলেন তা বলে বোঝানো যায় না। কাকাবাবু অবশ্য দু' তিনদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন খানিকটা। তারপরই আবার সেই পাথরের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

সূচা সিং যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে ওটা ঝিলম নদীতেই পড়ার কথা। কিন্তু তিনদিন ধরে ঝিলম নদীর অনেকখানি এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। সেই পাহাড়টার সব জায়গাও তন্নতন্ন করে খোঁজা বাকি থাকেনি। অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল, কে জানে !

কাকাবাবু আমাকে বারণ করেছেন, ওটার কথা কারুকে বলতে। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে।

আমার এখনও ধারণা, কাঠের বাক্সটা সহজে ডুবে যাবে না। ঝিলম নদীর তীরে কোথাও না কোথাও একদিন ওটাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে।
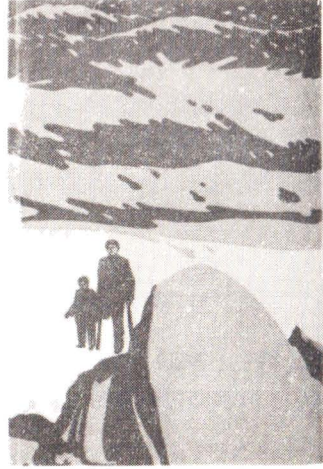
সবুজ দ্বীপের রাজা

জাহাজে যেতে চাও, না এরোপ্লেনে ?

কাকাবাবুর কথা শুনেই সন্তুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। খুব বেশি আনন্দ হলে বুকের মধ্যে এ-রকম টিপটিপ করে। ঠিক ভয়ের মতন। মনে হয়, হবে তো ? শেষ পর্যন্ত হবে তো ?

সবেমাত্র পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ক্লাস নাইন থেকে সন্তু এবার টেনে উঠবে। শেষ পরীক্ষার দিনই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, সন্তু, এখন তো তোমার ছুটি থাকবে, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে এক জায়গায় ?

সন্তু তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি। কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া মানেই, তো দারুণ ব্যাপার। নতুন কোনও অ্যাডভেঞ্চার হবে নিশ্চয়ই। অন্যরা বেড়াতে গিয়ে শুধু সুন্দর-সুন্দর জিনিস দেখে। আর কাকাবাবু যান বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে।

সন্তু সঙ্গে গেলে কাকাবাবুরও অনেক সুবিধে হয়। কাকাবাবুর বয়েস তিপান্ন-চুয়ান্নর মতো, যদিও দেখলে একটুও বুড়ো মনে হয় না। গায়ে বেশ জোর আছে, মুখে প্রকাণ্ড গোঁপ, কিন্তু কাকাবাবুর একটা পা চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে গেছে। দিল্লিতে পুরাতত্ত্ব বিভাগে তিনি খুব বড় চাকরি করতেন। একবার আফগানিস্তানে পাহাড়ি রাস্তায় তাঁর জিপ গাড়িটা উল্টে খাদে পড়ে যায়। সেবার মরতে-মরতেও বেঁচে উঠলেন, তবে একটা পা আর কিছুতেই ঠিক হল না। ডান পায়ের পাতার হাড়গুলো ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারেন।

সেই দুর্ঘটনার পর চাকরি ছেড়ে দিলেন কাকাবাবু, কিন্তু বাড়িতে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না একদম। আবিষ্কারের নেশা ওঁর এখনও রয়ে গেছে। ওঁর ঘরে কত যে পুরনো বই, তার ঠিক নেই। সেইসব বই পড়ে, যে-সব রহস্যের আজও সমাধান হয়নি, তিনি সেগুলোর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চান। কিন্তু এবারে কোথায় যাওয়া হবে, কিসের সন্ধানে, তা এখনও সন্তু জানে না। কাকাবাবুর এই এক দোষ, আগের থেকে কিছুই বলেন না। বড্ড গম্ভীর

লোক।

কাকাবাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন জাহাজে না এরোপ্লেনে যাওয়া হবে, তখন সন্তু দারুণ একটা চিন্তার মধ্যে পড়ল। সে কোনওদিন জাহাজেও চাপেনি, প্লেনেও চাপেনি। কোন্‌টা বেশি ভাল? কিছুতেই ঠিক করতে পারে না।

জাহাজে কিংবা প্লেনে যেতে হবে যখন, তখন নিশ্চয়ই খুব দূরের কোনও দেশে যাওয়া হচ্ছে এবার। আফ্রিকা? দক্ষিণ আমেরিকা? আনন্দে সন্তুর একেবারে নাচতে ইচ্ছে করল। তার ইস্কুলের বন্ধুদের মধ্যে কেউ এত দূর বিদেশে যায়নি।

"কাকাবাবু, আমরা কোথায় যাব?"

"সেটা তো গেলেই দেখতে পাবে!"

সন্তু জানত, কাকাবাবু এই উত্তরই দেবেন। তবু জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারছিল না। এবার সে বলল, "আমরা তাহলে প্লেনেই যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে।"

সন্তুর জাহাজে চড়ারও খুব ইচ্ছে ছিল। তবু প্লেনের কথাই বলল। প্লেনে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। ফেরার সময় জাহাজে ফিরলেই হবে।

এর পর দু'দিন কাকাবাবু আর কিছু বললেন না। তাঁকে খুব ব্যস্ত মনে হল। সকালবেলা বেরিয়ে যান, ফেরেন অনেক রাত্রে। সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা সেরে ফেলছেন। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন।

এর মধ্যে একদিন রাস্তায় রিনির সঙ্গে সন্তুর দেখা হল। রিনি সিদ্ধার্থদা আর স্নিগ্ধাদির সঙ্গে শিগগিরই গোয়া বেড়াতে যাচ্ছে। ওরা বোম্বে পর্যন্ত ট্রেনে যাবে, তারপর সেখান থেকে জাহাজে। কথাটা শুনে সন্তুর একটু খট্‌কা লাগল। গোয়াতেও জাহাজে যাওয়া যায়? তাহলে কাকাবাবুও কি গোয়াতেই যেতে চাইছেন? গোয়াতে গেলে রিনিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সেবার যেমন কাশ্মীরে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল।

রিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "তোরা এবার কোথাও যাচ্ছিস না?"

সন্তু তো এখনও জায়গাটার নাম ঠিক মতন বলতে পারছে না, তাই বলল, "কি জানি, দেখি, ঠিক নেই এখনও!"

সেদিন রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে কাকাবাবু আবার সন্তুকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তোমার কাছে তোমার নিজের ফটো আছে?"

মাসখানেক আগেই সিদ্ধার্থদা তাঁর নতুন ক্যামেরায় সন্তুর অনেকগুলো ছবি তুলে দিয়েছেন। সন্তু দৌড়ে গিয়ে সেই খামটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সবকটা ছবি নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর সেগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, "নাঃ, এগুলোতে চলবে না।"

সন্তু অবাক হয়ে গেল। ছবিগুলো খুবই সুন্দর, সবাই প্রশংসা করেছেন।

বাবা-মা'রও খুব ভাল লেগেছে। কাকাবাবুর পছন্দ হল না ?

কাকাবাবু বললেন, "দুটো কান দেখা যায়, এমন ছবি চাই।"

সন্তু আরও অবাক। কান ? লোকে মুখের ছবিই তো দেখে, কান দুটো আলাদা করে দেখে নাকি ? অজান্তেই সন্তু নিজের কানে হাত দিল।

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কাল সকালেই রাসবিহারী এভিনিউতে যে জুবিলি ফটোগ্রাফার্স আছে, সেখানে গিয়ে ছবি তুলিয়ে আসবে। আর বিকেলেই সেখান থেকে তোমার ছ'খানা ছবি নিয়ে আসবে। খুব জরুরি !"

কাকাবাবু তার ছ'খানা ছবি নিয়ে কী করবে, সেকথা সন্তু আকাশ পাতাল চিন্তা করেও বুঝতে পারল না। যাই হোক, পরদিন সকালেই সে জুবিলি ফটোগ্রাফার্সে ছবি তুলিয়ে এল। বিকেলেই নিয়ে এল ছ'খানা ছবি। সবকটা ছবি একই রকম। শুধু মুখের ছবি, দুটো কানই ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে বটে !

সন্তু আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছে না। রাত্তিরবেলা মাকে সে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, "মা, এবার কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে ?"

মা বললেন, "এবার তো দার্জিলিং যাওয়া হচ্ছে !"

দার্জিলিং ? দার্জিলিং তো পাহাড়ের ওপরে, সেখানে আবার জাহাজে করে যাওয়া যায় নাকি ? প্লেনে করে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাকাবাবু তো জাহাজের কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন ? সন্তু একটু হতাশ হয়ে গেল।

মা আবার বললেন, "দার্জিলিংয়ে তোর ছোট মামা থাকেন, ছোট মামাকে মনে আছে তো ? সেই যে একবার তোকে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছিলেন ? সে আজ দার্জিলিংয়ে মস্ত বড় বাড়ি পেয়েছে অফিস থেকে, সেই বাড়িতে আমরা সবাই উঠব।"

সন্তু বলল, "তোমরাও যাচ্ছ নাকি ?"

মা বললেন, "তার মানে ? আমরা যাব না তো কে যাবে ?"

"কাকাবাবুও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন ?"

"ও সেই কথা বল্। ঠাকুরপো আমাদের সঙ্গে যাবেন কেন ? উনি তো প্লেনে করে কোথায় যেন যাবেন বলছিলেন। সিঙ্গাপুর না অসম, কী যেন জায়গা ! তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে !"

সন্তু হাসল। মা একদম ভূগোল ভুলে গেছেন। সিঙ্গাপুর আর অসম কি কাছাকাছি জায়গা হল নাকি ?

"আমিও তো কাকাবাবুর সঙ্গে যাচ্ছি !"

মা একটু রাগের সঙ্গে বললেন, "সে জানি ! তুই তো আর আমাদের সঙ্গে যেতে চাস না !"

সে-কথা সত্যি। সন্তু খুব ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেত, তখন খুব ভাল লাগত। এখন আর ভাল লাগে না। এখন কাকাবাবুর সঙ্গে যাবার

জন্যই তার বেশি উৎসাহ।

সোমবার দিন সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি জামা প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নেবে। তুমি আজ আমার সঙ্গে বেরুবে।"

সন্তু ভাবল, সেইদিনই বুঝি বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে বলল, "বাক্স-টাক্স গুছিয়ে নেব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, তার দরকার নেই। এমনি তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় কাজে যাবে।"

দুপুরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে এলেন ডালহৌসিতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন একটা অফিস-বাড়ির দোতলায়। ক্রাচ নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে খুব অসুবিধে হয় না কাকাবাবুর। বেশ সাধারণ লোকের মতোই টক্‌টক্ করে উঠে যান। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে খুব কষ্ট হয়। কাশ্মীরে যেবার কণিষ্কের মুণ্ডুর সন্ধানে যাওয়া হয়েছিল, সেবারে তো কাকাবাবু একবার পাহাড় দিয়ে গড়িয়েই পড়ে গিয়েছিলেন। তবে, কখনও কোনও উঁচু পাঁচিল টপকাতে গেলে কাকাবাবু দু'হাতের ওপর ভর দিয়ে অনায়াসেই লাফিয়ে পার হয়ে যেতে পারেন। একটা পা নেই বলেই কাকাবাবুর হাত দুটোতে জোর সাঙ্ঘাতিক।

কাকাবাবু একজন অফিসারের ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে খুব খাতির করে বললেন, "আসুন, আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। এইটি কি আপনার ভাইপো নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। এ আমার সঙ্গে যাবে।"

সন্তু কাকাবাবুর পাশের চেয়ারে বসল। তারপর অফিসারটি তাকে কিছু কাগজপত্র সই করতে দিলেন। খানিকটা বাদে তিনি সুন্দর করে বাঁধানো দুটি নীল রঙের ছোট্ট, শক্ত বই কাকাবাবুকে দিয়ে বললেন, "এই নিন, মিঃ রায়চৌধুরী! আচ্ছা, আমার শুভেচ্ছা রইল।"

অফিসারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। সন্তু এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, এটা পাসপোর্ট অফিস। পাসপোর্ট কথাটা আগে শুনেছে সন্তু, কিন্তু জিনিসটা কখনও চোখে দেখেনি।

কাকাবাবু সেই ছোট নীল বইয়ের একটা সন্তুকে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা তোমার পাসপোর্ট, খুব সাবধানে রাখবে নিজের কাছে।"

সন্তু বইটা খুলে দেখল। প্রত্যেক পাতায় বেশ বড় অশোকচক্রের ছাপ মারা। প্রথম দিকেই বাঁ দিকের পাতায় সন্তুর ছবি আটকানো। সেই দু'কান সমেত মুখের ছবি।

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। এই সময় খালি ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। কোনও ট্যাক্সিই থামছে না। ক্রাচ নিয়ে কাকাবাবু বাসেও উঠতে পারবেন না। মহা মুশকিল। অনেকক্ষণ বাদে একটা ট্যাক্সি পাসপোর্ট

অফিসের সামনেই থামল, তা থেকে কয়েকজন লোক নামছে। সন্তু সেই ট্যাক্সিটা ধরবার জন্য যেই দৌড়ে গেল, অমনি একজন লোকের সঙ্গে তার খুব জোরে ধাক্কা লাগল। সন্তু ঘুরে পড়েই যাচ্ছিল, সামনে নিল কোনওক্রমে, কিন্তু পাসপোর্ট বইখানা ছিটকে গেল তার হাত থেকে।

সন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখল। লোকটা বিদেশি। সন্তু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে, লোকটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছে। সাহেবরা তো সাধারণত এরকম অভদ্র হয় না। সন্তু লোকটিকে কিছু বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই সে খালি ট্যাক্সিটাতে উঠে বসল। লোকটা তাহলে ট্যাক্সিটা নেবার জন্যই এরকম ধাক্কা মেরে দৌড়ে গেল!

পাসপোর্ট বইখানা ছিটকে গিয়ে পড়েছে ফুটপাতের ধারে। আর একটু হলেই পাশের জলকাদার মধ্যে পড়ত। সন্তু দৌড়ে গিয়ে সেটা নেবার আগেই আর-একটা ময়লা-পোশাক-পরা ভিখিরির মতন ছেলে ছোঁ মেরে তুলে নিল সেটা। তারপর পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। এর মধ্যেই কাকাবাবু এগিয়ে এসে একটা ক্রাচ তুলে খুব জোরে মারলেন ছেলেটার হাতে। ছেলেটা 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠে পাসপোর্টটা ফেলে দিল। কিন্তু আর দাঁড়াল না, দৌড়ে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। এদিকে সেই বিদেশি সাহেবটিকে নিয়ে ট্যাক্সিটাও ছেড়ে গেছে।

ব্যাপারটা এমনই হঠাৎ হল যে, সবটা বুঝতেই খানিকটা সময় লাগল সন্তুর। সাহেবটা তাকে ধাক্কা মারল আর ঠিক সেই সময়েই ভিখিরি ছেলেটা তার পাসপোর্টটা চুরি করবার চেষ্টা করল—এর মধ্যে কি কোনও যোগ আছে? না দুটো আলাদা-আলাদা ব্যাপার? ভিখিরি ছেলেটার পাসপোর্ট চুরি করে কী লাভ?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাকে বললাম না, পাসপোর্টটা খুব সাবধানে রাখতে?"

মা যেমন ভাবে ছেলেকে আদর করে, কিংবা ফোঁড়া হলে আমরা যে-রকম ভাবে তার ওপর হাত বুলোই, সন্তু ঠিক সেইরকমভাবে পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে সেটার ওপর হাত বুলোতে লাগল। ভাগ্যিস জলকাদায় পড়েনি, এমন সুন্দর জিনিসটা তা হলে নষ্ট হয়ে যেত।

আর একটা ট্যাক্সি পেতে বেশি দেরি হল না। তাতে উঠে বসে সন্তু একটু আগের ঘটনাটা ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মনে হল এমনিই একটা হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া ঘটনা। যদিও এর আসল মানে সন্তু বুঝতে পেরেছিল বেশ কয়েকদিন পরে।

যাই হোক, পাসপোর্টটা পাবার পর সন্তুর আর সন্দেহ রইল না যে, সে এবার বিদেশেই যাচ্ছে। গোয়া কিংবা দার্জিলিং যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না! কবে যাওয়া হবে তার ঠিক হয়নি এখনও, কিন্তু সন্তু এর মধ্যেই বাক্স-টাক্স গুছিয়ে

একেবারে তৈরি। কিন্তু সব গুছোনো ওলোট-পালোট করতে হল আবার। শুক্রবার দিন রাত্তিরে কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, কাল ভোরে আমরা যাচ্ছি! ছ'টার সময় প্লেন। সাড়ে চারটের সময়ই ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবে। জিনিসপত্র এখনই গুছিয়ে রাখো।”

সন্তু আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠল। বলল, “আমার সব গুছোনো ঠিকঠাক করাই আছে!

কাকাবাবু বললেন, “দেখি, বাক্স নিয়ে এসো!”

বাক্স খুলে দেখে কাকাবাবু বললেন, “একী, এত কোট-সোয়েটার নিয়েছ কেন? গরম জামা-টামা লাগবে না! বেশি করে গেঞ্জি নাও!”

বিদেশে যাবে, অথচ গরম জামা লাগবে না, এ আবার কী? তাহলে কি আরব-পারস্যের মতন কোনও মরুভূমির দেশে যাওয়া হচ্ছে? সেগুলোও বিদেশ অবশ্য!

॥ ২ ॥

পাছে ঠিক সময় ঘুম না ভাঙে, তাই সন্তু সারারাত ঘুমোলই না প্রায়। জেগে জেগে সে ঘড়ির আওয়াজ শুনল, একটা…দুটো…তিনটে। কিন্তু শেষ সময়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল ঠিক। মা যখন তাকে ডেকে তুললেন, তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। ঘড়ি দেখেই তার ভয় হল। কাকাবাবু রাগ করে একাই চলে যাননি তো?

না, কাকাবাবু যাননি। মা কাকাবাবুকেও একটু আগে ডেকে দিয়েছেন। কোথাও বাইরে যাবার সময় মা-ই সবাইকে ঠিক সময় তুলে দেন। মার কোনওদিন ভুল হয় না।

খুব তাড়াতাড়ি জামা-প্যাণ্ট পরে তৈরি হয়ে নিল সন্তু। কাকাবাবুর অনেক আগে। মা কত কী খাবার তৈরি করেছেন এরই মধ্যে, কিন্তু উত্তেজনার চোটে সন্তুর খেতে ইচ্ছেই করছে না।

মাকে জিজ্ঞেস করল, “এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি, তুমি এখনও জানো না, মা?”

মা বললেন, “ঐ তো শুনলাম, সিঙ্গাপুর না কোথায় যেন যাওয়া হচ্ছে। দেখিস বাপু, খুব সাবধানে থাকিস। তোর কাকাটি যা গোঁয়ার!”

কাকাবাবু খাবার ঘরে এসে বললেন, “সন্তু, রেডি? বাঃ! পাঁচটা বাজল, আর দেরি করা যায় না। যাও, একটা ট্যাক্সি ডাকো এবার!”

সন্তু রাস্তায় বেরিয়ে এল। ভোরবেলা ট্যাক্সি পাওয়ার কোনও অসুবিধে নেই। ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে সন্তু আবার তরতর করে উঠে এল ওপরে। কাকাবাবু এর মধ্যে খাবার ঘর ছেড়ে চলে গেছেন নিজের ঘরে। দরজাটা ভেজানো। দরজাটা ফাঁক করে কাকাবাবুকে ডাকতে গিয়ে সন্তু থমকে গেল।

বড় লোহার আলমারিটা খোলা। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু একটা রিভলভারে গুলি ভরছেন একটা-একটা করে।

সন্তু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এর আগে সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বার বাইরে গেছে, কোনওবার তো কাকাবাবুকে রিভলভার সঙ্গে নিয়ে যেতে দেখেনি। এবার কি আরও বিপজ্জনক কোনও জায়গায় যাওয়া হচ্ছে!

গুলি ভরা হয়ে গেলে কাকাবাবু রিভলভারটা সুটকেসের মধ্যে জামা-কাপড়ের নীচে সাবধানে রেখে দিলেন।

প্লেনে চাপবার কথা ভেবেই সন্তুর এত আনন্দ হচ্ছে যে, তার মুখ দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। জীবনে প্রথম সে প্লেনে চাপবে। প্লেনটা যখন ব্যাঁকা হয়ে মাটি থেকে আকাশে ওড়ে, তখন ভেতরের মানুষগুলো গড়িয়ে পড়ে যায় না?

দমদমে প্লেনে ওঠার আগে সবাইকে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। সেই ঘরের দরজায় লেখা আছে সিকিউরিটি চেকিং। একজন একজন করে সেই ঘরে ঢুকছে। কাকাবাবুর আগে সন্তুই ঢুকল। একজন পুলিশের পোশাক পরা লোক সন্তুর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, দেখি, ওর মধ্যে কী আছে?

ব্যাগটার মধ্যে রয়েছে কয়েকটা গল্পের বই, তোয়ালে আর মায়ের দেওয়া খাবারের কৌটো। লোকটা সেগুলো এক নজর শুধু দেখল। তারপর সন্তুর গায়ে দু' হাত দিয়ে চাপড়াতে লাগল। প্রথমে সন্তু এর মানে বুঝতে পারেনি। তার পরেই মনে পড়ল। লোকটি দেখছে, সন্তু জামা প্যান্টের মধ্যে কোনও রিভলভার কিংবা বোমা লুকিয়ে রেখেছে কিনা! খবরের কাগজে সে পড়েছে, আজকাল প্রায়ই প্লেন-ডাকাতি হয়। চলন্ত প্লেনে ডাকাতরা পাইলটের সামনে রিভলভার কিংবা বোমা দেখিয়ে প্লেনটা অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

কাকাবাবুর কাছে তো রিভলভার আছে, ওরা সেটা কেড়ে নেবে? ও, সেইজন্যই কাকাবাবু রিভলভার পকেটে না-রেখে সুটকেসে রেখেছেন। সুটকেসগুলো তো আগেই জমা দেওয়া হয়ে গেছে, সেগুলো তো আর ওরা খুলে দেখবে না।

যাই হোক, সকলের সঙ্গে লাইন দিয়ে ওরাও সিঁড়ি দিয়ে প্লেনে উঠল। সিঁড়ির ঠিক ওপরে, একটি খুব সুন্দরী মেয়ে হাতজোড় করে প্রত্যেককে বলছে, নমস্কার। সন্তু জানে, এই মেয়েদের বলে এয়ার হস্টেস।

প্লেনের ভেতরটায় হাল্‌কা নীল রঙের আলো। মেঝেতে পুরু কার্পেট। সবাই এখানে খুব ফিসফিস করে কথা বলে। সন্তুর আর কাকাবাবুর পাশাপাশি দুটি সীট। কাকাবাবু তাকে জানলার ধারের সীটটায় বসতে দিলেন। তারপর বললেন, দেখো, পাশে বেল্ট লাগানো আছে, তোমার কোমরে বেঁধে নাও।

সন্তু বেল্টটা খুঁজে পেল, কিন্তু ঠিক মতন লাগাতে পারল না। বেশ চওড়া নাইলনের বেল্ট, মোটেই সাধারণ বেল্টের মতন নয়। কাকাবাবু সেটা লাগাতে

শিখিয়ে দিলেন। খোলা দিকটা খাপের মধ্যে ঢোকাতেই ঘট করে একটা শব্দ হয়। ও, এ-রকম বেল্ট বাঁধা থাকে বলেই বুঝি লোকেরা গড়িয়ে পড়ে যায় না ?

তারপর কিন্তু আরও অনেকক্ষণের মধ্যে প্লেনটা ছাড়ল না। সবাই তো উঠে গেছে, দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে, তবু এত দেরি করছে কেন ? সন্তু আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। জানলা দিয়ে এখন বাইরে দেখবার মতন কিছু নেই। এখানে মাটি নেই, সব জায়গাটাই শান বাঁধানো, সেখানে ঝকঝক করছে রোদ।

সন্তু গলা উঁচু করে প্লেনের ভেতরের লোকজনদের দেখবার চেষ্টা করল। কতরকমের লোক, বাঙালি, মারোয়াড়ী, নেপালী, সাহেব-মেম, এমন-কী, একজন নিগ্রো পর্যন্ত আছে। সেই এয়ার হস্টেসটি একবার লোকজনদের গুনে গুনে গেল।

"কাকাবাবু, এখনও ছাড়ছে না কেন ?"

কাকাবাবু উঠেই খবরের কাগজ পড়ায় মন দিয়েছিলেন। চোখ না তুলেই বললেন, "সময় হলেই ছাড়বে !"

এই সময় প্লেনের দরজা আবার খুলে গেল। একজন পুলিশ অফিসার ঢুকে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ নরিন্দর পাল সিং কে আছেন ?"

সামনের দিক থেকে একজন লম্বামতন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি। কেয়া হুয়া ?"

"আপনার পাসপোর্টটা একবার দেখান তো !"

"আবার দেখাতে হবে ? একবার তো দেখালাম ?"

"আর একবার দেখান !"

লোকটি পরে আছে ধুতির ওপরে লম্বা ধরনের প্রিন্স কোট। প্রথমে কোটের সবকটা পকেট খুঁজল। তারপর হাতব্যাগটা খুলে নিয়ে দেখল। তারপর আবার পকেট চাপড়াল। কোথাও পেল না।

লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'মেরা পাসপোর্ট কোউন লিয়া ? পকেটমেই তো থা !"

প্লেনের সব লোক ঐ লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে।

লোকটি তার পাসপোর্ট কিছুতেই খুঁজে পেল না। পুলিশ অফিসারটি গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে নেমে আসুন !"

লোকটি প্রথমে আপত্তি করল খুব। তার খুব জরুরি দরকার আছে। তাকে যেতেই হবে। পাসপোর্ট তো তার সঙ্গেই ছিল, কী করে হারিয়ে গেল বুঝতে পারছে না।

পুলিশ অফিসারটি কিছুই শুনলেন না। লোকটিকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

সন্তু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, পুলিশ কি লোকটাকে ধরে

নিয়ে গেল ?"

"পাসপোর্ট খুঁজে পেলে ছেড়ে দেবে।"

"যদি খুঁজে না পায় ?"

"তা হলে যেতে দেবে না। এই দ্যাখ !"

কাকাবাবু আঙুল দিয়ে খবরের কাগজের একটা জায়গা দেখালেন। সেখানে লেখা রয়েছে, "পাসপোর্ট চুরি। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাসপোর্ট খোয়া যাচ্ছে আজকাল। পুলিশের ধারণা, কোনও একটা জালিয়াতের দল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই পাসপোর্ট চুরি করেছে"— ইত্যাদি।

সন্তু ভাবল, ওরে বাবা, পাসপোর্ট জিনিসটা তাহলে এত দামি ? হারিয়ে গেলে তাকেও এখন এই প্লেন থেকে নামিয়ে দিত ? তাড়াতাড়ি কোটের বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল তার নিজেরটা ঠিক আছে কিনা।

সেদিন তাহলে সেই যে ছেলেটা তার পাসপোর্টটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুটেছিল, সে কি চুরি করার চেষ্টা করছিল ? সাহেবটা তাকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল কেন ? সবাই বলে, সাহেবরা কখনও অভদ্র হয় না। হঠাৎ ধাক্কা লেগে গেলেও তারা "সরি" বলে ক্ষমা চায়। সেই সাহেবটা তো ক্ষমা চায়নি।

সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাল। উনি আবার খবরের কাগজ পড়ায় মন দিয়েছেন। সব সীটের পেছনের খাপে অনেকগুলো করে খবরের কাগজ রাখা থাকে।

একটু পরেই আবার প্লেনের দরজা বন্ধ হল। গোঁ গোঁ করে শব্দ হল ইঞ্জিনের। নরিন্দর পাল সিং আর ফিরে এল না। লোকটার জন্য একটু একটু দুঃখ হল সন্তুর। ইস, প্লেনে উঠেও লোকটার যাওয়া হল না !

এবার প্লেনটা মাটির ওপর দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর খুব জোরে। দৌড়চ্ছে তো দৌড়চ্ছেই ! কখন একসময় যে প্লেনটা মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল, সন্তু টেরও পেল না। কোমরের বেল্টে একটু হ্যাঁচকা টান লাগল না পর্যন্ত।

হঠাৎ সে দেখল, নীচের মানুষগুলো ছোট হয়ে আসছে। এয়ারপোর্ট আর নেই, তার বদলে গাছপালা, মাঠে গোরু চরছে, ফিতের মতন সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। গাড়িগুলো সব খেলনার মতন, গোরুগুলো ঠিক যেন ছোট-ছোট মাটির পুতুল। রুপোলি ফিতের মতন একটা নদী। তারপর আর কিছু দেখা যায় না। সামনে তাকাতেই মনে হল কালো রঙের একটা বিশাল পাহাড়। প্লেনটা সোজা সেই দিকেই যাচ্ছে। কলকাতার এত কাছে পাহাড় কী করে এল ? ভাল করে তাকিয়ে বুঝতে পারল পাহাড় নয় মেঘ। কী ভয়ংকর ঐ মেঘের চেহারা !

কাকাবাবু এর মধ্যেই ঝিমোচ্ছেন। খুব ভোর রাতে উঠতে হয়েছে তো। কিন্তু বাইরে এত চমৎকার সব দৃশ্য, তা না দেখে কেউ ঘুমোতে পারে ?

হাল্কা-হাল্কা মেঘ উড়ে যাচ্ছে প্লেনের খুব কাছ দিয়ে। এক-এক জায়গায় মেঘ জমে আছে এমন অদ্ভুতভাবে যে, দেখলে মনে হয়, সাদা রঙের দুর্গ কিংবা একটা জঙ্গল।

প্লেনের ভেতরে ইঞ্জিনের দিকটায় এতক্ষণ লাল আলোয় দুটো লেখা জ্বলছিল। ধূমপান করবেন না আর সিটবেল্ট বেঁধে রাখুন। এবার সেই আলো দুটো নিভে গেল। মাইক্রোফোনে একটা মেয়ের গলা শোনা গেল, "নমস্কার! এই বিমানের ক্যাপ্টেন দিলীপকুমার দত্ত আর অন্যান্য কর্মীদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা তিন ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে রেঙ্গুন পৌঁছব। এখন আপনারা সীটবেল্ট খুলে ফেলতে পারেন..."

রেঙ্গুনে! সন্তুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। তারা তাহলে রেঙ্গুন যাচ্ছে? রেঙ্গুন মানে বর্মা দেশ। প্যাগোডা। আর কী আছে রেঙ্গুনে?

ঘোষণা শুনেই কাকাবাবু চোখ মেলে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন। সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা তাহলে রেঙ্গুন যাচ্ছি?"

"না।"

কী আশ্চর্য ব্যাপার, সন্তু নিজের কানে শুনল যে, প্লেনটা রেঙ্গুনে যাবে, আর কাকাবাবু তবুও 'না' বলছেন। এর মানে কী?

এবার সেই এয়ার হস্টেসটি একটা ট্রেতে করে কিছু লজেন্স এনে সবাইকে দিয়ে গেল। তারপর নিয়ে এল চা আর কফি।

কাকাবাবু বললেন, "এদের চা ভাল হয় না। কফিটাই খাও।"

তারপর সন্তুর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "যদি বাথরুম পায়, বলতে লজ্জা পেও না। পেছন দিকে বাথরুম আছে।"

সন্তুর বাথরুম পায়নি। কিন্তু প্লেনের বাথরুম কেমন হয়, তার খুব দেখতে ইচ্ছে করল।

এখন আর বাইরে দেখার কিছু নেই। শুধু মেঘ। তাই সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি একটু যাব।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "নিজে নিজে যেতে পারবে?"

"হ্যাঁ।"

"ঐ যে দেখছ, টয়লেট লেখা আছে, ঐখানে।"

এত উঁচু দিয়ে দারুণ জোরে প্লেন যাচ্ছে, অথচ ভেতর থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ভেতরটা একদম স্থির। হেঁটে যেতে পা টলে যায় না।

সন্তু প্লেনের পেছন দিকে চলে গেল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলবে, এমন সময় পাশের দিকে চোখ পড়ল। তার গা-টা একবার কেঁপে উঠল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

একেবারে শেষের সীটটায় দু'জন সাহেব বসে আছে। সন্তুর চিনতে কোনও অসুবিধে হল না, এর মধ্যে একজন হচ্ছে সেই সাহেবটা, যে পাসপোর্ট অফিসের

সামনে সন্তুকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়েছিল ! কাকাবাবুর কাছ থেকে সন্তু একটা জিনিস শিখেছে। একবার কারুকে দেখলে তার মুখটা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করতে হয়। সন্তু ঠিক মনে রাখতে পারে।

সাহেবটি অবশ্য আজ পোশাক বদলেছে। একটা খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট পরে আছে। চার পাঁচ দিন দাড়ি কামায়নি। দেখলে খুব সাধারণ লোক মনে হয়। কিন্তু আগের দিন খুব সাজগোজ করা খাঁটি সাহেবের মতন দেখাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ ধরেছে। পাশের লোকটার পোশাকও সেইরকম। দু'জনে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে। সন্তুকে দেখতে পায়নি।

সন্তু বাথরুমের মধ্যে একটুখানি থেকেই বেরিয়ে এল। বাথরুমটা ছোট্ট, বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই।

ধীরে সুস্থে নিজের জায়গায় ফিরে এল। তারপর মুখ নিচু করে ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু, সেই সাহেবটা !"

"কোন্ সাহেবটা ?"

"সেদিন পাসপোর্ট অফিসের সামনে যে আমায়..."

সন্তু মাথা পেছন দিকে ঘুরিয়ে ওকে আবার দেখতে কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ওদিকে তাকাবি না। তোকে চিনতে পেরেছে ?"

"না, আমায় দেখতে পায়নি।"

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু আমায় ঠিক চিনবে।"

কথাটা ঠিক। কাকাবাবুর একটা পা কাটা। ক্রাচ নিয়ে চলতে হয়। এরকম লোককে একবার দেখলেই সবার মনে থাকে। সন্তুর মতন ছেলেমানুষকে হয়ত ঐ সাহেব দুটো লক্ষ করত না।

প্লেনের গতি কমে এল। আবার সীটবেল্ট বাঁধতে হবে। রেঙ্গুন এসে গেছে। সন্তু আবার নীচের দিকে তাকাল। ছবির মতন শহরটা দেখা যায়। এমন-কী, প্যাগোডার চূড়াও চোখে পড়ে।

রেঙ্গুনে কিন্তু যাওয়া হল না। প্লেন এখান থেকে তেল নেবে। তাই এয়ারপোর্টে আধঘণ্টা বিশ্রাম। একটু বাইরে বেরিয়ে শহরটাও দেখে আসা যাবে না !

সব যাত্রীরা নেমে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ঘোরাফেরা করছে। কাকাবাবু সন্তুকে একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, "এখানে চুপ করে বসে থাক। অন্য কোথাও যাবি না।"

সেই সাহেব দুটো একটু দূরে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করছিল। কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠক করে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হাতঘড়িটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ঘড়িটা বোধহয় ঠিক চলছে না। আপনাদের ঘড়িতে কটা বাজে ?"

সাহেব দুটো একটু বিরক্ত হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। তারপর ঘড়ি দেখে অবহেলার সঙ্গে সময় বলে দিল।

সন্তু কাকাবাবুর সাহস দেখে অবাক। উনি নিজে থেকে ওদের দেখা দিতে গেলেন ? ওরা যে খারাপ লোক তাতে তো আর কোনও সন্দেহই নেই। নইলে দাড়ি না-কামিয়ে কেউ প্লেনে চাপে ?

খানিকটা বাদে কাকাবাবু ফিরে এসে বললেন, "আবার প্লেনে উঠতে হবে।"

আবার সীটবেল্ট বাঁধা, আবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা। এবার প্লেন বেশ তাড়াতাড়ি উড়ল। এবারে মাইক্রোফোনে মেয়েটি ঘোষণা করল, "নমস্কার, আর দু' ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে আমরা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছে যাব, যদি ঝড়বৃষ্টি না হয়..."

পোর্ট ব্লেয়ার ? পোর্ট ব্লেয়ার জায়গাটা কোথায় ? সিঙ্গাপুরে ? জাপানে ? নামটা একটু চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

"কাকাবাবু, পোর্ট ব্লেয়ার কোথায় ?"

"আন্দামানে।"

তারপর একটু থেমে উনি বললেন, "আমরা ঐখানেই নামব।"

সন্তুর বুকটা দমে গেল। এত জল্পনা-কল্পনার পর শেষ পর্যন্ত আন্দামান ? সেটা তো একটা বিচ্ছিরি জায়গা। সেখানে শুধু কয়েদীরা থাকে। সেখানে যাবার মানে কী ?

সন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল গাঢ় নীল রঙের সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্র। মাঝে মাঝে জলের ওপর রোদ এমন ঠিকরে পড়ছে যেন চোখ ঝলসে যায় !

আন্দামান তো ভারতবর্ষের মধ্যেই। তবু সেখানে যাবার জন্য পাসপোর্ট জোগাড় করা কিংবা এত তোড়জোড় লাগে কেন ? সাহেব দুটোই বা কেন সেখানে যাচ্ছে ? কী আছে সেখানে ?

আন্দামানের নাম শুনে সন্তু ভেবেছিল একটা নোংরামতন বিচ্ছিরি দ্বীপ দেখবে। যে-জায়গায় এক সময় শুধু চোর-ডাকাত আর কয়েদীদের পাঠানো হত, সে জায়গা তো আর সুন্দর হতে পারে না। আগেকার দিনে অনেকেই নাকি আন্দামানে একবার গেলে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারত না। সেই জায়গায় কেউ শখ করে যায় ?

॥৩॥

কিন্তু প্লেনটা যখন ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল, তখন জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে অবাক হয়ে গেল। ছবির বই ছাড়া এমন সুন্দর দৃশ্য সন্তু আগে কখনও দেখেনি। পুরী কিংবা দীঘার সমুদ্রে সে দেখেছে ঘোলাটে ধরনের জল। এখানে সমুদ্রের জল একেবারে গাঢ় নীল রঙের। এত গাঢ় যে,

মনে হয় কলম ডুবিয়ে অনায়াসে লেখা যাবে। তার মাঝখানে ছোট-ছোট দ্বীপ। আন্দামান তো একটা দ্বীপ নয়—সন্তুই গুনে ফেলল এগারোটা। পরে শুনেছিল, ওখানে দুশোর বেশি দ্বীপ আছে।

প্রত্যেকটা দ্বীপেই ছোট-ছোট পাহাড় আছে, আর সেই পাহাড়ে গিসগিস করছে গাছপালা। এত গভীর বন যে পৃথিবীতে এখনও আছে, ভাবাই যায় না। মনে হয় যেন ওর মধ্য দিয়ে হাঁটাই যাবে না। বিরাট বিরাট গাছ। সেই নীল রঙের সমুদ্রের মধ্যে সবুজ সবুজ দ্বীপ, দ্বীপগুলোর ধারে ধারে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে ধপধপে সাদা ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বেশির ভাগ দ্বীপেই একটাও বাড়িঘর নেই। তারপর একটা বড় দ্বীপে কিছু-কিছু বাড়ি চোখে পড়ল। প্লেনটা সেখানেই নামছে। এই জায়গাটার নামই পোর্ট ব্লেয়ার। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেনটা মাটি ছুঁতেই সন্তু তার কাকাবাবুর দেখাদেখি কোমর থেকে সীটবেল্ট খুলে ফেলল। কান দুটো কী রকম যেন ভোঁভোঁ করছে। মাঝে মাঝেই পুচ্‌পুচ্‌ করে একটু হাওয়া বেরিয়ে আসছে কানের ভেতর থেকে। বাইরের শব্দ কিংবা ভেতরের অন্যদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে খুব আস্তে। বেশ মজাই লাগছে সন্তুর।

অন্যরা নামতে শুরু করতেই সন্তু তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। কাকাবাবু নামলেন সবার শেষে। কাকাবাবুকে ক্রাচে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় খুব সাবধানে। সন্তু একটু লজ্জা পেল। আগে আগে না এসে তার উচিত ছিল কাকাবাবুকে একটু সাহায্য করা। কিন্তু সে আবার সিঁড়ির কাছে যাবার আগেই কাকাবাবু নেমে পড়েছেন।

একজন গোলগাল বেঁটেমতন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত ছুঁয়ে বলল, "আপনি নিশ্চয় মিস্টার রায়চৌধুরী ? আমি দাশগুপ্ত। আপনার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু সন্তুকে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার ভাইপো। এর নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী, ডাকনাম সন্তু।"

দাশগুপ্ত নামের লোকটি সন্তুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "বেড়াতে এসেছ তো ? ভাল লাগবে, দেখো খুব ভাল লাগবে !"

কাকাবাবু দাশগুপ্তকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ঐ যে দু'জন বিদেশি সাহেব, ওদের দিকে একটু নজর রাখতে হবে। ওরা কোথায় যায়, কোথায় ওঠে—"

দাশগুপ্ত একটু অবাক হয়ে বলল, "এই প্লেনে তো বিদেশি কেউ আসছে না ! আমরা আগে থেকেই খবর পাই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ঐ দু'জন ?"

"ওরা নিশ্চয়ই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখানে একটা দেশলাইয়ের কারখানা

আছে। সেখানে কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কাজ করে। মাঝে-মাঝে ওদের যাতায়াত করতে হয় কলকাতায়—"

"তবু ওরা কোথায় থাকবে, সেটা আমি জেনে রাখতে চাই।"

দাশগুপ্ত এবার হেসে বলল, "সে ঠিক জানা যাবে। এটা খুব ছোট জায়গা, এখানে সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। ওরা নিশ্চয়ই দেশলাই কারখানার কোয়ার্টারেই থাকবে।"

কাকাবাবু আড়চোখে সাহেব দুটির দিকে লক্ষ করতে লাগলেন। লোক দুটি এমনভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন কারুকে খুঁজছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কোনও লোক আসেনি। একটু বাদে ওরা নিজেরাই গট্‌ গট্‌ করে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

মালপত্তর নিয়ে ওরা এয়ারপোর্টের বাইরে এসে একটা জিপ গাড়িতে চড়ল। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের থাকার জায়গা ঠিক আছে তো?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, টুরিস্ট হোমে আপনাদের ঘর বুক করা আছে। সেটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল জায়গা! খাওয়া-দাওয়ারও কিছু অসুবিধে হবে না। বেশ কিছুদিন থাকবেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "দেখি!"

প্লেন থেকে বোঝাই যায়নি যে দ্বীপের মধ্যে এ-রকম একটা শহর আছে। বেশ চমৎকার পীচ বাঁধানো রাস্তা, দু'পাশে নতুন-নতুন বাড়ি ও দোকানপাট। তবে রাস্তাটা পাহাড়ি শহরের মতন উঁচু-নীচু, আর মাঝে-মাঝেই হঠাৎ-হঠাৎ দূরে সমুদ্র দেখা যায়।

টুরিস্ট হোমটা একটা ছোট টিলার ওপর। আসবার পথে খানিকটা জঙ্গল পার হতে হয়। বাড়িটার সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান। আর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালেই সমুদ্র। খুব কাছে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট জাহাজ আর স্টিমার রয়েছে। চমৎকার জায়গা। যে-কোনও দিকে তাকালেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

একটা ডবল-বেড ঘর ঠিক করা ছিল সন্তুদের জন্য। একজন বেয়ারা ওদের মালপত্র পৌঁছে দিল ঘরে। কাকাবাবু তাকে এক টাকা বখশিস দিতে যেতেই সে লজ্জায় জিভ কেটে বলল, "নেহি! নেহি!"

কাকাবাবু আবার বললেন, "আরে নাও নাও, তোমার চা খাবার জন্য!"

লোকটি আরও লজ্জা পেয়ে মাথা নুইয়ে ফেলে বলল, "নেহি! নেহি! আপ রাখ দিজিয়ে।"

এ আবার কী রকম—হোটেলের বেয়ারা যে বখশিস নিতে চায় না? কাকাবাবু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "এক টাকা বখশিস দিলে কম হয় নাকি? আরও বেশি চাইছে?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, না, এরা বখশিস নিতে চায় না। দেখবেন, এখানকার

লোক খুব ভাল—পয়সা-কড়ির দিকে কারুর লোভ নেই !”

লোকটির কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। চেহারা দেখলেই মনে হয় দক্ষিণ ভারতীয়। অথচ হিন্দীতে কথা বলছে।

কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার নাম কী ? তুমি বাংলা বোঝো ?”

লোকটি বলল, “হাঁ সাব, বাংলা বুঝি। আমার নাম কড়কড়ি !”

সন্তু অমনি ফিক করে হেসে ফেলল। কড়কড়ি আবার লোকের নাম হয় নাকি ?

দাশগুপ্ত বলল, “সত্যিই ওর নাম কড়কড়ি। এই যে, শোনো কড়কড়ি, সাহেবদের যত্ন-টত্ন করবে কিন্তু ! ভাল খাবার-দাবার দেবে। আজ কী কী খাবার আছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যাবে ?”

দাশগুপ্ত বলল, “মাছ যত ইচ্ছে চাইবেন ! এটা তো মাছেরই দেশ। এখানকার রাঁধুনী, বেয়ারা সবাই কেরালার লোক, ওরা আমাদেরই মতন মাছের ঝোল খায়। চিংড়ি মাছ পাবেন খুব ভাল। তাছাড়া মুর্গী বা হরিণের মাংস—যেদিন যেটা ইচ্ছা হয় অর্ডার করবেন !”

কাকাবাবু বললেন, “বাঃ, তাহলে তো চমৎকার ব্যবস্থা !”

দাশগুপ্ত তখনকার মতন বিদায় নিল। আবার সন্ধের সময় আসবে। সন্তু সুটকেসগুলো খুলে জামা-টামা সব বার করে গুছিয়ে রাখল। দুটো পাশাপাশি বিছানা, বেশ চওড়া খাট।

কাকাবাবু একটা খাটের ওপর বসে একটা ম্যাপ বিছিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন। সন্তু পেছনের দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। পেছনেও খানিকটা বাগান, তারপর পাহাড়টা খাড়া হয়ে নেমে গেছে, তার ঠিক নীচেই সমুদ্র। একটু দূরেই, বাঁ পাশে আর-একটা দ্বীপ। সেটা একেবারে জঙ্গলে ভরা। ঐ দ্বীপটায় একবার যেতেই হবে।

সন্তু দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ শুনতে পেল হাতির ডাক। পরপর দু'বার। সে একেবারে শিউরে উঠল। এত কাছের ঐ দ্বীপটায় বুনো হাতি আছে ? বাঘ-সিংহও আছে নিশ্চয়ই। এরকম একটা ভয়ংকর জঙ্গল এত কাছে ? একটা দূরবীন থাকলে সে নিশ্চয়ই হাতিগুলোকে দেখতে পেত।

কিন্তু সন্তুর আর সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো হল না। কথা নেই বার্তা নেই, অমনি বৃষ্টি এসে গেল ! প্রথমে মিহি বরফের গুঁড়োর মতন, তারপরই ঝমঝম। সন্তু দৌড়ে ফিরে এল নিজেদের ঘরে।

কাকাবাবু তখনও ম্যাপটা দেখছেন। সন্তু উত্তেজিতভাবে বলল, “কাকাবাবু, কাকাবাবু, সামনের দ্বীপটায় না, হাতি আছে !”

কাকাবাবু মুখ না তুলেই বললেন, “তা তো থাকতেই পারে !”

"আমি হাতির ডাক শুনলাম। নিজের কানে, এক্ষুনি !"

"হুঁ।"

"ওখানে বাঘ বা সিংহ আছে ?"

কাকাবাবু এবার মুখ তুলে বললেন, "না ! আন্দামানে কোনও হিংস্র জন্তু নেই। ঐ হাতিগুলোও পোষা হাতি। বড়বড় গাছ কাটা হয় তো, সেগুলো বয়ে নিয়ে যাবার জন্য হাতি লাগে। আমার চেনা এক ভদ্রলোক একবার কলকাতা থেকে পঞ্চাশটা হাতি নিয়ে এসেছিলেন এখানে।"

পোষা হাতির কথা শুনে সন্তু একটু দমে গেল। পোষা হাতি আর বুনো হাতি দেখা তো আর এক নয় ! যাই হোক, রিনিকে যখন সে চিঠি লিখবে, তখন লিখবে যে, সে বুনো হাতিরই ডাক শুনেছে। এত গভীর জঙ্গলের মধ্যে পোষা হাতিই বা দেখেছে কজন ?

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঐ লোকটিকে ডেকে এক কাপ চা দিতে বলো তো আমাকে। ভাত খাবার তো খানিকটা দেরি আছে !"

এইরে, লোকটার নাম কী যেন ? একটু আগেই তো বলল, একদম মনে পড়ছে না ! গড়াগড়ি ? খড়খড়ি ? সুড়সুড়ি ? কাতুকুতু ? না তো ! ধরাধরি ? মারামারি ?

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "এই যে, ইয়ে ! একটু শুনে যাও তো !"

ভাগ্যিস তাতেই সাড়া দিল লোকটা। ডাইনিং রুমের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কী বলছেন, সাব ?"

সন্তু তাকে চায়ের কথাটা জানিয়ে নিশ্চিন্ত হল। ওর নামটা কিন্তু এখনও মনে পড়ছে না !

আশ্চর্য, এর মধ্যেই বৃষ্টি থেমে গেছে। এ কী রকম ভল্লুকের জ্বরের মতন বৃষ্টি ! আকাশে আর এক টুকরোও মেঘ নেই।

ভোরবেলা সন্তু ছিল কলকাতায় তার নিজের বাড়িতে। আর এখন এই দুপুরের মধ্যেই সে কোথা চলে এসেছে ! হঠাৎ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। সত্যি কি সে আন্দামানের টুরিস্ট হোমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ? নাকি এটা স্বপ্ন ? সন্তু নিজের হাতে একটু চিমটি কেটে দেখল, না, এটা স্বপ্ন নয়।

কাকাবাবুর আগে সন্তু স্নান করে নেবার জন্য বাথরুমে ঢুকল। সেখানে আবার এক অবাক কাণ্ড ! শাওয়ার খুলে সে সবেমাত্র ওপর দিকে তাকিয়েছে, পাশের দেয়ালে দেখল একটা সবুজ রঙের টিকটিকি ! প্রথমে সে ভেবেছিল সাপ বা অন্য কিছু। কিন্তু তা নয়। এমনিই একটি সাধারণ টিকটিকি। কিন্তু রঙটা একদম সবুজ ! টিকটিকিটা তাড়া করে আসছেও না, কিছুই না। শুধু তার দিকে চেয়ে আছে। সবুজ রঙের টিকটিকির কথা সে কারুর কাছে কোনওদিন শোনেনি। সে এতই অবাক হয়ে গেল যে, আর চেপে রাখতে পারল না।

ভিজে গায়ে তোয়ালে পরেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু, একটা অদ্ভুত জিনিস !"

সে এতই উত্তেজিত হয়ে বলল যে কাকাবাবু উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। টিকটিকিটা দেখে বললেন, "হুঁ, অদ্ভুতই বটে। এখানে এরকম আরও কিছু কিছু আছে, শুনেছি এখানে সাদা রঙের কুমির দেখতে পাওয়া যায় !"

সন্তু ভাবল, রিনিকে চিঠি লিখে চমকে দেবার আর একটা জিনিস পাওয়া গেল। গোয়াতে বেড়াতে গিয়ে ও কি এত সব নতুন জিনিস দেখতে পাবে !

সেদিন দুপুরে আর কোথাও বেরুনো হল না। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। এখানে সন্ধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি। বিকেল হতে না হতেই সন্ধে।

সন্ধের সময় দাশগুপ্ত এল, তার সঙ্গে যাওয়া হল বাজারের দিকে। পোর্ট ব্লেয়ার বেশ আধুনিক শহর। এখানে টেলিফোন করে ডাকলেই ট্যাক্সি এসে যায়। বাজারে সবরকম জিনিসই কিনতে পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সব জিনিস কলকাতা কিংবা মাদ্রাজ থেকে আনা।

শহরে নানারকম লোক। বাঙালি, মাদ্রাজী, কেরালার লোক, পাঞ্জাবী, বিহারী, বর্মী। তবে বাঙালিই যেন বেশি মনে হয়। কিছু লোক আছে, যারা আগেকার কয়েদীদের বংশধর। তবে, দাশগুপ্ত বলল, এখানে এখন চুরি ডাকাতি একদম হয় না।

রাস্তার পাশে-পাশে বড়-বড় ব্যারাক বাড়িতে দেখা যায় কিছু চীনে মেয়ে-পুরুষ। তাদের নোংরা নোংরা জামা, কী রকম রাগ-রাগ চোখে তারা তাকায়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দাশগুপ্ত, এরাই বুঝি সেই তাইওয়ানিজ ?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ সার !"

সন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তাইওয়ানিজ মানে কী ?"

কাকাবাবুর বদলে দাশগুপ্তই বলল, "তাইওয়ান বলে চীনেদের একটা ছোট্ট দেশ আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক নেই। সেই দেশ থেকে মাঝে মাঝে সাত-আটজন লোকসুদ্ধু এক-একটা মাছ ধরা নৌকো এখানে ভেসে চলে আসে। তাই তাদের ধরে আটকে রাখতে হয় !"

"কেন, তারা মাছ ধরতে আসে বলে তাদের ধরে রাখতে হয় কেন ?"

"এক দেশের নৌকো তো আর-এক দেশে বিনা অনুমতিতে যাবার নিয়ম নেই। তাছাড়া ওরা শুধু মাছ ধরতে আসে, না গুপ্তচরের কাজ করতে আসে, সেটাও জানা দরকার।"

"কিন্তু ওদের বাড়ির দরজা-টরজা তো সব খোলা। ওরা পালিয়ে যেতে পারে না আবার ?"

"কী করে যাবে ? ওদের নৌকো যে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সমুদ্র দিয়ে আর তো পালাবার কোনও উপায় নেই! ওদের মধ্যে যারা একটু বদমেজাজী, তাদের আটকে রাখা হয় জেলে।"

দাশগুপ্ত এবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "স্যার, আপনি এখানকার জেল দেখতে যাবেন না ? এখানকার বিখ্যাত জেল সবাই আগে দেখে। কবে যাবেন ? কাল ?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "না। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে এখানকার দেশলাইয়ের কারখানাটা দেখতে যাওয়া। সেখানকার কারুর সঙ্গে আপনার চেনা আছে ?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ। অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিঃ ভার্গবকে আমি ভালই চিনি।"

"কাল সকালেই সেখানে যাব।"

পরদিন খুব সকালে উঠেই সন্তু তৈরি হয়ে নিল। তারপর কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল হেঁটেই। সকালবেলা একটু হাঁটলে ভালই লাগে। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও হাঁটতে ভালবাসেন। কিন্তু সুস্থির হয়ে হাঁটবার কি উপায় আছে ? মাঝে-মাঝেই হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি। তখন কোনও গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। অবশ্য দু-এক মিনিটের বেশি বৃষ্টি থাকে না।

দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বড় রাস্তায়। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল। লোকটি বেশ বেঁটে ও মোটা, এত জোরে হাঁটবার জন্য হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, "দেশলাইয়ের কারখানা অনেকটা দূর, সেখানে তো হেঁটে যাওয়া যাবে না। দাঁড়ান, এই রাস্তা দিয়ে বাস আসবে !"

মিনিট পনেরো পরেই বাস এল। একদম ভিড় নেই। বাসের মাথায় লেখা আছে চ্যাথাম আয়ল্যাণ্ড। তার মনে বাসটা অন্য কোনও দ্বীপে যাবে ! কী করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাস যায় ?

দেশলাইয়ের কারখানাটা পোর্ট ব্লেয়ার শহরের একেবারে এক প্রান্তে, বন্দরের কাছে। সেখানেই বাস থেকে নেমে পড়া হল, সামনেই কারখানার বড় গেট, আর ডান পাশে সমুদ্র।

কারখানার গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর আপনমনে বললেন, "সন্তুকে এখানে নিয়ে আসা ভুল হয়েছে। ওকে বাংলোতে রেখে এলেই হত !"

সন্তু একটু দুঃখ পেয়েও চুপ করে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, "কেন, চলুক না !"

"না, আমরা কারখানায় গিয়ে ম্যানেজার-ট্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব, সেখানে ও কী করবে ? ছেলেমানুষ, ওর সেখানে থাকা উচিত নয়।"

"তা অবশ্য।"

"সন্তু, তুই আবার এখান থেকে বাস ধরে বাংলোয় ফিরে যেতে পারবি না ?"

দাশগুপ্ত বাধা দিয়ে বলল, "না, তার দরকার নেই। ও এখানেই একটু ঘুরে বেড়াক না। আন্দামানে ভয় তো কিছু নেই।"

"ভয়ের কথা বলছি না।"

দাশগুপ্ত সন্তুকে বলল, "তুমি সামনের দিকে একটু এগোলেই একটা ব্রীজ দেখতে পাবে, তার ওপারে চ্যাথাম আয়ল্যান্ড। সেখানটা ঘুরে এসো না !"

কাকাবাবু, বললেন, "সেই ভাল, সন্তু, তুই একটু বেড়িয়ে আয় এদিকটা, আবার ঠিক এখানে ফিরে আসবি।"

ওরা কারখানার ভেতরে ঢুকে যাবার পর সন্তু সামনের দিকে এগুলো। একটুখানি যেতেই দেখল বাঁ দিকে সমুদ্রের ওপর একটা কাঠের ব্রীজ। তার ওপারে একটা পুঁচকি দ্বীপ। বড় জোর একটা ফুটবল মাঠের সমান।

ব্রীজটার ওপর পা দিয়ে সন্তুর কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। সমুদ্রের ওপর সেতু ! রামায়ণে সেই রাম তাঁর বানর-সৈন্যদের নিয়ে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করেছিলেন। সেই কথা মনে পড়ে যায়। হোক না এটা ছোট সেতু, তবু দুটো দ্বীপের মাঝখানে তো, এবং তলায় আসল সমুদ্র।

জলের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। এখানে জলের রঙ আর ঘন নীল নয়, কাচের বোতলের মতন হালকা সবুজ। তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে মাছ, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ। অনেক মাছই রঙিন, লাল, সবুজ, হলুদ, ময়ূরকণ্ঠী—মনে হয় গোটা সমুদ্রটাই যেন একটা অ্যাকোয়ারিয়াম ! ব্রীজের কাঠের খুঁটির গায়ে-গায়ে লেগে আছে কাঁকড়া—সেগুলোর একটাও সাধারণ কাঁকড়ার মতন খয়েরি নয়, মাছগুলোর মতনই নানা রঙে রঙিন।

সন্তু কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে মাছেদের খেলা দেখছিল, আবার বৃষ্টি এসে গেল। সে দৌড়ে চলে গেল ব্রীজের ওপারে। চ্যাথাম দ্বীপটাতে বড়-বড় গুদাম ভর্তি কাঠ, এক জায়গায় কাঠ চেরাই হচ্ছে। দ্বীপটার অন্যদিকে রয়েছে কয়েকটা বড়-বড় জাহাজ। কোনওটার নাম এস· এস· হরিয়ানা, কোনওটার নাম চলুঙ্গা, কোনওটার নাম গঙ্গা। সেখানে কোনও লোকজন নেই। একটু দূরে দেখা যায় সমুদ্রের ওপর কয়েকটা মাছ-ধরা নৌকো।

সন্তু সবচেয়ে বড় জাহাজটার খুব কাছে গিয়ে সেটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সে কোনওদিন জাহাজে চাপেনি। ফেরার সময় নিশ্চয়ই জাহাজে করে ফেরা হবে ! কিন্তু কবে ফেরা হবে ?

হঠাৎ সন্তুর মনে হল, সে অনেক দেরি করে ফেলেছে। কাকাবাবুদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তার জন্যই দাঁড়িয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি ব্রীজ পেরিয়ে আবার ফিরে এল ওপারে।

কাকাবাবু আর দাশগুপ্ত ঠিক তখুনি বেরিয়ে এলেন কারখানার গেট দিয়ে। কাকাবাবুর মুখ গম্ভীর থমথমে। ক্রাচের খটখট শব্দ তুলে তিনি এগিয়ে গেলেন

সমুদ্রের দিকে। একদম কিনারার কাছে থেমে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা হাত বোলাতে লাগলেন গোঁফের ওপরে।

সন্তু ফিসফিস করে দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, "সেই সাহেব দু'জনকে পাওয়া গেছে ?"

দাশগুপ্ত মাথা নাড়িয়ে জানাল, "না।"

"তারা এখানে আসেনি তাহলে ?"

"উঁহু ! গত দু' মাসের মধ্যে এখানকার কেউ বাইরে যায়নি। নতুন কেউ আসেওনি। এখানে মাত্র তিনজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাজ করে। তাদের দেখলাম, তারা অন্য লোক !"

"তবে সেই সাহেব দু'জন নিশ্চয়ই অন্য কোনও হোটেলে আছে।"

"এখানে সাহেবদের থাকার মতন কোনও হোটেল নেই। ওরা যদি বিদেশি হয়, তাহলে তো আরও মুশকিল ! কোনও বিদেশিই আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে এখানে আসতে পারে না !"

দাশগুপ্ত কাকাবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "স্যার, আপনি চিন্তা করবেন না, ওদের ঠিক খুঁজে বার করা যাবে। এইটুকু ছোট জায়গা, এখানে ওরা পালাবে কোথায় ?"

কাকাবাবু মুখটা ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "এখানে অনেক দ্বীপ আছে, তার যে-কোনও একটাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকা তো খুব সোজা !"

"কিন্তু এখানে এসে তাদের লুকিয়ে থেকে কী লাভ ? কী আর এমন আছে এখানে ?"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অনেকটা আপনমনেই বললেন, "আছে। কারণ আছে। সেইজন্যই তো আমিও এসেছি এখানে।"

এই সময় চ্যাথাম দ্বীপের পেছন দিক থেকে ভট্‌ভট্‌ শব্দে একটা মোটরবোট বেরিয়ে এল। মোটরবোটটা ছোট, ঠিক একটা হাঙরের মতন দেখতে। সেটা সমুদ্রের জল কেটে খুব জোরে ছুটে যেতে লাগল দূরের দিকে। এতদূর থেকেও সন্তুরা স্পষ্ট দেখতে পেল, সেই বোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সাহেব। কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত, একটা মোটরবোট জোগাড় করতে পারো ? এক্ষুনি ?"

দাশগুপ্ত অবাক হয়ে বলল, "মোটরবোট ? কেন, আপনি কি ওদের তাড়া করবেন নাকি ?"

কাকাবাবু অধৈর্য হয়ে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, "আঃ, জোগাড় করতে পারবে কিনা বলো না ! ওরা একবার লুকিয়ে পড়লে আর ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না ! এই তো ব্রিজের পাশে একটা খালি মোটরবোট রয়েছে, এটা ব্যবহার করা যায় না ?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, স্যার ! এখানে পুলিশের অনুমতি ছাড়া কেউ বোট

চালাতে পারে না। আমি পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে আপনার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারি—"

"সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে!"

কাকাবাবু হতাশভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাহেবদের মোটরবোট ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। তারপর একটা দ্বীপের আড়ালে বাঁক নিতেই সেটাকে আর দেখা গেল না।

কাকাবাবু নিজের বাঁ হাতের ওপর ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মারলেন। তারপর বললেন, "এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যে, ওরা ঠিক লুকোবার চেষ্টা করবে। এখানে লুকিয়ে থাকা খুব সহজ! ওরা যে বোটটা নিয়ে গেল, সেটা কার বোট, কোনও অনুমতি নিয়েছে কিনা— এ খবর জোগাড় করতে পারবে?"

দাশগুপ্ত বলল, "তা পারব। হারবার মাস্টারের কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে।"

"তবে এক্ষুনি সেই খবর নিয়ে এসো।"

দাশগুপ্ত একটুক্ষণ তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু চিন্তা করার সময় লোকটির একটা চোখ ট্যারা হয়ে যায়। ট্যারা চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "এক কাজ করুন, স্যার। আপনি টুরিস্ট হোমে ফিরে যান। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিন। ততক্ষণে আমি সমস্ত খবর নিয়ে আপনার কাছে আবার যাচ্ছি। দিল্লি থেকে আমার কাছে অর্ডার এসেছে আপনাকে সব রকমে সাহায্য করার জন্য। তবে আপনি কোন্ রহস্যের খোঁজে এসেছেন, তা কিন্তু আমি এখনও জানি না।"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "একটু বাদে তুমি যখন টুরিস্ট হোমে আসবে, তখন তোমাকে সব বলব। চলো, সন্তু!"

॥ ৪ ॥

কাছেই একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। বাসের জন্য অপেক্ষা না করে ওরা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

টুরিস্ট হোমে একটা মস্ত বড় ডাইনিং হল আছে। সকলে সেখানে গিয়েই খাবার-টাবার খায়। দূরের সমুদ্র আর পাহাড় দেখতে দেখতে খাওয়া যায়।

ডাইনিং হলে তখন কয়েকজন লোক বসে ছিল। কাকাবাবু বেশি লোকজন পছন্দ করেন না। তিনি সন্তুকে বললেন, "আমাদের বেয়ারাকে বলে দাও, আমার খাবারটা আমার ঘরে দিয়ে যেতে।"

এই রে, সন্তু আবার বেয়ারাটার নাম ভুলে গেছে। এমন অদ্ভুত নাম, মনে রাখাই যায় না। কী যেন ওর নাম, হুটোপাটি? খিটিমিটি? ঝুমঝুমি? গুংগাগুলা? টুংগাটুলা? ধুৎ! এরকম আবার নাম হয় নাকি কারুর। অথচ এই

রকম সব কথাই মনে আসছে। কিড়িমিড়ি ? ধাঁই ধপাস ?

সন্তু আবার ডাকতে লাগল, "ইয়ে ! এই যে ইয়ে, শুনে যাও তো !"

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল বেয়ারাটি। সন্তু তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে ?"

লোকটি এক গাল হাসল। হাসলে তাকে অদ্ভুত দেখায়। কারণ তার একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, অন্য সব দাঁত ধপধপে সাদা, একটা দাঁত সোনালী।

সে বলল, "সাব, আমার নাম কড়কড়ি !'

"কড়কড়ি, ও কড়কড়ি ! হ্যাঁ, তাই তো ! আচ্ছা কড়কড়ি, তুমি আমাদের খাবারটা আমাদের ঘরে দিয়ে যাও !"

"এখনি দিচ্ছি। সাব, একটা বরিয়া চিজ দেখবেন ?"

"কী ?"

"আসুন আমার সঙ্গে !"

ডাইনিং হলের ডানপাশে একটা ছোট বাগান। তারপর পাহাড়টা ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রে। বাগানের এক কোণে একটা গাছের সঙ্গে একটা অদ্ভুত জন্তু বেঁধে রাখা হয়েছে। সেটা মস্ত বড় একটা কচ্ছপের মতন, কিন্তু গাটা কাঁকড়ার মতন। কড়কড়ি ধরে ধরে টানতেই সেটা ক্রোক করে একটা রাগী আওয়াজ বার করল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এটা কী ?"

"এটা একটা ক্র্যাব, সাব ! ক্র্যাব !"

"ক্র্যাব ? তার মানে কাঁকড়া ? এত বড় ? কাঁকড়া আবার ডাকে নাকি ?"

"হাঁ, সাব ! আজ এটা রান্না করে আপনাদের খাওয়াব ! ক্র্যাব খান তো ?"

এ রকম একটা অদ্ভুত জিনিস নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে দেখানো উচিত। সন্তু দৌড়ে গিয়ে কাকাবাবুকে ডেকে নিয়ে এল।

কাকাবাবুও চমকে গেলেন। কাছে গিয়ে ঝুঁকে ভাল করে দেখে বললেন, "হুঁ, নাম শুনেছি ! এগুলোকে বলে কোকোনাট রবার ! এরা নারকোল গাছে উঠে নারকোল ভেঙে খায়, এদের গায়ে এত জোর !"

কড়কড়ি বলল, "হাঁ সাব ! এরা কোকোনাট খায়।"

"এটাকে ধরলে কী করে ? এদের দাঁড়ায় তো খুব জোর ?"

"একটা পাথর দিয়ে মেরে উল্ট করে দিয়েছিলাম ?"

"ইস, ছিছি, এরকম একটা প্রাণীকে মারতে আছে ? এগুলো খুব রেয়ার, মানে খুব কম পাওয়া যায়। এরকমভাবে মারলে পৃথিবী থেকে একদিন এরা শেষ হয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, কড়কড়ি বলছে, এটা আজ ও আমাদের রান্না করে খাওয়াবে !"

কাকাবাবু দারুণ আপত্তি করে বললেন, "না, না, না ! এটাকে মারা উচিত নয় । এটাকে এক্ষুনি ছেড়ে দাও । তোমাকে আমি পয়সা দিয়ে দেব !"

কড়কড়ি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে একটা ছুরি এনে দড়িটা কেটে দিল । কাঁকড়াটা তার গুলিগুলি চোখ নিয়ে ওদের দিকে তাকাল । তারপর পেটের নীচ থেকে বার করল তার দুটো দাঁড়া । প্রায় মানুষের হাতের মতন মোটা ।

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, সরে দাঁড়াও, সন্তু ! ঐ দাঁড়া দিয়ে একবার চিমটে ধরলে আর কিছুতেই ছাড়ানো যাবে না !"

কাঁকড়াটা দু'বার ক্রোক ক্রোক শব্দ করল । তারপর হঠাৎ একটা মাকড়শার মতন তরতর করে নেমে গেল ঢালু জায়গাটা দিয়ে ।

ওরা ফিরে এল নিজেদের ঘরে । খাবার খেয়ে নেবার পর কাকাবাবু তিন-চারখানা বই একসঙ্গে খুলে তার মাঝখানে একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়ে বসলেন । সন্তুকে বললেন, "তুমি ইচ্ছে করলে এখন একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসতে পারো ।"

সন্তুর একটুও যাবার ইচ্ছে নেই । একটু পরেই দাশগুপ্তবাবু আসবেন, কাকাবাবু তাঁকে বলবেন যে, কোন্ রহস্যের সন্ধানে তিনি এখানে এসেছেন । সেটা সন্তুকে শুনতে হবে না ? কাকাবাবু তো নিজের থেকে তাকে কিছুই বলবেন না । সন্তুও টেবিলে একটা বই খুলে বসে রইল ।

একটু বাদে হাওয়ার ঝাপটায় কাকাবাবুর ম্যাপটা উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে । সন্তু তাড়াতাড়ি সেটা তুলে কাকাবাবুকে দিতে গেল ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ম্যাপ কী করে দেখতে হয় জানো ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জানি । ম্যাপের ওপর দিকটা সব সময় উত্তর দিক হয় ।"

কাকাবাবু হাসলেন । বললেন, "তা তো হয় ! এই যে দেখো, ভারতবর্ষের ম্যাপে, নীচের দিকে সমুদ্রের মধ্যে যে দু'-একটা কালির ছিটের মতন থাকে, সেইগুলোই হচ্ছে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ । এখানে সেই দ্বীপগুলোরই আলাদা করে বড় ম্যাপ আঁকা হয়েছে । এই যে লম্বা মতন বড় দ্বীপটা দেখছ, সেটা আসলে তিনটে দ্বীপ—এদের নাম হচ্ছে নর্থ আন্দামান, মিডল আন্দামান আর সাউথ আন্দামান । এই দ্যাখো, সাউথ আন্দামানের পেটের কাছে পোর্ট ব্লেয়ার—এইখানে আমরা আছি । আরও কয়েকটা দ্বীপের নাম নীল, হ্যাভলক, রস—এগুলো সব এক-একজন সাহেবের নামে । সাহেবরা আসবার আগে এই দ্বীপগুলো ছিল জলদস্যুদের আড্ডা !"

জলদস্যুদের কথা শুনেই সন্তু চমকে উঠল । জলদস্যু— তার মানেই গুপ্তধন— "ট্রেজার আয়ল্যান্ড" বইটার গল্পের কথা মনে পড়ল । তাহলে কি কাকাবাবু এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে এসেছেন ? কাকাবাবু সব সময় পুরনো ইতিহাস-বই পড়তে ভালবাসেন । হয়তো সেই রকম কোনও বইতে এখানকার গুপ্তধনের কথা আছে ।

কাকাবাবু বলতে লাগলেন, "এদিককার সমুদ্র দিয়ে যে-সব জাহাজ যেত, জলদস্যুরা হঠাৎ এসে আক্রমণ চালাত সেগুলোর ওপর। একটা পর্তুগীজ জাহাজ তো আগুন দিয়ে পুড়িয়েই দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের দমন করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার এখানে একটা ঘাঁটি তৈরি করবে ঠিক করল। কিন্তু জলদস্যুরা ছাড়াও এখানে আর-একটা বিপদ ছিল। এই সব দ্বীপগুলোতে তখন ভর্তি ছিল হিংস্র আদিবাসী—বাইরের লোকজন দেখলেই তারা আক্রমণ করত।"

সন্তু আর মনের কথাটা চেপে রাখতে পারল না। হঠাৎ বলে ফেলল, "কাকাবাবু, এখানে গুপ্তধন নেই ?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালেন, "গুপ্তধন ? কিসের গুপ্তধন ?"

"জলদস্যুরা যে অনেক সোনা আর হীরে-মুক্তো লুকিয়ে রাখত দ্বীপের মধ্যে ? যদি এখানেও সেরকম রেখে থাকে— তারপর সেই জলদস্যুরা মরে গেছে—সেগুলোর কথা আর কারুর মনে নেই..."

কাকাবাবু হেসে চশমাটা খুললেন। তারপর বললেন, "ওসব তো গল্পের বইতে থাকে—আজকাল কি আর সত্যি সত্যি কেউ গুপ্তধন পায় ?"

"আমরা যদি চেষ্টা করে পেয়ে যাই ?"

"এমনি-এমনি চেষ্টা করলেই যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়— তাহলে তো অনেকেই আগে পেয়ে যেত। শোনো, হঠাৎ টাকা-পয়সা পেয়ে বড়লোক হয়ে যাবার লোভ করতে নেই। টাকা রোজগার করতে হয় নিজে পরিশ্রম করে কিংবা বুদ্ধি খাটিয়ে। যাক ওসব বাজে কথা—শোনো, যা বলছিলাম, এই যে ম্যাপের মধ্যে অনেক ছোট-ছোট ফোঁটা দেখছ, এগুলোও এক-একটা দ্বীপ—আরও অনেক ছোট-ছোট দ্বীপ আছে, যা ম্যাপেও নেই—এর মধ্যে অনেক দ্বীপেই মানুষ থাকে না। মানুষ কখনও যায়ও না—শুধু পাহাড় আর জঙ্গল—সেই রকম কোনও একটা দ্বীপে যদি কয়েকজন সাহেব লুকিয়ে থাকে, কেউ তাদের খুঁজে বার করতে পারবে ?"

"কিন্তু সাহেবরা সেখানে লুকিয়ে থাকবে কেন ? তাদের কী লাভ ?"

কাকাবাবু উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজার বাইরে কার পায়ের শব্দ হল। কাকাবাবু থেমে গেলেন।

পর্দা সরিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আসব স্যার ?"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো। বলো, কিছু খবর পেলে ?

দাশগুপ্তর মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। অনেকখানি রাস্তা সে যেন দৌড়ে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার ! আমরা আজ নিজের চোখে দেখলাম একটা মোটরবোট চ্যাথাম দ্বীপের পাশ দিয়ে সমুদ্রে চলে গেল, অথচ হারবার মাস্টার বললেন, আজ সকালে কোনও বোটই যায়নি !"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে ?"

দাশগুপ্ত একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। এখানে অনেক রকম মোটরবোট আর স্টিমার আছে। কোনওটা যাত্রী নিয়ে যায়, কোনওটা মালপত্র, কোনওটা মাছ ধরার কিংবা ঝিনুক তোলার—তাছাড়া আছে পুলিশের বোট—সবগুলোর নাম রেজিস্ট্রি করা আছে, কোন্‌টা কোন্ সময় ছাড়ে বা ফিরে আসে তা লিখে রাখতে হয়। এখন হারবার মাস্টার বললেন, আজ খুব সকালে একটা শুধু যাত্রী-জাহাজ ছেড়েছে, আর কোনও বোটই ছাড়েনি। এমন কী, অন্য সব বোট কোন্‌টা এখন কোথায় আছে, তারও হিসেব মিলে যাচ্ছে। সুতরাং সকাল আটটার সময় আর কোনও বোট যেতেই পারে না।"

কাকাবাবু রেগে উঠে বললেন, "যেতেই পারে না মানে ? তাহলে যেটা দেখলাম, সেটা কী ?"

দাশগুপ্ত বলল, "আমিও তো সেই কথাই বললাম। আপনি দেখেছেন, আমি দেখেছি, সন্তু দেখেছে, আরও কয়েকজন দেখেছে। তাহলে বলতে হবে, একটা আলাদা মোটরবোট বেশি ছিল এখানে, যার খোঁজ কেউ রাখে না। সেটা কী করে সম্ভব ?"

কাকাবাবু বললেন, "খুবই সহজে সম্ভব। ঠিক আর-একটা মোটরবোটের মতন একই রকম চেহারা করে আর নাম লিখে কেউ একটা জাল বোট রেখেছিল এখানে। সেই জাল বোটটাই সাহেবদের নিয়ে পালিয়েছে। তুমি পুলিশকে এ খবর জানিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, স্যার, জানিয়েছি। পুলিশ আপনার কাছেও আসবে। স্যার, পুলিশ আপনার পরিচয়টাও জানতে চাইছিল !"

কাকাবাবু একটা চুরুট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমার পরিচয় বিশেষ কিছু নেই। আমি এক সময় ভারত সরকারের একটা চাকরি করতাম। একটা দুর্ঘটনায় আমার একটা পা নষ্ট হয়ে যাবার পর আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তারপর শুধু খেয়ে আর শুয়ে দিন কাটিয়ে দিই না। আমি কিছু-কিছু রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি। এগুলো সাধারণ খুনটুনের সমস্যা নয়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলো রহস্যময় ব্যাপার আছে, যার সমাধান মানুষ এখনও করতে পারেনি। যেমন ধরো, সাংহাইয়ের বাজারে অনেকদিন আগে একটা লোক নানারকম জড়িবুটি, পশুপাখির হাড়, শেকড়বাকড় এই সব বিক্রি করত। একবার তার দোকানে দুটো দাঁত পাওয়া গেল, যে-দুটো মানুষের দাঁত ছাড়া অন্য কারুর হতেই পারে না। কিন্তু সেই দাঁত দুটো ছিল এক ইঞ্চি করে লম্বা। অত বড় দাঁত আজ পর্যন্ত কেউ কোনও মানুষের দেখেনি। অন্তত দশ-বারো ফুট লম্বা মানুষের অত বড় দাঁত থাকতে পারে। অত লম্বা মানুষ কি কখনও পৃথিবীতে ছিল ? সব বৈজ্ঞানিকই বলছেন, মানুষ অত লম্বা কিছুতেই

হতে পারে না। তাহলে দাঁত দুটো কোথা থেকে এল? দাঁত দুটো তো ভেজাল নয়—অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সে-দুটি খাঁটি মানুষের দাঁত। এই দাঁতের রহস্যের মীমাংসা আজও হয়নি!"

দাশগুপ্তর মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে, তার সব কটা দাঁত দেখা যাচ্ছে, একটা চোখও ট্যারা হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, সে খুবই অবাক হয়ে গেছে। সাহেব আর মোটরবোটের সঙ্গে এক ইঞ্চি লম্বা দুটো দাঁতের যে কী সম্পর্ক সে বুঝতেই পারছে না। সন্তুও বুঝতে পারেনি।

কাকাবাবু আবার বললেন, "দক্ষিণ আমেরিকার একটা জায়গায় কতগুলো বিরাট বিরাট পাথরের বল আছে। বলগুলো কত বড় জানো? একটা মানুষের চেয়েও বড়—সেই একটা বল এই ঘরের দরজা দিয়েও ঢুকবে না—বলগুলো পাথরের হলেও নিখুঁত গোল আর চকচকে—সেগুলো মাঠেঘাটে ছড়ানো আছে—এখন রহস্য হচ্ছে, কে বা কারা অত বড় বড় বল তৈরি করেছিল, কেনই বা করেছিল? ঐ রকম বল দিয়ে তো আর ফুটবল খেলা যায় না! মানুষ এর রহস্যটা আজও জানতে পারেনি! তারপর ধরো, সম্রাট কণিষ্কের মূর্তিতে কেন মুণ্ডুটা নেই, কোথাও তার মুখের কোনও ছবি নেই কেন, সেটাও একটা রহস্য। আমি এরকম রহস্য সমাধানের চেষ্টা করি। কিছু একটা টের পেলে আমি ভারত সরকারকে চিঠি লিখে জানাই—সরকার তখন আমাকে নানা রকম সাহায্য দেয়। এ-সব কথা তোমাকে বললাম বটে, তবে তুমি বেশি লোককে আমার কথা জানিও না।"

কাকাবাবু একটু থেমে আবার চুরুট টানতে লাগলেন। দাশগুপ্ত আর সন্তু দারুণ কৌতূহলীভাবে চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "এবার তোমরা জানতে চাইতে পারো, এখানে আমি কোন্ রহস্য সমাধানের জন্য এসেছি! এজন্য আন্দামানের ইতিহাসটা একটু জানা দরকার। ইংরেজরা মাত্র শ'দেড়েক বছর আগে এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু তারও অনেক আগে অনেকের লেখায় এই দ্বীপের উল্লেখ আছে। এমন-কী, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে একজন ভ্রমণকারী এই দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আন্দামানের নাম দিয়েছিলেন 'সোনার দ্বীপ'। আরও অনেকে এটাকে সোনার দ্বীপ বলেছে। কেন? এ-দ্বীপগুলোর কোথাও তো সোনা পাওয়া যায় না? তবু সোনার দ্বীপ নাম দেওয়া হয়েছিল কেন? তারপর ধরো, এই দ্বীপের যে আদিবাসী, তাদের মাথার চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া কোঁকড়া। এটাই বা কী করে হল? ভারত কিংবা বর্মা কিংবা ইন্দোনেশিয়া—যেগুলো এর কাছাকাছি দেশ, সেখানকার লোকদের মাথার চুল তো এরকম নয়! তাহলে এই লোকগুলো এল কোথা থেকে? এটা রহস্য নয়?"

দাশগুপ্ত আস্তে আস্তে বলল, "তা বটে। এগুলো রহস্যই বটে!"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আমি এ-সব রহস্য সমাধানের জন্যও আসিনি! আমি এসেছি অন্য কারণে!"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে একটা ফাইল আনলেন। তার মধ্যে অনেক পুরনো খবরের কাগজের পাতা কেটে-কেটে জমিয়ে রাখা আছে। সেগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে তিনি বললেন, "এই যে দ্যাখো, এটা অনেকদিন আগেকার কথা, উনিশশো পঁচিশ সাল, তার মানে একান্ন বছর আগে, ডক্টর স্পিরনভ নামে একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তারপর তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেউ আর তাঁর খোঁজ পায়নি। অনেকের ধারণা, তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর দেহটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি খুব নামকরা লোক ছিলেন। তারপর দ্যাখো এটা—উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল—পোল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন দু'জন বৈজ্ঞানিক, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শুধু কাগজে ছাপা হয়েছিল, মিঃ জারজেসকি আর তাঁর সঙ্গী, এঁরাও দু'জনে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর উনিশশো একচল্লিশ সালে আবার রাশিয়া থেকে এলেন অধ্যাপক জুসকভ, ইনিও নিরুদ্দেশ। এঁর বেলায় খুব হৈ চৈ হয়েছিল। জাহাজ নিয়ে সমুদ্রেও খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। তবু পাওয়া যায়নি। এরপর উনিশশো তিপ্পান্ন সালে আবার দু'জন, সাতান্ন সালে একজন, উনিশশো চৌষট্টি সালে একসঙ্গে তিনজন বৈজ্ঞানিক উধাও হয়ে যান। পুরনো খবরের কাগজ থেকে আমি এগুলো বার করেছি। কেন একসঙ্গে এতগুলি বৈজ্ঞানিক এই জায়গায় এসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?"

দাশগুপ্ত তাড়াতাড়ি বলল, "স্যার, এর দু'-একটা ঘটনা আমিও শুনেছি। তবে এ-রহস্যের মীমাংসা করা তো শক্ত নয়। এ-সব ব্যাপার তো পুলিশও জানে। আপনি জারোয়াদের কথা শুনেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "শুনেছি।"

"আন্দামানের দ্বীপগুলোতে পাঁচ ধরনের আদিবাসী ছিল এক সময়। এর মধ্যে অন্যরা শান্ত হয়ে গেলেও দুটো জাত খুবই হিংস্র। এরা হচ্ছে সেন্টিনেলিজ আর জারোয়া। সেন্টিনেলিজরা থাকে অনেক দূরে, আলাদা একটা দ্বীপে। জারোয়ারা কিন্তু কাছেই থাকে— দক্ষিণ আর মধ্য আন্দামানের গভীর বনের মধ্যে। এই জারোয়ারা সাঙ্ঘাতিক হিংস্র; সভ্যলোক দেখলেই খুন করে। সাধারণ লোক কেউ ওদের এলাকায় যায় না। সাহেবদের তো সাহস বেশি হয়, তারা ঐ জঙ্গলে ঢুকেছে আর জারোয়াদের বিষ-মাখানো তীর খেয়ে মরেছে! এ তো খুব সোজা ব্যাপার। ভেবে দেখুন স্যার, জারোয়ারা এমন দুর্দান্ত যে, পুলিশ পর্যন্ত ওদের ধার ঘেঁষে না। এমন-কী, ওদের সংখ্যা যে কত তা গোনা পর্যন্ত যায়নি।"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, "না, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। কয়েকটা লোক খুন হয়েছে বা নিরুদ্দেশ হয়েছে, সে খোঁজ নিতেও আমি আসিনি। সে

তো পুলিশের কাজ। রহস্য হচ্ছে, এইসব বৈজ্ঞানিকরা এখানে এসেছিল কেন ? প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক এখানে এসেছে খুন হবার জন্য বা নিরুদ্দেশ হবার জন্য ? বৈজ্ঞানিকরা এত বোকা হয় না। তারা এসেছিল নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যটা যে কী, তা এখনও জানা যায়নি। আমি এসেছি সেটা জানতে।"

দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তাহলে এই যে সাহেব দুটো—"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এবার ঠিক ধরেছ। এই সাহেব দুটোরও নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। শুধু এই দু'জন কেন, আমার ধারণা আরও কয়েকজন এসেছে এর মধ্যে, তারা কোথাও লুকিয়ে আছে।"

ফাইলটা মুড়ে রেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের জন্য লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, স্যার, লঞ্চ রেডি। আপনি যখন খুশি ব্যবহার করতে পারেন।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো ! আমি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে চাই ?"

॥ ৫ ॥

তীরের কাছে সমুদ্রের জল খানিকটা ফিকে নীল আর সবুজে মেশানো, একটু দূরে গেলেই গাঢ় নীল। দূরে দূরে দু-একটা ছোট-ছোট দ্বীপ দেখা যায়। একটু পরেই মোটরবোটটা গভীর সমুদ্রে পড়ল।

মোটরবোটটা ছোট, কিন্তু খুব জোরে যায়। বিরাট-বিরাট ঢেউয়ের ওপর দিয়েও অনায়াসে চলে যাচ্ছে। শঙ্করনারায়ণ নামে একজন সেই বোটটা চালাচ্ছে, তার সঙ্গে রয়েছে আরও দু'জন লোক।

সন্তু ভেবেছিল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে মোটরবোটে চেপে যেতে তার দারুণ লাগবে। তার বন্ধুদের মধ্যে কারুর তো এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি কখনও। কিন্তু খানিকটা পরেই তার আর ভাল লাগল না। কী রকম মাথা ঘুরতে লাগল, পেটের মধ্যে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, তার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। সন্তু নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। বেড়াতে এসে এরকম তো কখনও হয় না তার।

সমুদ্র দেখতে একঘেয়ে লাগছে, একসময় সে শুয়ে পড়ল কাঠের বেঞ্চের ওপর। কাকাবাবু সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে ছিলেন, একবার পিছন ফিরে সন্তুকে শুয়ে থাকতে দেখেই তিনি উঠে এলেন। কাছে এসে বললেন, "কী সন্তু, শরীর খারাপ লাগছে ?"

সন্তু লজ্জিতভাবে বলল, "না, না, এই এমনি একটু শুয়ে আছি।"

তাড়াতাড়ি সে উঠে বসার চেষ্টা করল, তার ভয় হল, তার শরীর খারাপ দেখলে কাকাবাবু যদি তাকে ডাকবাংলোয় রেখে আসার কথা বলেন !

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মাথা ঘুরছে ? পেট ব্যথা করছে ?"

সন্তু উত্তর দেবার আগেই দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করল, "ও বুঝি আগে কখনও সমুদ্রে আসেনি ?"

"না।"

"তাহলে তো সী সিকনেস হবেই। এত বড় বড় ঢেউ..."

"দেখি, আমার কাছে বোধহয় ট্যাবলেট আছে।"

কাকাবাবু তাঁর বড় চামড়ার ব্যাগ হাতড়ে দুটো ট্যাবলেট বার করলেন। ঐ ব্যাগটার মধ্যে অনেক কিছু থাকে। এমন-কী, কাঁচি, গুলিসুতো, আঠার শিশি পর্যন্ত সন্তু দেখেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই ট্যাবলেট দুটো খেয়ে নাও সন্তু। তারপর শুয়ে থাকো। যদি বমি পায় বমি করে ফেলবে, লজ্জার কিছু নেই।"

সন্তুর সত্যি একটু-একটু বমি পাচ্ছিল। কিন্তু অতি কষ্টে চেপে রইল। পেটের মধ্যেও যেন সমুদ্রের ঢেউ ওঠা-নামা করছে।

সন্তু এক সময় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ দাশগুপ্তের চিৎকারে জেগে উঠল।

দাশগুপ্ত বলল, "ঐ দেখুন, ঐ দেখুন !"

সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসে বলল "কী ? কী ?"

দাশগুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে একদিকে আঙুল তুলে বলল, "ঐ যে, দেখতে পাচ্ছ ?"

সন্তু দেখল, "একটু দূরে জলের মধ্যে একটা খয়েরী তিনকোনা জিনিস উঁচু হয়ে আছে।"

"কী ওটা ?"

"হাঙর। ঐ দ্যাখো আর একটা !"

"হাঙর ঐ রকম দেখতে ?"

"ঐটুকু তো শুধু পাখনা। বাকি হাঙরটা জলের নীচে আছে।"

ক্রমে দশ-বারোটা হাঙরের পিঠের পাখনা দেখা গেল। দাশগুপ্ত সন্তুকে ভয় দেখিয়ে বলল, "দেখেছ তো ? এখানে একবার জলে পড়লে আর বাঁচবার উপায় নেই। হাঙরগুলো এক মিনিটে শেষ করে দেবে।"

কাকাবাবু একটা দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে ছিলেন। খানিকটা দূরেই একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। তিনি দাশগুপ্তকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, "হঠাৎ ওরকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠো না। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি কোনও মানুষজন দেখতে পেয়েছ !"

দাশগুপ্ত আবার চুপ করে গেল।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে দ্বীপগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলোতে নামা যায় ?"

দাশগুপ্ত বলল, "না, স্যার, জেটি না থাকলে নামবেন কী করে ? বেশি কাছে

গেলে বোট তো বালিতে আটকে যাবে !”

“একেবারে কাছে না গিয়ে যদি খানিকটা দূরে বোট দাঁড় করিয়ে জলে নেমে পড়া যায় ?”

দাশগুপ্ত একেবারে আঁতকে উঠল। চোখ দুটো টলগুলির মতন গোল গোল করে বলল, “না, না, তা কখনও হয় ? এখানে যেখানে-সেখানে জলে নামতে যাবেন না। তাহলেই হাঙর এসে একেবারে ক্যাঁচ করে পা কেটে নিয়ে যাবে !”

“তাই নাকি ?”

“হ্যাঁ, স্যার, সত্যি কথা ! একবার আমাদের চেনা একজনের পা কেটে নিয়েছিল।”

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, “আমার তো একটা পা এমনিতেই অকেজো হয়ে আছে। হাঙর কি মানুষের দুটো পা-ই কেটে নিয়ে যায় ? সব সময় তো শুনি ওরা মানুষের এক পা কাটে, আর এক পা রেখে যায়।”

দাশগুপ্ত মজাটা বুঝল না। সে তখনও ভয় পাওয়া গলায় বলল, “ওসব চিন্তা ছাড়ুন। আপনি কি দুশোটা দ্বীপের প্রত্যেকটাতেই নেমে নেমে দেখতে চান ? সে তো অসম্ভব ব্যাপার !”

“এই দ্বীপে মানুষ থাকতে পারে ?”

“কী করে পারবে ? খাবার জল কোথায় ? সমুদ্রের জল তো খাবার উপায় নেই। চারিদিকে এত জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল। এই সব দ্বীপে কেউ দু'দিন থাকলে জল তেষ্টাতেই শুকিয়ে মরবে !”

“তাহলে যে-সব দ্বীপে মানুষ থাকে, সেখানে কীভাবে জল পাওয়া যায় ?”

“সে তো ঝরনার জল ! যে-সব দ্বীপে বড় পাহাড় আছে, সেখানে ঝরনাও আছে। খুব মিষ্টি জল।”

কাকাবাবু শুধু বললেন, “হুঁ !”

মোটরবোটটা এবার মূল সমুদ্র ছেড়ে খাঁড়িতে ঢুকল। খাঁড়ি মানে, দু'-পাশে দ্বীপ, তার মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের রাস্তা। দু'-পাশের দ্বীপগুলো দারুণ ঘন জঙ্গলে ভরা, এক-একটা গাছ প্রকাণ্ড লম্বা—তার গায়ে লতাপাতায় ফুটে আছে নানারকম ফুল। এ-সব জায়গায় একটা গাছও চেনা গাছের মতন নয়।

দাশগুপ্ত ফিসফিস করে সন্তুকে বলল, “তাকিয়ে থাকো, একটু পরেই কুমির দেখতে পাবে।”

সন্তু বলল, “কুমির ? জলের মধ্যে ভেসে উঠবে ?”

“না। দেখবে পাশের বালির চড়ায় রোদ পোহাচ্ছে। লঞ্চের আওয়াজ শুনেই ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়বে।”

সন্তু একেবারে ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

দাশগুপ্ত বলল, “আজ যদি ভাগ্যে থাকে, তাহলে সাদা কুমিরও দেখতে পাবে !”

কাকাবাবু আবার মুখ ফেরালেন। দাশগুপ্তকে বললেন, "কী বাজে কথা বকছ ? সাদা কুমির আবার হয় নাকি ?"

"হ্যাঁ, স্যার, হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় ! একবার একটা বিরাট তিমিমাছও এসে পড়েছিল নিকোবরের দিকে। তার কঙ্কালটা রাখা আছে পোর্ট ব্লেয়ারে। আর কুমির আর হাঙরের যা লড়াই বাধে না, স্যার, সে একটা দেখার মতন জিনিস !"

কাকাবাবু হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে বললেন, "মানুষ ! ঐ যে মানুষ দেখা যাচ্ছে !"

সন্তু কুমির দেখলে যতটা উত্তেজিত হত, কাকাবাবু মানুষ দেখে তার থেকে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সত্যি দেখা গেল বনের মধ্যে দুটি খাঁকি প্যান্ট পরা লোক ভেতর দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত কিন্তু বেশি উত্তেজিত হল না। বলল, "হ্যাঁ, এদিকে বন বিভাগের কিছু লোক কাঠ কাঠতে আসে। কিন্তু ওদের শুধু বাঁ দিকেই দেখতে পাবেন। ডান দিকে পাবেন না !"

"কেন ?"

"এই দিকের জঙ্গলে কারুর নামা নিষেধ। এই দিকের জঙ্গলেই জারোয়ারা থাকে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জারোয়া কী ?"

"এই রে, এর মধ্যে ভুলে গেলে ? তখন বললাম যে ! জারোয়া হচ্ছে খুব হিংস্র একটা জাত। তারা জামাকাপড় পরে না, তারা বিষাক্ত তীর মারে—আমাদের মতন লোক দেখলেই তারা খুন করতে চায়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে এখান দিয়ে মোটরবোট কিংবা স্টিমার যায়—এর ওপর তারা তীর মারে না ? হঠাৎ যদি তীর ছুঁড়তে শুরু করে ?"

দাশগুপ্ত বলল, "সেই জন্যই দেখবেন, একটু পরে-পরে পুলিশের ক্যাম্প বসানো আছে—পুলিশ ওদের সমুদ্রের ধারে আসতে দেয় না। ওদের দেখলেই গুলির আওয়াজ করে ভয় দেখায়। ওরা বন্দুককে খুব ভয় করে !"

সন্তু বলল, "ওদের বন্দুক নেই বুঝি ?"

"বন্দুক কী বলছ, ওরা আগুন জ্বালাতেই জানে না ! ওরা লোহার ছুরিও ব্যবহার করতে জানে না। ওদের যে তীর, তার ডগায় লোহা নেই, এমনিই সরু বাঁশের তীর—কিন্তু সেগুলোতে সাঙ্ঘাতিক বিষ মাখানো থাকে। অনেক সময় সমুদ্রতে শিশি বোতল ভেসে-ভেসে আসে তো, সেই বোতল ভেঙে ওরা কাচের ছুরি বানায়। কিংবা ঝিনুক বা পাথরের ছুরিও আছে। তবে শুনেছি, ওরা মাঝে মাঝে এদিকে এসে লোহা চুরি করারও চেষ্টা করে। সেই লোহা ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র বানাচ্ছে।"

কাকাবাবু খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "জারোয়ারা যেখানে থাকে,

সেখানে কোনও সভ্য মানুষ ঢোকেনি এ পর্যন্ত ?”

“কার বুকের এত পাটা আছে বলুন ? ওখানে ঢুকলে কেউ প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারে না। চলুন না, একটু দূরে একটা জায়গা আপনাকে দেখাচ্ছি।”

“তাহলে একথা মনে করা যেতে পারে যে, যে-সব বৈজ্ঞানিক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তারা এ-জায়গাতেই যাবার চেষ্টা করেছিল ?”

“তা হতে পারে !”

“এখানে যে সাহেবদের দেখেছিলাম, তারাও তো এখানে আসবার চেষ্টা করতে পারে। কারণ তাদের কাছে নিশ্চয়ই বন্দুক-পিস্তল আছে !”

“সেটা কিন্তু বলা শক্ত। মাত্র দু'-তিনজন সাহেব বন্দুক পিস্তল নিয়েও এখানে এসে কী করবে ? পাঁচ-ছশো হিংস্র জারোয়া যদি তাদের ঘিরে ধরে—”

“এই দ্বীপের উল্টো দিকেও তো সমুদ্র, সেখানে যাওয়া যায় না ?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যায়। তবে সেদিকে পুলিশ-পাহারা নেই। জারোয়ারা একেবারে তীরের কাছে যখন-তখন চলে আসে—”

“আমি সেদিকে একবার যেতে চাই।”

দাশগুপ্ত আবার অবাক হয়ে বলল, “এখন ?”

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, “কেন, এখন যাওয়া যায় না ?”

“তাহলে স্যার বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে ? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে !”

“খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই।”

“তা হলেও—মানে, এই বোটের শুধু এদিক দিয়ে যাওয়ারই পুলিশ-পারমিশান আছে। অন্য দিক দিয়ে যাবার জন্য আবার আলাদা করে অনুমতি নিতে হবে। চলুন না। দেখি যদি রঙ্গত্ থেকে সেই অনুমতি জোগাড় করা যায়। ফেরার পথে না হয়—”

দাশগুপ্ত আর একটু থেমে কাচুমাচুভাবে বলল, “একটা কথা স্যার, ঐ জারোয়াদের মধ্যে যাবেন না ! আপনি যে রহস্যের কথা বলছিলেন, তা কি শুধু ঐ জায়গাতেই আছে ? তাহলে সে রহস্য যেমন আছে, থাক না ! কেন শুধু-শুধু প্রাণটা দিতে যাবেন !”

কাকাবাবু বললেন, “সব মানুষ তো এক রকম হয় না ? কেউ কেউ ভাবে, সব যেমন চলছে তেমন চলুক। পুরনো জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করার কী দরকার ? আর কোনও-কোনও লোক একটা জিনিস একবার ধরলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। এই রহস্যটা যদি আমি বুঝতে না পারি, তাহলে কোনওদিন আমার রাত্তিরে ঘুম হবে না !”

“কিন্তু স্যার, ওখানে গেলে যে আমাদের প্রাণটাও যাবে !”

“তোমাদের কারুর যাবার দরকার নেই।”

“তা কখনও হয় ? গভর্নমেন্ট থেকে আমার ওপর হুকুম হয়েছে, সব সময়

আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে। আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে।"

"তাহলে গভর্নমেণ্ট তো তোমাকে খুব বিপদে ফেলেছে দেখছি ?"

"না স্যার, আমি তো আপনাকে সাহায্য করতেই চাই। আপনি তো এদিককার ব্যাপার সব জানেন না !"

"আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?"

"ঐ যে বললাম, রঙ্গত্। এদিককার বেশ বড় জায়গা। আমি ওয়্যারলেসে আমাদের আসবার কথা জানিয়ে দিয়েছি। জেটিতে জিপগাড়ি রাখা থাকবে। ওখানে খুব সুন্দর ডাকবাংলো আছে, পাহাড়ের ওপরে—"

"সেখানে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে ?"

"তিনটের মধ্যে পৌঁছে যাব। রঙ্গত্ থেকে আরও অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। আপনি যদি চান, আমরা মায়াবন্দরের দিকেও যেতে পারি। আমরা কী মনে হয় জানেন ? ঐ সাহেবগুলো মায়াবন্দরে থাকতে পারে !"

"কেন ?"

"মায়াবন্দর খুব সুন্দর জায়গা। সাহেব-মেমরা খুব পছন্দ করে।"

"সে তো যারা বেড়াতে আসে ! এই সাহেবরা এখানে বেড়াতে এসেছে, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তাহলে তারা এত লুকোচুরি করত না !"

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। মোটরবোটের গুটগুট শব্দ শুধু শোনা যায়। খাঁড়ির সমুদ্রে ঢেউ বেশি নেই। দু' পাশেই দেয়ালের মতন জঙ্গল।

সন্তু কুমির দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এক সময় সত্যিই দেখা পেল। দুটো কুমির বালির ওপর শুয়ে ছিল। ঠিক যেন দুটো পোড়া কাঠ। বোটের শব্দ শুনে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর খুব একটা ভয় না-পেয়ে আস্তে আস্তে জলে নামল।

সন্তু বলল, "ঐ যে ! ঐ যে কুমির !"

দাশগুপ্ত একটু অবহেলার সঙ্গে বলল, "এ দুটো তেমন বড় নয় ! আরও বড় আছে। এইটাই কিন্তু সেই জায়গা !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কোন্ জায়গা ?"

"সেই যে বলেছিলাম দেখাব ! এ জায়গাটার বালির রঙ দেখছ কেমন সোনালী সোনালী ? অরণ্যদেবের গল্পে সোনা-বেলার কথা পড়েছ তো ?"

"এই সেই সোনা-বেলা নাকি ? তাহলে সেই জেড পাথরের ঘর কোথায় ?"

"না, এটা সোনা-বেলা নয়। তবে এখানকার বালি খুব মিহি আর সোনালী রঙের। অনেকের ধারণা ওখানে বালির মধ্যে সোনা মিশে আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সত্যি সোনা আছে ?"

"না, না। গভর্নমেণ্ট থেকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সে রকম কিছু নেই। তবু লোকের লোভ হয়। ওদিকে তো যাওয়া নিষেধ—তাও একদিন রাত্তিরবেলা তিনজন লোক ওদিকে বালি নেবার জন্য নেমেছিল। তিনটে বস্তায়

বালি ভরেছে, এমন সময় পেছন থেকে জারোয়ারা আক্রমণ করে ! দুটো ছেলেকে তক্ষুনি মেরে ফেলে— আর একটি ছেলে একজন জারোয়ার পেটে ছুরি মেরে নিজেকে কোনও রকমে ছাড়িয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জারোয়ারা সাঁতার জানে না—তাই জলে নামে না। সেই ছেলেটিও আহত হয়েছিল, সেই অবস্থায় সমুদ্রে ভাসতে থাকে। তার ভাগ্য ভাল, তাকে হাঙরে কুমিরে ধরেনি—বারো ঘণ্টা বাদে ছেলেটিকে একটা পুলিশের বোট উদ্ধার করে। তারপর তার পাগলের মতন অবস্থা। তারপর থেকে সে অনবরত চেঁচিয়ে বলে, জারোয়া ! ঐ যে জারোয়া !”

গল্প বলার সময় ঝোঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে উঠে নিজেই সেই ছেলেটিকে নকল করে বলতে থাকে, “জারোয়া ! ঐ যে জারোয়া !”

সন্তু হাঁ করে ঘটনাটা শুনছিল। কিন্তু কাকাবাবু হঠাৎ দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি সেই ছেলেটিকে কখনও দেখেছ ? নিজের চোখে ?”

দাশগুপ্ত থতমত খেয়ে বলল, “তা দেখিনি। তবে সবাই এটা জানে !”

কাকাবাবু বললেন, “গল্প ! এ-সব বানানো গল্প !”

“না স্যার, আপনি রঙ্গতে গিয়ে যাকে খুশি জিজ্ঞেস করবেন।”

“আমি লক্ষ করেছি তুমি বড্ড গল্প বানাও।”

দাশগুপ্ত এর পর একেবারেই চুপ করে গেল।

তিনটের সময় বোট এসে ভিড়ল রঙ্গতে। জেটি থেকে উঠে এসে বাইরের রাস্তায় দেখা গেল সত্যি একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আরও আট-ন মাইল যেতে হবে।

সন্তু গিয়ে জিপে উঠে বসেছে। কাকাবাবু জিপে উঠতে গিয়েও থেমে গিয়ে বললেন, “আমার চশমাটা বোটে ফেলে এসেছি !”

দাশগুপ্ত বলল, “আমি নিয়ে আসছি !”

“না, আমিই আনছি !”

কাকাবাবু ক্রাচ খট-খট করে নিজেই এগিয়ে গেলেন জেটির দিকে।

তারপর একটু বাদে মোটরবোটটার ইঞ্জিনের ঘট্‌ঘট্ আওয়াজ শোনা গেল।

দাশগুপ্ত চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে বোটটা ছেড়ে গেল যে ! কাকাবাবু গেলেন কোথায় ?”

সন্তু তাড়াতাড়ি ছুটে এল জেটির কাছে। মোটরবোটটা সাঁ করে জল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দাশগুপ্ত তার পাশে এসে বলল, “সর্বনাশের ব্যাপার ! মোটরবোটটা আপনা-আপনি চলতে লাগল নাকি ? তাহলে কি হবে ? শঙ্করনারায়ণ, শঙ্করনারায়ণ ?”

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণও বোটটার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লোকটি খুব কম কথা বলে। এবার সে বলল, “বোট কখনও আপনা-আপনি চলে ! ওটা

তো উনি চালাচ্ছেন।"

দাশগুপ্তর চোখ ট্যারা আর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। সে ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "উনি নিজে বোট চালাচ্ছেন? তাহলে উনি নিশ্চয় একলা-একলা জারোয়াদের কাছে যেতে চান। উঃ, কী গোঁয়ার লোক রে বাবা! জারোয়ারা ওঁকে মেরে ফেলবেই। আমি গভর্নমেণ্টকে কী জানাব?"

মোটরবোটটা এখনও দেখা যাচ্ছে। সন্তু চিৎকার করে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু! কাকাবাবু!"

দাশগুপ্তও চ্যাঁচাল, "মিঃ রায়চৌধুরী।"

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, "উনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। বোটে ডিজেল নেই। আমি এখান থেকে ডিজেল নেব ঠিক করেছিলাম।"

দাশগুপ্ত বলল, "অ্যাঁ? ডিজেল নেই? থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ শঙ্করনারায়ণ! তবে তো উনি আর জারোয়াদের জঙ্গলে যেতে পারবেন না!"

মোটরবোটটা কিন্তু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সন্তু ভাবল, মোটরবোটটার ডিজেল যদি ফুরিয়ে যায়, তাহলে কাকাবাবু মাঝ-সমুদ্রে একা-একা ভাসবেন? বোটে তো খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই!

দাশগুপ্ত বলল, "উঃ, কী ডানপিটে লোক বাবা! তাও তো একটা পা অচল। দুটো পা থাকলে আরও কী করতেন কে জানে। আচ্ছা, সন্তু, ওঁর একটা পা কাটল কী করে?"

"আফগানিস্তানে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল।"

"ওরে বাবা, উনি আফগানিস্তানেও গিয়েছিলেন?"

শঙ্করনারায়ণ জেটির সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে বালির চড়া ধরে দৌড়তে লাগল। দূরে এক জায়গায় কয়েকটা মোটরবোট রয়েছে। ওর মধ্যে কোনওটা মাছ ধরার, কোনওটা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার। একটু বাদেই শঙ্করনারায়ণ একটা বোট চালিয়ে নিয়ে এল জেটির পাশে। তারপর বলল, "আপনারা একজন কেউ আসুন।"

দাশগুপ্ত বলল, "আমি যাচ্ছি। তুমি একটু থাকো, সন্তু।"

সন্তু সে কথা শুনল না। সে লাফিয়ে গিয়ে মোটরবোটে উঠল।

শঙ্করনারায়ণ এত জোরে বোটটা চালিয়ে দিল যে, ওরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আর-একটু হলে। সবাই শক্ত করে ধরে রাখল রেলিং।

একটু বাদেই আগের মোটরবোটটা দেখা গেল। সেটা এদিক-ওদিক এঁকে-বেঁকে যাচ্ছে। কাকাবাবু ভাল চালাতে পারছেন না। দাশগুপ্ত এদিক থেকে আবার চ্যাঁচাতে লাগল, "মিঃ রায়চৌধুরী, মিঃ রায়চৌধুরী!"

খানিকক্ষণ দুই বোটে পাল্লা চলল। কাকাবাবু থামতে চান না। তারপর হঠাৎ এক সময় কাকাবাবুর বোটটা থেমে গেল। মোটরবোট যখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে, তখন তার একটা বেশ তেজী ভাব থাকে। থেমে গেলেই কী

রকম যেন অসহায় দেখায়। ঠিক যেন একটা মোচার খোলা।

শঙ্করনারায়ণ প্রথমে এই বোটটা নিয়ে কাকাবাবুর বোটের চারপাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরল কয়েকবার। তারপর একবার কাছাকাছি এসে একটা দড়ি নিয়ে ঐ বোটে লাফিয়ে পড়ল।

পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েও কাকাবাবুর কিন্তু লজ্জা নেই। বরং মুখে একটা রাগ-রাগ ভাব। কেউ কিছু বলার আগেই তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বোটটা হঠাৎ আপনা-আপনি থেমে গেল কেন?"

শঙ্করনারায়ণ বলল, "তেল নেই আর!"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কেন, তেল থাকে না কেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, আপনি এটা কী করছিলেন? এ-রকম পাগলামি করার কোনও মানে হয়? ওদিকে রঙ্গতে সবাই আমাদের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে বসে আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এখানে খেতে আসিনি। একটা কাজ করতে এসেছি।"

"কিন্তু কাজ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! কাজ মানে তো ঐ সাহেবগুলোকে খোঁজা? ওরা আর যাবে কোথায়?"

"আমি একটুও সময় নষ্ট করতে চাই না।"

"কিন্তু স্যার, আপনাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। আপনি ঐ জারোয়া-ল্যাণ্ডে যেতে পারবেন না। অর্ডার ছাড়া আমি কিছুতেই আপনাকে ওখানে যেতে দিতে পারি না।"

"অর্ডারটা দেবে কে?"

"পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে অর্ডার আনতে হবে। তাও তিনি পারমিশান দেবেন কিনা সন্দেহ। কয়েকজন সাহেব ছবি তোলবার জন্য এসেছিল, তাও দেওয়া হয়নি।"

কাকাবাবু আর কোনও কথা না-বলে এই বোটে উঠে এলেন। ঐ বোটটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল, তারপর দুটোই চলল একসঙ্গে।

তারপর জেটিতে পৌঁছে ওরা বোট থেকে নেমে জিপে উঠলেন, বেশ চওড়া বাঁধানো রাস্তা, দু'পাশে বড় বড় গাছ, কিন্তু মানুষজন বা বাড়িঘর বিশেষ দেখাই যায় না। এটাও একটা দ্বীপের মধ্যে, কিন্তু দু' পাশের ঘন জঙ্গল দেখে সে-কথা আর মনে থাকে না।

॥ ৬ ॥

আধ ঘণ্টার মধ্যেই রঙ্গতে পৌঁছনো গেল। দাশগুপ্ত বলেছিল, রঙ্গত বেশ জড় জায়গা। আসলে একটা ছোট্ট গ্রামের চেয়েও ছোট। কয়েকটা দোকান, দু'-তিনটে হোটেল আর কিছু বাড়িঘর। যে-কোনও বাড়ির পেছনেই নিবিড়

যম।

রঙ্গতের ডাকবাংলো একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে। রাস্তাটা এমন খাড়া যে, জিপটা ওঠবার সময় রীতিমতন গোঁগোঁ শব্দ করছে। যে-দিকে তাকানো যায়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

বাংলোটা অবশ্য বেশ সুন্দর। দোতলা বাড়ি, বড় বড় কাচের জানলা, সামনে সুন্দর ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। দোতলার জানলার সামনে দাঁড়ালে বহু দূর পর্যন্ত পাহাড় আর বন দেখা যায়—এখান থেকে আর সমুদ্র দেখা যায় না। এখানকার জঙ্গল এত ঘন যে আফ্রিকার কথা মনে পড়ে যায়—গল্পের বইতে যে-রকম জঙ্গলের কথা আমরা পড়েছি।

রান্না তৈরিই ছিল। ভাত, বড় বড় চিংড়ি মাছ ভাজা আর হরিণের মাংস। বাংলোর চৌকিদার খুব দুঃখ করে বলল, সে কিছুতেই পাঁঠার মাংস জোগাড় করতে পারেনি, তাই বাধ্য হয়ে হরিণের মাংস রেঁধেছে। সন্তু তো অবাক! পাঁঠার মাংস তো সে কতই খেয়েছে—কিন্তু হরিণের মাংস খাওয়াই দারুণ ব্যাপার। এখানে হরিণের মাংস খুবই শস্তা, এমন-কী, এক-একদিন বিনা পয়সাতেও পাওয়া যায়। মাছ তো শস্তাই। এখানে সবচেয়ে দামি জিনিস তরকারি। অনেক লোক তিন-চার বছরের মধ্যে ফুলকপি চোখেই দেখেননি।

কাকাবাবু দারুণ গম্ভীর, কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না। সন্তু কাকাবাবুর এই স্বভাবটা জানে। অনেক লোক শুধু নিজের বাড়ির লোকজন কিংবা টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু কাকাবাবু এমন সব জিনিস নিয়ে চিন্তা করেন, যার সঙ্গে তাঁর নিজের কোনও সম্পর্কই নেই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা এসে আন্দামানে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে, এজন্য কাকাবাবুর রাত্তিরে ঘুম হবে না কেন? কত লোক তো তবুও ঘুমোয়!

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সন্তু শুনতে পেল, কাকাবাবু একা-একা বারান্দায় পায়চারি করছেন। বারান্দাটা কাঠের। সেখানে কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্।

সকালবেলা দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, জিপ রেডি! কখন বেরুবেন?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাব?"

"যেখানে আপনার খুশি। এখানে কত বেড়াবার জায়গা আছে! চিত্রকূট যাবেন?"

"আমি এখানে বেড়াতে আসিনি, দাশগুপ্ত!"

চিত্রকূট নামটা শুনে সন্তুর খুব কৌতূহল হল। চিত্রকূট নামটা তো রামায়ণ বইতে আছে। এখানেও একটা চিত্রকূট আছে নাকি? জায়গাটা কেমন?

দাশগুপ্ত এক গাল হেসে বলল, "স্যার, কাজ তো আছেই! তবু এত দূর এসে একটু বেড়াবেন না? এখানে ভাল-ভাল জায়গা আছে। মায়াবন্দর যাবেন? চমৎকার জায়গা! আর যদি ডিগলিপুর যেতে চান, তাও ব্যবস্থা করা

যায়। হরিণের পাল আর কুমির দেখতে হলে ডিগলিপুর যেতে হয়! যাবেন?"

সন্তুর কাছে মায়াবন্দর নামটাও খুব সুন্দর লাগল। সত্যিই এ-রকম নামের কোনও জায়গা আছে? জায়গাটা কি যখন-তখন বদলে যায়?

কাকাবাবু কড়া সুরে বললেন, "আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি আজই ফিরে যেতে চাই।"

দাশগুপ্ত হতাশভাবে বলল, "আজই ফিরে যাবেন? একটা দিন থেকে গেলে হত না?"

"না! শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। এখানে আমাকে এনেছ কেন? আমি কি জায়গা দেখতে এসেছি? আজই ফিরে গিয়ে এস পি-র সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে নাও, যাতে আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি। এস পি যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আমাকে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে!"

দাশগুপ্তর নিজেরই আসলে খুব বেড়াবার ইচ্ছে। বোঝা যায়, লোকটি আসলে খুব বেড়াতে ভালবাসে। তার মুখ দেখলে আরও বোঝা যায়, কাকাবাবুর কথা তার একটুও পছন্দ হয়নি। কাকাবাবুর দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা শুনে সে আরও ভয় পেয়েছে।

সকালবেলায় চা-জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়া হল। আবার জিপে করে সেই বন্দর পর্যন্ত যাওয়া। কাকাবাবু আগাগোড়া মুখ বুজে রইলেন। জেটিতে গিয়ে মোটরবোটে ওঠার সময় শুধু বোট-চালককে একবার প্রশ্ন করলেন, "ভাল করে তেল ভরে নেওয়া হয়েছে তো? আবার কোথাও এটা থেমে যাবে না?"

এই প্রথম শঙ্করনারায়ণকে হাসতে দেখল সন্তু। সে বলল, "না, স্যার, থামবে না। আশা করছি, ঘণ্টা চারেকের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে যাব।"

"ঠিক আছে, চলো!"

আশ্চর্যের ব্যাপার, মোটরবোটটা ছাড়বার পরই কাকাবাবু চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন। আসবার সময় তিনি চারদিক দেখতে-দেখতে আসছিলেন, কিন্তু এখন আর তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

সন্তু কিন্তু খুব আগ্রহের সঙ্গে চোখ মেলে রইল। এবার আর তার পেট ব্যথা হচ্ছে না কিংবা বমিও পাচ্ছে না। আসবার সময় সে শুধু ডান দিকটা দেখেছিল, এবার বসল বাঁ দিকে। যদি আবার কুমির কিংবা হাঙর দেখা যায়।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা সেই জায়গাটায় এসে গেল, যেখানে জারোয়ারা থাকে। সেই বালির চড়াটাও দেখা গেল, যেটার নাম দাশগুপ্ত বলেছিল সোনা-বেলা। এখানকার বালিতে নাকি সোনা মিশে আছে।

ভুল হচ্ছে কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য সন্তু দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা সেই জায়গা নয়? যেখানে কয়েকটা ছেলে নেমেছিল, আর জারোয়ারা হঠাৎ এসে আক্রমণ করল?"

দাশগুপ্ত বলল, "হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ!"

তারপর দাশগুপ্ত ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে তখন আমি ঘটনাটা বললাম, আর তোমার কাকাবাবু বিশ্বাস করলেন না। উনি ভাবলেন আমি বানিয়ে বলেছি! আমি কিন্তু ঠিকই বলেছিলাম। জারোয়ারা এমন হিংস্র—"

কাকাবাবু এই সময় চোখ মেলে বললেন, "আমি এখনও তোমার কথা বিশ্বাস করি না!"

তার মানে কাকাবাবু সব শুনছিলেন? সজাগই ছিলেন উনি!

কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হুকুমের সুরে বললেন, "বোট ঘোরাও! আমি ওই বালির চরে নামব!"

দাশগুপ্ত বলল, "সে কী? অসম্ভব! আপনাকে কিছুতেই নামতে দেব না, স্যার! আপনাকে বললাম না, অর্ডার ছাড়া এখানে নামা যায় না। আপনি কি প্রাণটা খোয়াতে চান?"

কাকাবাবু হঠাৎ এবার কোটের পকেট থেকে তাঁর রিভলভারটা বার করলেন। তারপর সেটা উঁচু করে তুলে বললেন, "আমি যা বলছি, তাই শুনতে হবে! বোট ঘোরাও!"

কাকাবাবু খট্ খট্ করে এসে শঙ্করনারায়ণের ঘাড়ের কাছে রিভলভারটা চেপে ধরে বললেন, "শঙ্করনারায়ণ, তুমি খুব ভাল ছেলে, আমার কথা শুনে চলো! নইলে, তোমাকে আহত করে আমি নিজেই বোট ঘোরাব!"

শঙ্করনারায়ণ একটাও কথা উচ্চারণ না করে খাঁড়ির ডান দিকে মোটরবোট ঘোরাল।

সেটা বালির চরে এসে থামবার পর কাকাবাবু নিজের ক্রাচ নিয়ে অতি কষ্টে নামলেন। হাতব্যাগটাও নিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "তোমরা সবাই ফিরে যাও! আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না।"

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি কেন এখানে যাচ্ছেন? আপনার রহস্য সমাধান করার জন্য এ ছাড়া আর কোনও জায়গা কি নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "তার কারণ, অন্য সব জায়গায় গভর্নমেন্টের লোকেরা কখনও-না-কখনও যায়। সেখানে অদ্ভুত কিছু থাকলে এতদিনে জানা যেত! শুধু এই জায়গাটাতেই আর কেউ আসে না। সুতরাং কিছু রহস্য থাকলে এখানেই আছে। তোমরা ফিরে যাও। এস পি-কে বলে কালকে কিছু লোকজন নিয়ে আবার ফিরে এসো আমার জন্য।"

তিনি এবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্তু, তুমিও যাও, পোর্ট ব্লেয়ারে আমার জন্য অপেক্ষা করো।"

দাশগুপ্ত বলল, "ওরে বাবা, যে-কোনও মুহূর্তে জারোয়ারা তীর মারতে পারে।"

কাকাবাবু রিভলভারটা উঁচু করে বললেন, "তোমাদের আর তো থাকবার

দরকার নেই। তোমরা যাও!"

সঙ্গে-সঙ্গে মোটরবোটটা চলতে শুরু করল।

কিন্তু সন্তু কিছুতেই কাকাবাবুকে ছেড়ে যাবে না। সে মোটরবোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

বোটের চালক শঙ্করনারায়ণ আর একটুও দেরি করল না। সে বোটটা চালিয়ে দিল গভীর সমুদ্রের দিকে।

দাশগুপ্ত পাগলের মতন লাফাতে লাগল। সে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। "এ কি? এ কি? আমরা ওদের ফেলে চলে যাব নাকি? আমার তাহলে চাকরি যাবে! পাইলট, কোথায় চলে যাচ্ছ?"

শঙ্করনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলল, "বসে পড়ুন! বসে পড়ুন! গায়ে তীর লাগতে পারে!"

"অ্যাঁ?"

দাশগুপ্ত ধপাস করে বোটের মধ্যে শুয়ে পড়ল।

শঙ্করনারায়ণ বলল, "সবাই মিলে একসঙ্গে মরে যাওয়ার কোনও মানে আছে? আমরা ওখানে আর একটুক্ষণ থাকলেই জারোয়ারা তীর মারত!"

"কিন্তু ওদের কী হবে?"

"মিঃ রায়চৌধুরীর কাছে রিভলভার আছে। তিনি গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে জারোয়াদের আটকাবার চেষ্টা করতে পারেন। পারবেন কিনা জানি না! আমাদের উচিত পুলিশের এস পি সাহেবকে সব কিছু জানানো। তারপর পুলিশ নিয়ে এসে যদি ওঁদের বাঁচানো যায়..."

মোটরবোটটা অনেক দূর চলে এসেছে। এখন দ্বীপের সেই জায়গাটা দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় জঙ্গল। ওর মধ্যে বিষাক্ত তীর নিয়ে লুকিয়ে আছে জারোয়ারা। ওখানে বাইরের লোক যে একবার গেছে সে আর ফেরেনি!

দাশগুপ্ত ফোঁস ফোঁস করে দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তার এমনই দুঃখ হল যে, চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৭ ॥

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। এস পি সাহেব অফিসে নেই। দাশগুপ্ত তক্ষুনি ছুটল তাঁর বাড়িতে। সেখানে গিয়েও এক দারুণ খারাপ খবর শুনল। এস পি সাহেব এইমাত্র লিট্‌ল আন্দামান রওনা হয়ে গেছেন।

দাশগুপ্ত হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়ছিল, কিন্তু এস পি সাহেবের আর্দালি বলল, "সাহেব এই মাত্র বেরিয়েছেন, এখনও বোধহয় জেটিতে গেলে তাঁকে ধরতে পারবেন।"

দাশগুপ্ত আবার দৌড়ল জেটির দিকে। দূর থেকে দেখল, এস পি-র নিজস্ব

মোটরবোট তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে ছাড়বে। চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সে চ্যাঁচাতে লাগল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও ! পাইলট, বোট ছেড়ো না !"

কোনও রকমে জেটিতে এসে সে লাফিয়ে মোটরবোটের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

এস পি সাহেবের মোটরবোটটা শুধু তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। ভেতরে তাঁর বসবার জায়গাটা সিংহাসনের মতন, লাল ভেলভেট দিয়ে মোড়া। এস পি সাহেবের চেহারাটাও দারুণ। টকটকে ফর্সা রঙ, বিশাল মোটা গোঁফ মিশে গেছে তাঁর লম্বা জুলফির সঙ্গে। অনেকটা হরতনের গোলামের মতন মুখ। কোমরে চওড়া বেল্টে গোঁজা রিভলভার, পায়ে কালো জুতো চকচক করছে। তিনি পা ছড়িয়ে বসে চোখ বুজে ছিলেন।

দাশগুপ্ত ধড়াম করে লাফিয়ে পড়তেই তিনি চোখ মেলে কটমট করে তাকালেন। হুংকার দিয়ে বললেন, "এখানে লাফালাফি করছ কেন ? সার্কাস দেখাতে এসেছ ?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, সর্বনাশ হয়ে গেছে !"

"কিসের সর্বনাশ ? তোমার তো রোজই একটা করে সর্বনাশ হয় !"

"না, স্যার ! সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেণ্টের চিঠি নিয়ে এসেছিলেন, তিনি জারোয়াদের জঙ্গলে নেমে গেছেন !"

"কী ?"

এস পি সাহেব এবার সোজা হয়ে বসলেন। এমনভাবে দাশগুপ্তর দিকে তাকালেন যেন ওকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবেন।

"তুমি সঙ্গে ছিলে, তাও উনি নেমে গেলেন কী করে ?"

দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, "স্যার, আমার দোষ নেই, আমি অনেক বারণ করেছিলুম, উনি কিছুতেই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন।"

"কতক্ষণ আগে ?"

"প্রায় তিন ঘণ্টা আগে।"

"তাহলে দেখো গিয়ে, এতক্ষণে তাঁর মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে। লোকটা কি পাগল না রাম-বোকা ? লোকটা তো রোগা আর এক পা খোঁড়া, ওকে জোর করে আটকে রাখতে পারলে না ?"

"স্যার, ওঁর কাছে রিভলভার আছে।"

এস পি সাহেব আবার আঁতকে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, "রিভলভার ? কে দিয়েছে ? কার হুকুমে রিভলভার নিয়ে গেছে ?"

"জানি না। আগেই ওঁর কাছে ছিল !"

"ছি ছি ছি ছি ! এখন যদি একটাও জারোয়াকে গুলি করে মারে, তা হলে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ! জারোয়াদের মারা বারণ, তা জানো না ?"

“তা তো জানি। কিন্তু উনি যে কথা শুনলেন না !”

“বাঘ-সিংহই শিকার করা বন্ধ হয়ে গেছে। আর উনি কি মানুষ-শিকারে গেছেন ? ইচ্ছেমতন জারোয়াদের গুলি করে মারবেন ?”

“উনি গেছেন সেই রহস্যের সন্ধানে।”

“চুলোয় যাক রহস্য ! জারোয়ারা আপনমনে নিজেদের দ্বীপে আছে, কে ওনাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে তাদের বিরক্ত করতে ? রিভলভার থাকলেও উনি বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবেন না। নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে !”

“এখন কী উপায় হবে, স্যার ?”

“যাও, শিগগির প্রীতম সিংকে খবর দাও !”

মোটরবোটটা ইতিমধ্যে চলতে শুরু করেছিল। এস পি সাহেবের হুকুমে সেটা এসে আবার জেটিতে ভিড়ল। একজন গার্ড ছুটে গেল প্রীতম সিংকে ডেকে আনার জন্য।

প্রীতম সিং ছিলেন পুলিশের একজন ইন্সপেকটর। এখন রিটায়ার করে পোর্ট ব্লেয়ারেই বাড়ি বানিয়ে আছেন। একমাত্র এই প্রীতম সিং-ই কয়েকবার জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনি জারোয়াদের ভাষাও জানেন। জারোয়ারা অন্য সবাইকে দেখলেই মারতে আসে, শুধু প্রীতম সিংকে কিছু বলে না।

আন্দামানে আদিবাসীদের সংখ্যা খুব কমে যাচ্ছে বলে গভর্নমেণ্ট নানাভাবে সাহায্য করে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। পুলিশের লোক গিয়ে মাঝে-মাঝে ওদের দ্বীপে নানারকম খাবার রেখে আসে। ভাত, চিনি, গুঁড়ো দুধ, নানারকমের ফল। পুলিশেরা চলে যাবার খানিকক্ষণ পর জারোয়ারা এসে সেইসব নিয়ে যায়। তাদের জামা-কাপড় পরাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জামা-কাপড় রেখে এলে তারা নেয় না, শুধু তারা পছন্দ করে লাল কাপড়। লাল কাপড় নিয়ে তারা কী করে কে জানে ! জারোয়াদের কিন্তু খুব আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে। তারা ঐ সব জিনিস এমনি-এমনি নেয় না। অবশ্য ঐ সব খাবার-দাবার আর লাল কাপড়ের বদলে টাকা-পয়সা তারা দিতে পারে না, কিন্তু অনেকখানি শুয়োর আর হরিণের মাংস ঐ জায়গায় রেখে যায় পুলিশদের জন্য।

প্রীতম সিং-এর দারুণ সাহস। একবার তিনি একা ঐ খাবারের বস্তার মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিলেন একদম ন্যাংটো হয়ে। জারোয়ারা কাছে আসতেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন। তার মানে তিনি আগেই দেখিয়ে দিলেন যে, তাঁর কাছে বন্দুক পিস্তল নেই, আর জারোয়াদের যেমন গায়ে পোশাক নেই, তেমনি তিনিও কোনও জামা-কাপড় পরেননি। জারোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। তাঁকে মারেনি।

তারপর থেকে আস্তে-আস্তে তাঁর সঙ্গে জারোয়াদের ভাব হয়ে যায়। তিনি নিজেই কয়েকবার খাবার নিয়ে গেছেন। এর পরে তিনি জামা-কাপড় পরে গেলেও জারোয়ারা তাঁকে অবিশ্বাস করেনি। এখন অবশ্য তিনি বুড়ো। এখন আর পুলিশের কেউ জারোয়াদের কাছে যেতে সাহস করে না। প্রীতম সিং এই কিছুদিন আগেও জারোয়াদের কাছে একবার গিয়েছিলেন। রঘুবীর সিং নামে একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার যখন এখানে ছবি তুলতে আসেন, তখন প্রীতম সিং-ই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন জারোয়াদের দ্বীপে। প্রীতম সিং সঙ্গে ছিলেন বলেই জারোয়ারা সেই ফটোগ্রাফারকে মারেনি।

একটু বাদেই প্রীতম সিং সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। দাড়ি, গোঁফ, চুল সব সাদা। কিন্তু এখনও খাঁকি প্যাণ্ট সার্ট পরতে ভালবাসেন। সব ঘটনা শুনে তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "খুবই চিন্তার কথা। ঐ সাহেবকে বাঁচানো খুবই শক্ত। যদি না এতক্ষণে মরে গিয়ে থাকেন!"

দাশগুপ্ত বলল, "ওঁর কাছে তো রিভলভার আছে। চট্ করে মারতে পারবে না।"

প্রীতম সিং বললেন, "আপনি জানেন না। জারোয়ারা একদম মরতে ভয় পায় না। একজনকে মারলে অমনি আর একজন এগিয়ে আসে। ওরা যদি চারদিক থেকে তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে আসে, তাহলে উনি একা রিভলভার দিয়েই বা কী করবেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "তবু এক্ষুনি আমাদের যাওয়া দরকার। একবার চেষ্টা করা উচিত অন্তত।"

প্রীতম সিং বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হবেন না। বাঙালি ভদ্রলোক যদি এখনও সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একবার ঢুকে পড়লে আর উপায় নেই। জারোয়াদের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল বটে, কিন্তু খাতির হয়নি। ওরা খুব কম কথা বলে। ওদের ভাষাতেই মোট তিরিশ-চল্লিশটার বেশি শব্দ নেই। ওরা আমাকে মাটিতে দাগ কেটে দেখিয়ে বলেছিল, আমি যেন তার ওপাশে কক্ষনো না যাই! বনের ভেতরে আমাকে কোনওদিন যেতে দেয়নি। আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে একজন এমন-কেউ আছে, যার খুব বুদ্ধি, তার কথাই ওরা মেনে চলে। একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে ওরা সেদিন তার উত্তর না দিয়ে পরের বার দিত। আমি অনুরোধ করেছিলাম, একবার ওদের সারা দ্বীপটা ঘুরে দেখার জন্য। ঐ দ্বীপের ভেতরে তো সভ্য মানুষ কেউ যায়নি, ওখানে কী আছে, কেউ জানে না। কিন্তু পরের দিন এসে বলেছিল, না, যাওয়া চলবে না। সেদিনই মাটিতে দাগ কেটে সীমা টেনে দেয়।"

দাশগুপ্ত বলল, "আমার সঙ্গে পুলিশ নিয়ে যাব। আপনি শুধু ওদের বুঝিয়ে

বলবেন যে, আমরা ওদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসিনি।"

"আমার সে-কথা ওরা শুনবে না! এ রকম চেষ্টা কি আগে হয়নি? অনেকবার হয়েছে। কোনও লাভ হয়নি। একবার কী হয়েছিল শুনবেন?"

প্রীতম সিং এস পি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্যার, আপনি তখন এখানে আসেননি। সে-সময় এস পি ছিলেন মিঃ ভার্মা। তাঁর কথামতন পুলিশরা ফাঁদ পেতে তিনজন জারোয়াকে ধরে ফেলে। জ্যান্ত অবস্থায়। তারপর তাদের হাত পা শিকলে বেঁধে নিয়ে আসা হল। পোর্ট ব্লেয়ারে এনে তাদের শিকল খুলে দিয়ে খুব আদর-যত্ন করা হল। খাওয়ানো হল ভাল-ভাল খাবার। হেলিকপটারে চাপিয়ে তাদের দ্বীপ আর অন্যসব দ্বীপ দেখিয়ে আনা হল। অর্থাৎ তাদের বোঝানো হল যে, আমরা তাদের শত্রু নই, আমরা তাদের মারতে চাই না—তাদের দ্বীপটাই শুধু পৃথিবী নয়—বাইরে আরও কত জায়গা আছে, কতরকম মানুষ আছে। তিনদিন বাদে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসা হল তাদের দ্বীপে—যাতে তারা গিয়ে অন্যদের বলতে পারে যে, সভ্য লোকরা তাদের মারেনি, বরং আদর করেছে। এরপর কী হল বলতে পারেন?"

এস পি সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি ঘটনাটা। পরদিন দেখা গেল সেই তিনজন জারোয়ার মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসছে।"

প্রীতম সিং বললেন, "অন্য জারোয়ারা তাদের মেরে ফেলেছে। তারা মনে করে, সভ্য লোকদের ছোঁয়া লেগে ঐ তিনজন অপবিত্র হয়ে গেছে। তাহলেই বুঝুন, ওরা কতটা ঘেন্না করে আমাদের।"

দাশগুপ্ত বলল, "তবে কি আমরা কিছুই করব না! এখানে চুপ করে বসে থাকব?"

এস পি বললেন, "উনি একটা বয়স্ক লোক। নিজে যদি ইচ্ছে করে সেখানে যেতে চান, তাহলে নিজেই তার ঠ্যালা বুঝবেন! আমাদের কী করার আছে?"

"তা বলে আমরা লোকটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না? আমার কাছে দিল্লি থেকে অর্ডার এসেছে, ওঁকে সবরকমভাবে সাহায্য করার। স্যার, এক্ষুনি চলুন পুলিশ ফোর্স নিয়ে।"

এস পি সাহেব বললেন, "তারপর জারোয়ারা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়বে, সেগুলো কি আমরা খেয়ে হজম করে ফেলব?"

প্রীতম সিং বললেন, "বনের মধ্যে ওরা কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। তাহলে লড়াই লেগে যাবে।"

দাশগুপ্ত বলল, "দরকার হলে আমাদের গুলি চালাতে হবেই, উপায় কী?"

এস পি সাহেব বললেন, "আমরা শুধু-শুধু ওদের মারব? কেন, ঐ ভদ্রলোককে কে ওখানে যেতে বলেছিল? সারা পৃথিবীতে রটে যাবে যে, আমরা আমাদের আদিবাসীদের গুলি করে মারি।"

প্রীতম সিং মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "বাঙালি ছাড়া এমন উদ্ভট শখ

আর কারুর হয় না। জারোয়াদের গুলি করে মারা আমিও সমর্থন করি না।"

দাশগুপ্ত এস পি সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "স্যার, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে!"

এস পি সাহেব বললেন, "আমাকে তাহলে দিল্লিতে হোম সেক্রেটারির কাছে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। গভর্নমেণ্টের হুকুম ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।"

"কিন্তু স্যার, দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত একদিন লেগে যাবে।"

এস পি সাহেব বললেন, "একদিন অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

দাশগুপ্ত প্রায় কান্না-কান্না গলায় বলল, "ওঁর সঙ্গে সেই ছোট ছেলেটিও আছে। হায়, হায়, এতক্ষণে ওদের কী হয়েছে, কি জানি!"

॥ ৮ ॥

এদিকে সন্তু জলে লাফিয়ে পড়ার পরই ভাবল, তাকে কুমিরে ধরবে। সে ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু সাঁতার কাটতে হল না। সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ তাকে পাড়ে এনে পৌঁছে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠেই চলে এল একটা গাছের আড়ালে।

আর-একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর চাপা গলায় বললেন, "তুমি বোকার মতন জলে লাফিয়ে পড়লে কেন? তোমাকে পোর্ট ব্লেয়ারে চলে যেতে বললুম না?"

সন্তু বলল, "তুমি কেন এলে?"

"আমি এসেছি, বেশ করেছি। আমি বুড়ো মানুষ, কোনও একটা বড় কাজের জন্য যদি আমি মরেও যাই, তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মাকে আমি বলে এসেছি তোমার কোনও বিপদ হবে না।"

"মা আমাকে বলে দিয়েছিলেন, সব সময় তোমার কাছাকাছি থাকতে!"

"আঃ! তুমি এমন গণ্ডগোল বাধালে! যাক গে, তুমি আমার পেছনে এসে দাঁড়াও! একটুও নড়বে না। কোনও শব্দ করবে না!"

দু'জনে খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। বোধহয় জারোয়ারা এখনও তাদের আসার ব্যাপারটা টের পায়নি। সামনে থেকেই শুরু হয়ে গেছে ঘন জঙ্গল। ফাঁক নেই একটুও। এত ঘন জঙ্গলের মধ্যে গায়ে তীর লাগবার খুব ভয় নেই। একটু দূর থেকে তীর ছুঁড়লে কোনও না কোনও গাছে আটকে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা বুঝতে পারল কাছাকাছি কোনও জারোয়া নেই। তখন পা টিপে-টিপে ওরা জঙ্গলের মধ্যে এগোতে লাগল।

পায়ের তলার মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। গাছ থেকে খসে পড়া অসংখ্য পাতা পচে নরম হয়ে আছে। এখানে যখন-তখন বৃষ্টি হয়।

কাকাবাবু ভাবছেন, সমুদ্রের ধার থেকে যত দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। এতবড় জঙ্গলের মধ্যে জারোয়ারা তাঁদের চট্ করে খুঁজে পাবে না। জঙ্গলের মধ্যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার।

কাকাবাবুর ক্রাচটা হঠাৎ এক জায়গায় নরম মাটিতে গেঁথে গেল। তিনি সেটা টেনে তুলতে গিয়ে তাল সামলাতে পারলেন না, পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সন্তু তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরল। তারপর সে নিজেই ক্রাচটা উপড়ে তুলল কাদা থেকে।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে সব জায়গায় চলাফেরা করতে পারেন না। এই রকম জঙ্গলের মধ্যে তো আরও অসুবিধে। তবু তিনি সন্তুর ওপর রাগারাগি করছিলেন। ভাগ্যিস সন্তু জোর করে চলে এসেছে!

কাকাবাবু একটা গাছে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। সন্তু একটুখানি এগিয়ে দেখতে গেল। সব সময় গা-টা শিরশির করছে। দাশগুপ্ত বলেছিল, এখানকার জঙ্গল এত গভীর হলেও বাঘ-সিংহের কোনও ভয় নেই। সবচেয়ে বেশি ভয় মানুষের! সন্তুর খালি মনে হচ্ছে, কাছেই কারা যেন লুকিয়ে থেকে তাকে দেখছে। যে-কোনও মুহূর্তে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সন্তু ওপরের দিকে মুখ তুলে দেখতে লাগল, কোনও গাছের ওপর কেউ বসে আছে কি না। অবশ্য এখানকার গাছে ওঠা সহজ নয়। প্রায় সব কটা গাছই বিরাট-বিরাট লম্বা। প্রথম দিকে অনেকখানি উঠে গেছে সোজা হয়ে, কোনও ডালপালা নেই, মাথার কাছটা প্রকাণ্ড ছাতার মতন। এক-একটা গাছের বয়েস বোধহয় দু'শো তিনশো বছর। গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে।

হঠাৎ দূরে একটা ছরছর শব্দ হল। ভয়ে কেঁপে উঠল সন্তু। কারা যেন ঝোপঝাড় ভেঙে দৌড়ে আসছে। এইবার তাহলে আসছে জারোয়ারা। আর উপায় নেই। সন্তুও ছুটে গিয়ে দাঁড়াল কাকাবাবুর পাশে। কাকাবাবুও আওয়াজটা শুনেছেন। তিনি সন্তুকে ধরে এনে দাঁড়ালেন দুটো বড় গাছের ফাঁকে। হাতে রিভলভার।

একটু বাদেই ওদের খানিকটা দূর দিয়ে ছুটে গেল দুটো হরিণ। তারপর আরও তিনটে। শেষ হরিণটি ওদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে আরও জোরে দৌড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, একটুও নড়বি না। হরিণগুলোকে তাড়া করে পেছনে মানুষ আসতে পারে।"

কিন্তু কোনও মানুষ এল না। হরিণগুলো এমনিই দৌড়চ্ছে। সন্তু বোধহয় ইচ্ছে করলে একটাকে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন সে সময় নয়।

কাকাবাবু বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমাদের চেষ্টা

করতে হবে জারোয়াদের চোখ এড়িয়ে যাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসা যায়। তারপর কাল সকালেই দাশগুপ্ত পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে, তখন আমরা চলে যাব। চলো এগোই!"

চারদিক দেখতে দেখতে খুব সাবধানে ওরা এগোতে লাগল। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। খানিকটা দূরে একটা খুব আস্তে শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় জলের শব্দ। নিশ্চয়ই ওখানে কোনও ঝর্না আছে। সন্তুর মনে পড়ে গেল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তার গায়ের সমস্ত জামা-প্যান্ট ভিজে। জুতোটাও ভিজে থপ থপ করছে। কিন্তু তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

কাকাবাবু সেই জলের শব্দটা লক্ষ করেই এগুতে লাগলেন। হঠাৎ সন্তু কিসে একটা হোঁচট খেল।

নিচু হয়ে দেখল, একটা মানুষ। প্রকাণ্ড লম্বা একটা লোক, গায়ে কোনও জামা-কাপড় নেই। লোকটা মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ দুটো খোলা।

সন্তু ভয়ে আঁ করে শব্দ করতে গিয়ে নিজেই মুখে হাত চাপা দিল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল?"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না। ভয়ে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কাকাবাবুও এবার লোকটাকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরলেন সেদিকে।

লোকটি কিন্তু একটুও নড়ল-চড়ল না, কোনও কথাও বলল না। শুধু খোলা দু' চোখে যেন কটমট করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

কাকাবাবু ঝুঁকে লোকটির গায়ে হাত দিয়েই বললেন, "এ তো মরে গেছে দেখছি!"

কাকাবাবু এবার লোকটির পাশে বসে পড়লেন। লোকটির গায়ে কোনও দাগ নেই, কোনও ক্ষত নেই, তাহলে মরল কী করে? লোকটার মাথার চুল নিগ্রোদের মতন, কুচকুচে কালো রঙ, হাত দুটো বেশ লম্বা, আর বুকখানা যেন মনে হয় পাথরের। এমন একটা জোয়ান লোক এমনি-এমনি মরে গেল?

কাকাবাবু লোকটাকে উল্টে দিলেন। তখন দেখা গেল, তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি রক্ত জমে আছে। সেখানে একটা গর্তের মতন।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "গুলি! এর ঘাড়ের মধ্যে গুলি ঢুকে গেছে। সর্বনাশ!"

সন্তু এত কাছ থেকে কোনওদিন কোনও মরা মানুষ দেখেনি। সে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটাও কথা বলতে পারছে না।

কাকাবাবু বললেন, "একে গুলি করে মেরেছে। তার মানে সেই সাহেবগুলোও এই দ্বীপে নেমেছে। আমি বলেছিলাম না? ওরা আমাদের আগে এসে পৌঁছে গেছে। সন্তু, আমাকে টেনে তোল্!"

কাকাবাবুর একটা পা কাটা বলে উনি একবার বসে পড়লে চট্ করে নিজে

থেকে উঠতে পারেন না। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, সন্তু সেই হাত ধরে টেনে তুলল তাঁকে।

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের আবার চট করে লুকিয়ে পড়তে হবে। এখন আমাদের দু' দিক থেকে বিপদ। জারোয়ারা দেখলে মারবে, আর সাহেবগুলো দেখলেও আমাদের ছেড়ে দেবে না!"

দু'জনেই একটা ঝোপের আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, শুধু দূরের একটা ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া। তবু মনে হচ্ছে যেন খুব কাছাকাছি কেউ দাঁড়িয়ে ওদের লক্ষ করছে। সব দিকে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যায় না। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

সন্তুর গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। জলতেষ্টায় মনে হচ্ছে যেন বুকটা ফেটে যাবে। ঘাড়ের কাছে অনবরত কটা মশা কামড়াচ্ছে। একবার সে চটাস করে মশা মারল।

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু! শব্দ করো না।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আমি জল খাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আমারও জলতেষ্টা পেয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেও তো কিছু লাভ নেই। চলো, আমরা আস্তে আস্তে ঝর্নাটার দিকে এগোই!"

অন্ধকারে কোথায় পা পড়ছে, তা বোঝবার উপায় নেই। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখে নিতে হচ্ছে সামনে কোনও বড় গাছ আছে কি না। তাও গাছে মাথা ঠুকে গেল কয়েকবার। কাকাবাবুর ক্রাচটা প্রায়ই জড়িয়ে যাচ্ছে বুনো লতায়, সেগুলো টেনে-টেনে ছিঁড়তে হচ্ছে।

বেশ খানিকটা যাবার পর ঝর্নাটা চোখে পড়ল। এখানে গাছপালা কিছু কম বলে চাঁদের আলো এসে জলে পড়েছে, তাই অন্ধকার এখানে পাতলা। ঝর্নাটা বেশ চওড়া, জলে স্রোত আছে।

এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে বিচ্ছিরি লাগছিল, তাই সন্তু দৌড়ে চলে গেল ঝর্নাটার কাছে। ঝর্নার ধারে বালি ছড়ানো, বেশ ঝকঝকে, পরিষ্কার। সন্তু জলের মধ্যে এক পা দিয়েই আবার উঠে এল তাড়াতাড়ি। এত জোর স্রোত যে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সে উবু হয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল খানিকটা। জলটা ঠাণ্ডা নয়, একটু-একটু গরম, আর স্বাদটাও কষা-কষা। তবু পেট ভরে জল খেয়ে নিল সন্তু। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। এতক্ষণ খিদের কথা মনেই পড়েনি।

কাকাবাবু ঝর্নার ধারে বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। জলের মধ্যে গিয়ে পড়ার আগেই সন্তু তাঁর পিঠের জামা টেনে ধরল। তাতে কাকাবাবু নিজেকে সামলে নিতে পারলেন বটে, কিন্তু একটা সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটে গেল। হুমড়ি খাবার সময় কাকাবাবুর ডান হাতের ক্রাচটা হাত থেকে ছিটকে

দিয়ে পড়ল জলে, আর অমনি স্রোতে সেটা ভেসে গেল। সন্তু ঝর্নার ধার দিয়ে খানিকটা দৌড়ে গেল তবু সেটাকে ধরতে পারল না, একটু পরেই একটা মস্ত বড় পাথর, সেটা ডিঙনো যায় না। ডান পাশ দিয়ে ঘুরে যখন আবার ঝর্নাটার কাছে এল, তখন ক্রাচটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সন্তু ফিরে আসতেই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পেলি না?"

"না।"

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, "যাঃ, কী হবে এখন?"

ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবু এক পাও চলতে পারেন না। বাঁ হাতেরটা রয়েছে বটে, কিন্তু একটা নিয়ে হাঁটতে গেলে একটু বাদেই বগলে দারুণ ব্যথা হয়ে যায়। এমনিতেই বিপদে পড়লে কাকাবাবু দৌড়তে পারেন না, এরপর যদি হাঁটতেও না পারেন, তাহলে কী হবে?

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আঁজলা ভরে খানিকটা জল নিয়ে এলেন মুখের কাছে। প্রথমে একটু জিভ ঠেকিয়ে স্বাদ নিলেন, তারপর বললেন, "এটা একটা হট ওয়াটার স্প্রিং। কাছাকাছি কোনও জায়গায় পাহাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। জলে অনেকটা গন্ধক আর লোহা মেশানো আছে। তাতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হবে না, এ-জল খাওয়া যায়।"

সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। তারপর সন্তুর কাঁধে ভর দিয়েই এগোতে লাগলেন ঝর্নার ধার দিয়ে। একটু পরে বললেন, "কোনও গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি বানিয়ে নিতে হবে অন্তত।"

সন্তু বলল, "আমি এক্ষুনি বানিয়ে দিচ্ছি।"

কাছেই একটা গাছের ডাল ধরে সে টান মারল। সেটা কিন্তু ভাঙল না। দারুণ শক্ত। সন্তু ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। সেটা নুয়ে পড়ছে, কিন্তু ভাঙছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু বললেন, "ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। এখানকার বেশির ভাগ গাছই প্যাডোক কিংবা সিলভার উড, খুব ভাল কাঠ হয়।"

সন্তুর পকেটে একটা ছোট্ট ছুরি আছে। তাতে বেশি মোটা ডাল কাটা যাবে না। তবু সে চেষ্টা করতে গেল, সেই সময় শুনতে পেল একটা অদ্ভুত শব্দ। কেউ যেন খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এলে যে-রকম নিশ্বাস পড়ে।

দু'জনেই কান খাড়া করে শুনল আওয়াজটা। এক-একবার থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। খুব কাছেই। শব্দটা লক্ষ করে এগিয়ে যেতেই দেখল একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে। তার দেহটা ঝোপঝাড়ের মধ্যে, আর মুখটা বেরিয়ে আছে বাইরে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঝর্নাটার দিকে আর ঐ রকম নিশ্বাস ফেলছে।

এর চেহারাও আগের লোকটার মতন, কিন্তু জ্যোৎস্নার আলোয় বোঝা যায়,

এর সারা গায়ে রক্ত মাখা।

কাকাবাবু বললেন, 'এর গায়েও গুলি লেগেছে। কিন্তু লোকটা এখনও বেঁচে আছে।"

ওরা গিয়ে লোকটার কাছে দাঁড়াল। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ওদের দিকে, সেই দৃষ্টিতে দারুণ ঘৃণা।

কাকাবাবু বললেন, "আহা রে, লোকটা গড়িয়ে গড়িয়ে এতটা এসেছে জল খাবার জন্য। আর এগোতে পারেনি। সন্তু, ওকে একটু জল এনে দাও তো!"

সন্তু আঁজলা করে খানিকটা জল নিয়ে এসে লোকটার মুখের ওপর ঢেলে দিল। লোকটা হাঁ করে আছে। যে-টুকু জল মুখের বাইরে পড়েছে, তা জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে। সন্তু তিন-চারবার ওকে জল এনে এনে দিল। কাকাবাবু ততক্ষণে লোকটার পাশে বসে পড়েছেন।

লোকটার পেটে আর কাঁধে আর পায়ে তিনটে গুলি লেগেছে। এর মধ্যে পেটের জখমটাই সাঙ্ঘাতিক।

কাকাবাবু বললেন, "এখনও চেষ্টা করলে লোকটাকে বাঁচানো যায়।"

তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করে তুলোর মতন পেটের ক্ষতটাতে গুঁজে দিলেন। তারপর দু' পায়ের মোজা খুলে ফেলে সেগুলো ছিঁড়ে গিঁট বেঁধে ব্যাণ্ডেজ বানাতে লাগলেন।

সন্তু পাশে বসে আছে। হঠাৎ লোকটা একটা হাত তুলে সন্তুর গলা টিপে ধরল। সন্তু কিছু বোঝবার আগেই আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতন বসে গেল তার গলায়। লোকটার শরীর থেকে কতখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে, তবু তার গায়ে অসম্ভব জোর। সন্তু দু' হাত দিয়ে টেনেও লোকটার হাত ছাড়াতে পারছে না। তার দম আটকে আসছে, সে এবার মরে যাবে! সে কোনও শব্দ করতে পারছে না। কাকাবাবু অন্যদিকে ফিরে এক মনে মোজা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানাচ্ছেন, তিনি কিছু টেরও পেলেন না।

প্রাণপণ চেষ্টায় সন্তু একবার শব্দ করে উঠল, আঁ আঁ—

কাকাবাবু পেছন ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারলেন লোকটার হাতে। লোকটা হাত ছেড়ে দিল, সন্তু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা তখন মুখখানা উঁচু করে কাকাবাবুর একটা হাত কামড়ে ধরল। কাকাবাবু সব কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'উঃ' করে! তারপর অন্য হাত দিয়ে রিভলভারের বাঁটটা ঠুকে দিলেন লোকটার মাথায়। লোকটার কামড় আলগা হয়ে গেল, ঘাড় কাত করে চোখ বুজল।

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্না থেকে জল এনে এনে ঝাপটা দিতে লাগলেন সন্তুর চোখ-মুখে। আর ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন, 'সন্তু, সন্তু!'

একটু বাদে সন্তু চোখ মেলল। তাড়তাড়ি উঠে বসতে যেতেই কাকাবাবু

বললেন, "থাক্ থাক্ উঠতে হবে না। একটু শুয়ে থাক। একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু আবার হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন সেই লোকটির মুখে। সে কিন্তু আর চোখ খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, "লোকটা মরেই গেল নাকি? আমি ওকে মেরে ফেললাম?"

তিনি লোকটার নাকের কাছে হাত নিয়ে বললেন, "না, এখনও নিশ্বাস পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। থাক্।"

এবার তিনি লোকটার ক্ষত জায়গাগুলো মুছে দিলেন। কিছু লতাপাতা ছিঁড়ে রস লাগিয়ে দিলেন সেখানে। তাঁর মোজার ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিলেন পেটে। তারপর বললেন, "পেট থেকে যদি রক্ত পড়া বন্ধ হয়, তাহলে বেঁচেও যেতে পারে।"

সন্তু ততক্ষণে উঠে বসেছে। এখনও তার মাথা ঝিম-ঝিম করছে। সে ভেবেছিল সে মরেই যাবে। গলাটা ফুলে গেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন লাগছে? কষ্ট হচ্ছে?"

সন্তু বলল, "না।"

"বাবাঃ, কী সাঙ্ঘাতিক!"

সন্তু খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, "আমি ওকে জল খাওয়ালাম, তবু ও আমাকে মারতে চাইল কেন? আমরা তো ওকে বাঁচাবারই চেষ্টা করছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না। বাইরের যে-কোনও লোকই ওদের কাছে শত্রু।"

"আমার আর এখানে একটুও থাকতে ভাল লাগছে না।"

"কাল সকালেই আমরা চলে যাব। পুলিশের বোট আসবে।"

"যদি না আসে?"

"আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। ওরা কি আমাদের ভুলে যেতে পারে? আমরা রাত্তিরটাতে সারা দ্বীপটা একবার ঘুরে দেখে আসব। রাত্তিরেই সুবিধে। তারপর ভোরবেলা আমরা সমুদ্রের ধারে লুকিয়ে বসে থাকব। লঞ্চ এলেই উঠে পড়ব চট্ করে!"

এত রকম বিপদের পরও কাকাবাবু দ্বীপটা ঘুরে দেখতে চান। ওঁর উৎসাহ কিছুতেই কমে না। ভয়ডর একটুও নেই। একটা ক্রাচ নেই, নিজে হাঁটতে পারছেন না, তবু এখনও হেঁটে বেড়াবেন।

সন্তু বলল, "আমরা এখনি সমুদ্রের ধারে চলে যাই না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ গোটা দ্বীপটা না-দেখেই চলে যাব? তাহলে এলাম কেন? সবটা না-দেখে ফিরব না!"

আবার তিনি সন্তুর কাঁধ ধরে হাঁটতে লাগলেন। ঝর্নার পাশ দিয়ে-দিয়েই।

কারণ বালির ওপরটা বেশ পরিষ্কার। পায়ে লতাপাতা আটকে যায় না। জ্যোৎস্নায় সামনেটাও দেখা যায়।

তবু বেশি দূর আর এগোনো হল না। খানিকটা বাদে হঠাৎ দেখা গেল, বনের মধ্যে এক জায়গায় জ্বলে উঠল একটা টর্চের আলো।

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়লেন মাটিতে। গড়াতে-গড়াতে ঝর্নার ধার থেকে সরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন একটা ঝোপের মধ্যে। সন্তুও চলে এল কাকাবাবুর পাশে-পাশে।

অমনি গুড়ুম-গুড়ুম করে দুটো গুলির শব্দ হল।

সেই গুলির শব্দ যেন প্রতিধ্বনি তুলল জঙ্গলের মধ্যে। যেন দূরে কোনও পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে শব্দগুলো ফিরে আসছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও আওয়াজ নেই। সন্তু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে, কিন্তু তার বুকের মধ্যে টিপটিপ শব্দ হচ্ছে, যেন সেটাই বাইরের লোক শুনে ফেলবে।

একটু বাদে শোনা গেল পায়ের শব্দ। একসঙ্গে অনেক লোকের। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, যারা হাঁটছে, তাদের খালি পা নয়, তারা জুতো পরে আছে। লোকগুলো আসছে এদিকেই। মাঝে-মাঝে টর্চের আলো জ্বলেই নিভে যাচ্ছে। তারপর প্রায় সাত-আটজন লোক এসে দাঁড়াল ঝর্নাটার ধারে। এরা সবাই সাহেব। না, সবাই নয়, একজনকে মনে হয় পাঞ্জাবী শিখ। তারা টর্চ ঘুরিয়ে চার পাশটা দেখতে লাগল।

একজন ইংরিজিতে বলল, "নিশ্চয়ই এখানে একটু আগে কেউ ছিল। আমি গলার আওয়াজ শুনেছি।"

আর-একজন বলল, "এই দ্যাখো, বালিতে পায়ের ছাপ।"

আবার তারা টর্চের আলো ফেলল ঝর্নার দু' দিকে।

কাকাবাবু আর সন্তু যদিও একটা বেশ ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে, কিন্তু সেটা ঝর্না থেকে খুব দূরে নয়। ঐ সাহেবরা একটু ভাল করে খুঁজলেই সন্তুরা ধরা পড়ে যাবে। কাকাবাবু একহাতে রিভলভারটা তাক করে ধরে, অন্য হাতটা তার ওপর চাপা দিয়ে রেখেছেন।

সাহেবদের মধ্যে দু'জনের হাতে রাইফেল, বাকিদের হাতে রিভলভার। আর পাঞ্জাবীর মতন চেহারার লোকটির হাতে টর্চ।

সন্তু টের পেল তার পায়ের কাছে কী যেন একটা নড়ছে। একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস তার গায় লাগছে। সাপ নাকি ? কাকাবাবু যদিও বলেছিলেন যে, এখানকার সাপের বিষ নেই, কিন্তু সে-কথা সন্তুর তখন মনে পড়ল না। সে তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিল। এবার পা-টা পড়ল বেশ বড় একটা ঠাণ্ডা জ্যান্ত জিনিসের ওপর। দারুণ ভয় পেয়েও সন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করল না বটে, কিন্তু পা-টা আবার সরিয়ে নিতেই শুকনো পাতায় খচমচ শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চের আলোটা ঘুরে গেল এদিকে।

কিন্তু সন্তুরা ধরা পড়ার আগেই একটা সাহেব 'ওয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর একজন উত্তেজিতভাবে বলল, "ওরা আবার তীর ছুঁড়ছে। টর্চটা শিগগির নেভাও, বোকা!"

তারপরই একসঙ্গে ছ'টা বন্দুক পিস্তল গর্জে উঠল। সন্তুরা বুঝতে পারল, তাদের পিছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসছে। কয়েকটা তীর গাছের ডালে লেগে আটকে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। জারোয়াদের সঙ্গে সাহেবদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সন্তুরা পড়ে গেছে মাঝখানে। যে-কোনও দিক থেকে গুলি কিংবা তীর এসে লাগতে পারে ওদের গায়ে। কিন্তু এখন কিছুই করার উপায় নেই।

সাহেবরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, তারা এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছে আর গুলি চালাচ্ছে। জারোয়ারা যাতে তাদের ওপর টিপ না করতে পারে। এর মধ্যে এত গোলাগুলির শব্দ শুনে ভয় পেয়ে কোথা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক পাল বুনো শুয়োর। তারা জীবনে কখনও এরকম শব্দ শোনেনি—একসঙ্গে হুড়মুড় করে ছুটে গেল ঝর্নার ধার দিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা।

যুদ্ধ থেমে গেল মিনিট দশেকের মধ্যেই। জারোয়ারা তীর ছোঁড়া বন্ধ করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

একজন সাহেব বলল, "লেট্‌স মুভ!"

আর একজন সাহেব বলল, "আমার গায়ে তীর লেগেছে। শিগগির তুলে দাও। ইঞ্জেকশন , ইঞ্জেকশন কার কাছে?"

তারপর কিছুক্ষণ ফিসফাস। একটা কাচ ভাঙার শব্দ হল। একটু পরে বোঝা গেল, ওরা চলে যাচ্ছে।

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর কাকাবাবু উঠে বসলেন। সন্তু উঠে প্রথমেই দেখল, তার পায়ের কাছের জিনিসটা কী। না, সাপ নয়, একটা মস্ত বড় ব্যাঙ, প্রায় আধ কিলো ওজন হবে। সন্তু জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সেটাকে দূরে সরিয়ে দিল।

কাকাবাবু কোট থেকে মাটি আর শুকনো ডালপাতা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "আমরা দু'জন সাহেবকে পালাতে দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে এরা ছ'জন। তার মানে আগে থেকে কয়েকজন এসে অন্য দ্বীপে লুকিয়ে ছিল। আশ্চর্য জাত!"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আস্তে কথা বলো, জারোয়ারা যদি কাছেই থাকে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সে সম্ভাবনা নেই। জারোয়ারা পালিয়েছে। তারা ভয় পেয়েছে। এরকম জিনিস কখনও তারা দেখেনি।"

"কী? বন্দুক? আগে বন্দুক দেখেনি?"

"না, বন্দুক নয়। আমি যতদূর শুনেছি, জারোয়ারা গুলি বন্দুককে ভয় পায় না। তারা মরতেও ভয় পায় না। কিন্তু এরকম ব্যাপার ওরা কখনও দেখেনি

আগে।”

“কোন্ ব্যাপার ?”

“তুইও বুঝতে পারলি না। একজন সাহেব যে ইঞ্জেকশন ইঞ্জেকশন বলে চ্যাঁচাল, সেটা শুনিসনি ?”

“হ্যাঁ, শুনেছি।”

“এবার সাহেবরা আটঘাট বেঁধে এসেছে। সাহেবের জাত তো, কোনও ত্রুটি রাখে না। সবাই জারোয়াদের বিষাক্ত তীরকে ভয় পায়। ঐ তীর গায়ে বিঁধলে মানুষ মরে যায়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, বিষেরও ওষুধ আছে। এমন কী, সাপের বিষও সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়ে নষ্ট করা যায়। ঐ সাহেবরা সেই ওষুধ নিয়ে এসেছে। কারুর গায়ে তীর লাগলেই ওষুধের ইঞ্জেকশন নিয়ে নিচ্ছে একটা করে। তীর খেয়েও কোনও সাহেব মরছে না, এই দেখে ভয় পেয়ে গেছে জারোয়ারা। এবার ওরা হারবেই।”

কাকাবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ঝর্নার কাছে এগিয়ে গেলেন। এদিক-ওদিক হাতড়িয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলেন একটা তীর। খুব সাবধানে তীরটার পেছনটা ধরে সেটাকে খুব সাবধানে ধুয়ে নিলেন জলে। তারপর সেটা তুলে বললেন, “এই দ্যাখ্। এমনিতে এটা এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র নয়।”

সন্তু দেখল, তীরটা সত্যিই অন্যরকম। অনেকটা খেলবার তীরের মতন। তীরের ডগায় যে লোহার ফলক থাকবার কথা, এতে তা নেই। তীরটা বাঁশের, মুখটা খুব ছুঁচলো। তীরের পেছন দিকটায় পালকও লাগানো নেই।

কাকাবাবু বললেন, “যদি বিষ না থাকে, তাহলে এরকম তীর আট-দশটাও যদি কারুর গায়ে বেঁধে, তাহলেও এমন-কিছু লাগবে না। বিষের জন্য সাহেবরা ইঞ্জেকশন নিয়ে নিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে কী আর এমন বিষ পাওয়া যাবে ? খুব সম্ভব জারোয়ারা স্ট্রিকনিন ধরনের বিষ ব্যবহার করে। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যান্টিডোট নিলে সে-বিষ কোনও ক্ষতিই করতে পারে না। সাহেবরা বুদ্ধি করে সেই ওষুধ সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আমাদেরও আনা উচিত ছিল।”

কাকাবাবু সেই তীরটা নিজের ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ঐ ছ'-সাতটি সাহেব মিলে পাঁচ-ছশো জারোয়াকে মেরে ফেলতে পারে। আমাদের উচিত এক্ষুনি পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে গিয়ে পুলিশকে এই খবর জানানো !”

কিন্তু পোর্ট ব্লেয়ারে ফেরা হবে কী করে ? সন্তু সেই কথাই ভাবল। এই অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে সমুদ্রের দিকের রাস্তা খুঁজে পাওয়াই প্রায় অসম্ভব। সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছলেই বা কী লাভ ? লঞ্চ কিংবা মোটরবোট কোথায় পাওয়া যাবে ? দাশগুপ্তরা তো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। কাল যদি দাশগুপ্ত পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে—

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনেই বললেন, "সাহেবরা এত আটঘাট বেঁধে এখানে এসেছে কেন ? নিশ্চয়ই এখানে সাঙ্ঘাতিক কোনও দামি জিনিস আছে। এর আগে-আগে এসেছে বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এদের বৈজ্ঞানিক বলে মনে হয় না, কোনও বৈজ্ঞানিক গুলি করে মানুষ মারে না। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত-টাকাত হবে।"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন, "সন্তু, তোকে একটা কাজ করতে হবে। এর জন্য খুব সাহসের দরকার। ভয় পেলে একদম চলবে না। তুই সমুদ্রের ধারে চলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাক। এখন জারোয়ারা সমুদ্রের ধারে পাহারা দেবার সময় পাবে না। তবু তুই খুব সাবধানে থাকবি। দাশগুপ্ত কাল কোনও সময় মোটরবোট নিয়ে আসবেই। তাকে সব বুঝিয়ে বলবি। দরকার হলে পঞ্চাশ-ষাটজন পুলিশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে যেন। ঐ সাহেবগুলোকে আটকাতেই হবে। যে-কোনও উপায়ে হোক। যা, তুই এগিয়ে পড়।"

সন্তু অবাক হয়ে বলল, "আমি একা যাব ?"

"হ্যাঁ।"

"আমি একা কেন যাব ? না, তা হয় না।"

"বেশি কথা বলিস না। তোকে একাই যেতে হবে।"

"তুমি এখানে থাকবে ? তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।"

"সহজে পারবে না। আমি লুকিয়ে থাকব।"

"কাকাবাবু, আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না। মা বলে দিয়েছেন, সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে।"

"সন্তু, অবুঝ হয়ো না। এখানে এখন দু'জনের থাকার কোনও মানে হয় না। তাহলে দু'জনেই মরব। আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি মরে গেলেও কী এমন ক্ষতি আছে ! মানুষ তো এক সময় না এক সময় মরেই ! তবু মরার আগে এই রহস্যটা জেনে যাওয়ার চেষ্টা করব। তোমাকে বাঁচতেই হবে। তাছাড়া, তুমি গিয়ে দাশগুপ্তকে খবর দিলে তারা হয়তো আমাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করতে পারে।"

"কিন্তু তুমি তো একটা ক্রাচ নিয়ে বেশিক্ষণ হাঁটতেই পারবে না।"

"আমি রাত্তিরটা এখানেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকব। সকালবেলা একটা গাছের ডাল জোগাড় করে নেব ঠিকই। আমার অসুবিধে হবে না। সমুদ্রের ধারটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ।"

"কিন্তু আমি অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের ধারে যাব কী করে ? রাস্তা হারিয়ে ফেলব।"

"সমুদ্রের কাছে যাওয়া তো খুব সোজা। এই ঝর্নাটা যখন পাওয়া গেছে। এটার ধার দিয়ে ধার দিয়ে গেলেই হবে। এই ঝর্নাটা নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে

পড়েছে। খুব সাবধানে যাবে কিন্তু।"

সন্তুর বুক ঠেলে কান্না উঠে এল। সে কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে বলল, "কাকাবাবু, আমি যাব না। আমি তোমাকে একা ফেলে কিছুতেই যাব না!"

কাকাবাবু সন্তুর মাথায় হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, "সন্তু, এবার তোমাকে এখানে আনাই ভুল হয়েছে। এতটা বিপদের কথা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখানে আমাদের দু'জনের একসঙ্গে থাকা খুবই বিপজ্জনক। পুলিশকে একটা খবর দেওয়া খুবই দরকার।"

"তুমিও চলো আমার সঙ্গে।"

"আমি গেলে চলবে না। আমি ঐ সাহেবগুলোর ওপর নজর রাখতে চাই।"

"তুমি একা ওদের সঙ্গে কী করবে? যদি ওরা আবার এদিকে এসে পড়ে?"

"আমি লুকিয়ে থাকব, ওরা আমাকে দেখতে পাবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি এখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না।"

"তাহলে শুধু-শুধু কেন একলা বসে থাকবে। না কাকাবাবু, তুমি চলো আমার সঙ্গে। আমি একা কিছুতেই যাব না।"

কাকাবাবু এবার গম্ভীর কড়া গলায় বললেন, "সন্তু, তোমাকে যেতে বলছি, যাও! তুমি জানো না, আমার কথার নড়চড় হয় না? আমি অনেক ভেবেচিন্তেই তোমাকে যেতে বলেছি। আমি এখানেই থাকব। যাও, এক্ষুনি রওনা হও!"

সন্তু আর কথা বলার সাহস পেল না। এক পা এক পা করে চলতে শুরু করল। কয়েকবার পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু একটু বাদেই আর কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। কাকাবাবু ঝোপের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। সন্তুও বড় পাথরটার ওপাশে চলে গেল।

ঝর্নার পাশে বালির ওপর হালকা চাঁদের আলো, তাতে সন্তুর ছায়া পড়েছে। সেই ছায়াটাই তার সঙ্গী। বন এত নিস্তব্ধ যে, এমনিতেই গা ছমছম করে। কোথায় আড়ালে গাছের ওপর জারোয়ারা লুকিয়ে আছে কে জানে। যে-কোনও সময় একটা তীর এসে গায়ে লাগতে পারে।

সন্তু তাড়াতাড়ি ঝর্নার পাড় থেকে সরে জঙ্গলে চলে গেল। ঝর্নার পাশে থাকলে দূর থেকেও তাকে দেখা যাবে। কিন্তু বনের মধ্যে আসার পর ছায়াটাও আর তার সঙ্গী রইল না।

মনের মধ্যে ভীষণ খারাপ লাগছে। কাকাবাবুকে এরকমভাবে ছেড়ে চলে যাওয়া কি ঠিক হল? একলা এই ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে উনি কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবেন? নিজে ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। অথচ কাকাবাবু যে কিছুতেই শুনবেন না অন্য কারুর কথা।

ঝর্নাটা ক্রমশই চওড়া হচ্ছে। এখানে হাঁটাও খুব শক্ত। মাঝে-মাঝেই কাঁটাঝোপ। একটা বড় গাছের গায়ে একবার সন্তু হাত দিতেই তার হাত ছড়ে

গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। গাছের গায়েও কাঁটা। খালি তার ভয় হচ্ছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে না যায়। তাকে সমুদ্রের ধারে পৌঁছতেই হবে।

হঠাৎ একটা আওয়াজে সে দারুণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। শব্দটা এমনই বিকট যে, শরীরের রক্ত প্রায় জল হয়ে যায়। প্রথমে মনে হল, যেন একসঙ্গে দু'-তিনটে পাখি ডেকে উঠল। কিন্তু কোনও পাখি এরকম বিশ্রী সুরে ডাকে? আর এত জোরে? শব্দটা এই রকম : কিলা কিলা কিলা কিলা কিলা কিলা!

সন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু বাদেই সেই রকম আবার কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ উঠল ডান দিক থেকে। আগের শব্দটা এসেছিল বাঁ দিক থেকে। এবার মনে হল, যেন কয়েকজন লোক উলু দিচ্ছে। কিন্তু শব্দটা শুনলেই গা শিউরে ওঠে।

তারপর চারদিক থেকে কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ উঠল। যেন শত শত লোক একসঙ্গে চিৎকার করছে। বনের সব দিক থেকে ঐ শব্দ করতে করতে কারা ছুটে আসছে। এর মধ্যেই দুমদুম করে গুলির শব্দ শুরু হয়ে গেল। তবু ঐ কিলা কিলা থামল না। সন্তু একটা পাথরের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসে রইল। তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে যেন নরকের সব প্রাণীরা জেগে উঠে বন ঘিরে ধরছে।

বন্দুকের গুলির শব্দ কিন্তু একটু বাদেই থেমে গেল, কিন্তু কিলা কিলা শব্দ থামল না। এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ঐ রকম শব্দ করে এক জায়গায় লাফাচ্ছে। তারপর শব্দটা একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগল।

ব্যাপারটা কী হল, তা বোঝার চেষ্টা করল সন্তু। তার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দু'-হাত দিয়ে মুখটা ঘষতে লাগল জোরে জোরে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গুঁড়ি মেরে ঝর্নার পাশে এসে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল অনেকটা। তারপর তার পেট ব্যথা করতে লাগল।

সারাদিন কিছুই খায়নি, পেট খালি। শুধু ঝর্নার জল খাচ্ছে। জলেও কষা-কষা স্বাদ। জলের জন্যই পেট ব্যথা করছে কি না কে জানে।

কিলা কিলা আওয়াজটা এখনও শোনা যাচ্ছে, কিন্তু অনেকটা দূরে চলে গেছে এবার। সন্তুর মনে হল যে, নিশ্চয়ই একসঙ্গে একশো-দুশো জারোয়া এসে সাহেবদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাহেবরা গুলি করেও আটকাতে পারেনি। এবার ওরা সাহেবগুলোকে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে কাকাবাবুর কী হল? ওরা যদি কাকাবাবুকেও ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে? কিংবা যদি কাকাবাবুকে মেরে ফেলে?

সন্তুর ভীষণ ইচ্ছে হল, কাকাবাবুকে আর-একবার দেখে আসে। যদিও কাকাবাবু তাকে হুকুম দিয়েছেন সমুদ্রের কাছে যেতে, কিন্তু সন্তু তক্ষুনি যেতে পারবে না কিছুতেই। সে আবার উল্টো দিকে ফিরল।

এখন আর সন্তু গ্রাহ্যই করছে না কেউ তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কি না। সে বালির ওপর দিয়ে তীরের মতন ছুটতে লাগল। পেটের ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে, সে দু'-হাতে চেপে ধরে রাখল পেট।

সেই ঝোপটার কাছাকাছি এসেই সে ডাকল, "কাকাবাবু কাকাবাবু!"

কোনও উত্তর পেল না।

সন্তু হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে। কাকাবাবু সেখানে নেই। এর মধ্যে তিনি কোথায় গেলেন? কাকাবাবু যে বলেছিলেন, এ-জায়গাটা ছেড়ে যাবেন না? সন্তু এদিক-ওদিক ঘুরে কাকাবাবুর নাম ধরে ডাকতে লাগল। কাকাবাবুর কোনও চিহ্নই নেই। সন্তু চলে এল ঝর্নার পাশে। দূরে কিলা কিলা শব্দ শোনা যাচ্ছে, এখন শব্দটা এক জায়গায় গিয়ে থেমেছে মনে হচ্ছে।

সন্তুর দৃঢ় বিশ্বাস হল জারোয়ারা কাকাবাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে। সে আর কোনও কিছুই চিন্তা করল না, সেই শব্দটা লক্ষ্য করে ছুটল।

অন্ধকারের মধ্যে সন্তু ছুটছে তো ছুটছেই। নদীর ধারে বালির ওপরে মাঝে মাঝে বড়-বড় পাথর আর কাঁটাগাছের ঝোপ, কিন্তু সন্তু কোনও বাধাই মানছে না। কাকাবাবুকে ফেলে রেখে সে যাবে না কিছুতেই। যদি কোনওক্রমে সে এখান থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতেও পারে, তাহলে বাড়িতে মা, বাবা, আর সবাই বলবেন, তুই কাকাবাবুকে দ্বীপে রেখে নিজে চলে এলি? তুই এত কাপুরুষ? না, যদি মরতে হয় তো কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তু নিজেও মরবে।

কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দটা এখনও দূরে শোনা যাচ্ছে। ঐ শব্দটা শুনলেই ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষের গলার আওয়াজ যে এরকম হতে পারে, নিজের কানে না শুনলে সন্তু বিশ্বাস করত না কিছুতেই। যেন মুখের মধ্যে একটা লোহার জিভ নিয়ে কেউ চ্যাঁচাচ্ছে!

সাহেবরা এতগুলি বন্দুক নিয়ে এসেও হেরে গেল জারোয়াদের কাছে। ওরা একসঙ্গে দু'-তিনশো জন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাহেবদের ওপর। এখন বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু কী করে পড়ে গেলেন ওদের মধ্যে? কাকাবাবুর একটা পা নেই, একটা ক্রাচও নদীর জলে ভেসে গেছে, তিনি হাঁটতে পারবেন না। ওরা কি কাকাবাবুকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাচ্ছে? ইস্, কত কষ্ট হচ্ছে তাঁর। কাকাবাবু যদি এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকেন?

সন্তু আরও জোরে দৌড়তে গেল। তার পেটের মধ্যে দারুণ ব্যথা করছে, দম ফুরিয়ে আসছে, তবু সে কিছুতেই থামবে না। কিন্তু একটু পরেই সন্তু একটা বড় পাথরে দারুণ জোরে হোঁচট খেয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল। আর একটা পাথরে তার মাথাটা এমন জোরে ঠুকে গেল যে, সে সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

অজ্ঞান অবস্থায় সন্তু উপুড় হয়ে পড়ে রইল ঝর্নাটার ধারে। সেই অবস্থাতেই তার বমি হতে লাগল। মুখ দিয়ে গল গল করে বমি বেরিয়ে আসছে তো

আসছেই। সন্তুর জামাটামা সব বমিতে মাখামাখি হয়ে গেল। অজ্ঞান অবস্থায় আর মানুষের কোনও ভয় থাকে না। এখন আর সাহেবদের ভয় নেই, জারোয়াদের ভয় নেই। খুব শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ার মতন সন্তুর চোখ দুটো বোজা।

খানিকটা বাদে একপাল হরিণ এল সেই ঝর্নার জল খেতে। এখানকার জঙ্গলে বাঘ সিংহের মতন কোনও হিংস্র প্রাণী নেই বলে হরিণের সংখ্যা খুব বেশি। হরিণগুলো সন্তুকে দেখেও কোনও ভয় পেল না। কয়েকটা হরিণ সন্তুর কাছে এসে তার গায়ের গন্ধ শুঁকল। আবার তারা ফিরে গেল বনের মধ্যে।

তারপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। সন্তু ভিজতে লাগল সেই বৃষ্টিতে। সমস্ত জঙ্গল জুড়ে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে, তার মধ্যে সেই কিলা কিলা শব্দটা আর শোনা যায় না।

এখানকার বৃষ্টি হঠাৎ আসে, হঠাৎ থেমে যায়। এই বৃষ্টিও থেমে গেল একটু বাদে। কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য সন্তুর জ্ঞান ফিরে এল। সে উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। সে কোথায় আছে, কেন শুয়ে আছে—প্রথমে এসব কিছুই তার মনে এল না। একটুক্ষণ বসে রইল ঝিম দিয়ে, তারপর সব মনে পড়ল। সে শিউরে উঠল একেবারে। সে এরকম ফাঁকা জায়গায় শুয়ে ছিল? যে-কোনও জারোয়ার চোখে পড়লে একেবারে শেষ হয়ে যেত। সে তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকিয়ে দেখল। না, কোথাও কেউ নেই। সেই কিলা কিলা শব্দটা এখন একেবারে থেমে গেছে।

বমি হয়ে যাওয়ার জন্য সন্তুর পেটের ব্যথাটা একদম সেরে গেছে। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। শুধু মাথার এক জায়গায় ব্যথা। সেখানে হাত দিয়ে দেখল, চুলের মধ্যে এক জায়গায় চট্‌চট করছে। রক্ত বেরিয়ে চুলের মধ্যে জমে আছে। সন্তুর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। বাড়ি থেকে কত দূরে এই বিদঘুটে জঙ্গলের মধ্যে সে একা পড়ে আছে। কী করে বাঁচবে জানে না। কাকাবাবু কোথায় তার ঠিক নেই। কাকাবাবু কেন এইসব জায়গায় আসেন?

আবার সন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। কাকাবাবু তো তাকে জোর করে আনেননি। সে-ই তো ইচ্ছে করে এসেছে অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। এখন বিপদে পড়ে সে কাঁদছে কেন? কেঁদে কোনও লাভ নেই, তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে।

চোখের জল মুছে ফেলে সন্তু গেল ঝর্নার ধারে। ভাল করে বমিটমি ধুয়ে ফেলল। এখানকার জলটা বেশ গরম। যাকে উষ্ণ প্রস্রবণ বলে, এই ঝর্নাটা বোধহয় তাই। এর জল খেয়েই সন্তুর পেট ব্যথা করছিল। কিন্তু উপায় তো নেই। আবার আঁজলা করে খানিকটা জল তুলে সন্তুকে খেতে হল। তার খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

আবার সে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কিলা কিলা শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলেও যে-দিক থেকে শব্দটা আসছিল, সন্তু যেতে লাগল সেই দিকে। এখন আর দৌড়তে পারছে না। হাঁটছে আস্তে আস্তে।

খানিকটা যাবার পর সে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখতে পেল। সেই আলোটা দেখেও ভয় পাবার কথা। এই জঙ্গলের মধ্যে এরকম আলো আসবে কোথা থেকে? একদম নীল রঙের আলো। গাছপালা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে সেই আলোর ছটা। কালীপুজোর সময় ম্যাগনেসিয়ামের তার পোড়ালে এরকম নীল আলো হয়। সন্তু যত এগোতে লাগল ততই আলোটা উজ্জ্বল হতে লাগল। যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সন্তু কাকাবাবুর কাছে শুনেছিল যে, জারোয়ারা আগুনই জ্বালতে জানে না। তা এরকম আলো এখানে কে জ্বেলেছে?

আলোটা দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে। তাই সন্তু নদীর ধার ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সেই দিকে এগোল। আরও খানিকটা যাবার পর সে থমকে দাঁড়াল। যা দেখল, তাতে তার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার মতন অবস্থা। বুকের মধ্যে এত জোর দুম দুম শব্দ হচ্ছে যেন বাইরে থেকেও শোনা যাবে।

জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তার পাশে একটা গোল জিনিস দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই গোল জিনিসটা একটা একতলা বাড়ির সমান। সবচেয়ে আশ্চর্য তার আগুনটা। এরকম অদ্ভুত আগুনের কথা সন্তু কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। আগুনটা নানা রঙের। বেশির ভাগই একদম নীল, তাই দূর থেকে নীল রঙের আলো দেখা যায়। কিন্তু ঐ নীল আগুনের মধ্যে আবার লক লক করছে কয়েকটা লাল, সবুজ আর গোলাপী রঙের শিখা। গ্যাসের আগুন নিয়ে ঝালাই-টালাইয়ের কাজ হয় যে-সব দোকানে, সেখানে সন্তু অনেকটা এরকম নীল রঙের আগুন দেখেছে, কিন্তু সবুজ কিংবা আলতার মতন টকটকে লাল রঙের আগুনের কথা কে কবে শুনেছে? ঐ গোল জিনিসটা কী? ওটার মধ্যে যেন অনেকগুলো জিনিস আছে, সেগুলো থেকে আলাদা-আলাদা আগুন বেরুচ্ছে। যেন একটা আগুনের ফুলের তোড়া। ওটার দিক থেকে সহজে চোখ ফেরানো যায় না।

তবু কোনওরকমে চোখ ফিরিয়ে সন্তু দেখল, সেই গোল আগুনটা থেকে অনেক দূরে ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতিতে সার বেঁধে বসে আছে কয়েক শো জারোয়া। ওরা বসেছে মাটিতে হাঁটু গেড়ে, সকলের শরীর সোজা। আর ওদের সামনে পড়ে আছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সাহেবগুলো। নীল আলোয় জায়গাটা দিনের বেলার মতন পরিষ্কার। সব স্পষ্ট দেখা যায়।

সন্তু গুঁড়ি মেরে আরও একটু সামনে এগিয়ে গেল। এখন সে আর নিজের প্রাণের কথা চিন্তাই করছে না। সে দেখতে চায় ওখানে কাকাবাবুও আছেন কি না। খুব শক্ত কোনও জংলী লতা দিয়ে সাহেবগুলোর হাত-পা একসঙ্গে

এমনভাবে বাঁধা যে, তারা নড়তে-চড়তে পারছে না। কিন্তু কাকাবাবু তো ওদের মধ্যে নেই। তাহলে কি কাকাবাবুকে আগেই মেরে ফেলেছে?

ফাঁকা জায়গাটার এক পাশে কতগুলো ঘর রয়েছে। ঘরগুলো গাছের ডাল আর লতা দিয়ে তৈরি করা। সেই সব ঘর থেকে কিছু কিছু জারোয়া মেয়ে আর বাচ্চা বেরিয়ে আসছে, কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে সাহেবদের। তারপর মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করছে। একটা জারোয়া মেয়ে একটা লম্বা শুকনো গাছের ডাল নিয়ে এগিয়ে গেল সেই আগুনটার কাছে। দূর থেকে সে ডালটা ঢুকিয়ে দিল আগুনের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। মেয়েটি সেই জ্বলন্ত ডালটা নিয়ে ফিরে এল আবার। এই ডালের আগুনটা কিন্তু সাধারণ আগুনের মতনই, নীল নয়। মেয়েটি সেই আগুন নিয়ে ঢুকে গেল একটা ঘরের মধ্যে।

সন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে, বুঝতে পারছে না। কাকাবাবুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কাকাবাবুকে এরা মেরে বনের মধ্যে কোথাও ফেলে রেখে এসেছে? কিন্তু সাহেবগুলোকে যখন নিয়ে এসেছে, তখন কাকাবাবুকেই বা আনবে না কেন? তাহলে কি কাকাবাবু ধরা পড়েননি, তাহলে কাকাবাবু গেলেন কোথায়? কাকাবাবু যেখানটায় লুকিয়ে ছিলেন, সন্তু সে-জায়গাটা খুঁজে দেখেছে। কাকাবাবু একটা ক্রাচ নিয়ে বেশিদূর যেতেও পারবেন না। তাহলে ব্যাপারটা কী হল?

সাহেবগুলোকে ওরকমভাবে হাত-পা বেঁধে রাখা হলেও ওদের মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই। কেউ কান্নাকাটিও করছে না। জারোয়ারা সবাই একদম চুপ করে বসে আছে। সাহেবরা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। সন্তু ইংরিজি ভালই জানে, কিন্তু সাহেবদের মুখের উচ্চারণ অনেক সময় বুঝতে পারে না। তবু একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল। সে টুকরো-টুকরো কয়েকটা কথা শুনতে পেল…দিজ বেগারস্ উইল সার্টেনলি কিল আস…দ্যাট মেটিওরাইট…ইনভেলুয়েবল…সো নীয়ার…

একজন সাহেব পাশ ফিরে শুতেই একজন জারোয়া উঠে গিয়ে তাকে আবার চিৎ করে দিল। কচ্ছপকে যেমন চিৎ করে রাখা হয়, এদেরও তেমনি চিৎ হয়েই থাকতে হবে।

জারোয়াদের দেখলেই মনে হয় তারা যেন কিসের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরা যদি সাহেবগুলোকে মারতে চায়, তাহলে তো মেরে ফেললেই পারে। দেরি করছে কেন?

সন্তু নিশ্বাস ফেলছে খুব আস্তে-আস্তে। একটুও নড়াচড়া করতে সাহস পাচ্ছে না। কিন্তু এখানেই বা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? কাকাবাবু এখানে নেই, তা বোঝাই যাচ্ছে। মনে হয় ভোর হতেও আর দেরি নেই। বারবার সে সেই গোল আগুনটার দিকে তাকাচ্ছে। ওই দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল

লাগে—যদিও চোখটা একটু জ্বালা-জ্বালা করে। তবু যেন মনে হয় ; ওটার মধ্যে চুম্বক আছে। আগুন যে এত সুন্দর হয়, সন্তু তা জানত না। সবুজ আগুন ? এক-একবার মনে হয় যেন রঙিন কাগজ। কিন্তু কাগজ নয়, সত্যিকারের আগুন। একটু আগেই তো একজন মেয়ে ঐ আগুন থেকে একটা গাছের ডাল জ্বালিয়ে নিল।

আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু এত বড় জঙ্গলের মধ্যে কোথায় সে কাকাবাবুকে খুঁজে পাবে। তবু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করে সন্তু ছাড়বে না।

হঠাৎ সন্তুর একটা কথা খেয়াল হল। একটা দারুণ সুযোগ। এখন যদি কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে তারা খুব সহজেই পালিয়ে বেঁচে যেতে পারে। জারোয়ারা সব এখানে, তারা জঙ্গলের মধ্যে খুঁজবে না। ঐ সাহেবগুলোর একটা মোটরবোট নিশ্চয়ই সমুদ্রের ধারে কোথাও আছে। সেই বোটটায় চেপেই তো তারা পালাতে পারে এখান থেকে। সাহেবগুলোকে ফেলে তাদের মোটরবোট নিয়েই যেতে হবে—কিন্তু তাতে কোনও দোষ নেই, সাহেবরা তো তাদের শত্রু !

সন্তু পা টিপে-টিপে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে লাগল। আরও খানিকটা দূরে গিয়েই সে দৌড় মারবে। কিন্তু তার যাওয়া হল না। হঠাৎ জারোয়াগুলো শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। আবার তারা বিকটভাবে সেই কিলা কিলা কিলা কিলা শব্দ করে উঠল। সন্তু কেঁপে উঠল একেবারে। জারোয়ারা কি তার কথা টের পেয়ে গেছে ? সন্তু দৌড়ে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু জারোয়ারা তেড়ে এল না তার দিকে। সেখানেই দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগল। ব্যাপারটা কী ঘটছে তা দেখবার জন্য সন্তু আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। আস্তে আস্তে আবার মাথা উঁচু করল।

এবারে সেখানে রয়েছে আর-একজন নতুন লোক। পাতার ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে সেই লোকটি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই জারোয়ারা ওরকম চিৎকার করছে ঠিক যেন জয়ধ্বনি দেবার মতন। লোকটি একটি হাত উঁচু করে আছে ওদের দিকে।

লোকটি অসম্ভব বুড়ো। মনে হয় নব্বই কিংবা একশো বছর বয়েস। ছোট্টখাট্টো চেহারা, পিঠটা একটু বেঁকে গেছে। মাথার চুল ধপধপে সাদা, মুখেও সাদা দাড়ি। লোকটির ভুরু দুটিও পাকা। লোকটি একটি লাল রঙের ধুতি মালকোঁচা দিয়ে পরে আছে গায়ে একটা লাল রঙের চাদর। অন্য কোনও জারোয়া জামা কাপড় কিছুই পরে না। এই বুড়ো লোকটিকে জারোয়া বলে মনেও হয় না, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা, মাথার চুলও কোঁকড়ানো নয়। এ লোকটা কে ? এ কি জারোয়াদের রাজা ?

লোকটি আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সাহেবগুলোর কাছে দাঁড়াল। খুব ভাল

করে দেখতে লাগল তাদের মুখগুলো। আর মাঝে-মাঝে মাটিতে চিক চিক করে থুতু ফেলতে লাগল। তারপর মুখ তুলে কী যেন জিজ্ঞেস করল জারোয়াদের। চার-পাঁচজন জারোয়া একসঙ্গে উত্তর দিল।

একজন সাহেবের পাশে তার বন্দুকটা পড়ে ছিল। বুড়ো লোকটি নিজের হাতে তুলে নিল বন্দুকটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তারপর টুক টুক করে হেঁটে চলে গেল সেই গোল আগুনটার কাছে। বন্দুকটা ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। আবার জারোয়াদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে অদ্ভুত ভাষায় কী যেন বলল।

অমনি চার-পাঁচজন জারোয়া এগিয়ে এসে একজন সাহেবকে মাটি থেকে উঁচু করে তুলল। তারপর চ্যাংদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল বুড়োটির দিকে। সাহেবটা এবার চ্যাঁচাতে লাগল, "হেই, হোয়াট আর য়ু ডুইং·· লীভ মি অ্যালোন। হেই!"

জারোয়ারা সাহেবটিকে বুড়ো লোকটির কাছে নিয়ে এল। বুড়ো লোকটি হাত তুলে দেখাল আগুনের দিকে। তারপর সন্তু কিছু বোঝবার আগেই জারোয়ারা সাহেবটিকে ছুঁড়ে দিল আগুনের মধ্যে। ঠিক যেমনভাবে লোকে জলের মধ্যে পাথর ছোঁড়ে। শেষ মুহূর্তে সাহেবটি প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিল আঁ আঁ করে। আগুনের মধ্যে পড়েই সব থেমে গেল। তার আর কোনও চিহ্ন রইল না। একটু ধোঁয়া পর্যন্ত বেরুল না।

সন্তু দু' হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। চোখের সামনে এরকমভাবে কোনও মানুষকে মরতে কে কবে দেখেছে? সন্তুর মনে হল, সে বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু অজ্ঞান হলে চলবে না। তাকে পালাতে হবে।

বুড়ো লোকটি আবার কিছু একটা হুকুম দিতেই জারোয়ারা আর-একজন সাহেবকে চ্যাংদোলা করে তুলল। এবার সব কটা সাহেব একসঙ্গে চিৎকার শুরু করে দিল। সেটা চিৎকার না কান্না ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু জারোয়ারা কিছুই গ্রাহ্য করল না। তারা তাকে নিয়ে গেল আগুনের কাছে।

সাহেবটি সেই বুড়ো লোকটিকে কেঁদে কেঁদে বলল, "ইউ, ইউ আর নট আ জারোয়া···ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ? প্লিজ ফরগিভ মী, স্পেয়ার মাই লাইফ, প্লীজ···"

বুড়ো লোকটি কিছুই বলল না। চিক করে মাটিতে থুতু ফেলল, তারপর আগুনের দিকে আঙুল দেখিয়ে জারোয়াদের দিকে তাকাল।

জারোয়ারা দ্বিতীয় সাহেবটিকেও আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য যেই উঁচু করে তুলেছে, অমনি দড়াম করে একটা গুলির শব্দ হল। জঙ্গলের মধ্য থেকে একটা গুলি ছুটে এসে লাগল একজন জারোয়ার হাতে। সবাই সেদিকে ফিরে তাকাল।

দূর থেকে স্তম্ভিত হয়ে সন্তু দেখল রিভলভার হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্য

থেকে কাকাবাবু সেই ফাঁকা জায়গাটায় চলে এলেন। এক হাতে ক্রাচ নিয়ে তিনি লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটছেন। তাঁর রিভলভারটা সোজা সেই বুড়ো লোকটির বুকের দিকে তাক্ করা।

॥ ৯ ॥

দাশগুপ্তর মনটা আজ একদম ভাল নেই। পুলিশের এস পি সাহেবের কাছ থেকে ফেরার পথে সে বারবার চমকে-চমকে উঠছে। সন্ধে হয়ে গেছে, এতক্ষণে সন্তু আর মিঃ রায়চৌধুরীর কী অবস্থা হয়েছে কে জানে! জারোয়ারা কি ওদের এখনও দেখতে পায়নি? জারোয়ারা কারুকে ছাড়ে না, দেখামাত্র বিষাক্ত তীর মারে। ইস্, শুধু-শুধু ওঁদের প্রাণ যাবে! মিঃ রায়চৌধুরী যে কোনও কথাই শুনলেন না। জোর করে নেমে গেলেন ঐ দ্বীপে। নিজে থেকে কেউ ওখানে যায়? ভদ্রলোকের একটা পা খোঁড়া, তবু এত সাহস! আর সন্তু তো বাচ্চা ছেলে, সে-ও কাকাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে মরবে। কাল সকালেই হয়তো দেখা যাবে, ওদের লাশ সমুদ্রের জলে ভাসছে।

আর এস পি সাহেবও যা গোঁয়ার! কিছুতেই ওঁদের উদ্ধার করতে যেতে রাজি হলেন না। দিল্লি থেকে হুকুম না পেলে তিনি যাবেন না। দিল্লি থেকে হুকুম আসতে অন্তত দু'-তিন দিন লেগে যাবে, তারপর আর ওদের মৃতদেহও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দাশগুপ্ত হাঁটতে হাঁটতে এসে টুরিস্ট হোমের খাবার ঘরের একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, "কে আছ, এক কাপ চা দেবে?"

সেখানকার বেয়ারা কড়কড়ি এসে বলল, "হ্যাঁ বাবু, চা দিচ্ছি। আর কী খাবেন?"

দাশগুপ্ত বলল, "আর কী খাব! তোমার মাথা খাব!"

কড়কড়ি হাসতে হাসতে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "এটা খেতে পারবেন না বাবু, বড় শক্ত!"

দাশগুপ্ত রেগে উঠে বলল, "ইয়ার্কি করতে হবে না, চা নিয়ে এসো শিগগির।"

"সেই বাবুরা কোথায় গেল?"

"কে জানে! সে বাবুরা আর ফিরবেন না।"

"অ্যাঁ? সে কী কথা? ওঁদের মালপত্র রয়েছে যে! সেই খোকাবাবু আর সেই বুড়োবাবু, তাঁরা আর ফিরবেন না? তাঁদের কী হয়েছে?"

"তাঁদের জারোয়ারা ধরে নিয়ে গেছে।"

একথা শুনে কড়কড়ি একেবারে হাউমাউ করে উঠল। মাথা চাপড়ে বলতে লাগল, "কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!"

কড়কড়ির কান্না শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল আরও দু'-তিনজন

লোক। তারা অবাক হয়ে গেছে। যখন তারাও শুনল যে, সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে জারোয়ারা, খুব দুঃখ হল তাদের। জারোয়ার হাতে পড়লে যে আর কেউ বাঁচে না, তা ওরা সবাই জানে। ওরা দাশগুপ্তকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে লাগল।

এমন সময় আকাশে একটা শব্দ উঠল। দাশগুপ্ত চমকে উঠে বলল, "কী ব্যাপার ? এখন কিসের শব্দ ?"

কড়কড়ি বলল, "একটা এরোপ্লেন আসছে বাবু !"

দাশগুপ্ত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "প্লেন, এই সময় ? কিসের প্লেন ? সন্ধের পর কখনও এখানে প্লেন আসে ?"

সকলেই তখন ভাবল, সত্যিই তো, পোর্ট ব্লেয়ারে তো প্লেন আসে দুপুরে। কোনওদিন তো সন্ধের পর এখানে কোনও প্লেন আসেনি। তাহলে এটা কিসের প্লেন ?

প্লেনটা আকাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তার মানে, এখানেই নামবে।

দাশগুপ্ত হাত পা ছুঁড়ে বলল, "ট্যাক্সি ! আমার এক্ষুনি একটা ট্যাক্সি চাই। ফোন করো ট্যক্সির জন্য। না, না, ফোন করতে হবে না, দেরি হয়ে যাবে। আমি নিজেই যাচ্ছি।"

দাশগুপ্ত টুরিস্ট হোমের বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোজা রাস্তা দিয়ে দৌড়তে লাগল। খানিকটা বাদেই রাস্তায় একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। সেই ট্যাক্সিতে দু'জন লোক ছিল। দাশগুপ্ত হাত জোড় করে বলল, "আমার বিশেষ দরকার, আমাকে এক্ষুনি একবার এয়ারপোর্ট যেতে হবে। যেতেই হবে ! আপনারা দয়া করে নেমে পড়বেন ?"

দাশগুপ্তর রকম-সকম দেখে মনে হল, সে পাগল হয়ে গেছে। লোক দুটি হতভম্ব হয়ে নেমে গেল। দাশগুপ্ত ট্যাক্সিতে উঠে বসেই বলল, "জলদি চালাও, এয়ারপোর্ট। জলদি !"

দাশগুপ্ত যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছল, তার আগেই প্লেনটা নেমে গেছে। এয়ারপোর্টে অনেক পুলিশ, স্বয়ং এস পি সাহেবও উপস্থিত। নিশ্চয়ই হোমরা-চোমরা কেউ এসেছে।

দাশগুপ্ত একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, "কে এসেছেন ? কে উনি ?"

পুলিশটি বলল, "হোম সেক্রেটারি সাহেব এসেছেন !"

দাশগুপ্ত আনন্দে একেবারে নেচে উঠল। এত বড় সৌভাগ্যের কথা ভাবাই যায় না। এস পি সাহেব এই হোম সেক্রেটারির কাছ থেকেই অনুমতি আনার কথা বলেছিলেন। সেই হোম সেক্রেটারি নিজেই দিল্লি থেকে এখানে এসে উপস্থিত ! কোনও গুরুতর ব্যাপার তাহলে আছেই।

হোম সেক্রেটারি একজন বেশ লম্বা মতন লোক। মাঝারি বয়েস। মাথার চুলগুলো বড়-বড়। তিনি বড়-বড় পা ফেলে গিয়ে একটা গাড়িতে উঠলেন।

দাশগুপ্ত সেদিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই কয়েকজন পুলিশ তাকে বাধা দিল।

দাশগুপ্ত তখন চেঁচিয়ে এস-পি সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, "স্যার, ওঁর সঙ্গে আমার এক্ষুনি কথা বলা দরকার। সেই ব্যাপারটা..."

এস পি মিঃ সিং বললেন, "দাঁড়ান, ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন। উনি অতদূর থেকে সবে এসে পৌঁছেছেন—"

দাশগুপ্ত বলল, "একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না এখন। আপনি বুঝতে পারছেন না..."

কিন্তু ততক্ষণে হোম সেক্রেটারির গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দাশগুপ্ত চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সেদিকে ছুটে গিয়েও গাড়িটা থামাতে পারল না।

রাগে-দুঃখে দাশগুপ্তর চোখে জল এসে গেল। এবার আর সে এস পি সাহেবকে ভয় পেল না। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, "আপনাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। দিল্লি থেকে আমার ওপর অর্ডার দেওয়া আছে, মিঃ রায়চৌধুরীর যাতে কোনও রকম বিপদ না হয়, তার ব্যবস্থা করার। কিন্তু আপনি আমাকে কোনও সাহায্য করেননি। একথা আমি হোম সেক্রেটারিকে বলব।"

মিঃ সিং বললেন, "অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হোম সেক্রেটারি যখন এসেই গেছেন, তখন ওঁর কাছ থেকে অনুমতি পেলেই আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

দাশগুপ্ত বলল, "কিন্তু প্রতিটি মিনিট নষ্ট করা মানেই সাঙ্ঘাতিক ভুল করা।"

দিল্লি থেকে খুব হোমরা-চোমরা কেউ এলে ওঠেন এখানকার সরকারি অতিথি-ভবনে। দাশগুপ্ত তা জানে। ট্যাক্সিটা রাখাই ছিল, সেটা নিয়ে সে আবার সেইদিকে ছুটল।

অতিথি-ভবনে দাশগুপ্ত আর এস পি মিঃ সিং পৌঁছল প্রায় একই সময়ে। এস পি সাহেব গটগট করে ঢুকে গেলেন ভেতরে। গেটের পুলিশ দাশগুপ্তকে আটকাতে যেতেই সে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বলল, "এটা হোম সেক্রেটারিকে দাও, তাহলেই তিনি বুঝবেন।"

হোম-সেক্রেটারির নাম কৌশিক ভার্মা। তিনি তখন ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে এক কাপ চা খাচ্ছিলেন। আর এস পি সাহেবকে বলছিলেন, "শুনুন, আমি এখানে এসেছি একটা বিশেষ কাজে। আমি গোপন রিপোর্ট পেয়েছি, কিছু বিদেশি গুপ্তচর আন্দামানে নিয়মিত যাতায়াত করছে। তারা কলকাতা আর দিল্লি থেকে কিছু-কিছু পাসপোর্ট চুরি করে ভারতীয় সেজে প্লেনে করে চলে আসছে আন্দামানে। কী তাদের উদ্দেশ্য, সেটা আমাদের জানা দরকার। আন্দামানের মতন একটা সাধারণ জায়গায় বিদেশিদের নজর পড়ল কেন?"

এস পি মিঃ সিং বললেন, "না স্যার, এখানে তো কোনও বিদেশি আসেনি

অনেকদিন। বিদেশি কোনও টুরিস্ট এলে আমার অনুমতি ছাড়া তো এখানে ঢুকতেই পারবে না।"

মিঃ ভার্মা বললেন, "তারা কি আর টুরিস্ট সেজে আসবে? তারা ভারতীয় সেজে গোপনে ঢুকবে।"

মিঃ সিং বললেন, "না স্যার, বিদেশি এলে আমার নজরে পড়তই।"

এই সময় দাশগুপ্ত সেখানে ঢুকে পড়ে বলল, "স্যার, আমি সেই বিদেশিদের কথা জানি।"

এস পি অমনি ভুরু কোঁচকালেন। মিঃ ভার্মা মুখ তুলে দাশগুপ্তকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, আমি আপনার ডিপার্টমেন্টেই কাজ করি। দু'-বছর ধরে আন্দামানে আছি। আমার কাজ হল এখানকার অবস্থার ওপর লক্ষ রাখা। বিদেশি গুপ্তচরদের কথা প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মিঃ রায়চৌধুরী আমার চোখের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছেন—"

মিঃ ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "রায়চৌধুরী? কোন্ রায়চৌধুরী?"

দাশগুপ্ত বলল, "সেই যে মিঃ রায়চৌধুরী, যিনি আগে ভারত সরকারের কাজ করতেন, এখন রিটায়ার্ড, নানান জায়গায় রহস্যের সন্ধান করে বেড়ান..."

কৌশিক ভার্মা চমকে উঠে বললেন, "ও সেই ওয়ান-লেগেড ম্যান? সেই দারুণ সাহসী মানুষটি? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

দাশগুপ্ত বলল, "স্যার, তাঁর সাঙ্ঘাতিক বিপদ। এতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন কি না সন্দেহ!"

কৌশিক ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "সে কী কথা? কেন, তাঁর কী হয়েছে?"

"তিনি জারোয়াদের হাতে ধরা পড়েছেন।"

"হোয়াট? জারোয়াদের হাতে? কীভাবে ধরা পড়লেন? আপনারা কিছু করতে পারেননি?"

দাশগুপ্ত হাতজোড় করে বলল, "স্যার, আমি স্বীকার করছি, আমার কিছুটা দোষ আছে। আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু উনি আমার দিকে রিভলভার তুলে ভয় দেখিয়ে মিডল আন্দামানের একটা দ্বীপে নেমে গেলেন জোর করে। তারপর আমি রেসকিউ পার্টি পাঠাবার জন্য পুলিশের এস পি সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম। উনি রাজি হননি।"

কৌশিক ভার্মা এস পি সাহেবের দিকে তাকালেন। এস পি সাহেব তখন গোঁপে তা দিচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি গোঁপ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, "আমি ঠিক কাজই করেছি। আমি সব ঘটনা জানিয়ে দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি একটু আগে।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "দিল্লি থেকে হুকুম আসতে যদি দু'-তিনদিন লাগে,

ততদিন আপনি ওরকম একটা লোককে জারোয়াদের হাতে ছেড়ে রাখবেন ?”

মিঃ সিং বললেন, “স্যার, তাছাড়া আমি কী করব বলুন ? সেখানে পুলিশ পাঠালে জারোয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যেত। গুলি খেয়ে বেশ কিছু জারোয়া মরত। একজন জারোয়াকেও মারার হুকুম নেই আমার কাছে। তাছাড়া সেই মিঃ রায়চৌধুরীকে আর বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ। কেউ বাঁচে না ঐ অবস্থায়।”

কৌশিক ভার্মা উঠে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বললেন, “তা বলে কোনও চেষ্টাও করবেন না ? মিঃ রায়চৌধুরী কে জানেন ? ওরকম সাহসী লোক সাহেবদের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে ক'জন আছেন ? ওরকম একজন মানুষ আমাদের দেশের গর্ব। সেই লোককে আমরা বাঁচাবার চেষ্টা করব না ? ছি ছি ছি। এক্ষুনি রেসকিউ পার্টি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিজে তাদের সঙ্গে যাব।”

এস পি সাহেব আস্তে আস্তে বললেন, “এই রাত্তিরবেলা ? সে তো প্রায় অসম্ভব।”

“কেন, অসম্ভব কেন ?”

“মোটরবোট নিয়ে অতদূর যেতে অন্তত চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লাগবে—বনের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেখানে এখন যে নামবে তাকেই প্রাণ দিতে হবে। জারোয়ারা চব্বিশ ঘন্টা লুকিয়ে থেকে পাহারা দেয়।”

কৌশিক ভার্মা বললেন, “মোটরবোটের সঙ্গে সার্চ-লাইট লাগানো যেতে পারে না ? সার্চ-লাইটের আলোয় অনেক দূর দেখা যাবে।”

“স্যার, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, সার্চলাইটের আলোয় আর কতদূর দেখা যেতে পারে। দ্বীপটা অনেক বড়। তাছাড়া জারোয়ারা যুদ্ধ না করে পিছু হটবে না। তাতে দু'পক্ষের অনেক লোক মরবে। এটা আমাদের নীতি নয়।”

কৌশিক ভার্মা চিবুকে হাত রেখে চিন্তা করতে লাগলেন।

দাশগুপ্ত আস্তে আস্তে বলল, “স্যার, আমি একটা কথা বলতে পারি ?”

“বলুন।”

“একটা উপায়ে এক্ষুনি সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়। বোটে না গিয়ে আমরা যদি হেলিকপটারে যাই, তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। হেলিকপটারের ওপর থেকে আলো ফেলে খুঁজে দেখা যায় সারা জঙ্গলটা। তাতে যুদ্ধও হবে না। জারোয়ারা হেলিকপটারে তীর মারতেও পারবে না। ওদের তীর বেশি উঁচুতে পৌঁছয় না।”

কৌশিক ভার্মা টেবিলে এক চাপড় মেরে বললেন, “ঠিক ! খুব ভাল কথা। সেই ব্যবস্থাই করা যাক।”

দাশগুপ্ত বলল, “সেই সঙ্গে প্রীতম সিংকেও নিয়ে গেলে ভাল হয়।”

“প্রীতম সিং কে ?”

"প্রীতম সিং আগে এখানেই পুলিশের কাজ করতেন। উনি জারোয়াদের ভাষা জানেন। হেলিকপটার থেকে উনি মাইকে জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মিঃ রায়চৌধুরীকে যদি ওরা মেরে না ফেলে বন্দী করে রাখে, তাহলে প্রীতম সিং-এর কথায় হয়তো ছেড়ে দেবে। প্রীতম সিং ছাড়া আর তো কেউ জারোয়াদের সঙ্গে কথাই বলতে পারবে না।"

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "সেরকম লোকও আছে? তবু আপনারা কিছু চেষ্টা করেননি!"

মিঃ সিং গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, প্রীতম সিংকে ডেকে আমি তার মত নিয়েছিলাম। প্রীতম সিং-এর মতে এখন আর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। প্রীতম সিংকে জারোয়ারা বনের ভেতরে ঢুকতে দেয় না।"

"প্রীতম সিং হেলিকপটার থেকে ওদের সঙ্গে কথা বলে আসল খবরটা অন্তত জেনে নিতে পারবে। হেলিকপটার কোথায় আছে? চলুন!"

"আমাদের হেলিকপটার নেই।"

দাশগুপ্ত আবার বলল, "এখানে নেভির হেলিকপটার আছে, স্যার। আমরা বললে দেবে না। কিন্তু আপনি অর্ডার দিলে ঠিকই দেবে।"

"আমি এক্ষুনি অর্ডার লিখে দিচ্ছি।"

কৌশিক ভার্মা তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে তক্ষুনি অর্ডার লিখিয়ে দিলেন। তারপর এস পি-কে বললেন, "একজন লোক দিয়ে এই চিঠি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন। তাকে জেনে আসতে বলুন আধঘণ্টার মধ্যে হেলিকপটার পাওয়া যাবে কি না!"

একজন লোক চিঠি নিয়ে তক্ষুনি ছুটে গেল। কিন্তু একটু বাদেই সে ফিরে এল খারাপ খবর নিয়ে।

নেভির দুটি মাত্র হেলিকপটার। একটা চলে গেছে নিকোবর, সেটা তিন-চারদিনের মধ্যে ফিরবে না। আর-একটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। সেটা সারাবার চেষ্টা চলছে।

কৌশিক ভার্মা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সেটা সারিয়ে তুলতেই হবে···যত তাড়াতাড়ি সম্ভব···আধ ঘণ্টা, অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে···"

দাশগুপ্তর মুখটা শুকিয়ে গেছে। এত চেষ্টা করেও শেষরক্ষা করা গেল না? হেলিকপটারটাও এই সময় খারাপ!

কৌশিক ভার্মা দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "চলুন, আমি নিজে সেই হেলিকপটারটা দেখে আসতে চাই···"

॥ ১০ ॥

এদিকে তখন বনের মধ্যে কী হচ্ছে ?

হঠাৎ গুলির শব্দ। তারপরেই কাকাবাবু একটামাত্র ক্রাচ নিয়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এলেন সেই আগুনের কাছে। তাঁর রিভলভার সোজা সেই বুড়ো রাজার বুকের দিকে তাক করা।

জারোয়ারা প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর কাকাবাবুকে দেখে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে আবার ইংরেজিতে বললেন, "আপনার লোকদের বলুন, কেউ যেন আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা না করে ! কেউ আমার কাছে এলেই আমি তার আগে আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলব !"

বুড়ো রাজা কিন্তু একটুও ভয় পাননি। তার পাকা ভুরুর নীচে চোখ দুটি ঘোলাটে। একদৃষ্টে তিনি কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর দুটো হাত তুললেন মাথার ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে জারোয়ারা থেমে গেল।

বুড়ো রাজা কাকাবাবুকে স্পষ্ট ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে বলুন, আপনি কে ? আপনি জারোয়া নন, তা বুঝতেই পারা যায়। আপনি সভ্য মানুষ। আপনি কেন সাহেবগুলোকে পুড়িয়ে মারছেন ?"

বুড়ো রাজা মাটিতে চিক করে থুতু ফেললেন। তারপর হাসলেন। সেই রকম একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "তুমি আমাকে গুলি করলেও নিজে বাঁচতে পারবে না। তোমাকে এরা শেষ করে ফেলবে। তুমি এখানে কেন এসেছ ?"

কাকাবাবু ডান দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "এই আগুনটা দেখতে। এই সাহেবগুলোও সেইজন্যেই এসেছে।"

বুড়ো রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। কিন্তু আপনি এই অসভ্যদের সঙ্গে থেকে কি অসভ্য হয়ে গেছেন ? জ্যান্ত মানুষদের পুড়িয়ে মারছেন ?"

বুড়ো রাজা বললেন, "তোমাকে কে বলেছে, এই জারোয়ারা অসভ্য ? আর এই সাহেবরা কিংবা তোমরা সভ্য ? তোমাদের আমি ঘৃণা করি !"

"এদের ছেড়ে দিন !"

এবার বুড়ো রাজা ঝুঁকে-ঝুঁকে এগিয়ে আসতে লাগলেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর হাত কাঁপছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "খবর্দার, আমার কাছে আসবেন না, আমি গুলি করব, ঠিক গুলি করব !"

বুড়ো রাজা কোনও কথা না বলে হাসিমুখে তবু এগিয়ে আসতে লাগলেন।

কাকাবাবু বললেন, "আমি গুলি করব কিন্তু ! আমার রিভলভার কেড়ে নেবার চেষ্টা করবেন না, তার আগেই আমি গুলি করব।"

বুড়ো রাজা একেবারে কাকাবাবুর মুখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কাকাবাবুর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বাংলায় বললেন, "তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছ? এই আগুনটা বুঝি এত দামি? ঠিক আছে, তোমাদের সবাইকে আমি এই আগুনের মধ্যে পাঠিয়ে দেব।"

দূরে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সন্তু শুনতে পেল, বুড়ো রাজা স্পষ্ট বাংলায় কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছ?"

সন্তু তার নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বাঙালি?"

বুড়ো রাজা সে-কথার উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিতে গেলেন।

কাকাবাবু বললেন, "খবরদার, আর এগোবেন না, আমি গুলি করব! ঠিক গুলি করব।"

বুড়ো রাজা মাথার ওপর দু'হাত তুলে বললেন, "করো গুলি করো, দেখি তোমার কত সাহস?"

কাকাবাবু গুলি করতে পারলেন না। তাঁর হাত কাঁপছে। তিনি বললেন, "আমি আপনাকে মারতে চাই না। আমি জানতে চাই, আপনি কে?"

বুড়ো রাজা কাকাবাবুর ডান হাতে জোরে একটা ধাক্কা মারতেই রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল একটু দূরে। কাকাবাবু আবার সেটা কুড়িয়ে নেবার জন্য ঝুঁকতেই পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। কাকাবাবুর যে একটা পা নেই, সেটা তাঁর মনে থাকে না সব সময়। কাকাবাবু পড়ে যেতেই বুড়ো রাজা তাঁর পিঠের ওপর একটা পা রেখে দাঁড়ালেন।

সমস্ত জারোয়ারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তারা দেখল তাদের বুড়ো রাজা রিভলভারকেও ভয় পান না। কাকাবাবু জোর করে ওঠবার চেষ্টা করতে যেতেই দু'জন জারোয়া ছুটে এসে তাঁকে চেপে ধরল।

হাত-পা বাঁধা সাহেবগুলোও ভয়ের শব্দ করে উঠল।

দূরে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তু সব দেখল। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এবার ওরা কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে? সন্তু একা কী করে তাঁকে বাঁচাবে? এখনও সন্তুকে কেউ দেখতে পায়নি।

বুড়ো রাজা চিক করে মাটিতে থুতু ফেললেন। তারপর খুব কড়া গলায় কাকাবাবুকে বললেন, "তোমাদের সবকটাকে আমি এক্ষুনি যমের বাড়ি পাঠাব! আমরা জারোয়ারা এখানে জঙ্গলের মধ্যে আপন মনে থাকি। আমরা কারুর কোনও ক্ষতি করি না। তোমরা কেন আমাদের বিরক্ত করতে আসো?"

কাকাবাবু বললেন, 'আপনি জারোয়া নন। আপনি কে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "আমি এক সময় বাঙালি ছিলাম। এখন আমি এদেরই

একজন। আমি আর তোমাদের মতন পরাধীন নই। আমি স্বাধীন।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার কষ্ট হচ্ছে, আমাকে উঠে দাঁড়াতে দিন।”

বুড়ো রাজা বললেন, “তোমার সব কষ্ট এক্ষুনি শেষ করে দেব। তোমরা এই আগুনটা দেখতে এসেছিলে না ? এই আগুনের মধ্যেই তোমরা যাবে। যত সব চোরের দল !”

কাকাবাবু বললেন, “আমি কিছু চুরি করতে আসিনি। আমি শুধু দেখতে এসেছিলাম।”

“মিথ্যে কথা ! যে-পাথরটা থেকে এই আগুন বেরুচ্ছে, তোমরা আসো সেই পাথরটা চুরি করতে। এর আগেও কয়েকটা সাহেব এসেছিল, সব কটাকে আমি যমের বাড়ি পাঠিয়েছি। তুমি বাঙালি হয়েও এই সাহেবদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ। সাহেবের পা-চাটা ! পরাধীন দেশের মানুষেরাই এরকম কাপুরুষ হয়ে যায় !”

“আমি ওদের সঙ্গে আসিনি। আমি ওদের পথ দেখিয়ে আনিনি।”

“চুপ ! মিথ্যুক ! কুকুর !”

বুড়ো রাজা কাকাবাবুকে আর কোনও কথা বলতে দিলেন না। জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা কাকাবাবুকে টেনে তুলল। এবার বুঝি আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে !

সন্তু আর থাকতে পারল না। তার যা হয় হোক। কাকাবাবু যদি মরে যান, তাহলে সে-ও মরবে !

সে কাকাবাবু বলে চিৎকার করে তীরের মতন ছুটে এল। কোনও জারোয়া তাকে ধরতে পারল না, তার আগেই সে দৌড়ে কাকাবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সন্তুকে দেখে কাকাবাবুও খুব অবাক হয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে বললেন, “তুই চলে যাসনি ? তোকে যে আমি বললাম।”

বুড়ো রাজা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “এই ছেলেটি কে ?”

কাকাবাবু বললেন, “এ আমার ভাইপো। আপনি আমাকে মারতে চান মারুন, কিন্তু ওকে ছেড়ে দিন।”

“এইটুকু ছেলেকেও সাহেবদের চাকরের কাজে লাগিয়েছ ?”

সন্তু বলল, “বিশ্বাস করুন, আমরা ঐ সাহেবদের সঙ্গে আসিনি। আমরা আলাদা এসেছি। ঐ সাহেবেরা আমাদেরও মেরে ফেলতে চেয়েছিল।”

বুড়ো রাজা সন্তুকে বললেন, “আমার কাছে এসো !”

বুড়ো রাজার চোখের দিকে তাকালেই ভয় করে। তবু সন্তু এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। বুড়ো রাজা একটা হাত বাড়িয়ে সন্তুর গালটা ছুঁলেন। রাজার গায়ের সব চামড়া কুঁচকে গেছে। লম্বা লম্বা শুকনো আঙুলের ছোঁয়ায়

সন্তুর গাটা একবার শিরশির করে উঠল।

রাজা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর মুখে একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব ফুটে উঠল। তিনি আপনমনে বললেন, "আমার ঠিক এই বয়েসী একটা ভাই ছিল। জানি না সে এখনও বেঁচে আছে কি না।"

তারপর তিনি মুখ নামিয়ে সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমার কাকাবাবু একজন খুব পণ্ডিত লোক। উনি মোটেই চোর নন।"

"অনেক পণ্ডিতও চোর হয়। টাকা-পয়সার লোভে তারাও সাহেবদের পা চাটে।"

"আমার কাকাবাবু মোটেই সেরকম লোক নন।"

"তাহলে সাহেবদের বাঁচাবার জন্য ওর এত দরদ কেন?"

এবার কাকাবাবু বললেন, "কোনও মানুষকেই মেরে ফেলা আমি পছন্দ করি না। এই সাহেবদের অন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, মেরে ফেলা উচিত নয়!"

"ওরা আমার অন্তত পনেরোজন জারোয়াকে মেরে ফেলেছে। কেন? জারোয়ারা ওদের কোনও ক্ষতি করেছিল? জারোয়ারা এখানে শান্তভাবে থাকে—তারা তো অন্য কোনও জায়গায় গিয়ে অন্যদের মারতে যায় না।"

"সাহেবরা অন্যায় করেছে ঠিকই। সেজন্য তাদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। আপনি সভ্যজগতের মানুষ।"

"চুপ! তোমাদের সভ্যতাকে আমি ঘৃণা করি!"

কাকাবাবুকে তখনও দু'জন জারোয়া চেপে ধরে আছে। আগুনটা এখান থেকে খুব কাছে। গায়ে আঁচ লাগছে। কিন্তু ঐ আগুনের কতরকম রঙ। দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। এরকমভাবে যখন-তখনই বৃষ্টি নামে এখানে। সন্তু ভাবল, বৃষ্টিতে কি আগুনটা নিভে যাবে? কিন্তু সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখল। বৃষ্টির জল, সেই আগুনের মধ্যে পড়তেই পারছে না। ছ্যাঁত ছ্যাঁত শব্দে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছোট ছোট আগুনের ফুলকি হয়ে যাচ্ছে। যেন সেই আগুনের শিখার ওপর অসংখ্য জোনাকি। এরকম দৃশ্য সন্তু কখনও দেখেনি।

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বললেন, এটা পৃথিবীর আগুন হতেই পারে না। এই আগুন অন্য কোনও জায়গা থেকে এসেছে।

বুড়ো রাজা বললেন, "এই আগুন জ্বলছে বহু বছর ধরে। কখনও নিভবে না।"

বৃষ্টি আরও জোরে এল। বুড়ো রাজা জারোয়াদের কিছু একটা হুকুম করে পেছন ফিরে চলতে লাগলেন। জারোয়ারা সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে রেখে তাঁর সঙ্গে চলল। রাজা একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, জারোয়ারা সন্তু

আর কাকাবাবুকে তার মধ্যে ঠেলে দিল।

ঘরটার মধ্যে প্রায় কিছুই জিনিসপত্র নেই। মাটিতে ছড়ানো রয়েছে একগাদা শুকনো পাতা, তার ওপর দুটো হরিণের শুকনো চামড়া। একটা আস্ত গাছ উঠে গেছে ঘরের এক কোণ দিয়ে। সেই গাছের ডালে একটা বাঁশের চোঙা ঝোলানো। তাতে জল ভর্তি। বুড়ো রাজা সেটা নিয়ে ঢক ঢক করে জল খেলেন খানিকটা। তারপর কাকাবাবুদের বললেন, "বসো।"

বসবার পর আর দুটো জিনিসের দিকে চোখ পড়ল ওদের। ঘরের এক পাশে এক টুকরো লাল কাপড়ের ওপর রাখা আছে একটা বই। বইটার মলাটের ওপর লেখা আছে 'গীতা'। আর তার পাশে একটা লোহার হাতকড়া। পুলিশরা চোর ডাকাতের হাতে যে-রকম হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

ওরা দু'জনেই সেই দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ দুটো আমার পুরনো কালের স্মৃতি। আর কিছুই নেই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বয়েস কত?"

বুড়ো রাজা বললেন, "হিসেব রাখি না। কী দরকার বয়েসের হিসেবে? আশি-নব্বই হতে পারে, একশোও হতে পারে। জানি না কতদিন আগে এসেছি।"

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমি বোধহয় আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার নাম কি গুণদা তালুকদার?"

"কী বললে?"

"আপনি নিশ্চয়ই গুণদা তালুকদার?"

"কে গুণদা তালুকদার? তুমি তার কথা কী করে জানলে?"

"আমি আন্দামানে আসবার আগে, এখানকার সম্পর্কে যত কিছু বইপত্র আছে, তা সব পড়ে ফেলেছি। বহু বছর আগে আন্দামান জেল থেকে গুণদা তালুকদার নামে একজন বিপ্লবী পালিয়েছিলেন। ঐ জেল থেকে মাত্র ঐ একজনই পালিয়েছেন কিন্তু ধরা পড়েননি। সবাই তখন ভেবেছিল, গুণদা তালুকদার সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন। আজ এই হাতকড়াটা দেখেই হঠাৎ মনে হল..."

বুড়ো রাজা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "এসব কথা বইতে লেখা আছে? গুণদা তালুকদারকে এখনও লোকে মনে রেখেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই! আপনার ছবি ছাপা হয়েছে কত বইতে। অবশ্য সে-ছবি দেখে এখন আপনাকে চেনা যায় না। আপনার জন্মদিনে উৎসব হয় অনেক জায়গায়। নেতাজীকে যেমন খুঁজে পাওয়া যায়নি, তেমনি আপনাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেশের লোক আপনাকে শ্রদ্ধা করে।"

"নেতাজী কে?"

"সে কী, আপনি নেতাজীর নাম শোনেননি? সুভাষচন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ

ফৌজ নিয়ে যিনি যুদ্ধ করেছিলেন ব্রিটিশের সঙ্গে ?"

"সুভাষবাবু ? তিনি যুদ্ধ করেছেন ? কবে ?"

"আপনি এসব কিছুই জানেন না ?"

"না। আমার নাম লোকে মনে রেখেছে ? তার মানে পুলিশ এখনও আমার খোঁজ করে ?"

"পুলিশ ? আপনাকে খুঁজবে কেন ? ও সেই জন্যই আপনি আমাদের পরাধীন দেশের মানুষ বলছিলেন ? আমাদের দেশ তো বহুদিন আগে স্বাধীন হয়ে গেছে। এই যে সন্তু, ও তো স্বাধীন দেশে জন্মেছে। ভারত এখন পৃথিবীর একটি প্রধান দেশ।"

"স্বাধীন হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ। আপনি দেশের জন্য কত লড়াই করেছেন, জেল খেটেছেন, আর সেই খবরটা রাখেন না ?"

"আমি গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে কথাই বলিনি।"

"আপনার কথা জানতে পারলে সবাই দারুণ খুশি হবে। সারা দেশ আপনাকে নিয়ে উৎসব করবে।"

"আমি আর কোথাও যাব না। আমি এইখানে খুব ভাল আছি।"

"আপনি এখানে এলেন কী করে ? জারোয়ারা আপনাকে রাজা করে নিল ?"

"আমি একটা ছোট ভেলা নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলাম। ঝড়ে সেই ভেলা উল্টে গেল। আমি মরেই যেতাম। অজ্ঞান অবস্থায় ভাসতে ভাসতে এই দ্বীপে এসে ঠেকেছিলাম। আমাকে এরা মারেনি কেন জানি না। তখনও আমার এক হাতে হাতকড়া ঝুলছিল। এরা মোটেই হিংস্র নয়। এদের যদি কেউ বিরক্ত না করে, এরা কখনও অন্য মানুষকে মারে না। এরা আমাকে খাইয়ে দাইয়ে সুস্থ করে তুলেছিল। সে কতকাল আগের কথা !"

"কিন্তু আপনি তো এদের সভ্য করে তুলতে পারতেন !"

"চুপ, ও কথা বলো না ! সভ্য মানে কী ? তোমরা সভ্য আর এরা অসভ্য ? এখানে কেউ চুরি করে না, মিথ্যে কথা বলে না। এখানে সবাই খাবার একসঙ্গে ভাগ করে খায়। এখানে কোনও রোগ নেই। এর থেকে বেশি সুখ মানুষ আর কী চায় ? আমিই এদের বারণ করেছি তোমাদের মতন সভ্য লোকদের সঙ্গে মিশতে। তোমরা এদের নষ্ট করে দেবে !"

"আপনার মতন একজন মানুষ এখানে এইভাবে লুকিয়ে আছেন, একথা আমার কাছে শুনলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"তোমরা কেন এই জারোয়াদের ওপর অত্যাচার করতে আসো ?"

"আমি বন্ধুত্ব করতে এসেছি।"

"তোমারও ঐ পাথরটার ওপর লোভ আছে নিশ্চয়ই ?"
"কোন্ পাথরটা ?"
"যেটা দিয়ে আগুন জ্বলে ?"
"ওটার কথা আমি জানতামই না। তবে আন্দাজ করেছিলাম, এরকম একটা মহা-মূল্যবান জিনিস এখানে আছে। সাহেবরা আগেই টের পেয়েছে নিশ্চয়ই।
"ওটা কী তুমি বুঝতে পেরেছ ?"
"নিশ্চয়ই ওটা কোনও উল্কা। কিংবা অন্য কোনও গ্রহের ভাঙা টুকরো। পৃথিবীতে এরকম কিছু কিছু মাঝে-মাঝে এসে পড়ে। অনেকগুলো আসার পথেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু এটা বহু বছর ধরে জ্বলছে। এটার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোনও ধাতু আছে, যা আমাদের পৃথিবীতে নেই। সে রকম নতুন ধাতুর আবিষ্কার হলে তার সাঙ্ঘাতিক দাম হবে। পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে যাবে।"
"জারোয়ারা আগুন জ্বালাতে পারে না। এই আগুন থেকেই তারা সব কাজ চালায়। সেই আগুন চুরি করতে চায় কেন সভ্য মানুষ ?"
"তা বলে একটা নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে না ? এর বদলে ওদের আমরা হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ দেশলাই দিতে পারি—"
"না, এটা প্রকৃতির দান ওরা তাই নিয়েছে। ওরা সভ্য মানুষদের কাছ থেকে কিছুই চায় না। তোমাদের আমি ছেড়ে দিতে পারি এক শর্তে, তোমরা এই আগুনের কথা কখনও কারুকে বলতে পারবে না।"
"কিন্তু আমরা আপনাকেও নিয়ে যেতে চাই।"
"আমাকে ?"
"দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনি একবার দেখতে আসবেন না ? একবার দিল্লিতে আর কলকাতায় চলুন। দেখবেন, কত কী বদলে গেছে !"
"না, আমি যাব না !"
এই সময় বাইরে হঠাৎ দারুণ একটা গোলমাল শোনা গেল। ডিসুম্ ডিসুম্ করে শব্দ হল বন্দুকের গুলির।
ওরা তিনজনই চমকে উঠল।
বুড়ো রাজা উঠে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। তারপর বাইরে একবার তাকিয়েই কাকাবাবুর দিকে মুখ ফেরালেন। আস্তে আস্তে বললেন, "তোমার জন্যই এবার আমাদের সর্বনাশ হল !"
সন্তুও লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। সে দেখল, সেই সাহেবগুলো হাতের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিন-চারজনের হাতে বন্দুক, এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে চারদিকে।
বুড়ো রাজা বললেন, "এবার ওরা সবাইকে মেরে ফেলবে।"
কাকাবাবু বললেন, "আপনি ঘরের মধ্যে ঢুকে আসুন। বাইরে যাবেন না !"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঘরের মধ্যে ঢুকলেও বাঁচা যাবে না। ওদের কাছে লাইট মেশিনগান আছে। ওরা আমার লোকজনকে মারছে!"

সত্যিই তাই। কয়েকজন জারোয়া প্রাণের ভয় না করে সাহেবদের দিকে তাড়া করে আসছিল, সাহেবরা কট্ কট্ কট্ কট্ করে গুলি চালাল, সঙ্গে সঙ্গে তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। জারোয়াদের বিষাক্ত তীর দু'জন সাহেবের গায়ে লাগল, কিন্তু তাতে তাদের কিছুই হল না। সাহেবরা আগেই বিষ প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিয়ে নিয়েছে।

কাকাবাবুকে ঠেলে বুড়ো রাজা বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। দু'হাত উঁচু করে ইংরিজিতে চেঁচিয়ে বললেন, "হোল্ড অন্!"

সঙ্গে সঙ্গে একজন সাহেব হিংস্রভাবে ঘুরে দাঁড়াল সেই দিকে। তার হাতে একটা বেঁটে আর মোটা ধরনের বন্দুক। সন্তু বুঝল, ওটারই নাম বোধহয় লাইট মেশিনগান।

সন্তুর মনে হল, সাহেবটি এক্ষুনি বুড়ো রাজাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু বুড়ো রাজার দারুণ সাহস। তবু তিনি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে একপা একপা করে এগিয়ে গেলেন সাহেবদের দিকে। তারপর ইংরিজিতে বললেন, "তোমরা আমার লোকদের শুধু-শুধু মেরো না। তোমরা যা চাও, তাই নিয়ে যাও।"

তিনি জারোয়াদের দিকে তাকিয়ে কী একটা অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করলেন। অমনি তারা সার বেঁধে পেছিয়ে যেতে লাগল। সেইসঙ্গে মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। সেই শব্দটা ঠিক কান্নার মতন।

আর-একজন সাহেব এগিয়ে এসে খুব নিষ্ঠুরভাবে প্রচণ্ড এক চড় কষাল বুড়ো রাজার গালে। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। সাহেবটা বুড়ো রাজার বুকের ওপর পা তুলে বলল, "একে এক্ষুনি মেরে ফেলব! এই বুড়োটাই যত নষ্টের মূল। এর হুকুমেই আমাদের একজন বন্ধুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এতক্ষণে আমাদেরও মেরে ফেলত।"

মেশিনগান-হাতে সাহেবটি বলল, "ওকে এক্ষুনি মেরো না, একটু পরে। ওর কাছ থেকে আরও কিছু খবর জানা যেতে পারে।"

যে লতা দিয়ে সাহেবদের বাঁধা হয়েছিল, সেই লতা দিয়েই ওরা বেঁধে ফেলল বুড়ো রাজাকে।

সেই অবস্থাতেও বুড়ো রাজা বললেন, "আমাকে মারার চেষ্টা কোরো না। তাহলে তোমরা একজনও বেঁচে ফিরতে পারবে না এখান থেকে। তোমরা যা চুরি করতে এসেছ, তাই নিয়ে ফিরে যাও!"

একজন সাহেব বুড়ো রাজার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল।

সন্তু আর কাকাবাবু সেই কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে মাটিতে শুয়ে পড়েছে।

মাটিতে শুয়ে থাকলে হঠাৎ গায়ে গুলি লাগে না। বুড়ো রাজার এই দুর্দশা দেখে ওরা শিউরে উঠল।

কাকাবাবু আফশোস করে বললেন, "ইস, আমার রিভলভারটা যদি এখন কাছে থাকত!"

সন্তু দেখল, খানিকটা দূরে মাটির ওপরে কাকাবাবুর রিভলভারটা পড়ে আছে। একজন সাহেবের পায়ের কাছে।

কিন্তু চারজন সাহেবের হাতে বন্দুক একজনের হাতে লাইট মেশিনগান, কাকাবাবু শুধু একটা রিভলভার নিয়ে কী করতেন?

একজন সাহেবের কাঁধে ঝোলানো আছে একটা ব্যাগ। সে সেটা খুলে ফেলল। তার মধ্য থেকে বেরুল অনেক কিছু। নানারকমের যন্ত্রপাতি আর একটা খুব মোটা ফিতের মতন জিনিস গোল পাকানো। সেটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, সেটা আসলে একটা বিরাট লম্বা ক্যাম্বিসের জলের পাইপ। তার একটা মুখ ধরে দু'জন সাহেব ছুটে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

একটু বাদেই সেই পাইপটা ফুলে উঠল আর তার অন্য মুখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল। আর দু'জন সাহেব সেটা নিয়ে গেল আগুনটার দিকে।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "ওরা ঝর্না থেকে জল আনছে।"

সন্তুও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওরা আগুন নেভাতে চাইছে কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "যে পাথরটা থেকে ঐ আগুন বেরুচ্ছে, সেটার সাংঘাতিক দাম। কোটি কোটি টাকা। ওরা সেটা চুরি করতে এসেছে। ওটা নিশ্চয়ই অন্য কোনও গ্রহের টুকরো কিংবা উল্কা। হয়তো ওর মধ্যে এমন অনেক নতুন ধাতু আছে, যা পৃথিবীর মানুষ কখনও দেখেনি। ওগুলো পেলে আমাদের বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম উল্টে যেতে পারে।"

সন্তু বলল, "সাহেবগুলো ঐ পাথরটা যে এখানে আছে তা জানল কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে কোথায় কখন উল্কাপাত হয়, অনেক বৈজ্ঞানিক তার খবর রাখেন। সবগুলোরই সন্ধান পাওয়া যায়, শুধু এটারই পাওয়া যায়নি। তবে এই লোকগুলো বৈজ্ঞানিক নয়। এরা যেমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর, তাতে মনে হয় এরা একটা ডাকাতের দল। কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছে।"

সন্তু বলল, "ওদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবীও তো রয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ পাঞ্জাবীটি ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা দিয়ে হাত করেছে ওকে।"

তারপর আর ওরা কথা বলতে পারল না। অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল আগুনের দিকে।

সাহেবরা পাইপে করে আগুনের মধ্যে জল ছোঁড়াতেই একটা আশ্চর্য সুন্দর জিনিস হল। আগুনের মধ্যে জল পড়তেই সেই জল লক্ষ লক্ষ রঙিন ফুলঝুরি হয়ে উঠে আসতে লাগল ওপরের দিকে। সমস্ত জায়গাটা লাল-নীল আলোয় ভরে গেল। আগুন নেভার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না।

সাহেবরা তবু থামবে না। তারা জল ছিটিয়েই যেতে লাগল। আর সন্তু একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল সেই ফুলঝুরি। এত সুন্দর রঙের খেলা সে কখনও দেখেনি। এখন আর ভয়ের কথা, বিপদের কথা তার মনে পড়ছে না।

কাকাবাবু বললেন, "ও আগুন এই পৃথিবীর নয়। পৃথিবীর জল দিয়ে ঐ আগুন নেভানো যাবে না। ঐ আগুনেই পাথরটা পুড়ে পুড়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে।"

সাহেবরা এবার একটা কৌটো থেকে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াতে লাগল আগুনে। তাতেও কাজ হল না কিছুই। পাউডারগুলো পড়তেই দপ্ করে এক-একটা শিখা বেরিয়ে আসতে লাগল।

তাতেও নিরাশ হল না সাহেবরা। এবার একটা সরু লম্বা গাছের গুঁড়ির কাছে গিয়ে মেশিনগানের গুলি চালাল পঁচিশ তিরিশটা। তারপর গাছটাকে ধরে কাৎ করতেই সেটা ভেঙে গেল মড়াত করে।

ওরা চারজনে মিলে সেই গাছটাকে বয়ে এনে আগুনের মধ্যে তার একদিকটা ঢুকিয়ে দিল অনেকখানি। গুম করে একটা শব্দ হল। পাথরটার গায়ে গাছটার ধাক্কা লেগেছে।

তখন সাহেবরা উৎসাহ পেয়ে গাছটাকে আবার বার করে এনে খানিকটা পিছিয়ে এল। তারপর জোরে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মারল আবার। আবার গুম করে শব্দ হল, আগুনের শিখাগুলো যেন নড়ে-চড়ে উঠল খানিকটা।

সন্তুরা দম বন্ধ করে দেখছে। তারা বুঝতে পেরেছে সাহেবদের মতলবটা কী! তারা গাছ দিয়ে ধাক্কা মেরে মেরে আগুনের ভেতর থেকে পাথরটাকে বার করে আনতে চাইছে। কিংবা আগুনসুদ্ধই পাথরটাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে ঝর্নার মধ্যে ফেলবে।

কিন্তু একটু পরেই আর একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হল। পাথরটা সহজে নড়ানো যায় না বলে ওরা খুব জোরে জোরে ধাক্কা মারছিল। এতবার ধাক্কা মারতে গিয়ে ঝোঁক সামলাতে না পেরে একজন সাহেব আগুনটার খুব কাছে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মতন আগুন তাকে টেনে নিল ভেতরে। ঠিক যেন একটা হাতের মতন একটা আগুনের শিখা বেরিয়ে টেনে নিয়ে গেল লোকটিকে। সে একটা বীভৎস চিৎকার করে উঠল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

শেষ মুহূর্তে সন্তু চোখ বুজে ফেলেছিল। আবার যখন চোখ মেলল, তখন দেখল, গাছটা ফেলে দিয়ে অন্য সাহেবরা ভয়ে পালিয়ে আসছে। কাকাবাবু

কপালের ঘাম মুছছেন।

সাহেবটা আগুনে পুড়ে যাবার সময় দূরের জারোয়ারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান হাতে সাহেবটি সেদিকে এক ঝাঁক গুলি চালাল।

বুড়ো রাজা হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই আবার হুকুমের সুরে চেঁচিয়ে বললেন, "ওদের মেরো না! আমি হুকুম দিলে ওরা তোমাদের এখনও শেষ করে দিতে পারে!"

সাহেবটা অসম্ভব রেগে গেল সেই কথা শুনে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বুড়ো বদমাশ, এবার তোকেই আগুনে পোড়াব। এই ল্যারি, এই বুড়োটাকে তুলে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দে তো!"

অন্য সাহেবরা কাছাকাছি এক জায়গায় হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন সঙ্গী তাদের চোখের সামনে আগুনে পুড়ে গেল! ব্যাপারটা ওরাও যেন সহ্য করতে পারছে না।

মেশিনগান-হাতে সাহেবটিই বোধহয় ওদের সর্দার। সে কিন্তু দমেনি। সে আবার চিৎকার করে বলল, "ল্যারি, এদিকে এসো, এই বুড়োটাকে আগুনে ফেলে দাও!"

ওপাশ থেকে ল্যারি উত্তর দিল, "জ্যাক, পাথরটা পাবার কোনও আশা নেই। ওটা খুনে আগুন। চলো, আমরা এবার পালাবার চেষ্টা করি। নইলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব!"

জ্যাক বলল, "পালাবার আগে প্রতিশোধ নিতে হবে। এই বুড়োটাকে আমার চোখের সামনে আগুনে পোড়াতে চাই। আমি জারোয়াদের দিকে মেশিনগান তুলে রাখছি, তুমি একে আগুনে ফেলে দাও!"

ল্যারি এগিয়ে এল।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "সন্তু, আমার রিভলভারটা..."

সন্তু বুকে হেঁটে আস্তে আস্তে এগোল। রিভলভারটা যেখানে পড়ে আছে, সাহেবটা সেখান থেকে খানিকটা দূরে। সন্তু মাটির ওপর দিয়ে শুয়ে শুয়ে গেলে বোধহয় ওরা তাকে দেখতে পাবে না।

এই সময় তিনবার কাক ডেকে উঠল।

অর্থাৎ ভোর হয়ে আসছে। আলো ফোটার আর বেশি দেরি নেই। আরও কয়েকটা পাখির ডাক, আরও কী যেন শব্দ হচ্ছে দূরে।

সন্তু রিভলভারটা নিয়ে ফিরে আসার সময় পেল না। ল্যারি এসে বুড়ো রাজাকে পাঁজাকালো করে তুলে নিতেই কাকাবাবু আর থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাঙারুর মতন লাফাতে লাফাতে ছুটে গেলেন ওদের কাছে। চিৎকার করে বললেন, "থামো, থামো! ওকে মেরো না!"

জ্যাক চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল কাকাবাবুকে। তারপর বলল, "এই আর

একটা শয়তান ! ধর এটাকেও !"

কাকাবাবুকে দেখে বুড়ো-রাজা শান্তভাবে বললেন, "আমি কিছুতেই ইংরেজের হাতে মরব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তোমার জন্য সেই অপমানের মৃত্যুই আমাকে মরতে হচ্ছে। তুমিও মরবে !"

কাকাবাবু ল্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে একজন জারোয়া আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় আমি এসে তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম, ঠিক কি না ? তুমি এই বুড়ো রাজাকে ছেড়ে দাও !"

ল্যারি তাকাল জ্যাকের দিকে। জ্যাক বলল, "এই দুটো বুড়োকেই আগুনের মধ্যে ফেলে দাও ! নইলে আমরা পালাবার সময় এরা আমাদের পেছনে জারোয়াদের লেলিয়ে দেবে।"

ল্যারি তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক ধমক দিয়ে বলল, "দেরি করছ কী ? দাও, ফেলে দাও !"

সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটা প্রচণ্ড ঘট্ ঘট্ শব্দ শোনা গেল। দূর থেকে শব্দটা এগিয়ে এল খুব কাছে। সবাই চমকে ওপরে তাকাল। একটা হেলিকপটার !

ল্যারি বলল, "জ্যাক, শিগগির পালাও ! হেলিকপটার নিয়ে পুলিশ এসেছে !

হেলিকপটার দেখে সন্তুরও মনে হল, নিশ্চয়ই তাদের উদ্ধার করার জন্যই ওটা এসেছে। আর কোনও চিন্তা নেই। সে উঠে সোজা হয়ে বসল।

জ্যাক দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "একটা মোটে হেলিকপটার এসেছে, তাতে ভয় পাবার কী আছে ? আমি এই মেশিনগান দিয়ে ওটাকে ফুঁড়ে দিচ্ছি এক্ষুনি। তোমরা সরে দাঁড়াও, কিংবা মাটিতে শুয়ে পড়ো !"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু—"

সন্তু বুঝতে পারল না, কাকাবাবু তাকে কী করতে বলছেন। হেলিকপটারটা নীচের দিকে নেমে আসছে। আর একটু নীচে নামলেই জ্যাক গুলি চালাবে। তাদের সব আশা শেষ হয়ে যাবে।

সন্তুর খুব কাছেই পড়ে আছে কাকাবাবুর রিভলভারটা। সে সেটা চট করে তুলে নিল। কোনও চিন্তা না করেই সে দুটো গুলি চালিয়ে দিল জ্যাকের দিকে। গুলির শব্দে তার নিজেরই কানে তালা লেগে গেল, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল হাতে। সে চোখ বুজে ফেলল ভয়ে।

আবার চোখ খুলে দেখল, জ্যাক মাটিতে পড়ে গেছে, আর কাকাবাবু মেশিনগানটা তার হাত থেকে তুলে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর কাকাবাবু সেটা বাকি সাহেবদের দিকে ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা সব চুপ করে সারি বেঁধে দাঁড়াও। কেউ একটু নড়বার চেষ্টা করলেই গুলি চালিয়ে শেষ করে দেব—"

ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দ করে হেলিকপটারটা ঘুরতে লাগল ওদের মাথার

ওপরে। একটু একটু করে নীচে নেমে আসছে। অনেকটা কাছে আসার পর সেটা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। কে যেন মাইকে বলছে, "আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা ! আকিলা কিলকিল টুংকা টাকিলা !"

সন্তু অবাক হয়ে গেল। এ আবার কী ?

সেই আওয়াজ শুনে জারোয়ারা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "টাকিলা ! টাকিলা !"

হেলিকপটার থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এল, "কাকিনা সুপি সুপি ! কাকিনা সুপি সুপি !"

এবার জারোয়ারা কোনও উত্তর দিল না। সবাই বুড়ো রাজার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বুড়ো রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কী বলছে ?"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ জিনিসটা থেকে কেউ একজন জারোয়া ভাষায় বলছে, মাঝখানে জায়গা ছেড়ে দিতে। ওটা এখানে নামবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাইকে আপনি সরে যেতে বলুন ! জায়গা করে দিতে বলুন !"

এবার হেলিকপটার থেকে ইংরিজিতে কেউ জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার ? মিঃ রায়চৌধুরী, আর ইউ দেয়ার ?"

কাকাবাবু চিৎকার করে বললেন, "ইয়েস, আই অ্যাম হিয়ার। রায়চৌধুরী স্পিকিং—"

কিন্তু হেলিকপটারের ঘ্যাটঘ্যাট আওয়াজে তাঁর কথা বোধহয় ওপরে পৌঁছল না, কারণ, ওরা সেই কথাই বারবার বলে যেতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের দিকে মেশিনগান তুলে রেখে, চোখ না সরিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, তোমার পকেটে রুমাল আছে ?"

রিভলভার থেকে গুলি চালাবার পর সন্তু আচ্ছন্নের মতন হয়ে মাটিতেই বসে ছিল। এবার সে তাড়াতাড়ি উঠে বলল, "হ্যাঁ আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই রুমালটা বার করে মাথার ওপরে ওড়াতে থাকো।"

সন্তু তার সাদা রুমালটা বার করে ডান হাতে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল।

কাকাবাবু সাহেবদের হুকুম করলেন, "তোমরা সব মাটিতে বসে পড়ো। প্রত্যেকে হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে রাখো।"

একজন সাহেব মাটিতে পড়ে থাকা একটা বন্দুকের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, একটু নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব !"

হেলিকপটারটা আস্তে-আস্তে ফাঁকা জায়গাটায় এসে নামল। প্রথমেই তার থেকে বেরিয়ে এল ধপধপে সাদা দাড়িওয়ালা একজন শিখ। সে হাত তুলে বলল, "টুংচা সংচু ! টুংচা সংচু !"

বুড়ো রাজা বললেন, "টুংচা সংচু !"

সঙ্গে-সঙ্গে সব জারোয়া সেই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল।

বৃদ্ধ শিখটি তখন হেলিকপটারের দিকে হাত নাড়তেই তার থেকে বেরিয়ে এল আরও কয়েকজন।

প্রথমেই লম্বা চেহারার কৌশিক ভার্মা, তারপর বেঁটে গোলগাল পরেশ দাশগুপ্ত, তারপর বিশাল গোঁফওয়ালা পুলিশের এস পি মিঃ সিং আর চারজন সৈন্য, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে মেশিনগান।

পরেশ দাশগুপ্ত ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে লাফাতে-লাফাতে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি বেঁচে আছেন ! আঃ, কী যে আনন্দ হচ্ছে ! এই দেখুন, হোম সেক্রেটারি কৌশিক ভার্মা নিজে এসেছেন আপনাকে উদ্ধার করতে।"

কাকাবাবুর আনন্দ হলেও মুখে তা প্রকাশ করেন না। কৌশিক ভার্মাকে দেখে তিনি বললেন, "আপনার সোলজারদের বলুন, এই সাহেবগুলোকে ঘিরে ফেলতে। আমি আর এই ভারী মেশিনগানটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না !"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "এরা কারা ?"

কাকাবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "এরা ডাকাত !"

কৌশিক ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "জারোয়াদের মধ্যে ডাকাতি করতে এসেছে ? কিসের লোভে ? এদের কাছে কি সোনা আছে ? হীরে আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সে সব কিছু নেই। কিন্তু এইটা আছে।"

কাকাবাবু সেই রঙিন আগুনটার দিকে হাত দেখালেন।

দিনের আলো ফুটে উঠেছে। এই সময় আগুনের রঙ বদলে যায়। এই আগুনটার রঙ কিন্তু একইরকম আছে।

কৌশিক ভার্মা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "আশ্চর্য ! এরকম আগুন কখনও দেখিনি। সাহেবরা এটা চুরি করতে এসেছিল ? এটা কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে সব পরে বলব। আপনি জারোয়াদের দ্বীপে এসেছেন, আগে এখানকার রাজাকে নমস্কার করুন ! ইনিই জারোয়াদের রাজা !"

হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বুড়ো রাজার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কৌশিক ভার্মা আরও অবাক হয়ে বললেন, "ইনি রাজা ? মাই গড ! ইনি তো জারোয়া নন ?"

কৌশিক ভার্মা হাত জোড় করে নমস্কার করলেন বুড়ো রাজাকে।

কাকাবাবু বললেন, "না, ইনি জারোয়া নন। এঁর নাম গুণদা তালুকদার।"

বুড়ো রাজা আস্তে আস্তে বললেন, "সাহেবগুলোকে ভাল করে বেঁধে

ফেলতে বলুন। এরা সাঙ্ঘাতিক লোক। আপনারা চলুন, আমার ঘরে বসে কথা বলা যাক।"

কাকাবাবু পরেশ দাশগুপ্তর কাঁধে ভর দিয়ে বুড়ো রাজার কুঁড়েঘরের দিকে এগোলেন। বুড়ো রাজা যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সন্তুকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলেন।

সন্তু কাছে যেতেই বুড়ো রাজা তার মাথায় খুব স্নেহের সঙ্গে হাত বোলাতে লাগলেন, তারপর কৌশিক ভার্মাকে বললেন, "এই ছেলেটি না-থাকলে আজ আমরা কেউ বাঁচতুম না। আপনারাও বাঁচতেন না।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "তাই নাকি ? কেন ? এ কী করেছে ?"

বুড়ো রাজা বললেন, "ঐ একজন সাহেবের হাতে মেশিনগান ছিল, সে গুলি চালিয়ে আপনাদের ঐ ফড়িঙের মতন যন্ত্রটায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারত।"

বুড়ো রাজা আগে কখনও হেলিকপটার দেখেননি, তাই নাম জানেন না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "তা হয়তো পারত। সাহেবগুলো মেশিনগান নিয়ে ডাকাতি করতে এসেছে, এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকাতি ?"

বুড়ো রাজা বললেন, "সাহেবগুলো আমাকে আর ওর কাকাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সময় এই ছেলেটি রিভলভারের গুলি চালিয়ে সাহেবটির হাত থেকে মেশিনগানটা ফেলে দেয়। তাই তো আমরা সবাই বেঁচে গেলাম।"

কৌশিক ভার্মা প্রশংসার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে। তারপর তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "ব্রেভ বয় ! এইটুকু ছেলে রিভলভার চালাতে জানে ? টিপও নিশ্চয়ই খুব ভাল।"

সন্তু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে তো এমন কিছু করেনি। আনতাবড়ি একবার রিভলভার চালিয়ে দিয়েছে। সে যে এর আগে কখনও রিভলভার চালায়নি সে কথা আর বলল না।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "হি মাস্ট গেট আ রিওয়ার্ড। আমরা শুধু জারোয়াদেরই ভয় পেয়েছিলাম, সাহেব ডাকাতদের কথা ভাবিইনি। সত্যিই সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়ে যেতে পারত। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন ?"

কথা বলতে-বলতে ওঁরা ঢুকলেন কুঁড়েঘরের মধ্যে। সেখানে সেই গীতা বইটি আর বহুকালের পুরনো একজোড়া হাতকড়া দেখে কৌশিক ভার্মা আবার চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, "আমরা জানতাম, সভ্য জগতের সঙ্গে জারোয়াদের কোনও সম্পর্কই নেই, অথচ দেখছি, তাদের রাজা একজন লেখাপড়া-জানা মানুষ !"

কাকাবাবু মাটির ওপরে বসে পড়েছেন। সেখান থেকে তিনি বললেন, "এই

গুণদা তালুকদার এক সময় ছিলেন একজন নামকরা বিপ্লবী। আন্দামান জেল থেকে ইনি পালিয়ে যান। সে বহু-বহু বছর আগেকার কথা। সকলের ধারণা ইনি মারা গেছেন। স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রত্যেক বইতে এঁর নাম আছে, ছবি আছে। এঁর জন্মদিনে উৎসব হয়!"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, এখন আমারও মনে পড়েছে। এ যে দারুণ ব্যাপার। দিল্লিতে ফিরে গিয়ে এই খবর দিলে তো বিরাট হৈচৈ পড়ে যাবে! কিন্তু আপনি এখানে এলেন কী করে?"

বুড়ো রাজা বললেন, "এই হাতকড়ি বাঁধা অবস্থাতেই জেল থেকে পালিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাঙরে কুমিরে খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু খায়নি। ভাসতে-ভাসতে এসে ঠেকেছিলাম এই দ্বীপে।"

"জারোয়ারা আপনাকে মারেনি?"

"জারোয়ারা এমনি-এমনি কাউকে মারে না। এরা অত্যন্ত সভ্য। তোমরাই এদের হিংস্র বানিয়েছ।"

"তারপর থেকে আপনি এখানে থেকে গেলেন?"

"হ্যাঁ। আমি পরাধীন ভারতবর্ষে থাকব না ঠিক করেছিলাম, তাই এখানে এদের নিয়ে স্বাধীন হয়ে থেকেছি। আমি আর বাইরের কোনও খবর রাখিনি।"

"এই আন্দামানে তো নেতাজী এসেছিলেন, কিছুদিনের জন্য স্বাধীন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, তাও জানেন না!"

"এই দ্বীপের বাইরের কোনও খবরই আমি রাখি না। ইচ্ছে করেই রাখতে চাইনি। আমি যে এখানে আছি, তা জানতে পারলেই ইংরেজ সরকার আবার আমাকে বন্দী করত। সুভাষবাবু যে কবে নেতাজী হলেন, একটু আগে পর্যন্ত তাও জানতাম না!"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য! কিন্তু গোটা ভারতবর্ষই তো অনেক দিন স্বাধীন হয়ে গেছে! আপনি সে খবরও পাননি?

কাকাবাবু বললেন, "উনি সে-কথাও বিশ্বাস করতে চাইছেন না। শুনুন, এই কৌশিক ভার্মা, ইনি গভর্নমেন্টের একজন বড় অফিসার। এঁকে জিজ্ঞেস করুন, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সেই সাতচল্লিশ সালে। আপনি জওহরলাল নেহরুর নাম শুনেছিলেন তো?"

বুড়ো রাজা বললেন, "হ্যাঁ। মতিলাল নেহরুর ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিল।"

"সেই জওহরলাল হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। সে-ও তিরিশ বছর আগে।"

"গান্ধী কোথায়?"

"গান্ধীজী মারা গেছেন স্বাধীনতার এক বছর পরে। আপনাদের সময়কার

প্রায় কেউ-ই বেঁচে নেই। চলুন, আপনি দিল্লি চলুন, সেখানে গিয়ে সব শুনবেন !"

বুড়ো রাজা ভুরু তুলে বললেন, "কোথায় যাব ? দিল্লি ? কেন ? আমি কোথাও যাব না—"

"সে কী, আপনি এখনও এখানে থাকতে চান ?"

"নিশ্চয়ই ! আমি এখানে জারোয়াদের নিয়ে পরম শান্তিতে আছি।"

"আপনি স্বাধীন দেশে একবার ঘুরে আসতেও চান না ? আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজন হয়তো এখনও বেঁচে আছে, তাদেরও দেখতে চান না একবার ?"

"না।"

বুড়ো রাজা কিছুতেই তাঁর জারোয়া-রাজ্য ছেড়ে আর যেতে চান না কোথাও। কাকাবাবু আর কৌশিক ভার্মা অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনবেন না। শেষে একবার রেগে উঠে বললেন, "আপনারা যদি আমাকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে যেতে চান, সেটা আলাদা কথা ! তবুও সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে জোর করে নিতে গেলে সব জারোয়া একসঙ্গে মিলে বাধা দেবে। তারা প্রাণ দিয়েও আমাকে বাঁচাতে চাইবে।"

কৌশিক ভার্মা বললেন, "না, না, আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব কেন ? আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। আপনি দেশ স্বাধীন করার জন্য এত কষ্ট করেছেন। কিন্তু আমরা ফিরে গিয়ে যখন আপনার কথা বলব, কেউ বিশ্বাস করবে না !"

সন্তু হঠাৎ বলে উঠল, "ছবি তুলে নিয়ে গেলে সবাই বিশ্বাস করবে।"

কাকাবাবু রাগ করে সন্তুর দিকে তাকালেন, সন্তু থতমত খেয়ে গেল। সে বুঝতে পারেনি, সে ভুল কথা বলে ফেলেছে।

সাদা দাড়িওয়ালা প্রীতম সিং এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। এবারে তিনি বললেন, "কেয়া তাজ্জব কি বাত্ ! আমি এতদিন জারোয়াদের সঙ্গে কথা বলেছি, কোনওদিন তারা জানতেও দেয়নি যে, তাদের একজন বাংগালী রাজা আছে। সেইজন্যই তারা বেশি ভেতরে ঢুকতে দিত না।"

বুড়ো রাজা বললেন, "সেটাই ছিল আমার হুকুম।"

কাকাবাবু হতাশভাবে বললেন, "তাহলে আপনি কিছুতেই যাবেন না ?"

বুড়ো রাজা বললেন, "না।"

সন্তু কিছু না বুঝে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো রাজার হাত ধরে বলল, "আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে ! একবারটি গিয়ে সব দেখে শুনে আবার এখানে ফিরে আসবেন। জানেন, হাওড়া স্টেশনে মাটির তলা দিয়ে রাস্তা হয়েছে, আপনি তো সেসব দেখেননি !"

বুড়ো রাজা হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। সন্তুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে, তুই আমাকে একথা বললি কেন ? তোর মতন আমার একটা ছোট ভাই ছিল,

ভেলে আসবার আগে তাকে ঠিক এই বয়েসী দেখে এসেছি। তোকে দেখেই তার কথা মনে পড়ছে !"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো আপনার সেই ভাই এখনও বেঁচে আছেন। আপনি গেলে তাকে দেখতে পাবেন !"

বুড়ো রাজা একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তার দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর চোখের জল মুছে বললেন, "ঠিক আছে, আমি যাব ! কিন্তু তার আগে তোমাদের কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে !"

কাকাবাবু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন !"

বুড়ো রাজা বললেন, "তোমাদের কথা দিতে হবে, আমার এই জারোয়াদের কেউ কোনও ক্ষতি করবে না। এই দ্বীপে অন্য কেউ আসতে পারবে না। জারোয়াদের ঐ পবিত্র আগুন তোমরা নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। ওরা যে-রকমভাবে বাঁচতে চায়, সেইরকমভাবে থাকতে দেবে।"

কাকাবাবু তাকালেন কৌশিক ভার্মার দিকে।

কৌশিক ভার্মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "আমি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, এগুলো সব মানা হবে। এগুলোই তো আমাদের নীতি।"

বুড়ো রাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে, তা হলে চলো, কিন্তু কয়েকদিন থেকেই আমি আবার ফিরে আসব কিন্তু !"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই। আমি নিজে সব ব্যবস্থা করে দেব।"

বাইরে প্রত্যেকটি সাহেবের হাত পিঠের দিকে মুড়ে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। সন্তু যে সাহেবটিকে গুলি করেছিল, সেও মরেনি, দুটো গুলিই লেগেছে তার কাঁধে। হেলিকপটারে কিছু ওষুধপত্র ছিল, তাই দিয়ে তাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের পাহারায় সাহেবদের পাঠিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের দিকে। ওখান থেকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে ওদের।

বাকিরা সবাই হেলিকপটারে যাবে।

কিন্তু বুড়ো রাজাকে হেলিকপটারে তোলার সময় সে একটা দৃশ্য হল বটে। বুড়ো রাজা জারোয়াদের ভাষায় বুঝিয়ে বললেন ওঁর চলে যাবার কথা। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি জারোয়া মাটিতে মুখ গুঁজে একটা অদ্ভুত করুণ শব্দ করতে লাগল। এই ওদের কান্না। কান্নার সময় ওরা কারুকে মুখ দেখায় না। কয়েকটি জারোয়া মেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বুড়ো রাজাকে। তারা কিছুতেই ওঁকে যেতে দেবে না। তিনি হাত-পা নেড়ে অনেক কষ্টে ওদের বোঝাতে লাগলেন, তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়ছে। তিনি মাটিতে মুখ-গোঁজা প্রত্যেকটি জারোয়ার গায়ে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, "আমি ফিরে আসব, ক'দিনের মধ্যেই ফিরে আসব !"

কৌশিক ভার্মা কাকাবাবুকে বললেন, "মানুষ মানুষকে যে এত ভালবাসতে

পারে, আগে কখনও দেখিনি। এদের ভালবাসা কত আন্তরিক !”

কাকাবাবু বললেন, “হুঁ !”

তারপর এক সময় হেলিকপটার আকাশে উড়ল। সমস্ত জারোয়া একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল, বুড়ো রাজাও হাত নাড়তে লাগলেন তাদের দিকে। একটু বাদেই হেলিকপটার চলে এল সমুদ্রের ওপর।

পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছতে বেশি দেরি লাগল না। দূর থেকেই দেখা যায় জেলখানাটা। ব্রিটিশ আমলের কুখ্যাত সেলুলার জেল। পোর্ট ব্লেয়ারে এখনও সেটাই সবচেয়ে উঁচু বাড়ি। আকাশ থেকে সেদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বুড়ো রাজা। একদিন তিনি এই জেল থেকে পালিয়েছিলেন। আজ সত্যিই সেখানে রাজার মতন ফিরে আসছেন।

পোর্ট ব্লেয়ারে থাকা হল মাত্র একদিন। এর মধ্যে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হল কলকাতা আর দিল্লিতে। ঠিক হল, কলকাতায় প্রথমে তিনি তিনদিন থাকবেন। তারপর যাবেন দিল্লিতে। সেখানে যে ক'দিন তাঁর থাকতে ইচ্ছে হয় তিনি থাকবেন। তারপর যেদিন ফিরে আসতে চাইবেন, সেদিন আবার কলকাতা হয়ে ফিরবেন।

পরদিন বিশেষ বিমান ওঁদের নিয়ে এল কলকাতায়। দমদম এয়ারপোর্টে কী সাঙ্ঘাতিক ভিড়। হাজার হাজার মানুষ এসেছে জারোয়াদের রাজাকে দেখতে। আরও কত খবরের কাগজের লোক, ফটোগ্রাফার। আলোর ঝিলিক দিয়ে ফটো উঠছে ঘন ঘন। সন্তুরও ছবি উঠে যাচ্ছে খুব, কারণ বুড়ো রাজা তারই কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কিনা !

মাঝে মাঝেই ধ্বনি উঠছে, “গুণদা তালুকদার জিন্দাবাদ !”

এয়ারপোর্টে সন্তুর মা-বাবা, দুই দাদা, পাশের বাড়ির রিনি, বাবলু, পিংকুরাও এসেছে, কিন্তু সন্তু তো এক্ষুনি বাড়ি যাবে না। বুড়ো রাজার সঙ্গে এখন তাদেরও যেতে হবে রাজভবনে, সেখানে গভর্নর তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে মধ্যাহ্নভোজ খাওয়াবেন। লাটসাহেবের বাড়ি খাওয়া তো যে-সে কথা নয়।

লোকেরা এত ফুলের মালা দিচ্ছেন যে, তার ভারেই আরও ঝুঁকে পড়ছেন বুড়ো রাজা। এত ভিড়ের মধ্যে তাঁর কষ্ট হবে বলে কৌশিক ভার্মা তাড়াতাড়ি তাঁকে গাড়িতে তুললেন। কাকাবাবু আর সন্তুও সেই গাড়িতে।

গাড়ি এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। আবার কলকাতায় ফিরে সন্তুর খুব আনন্দ হচ্ছে। এবার যে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে তাতেই খুব সন্দেহ ছিল।

সন্তু বুড়ো রাজাকে বলল, “জানেন তো, এই রাস্তাটার নাম ভি আই পি রোড। আপনাদের সময় তো এটা ছিল না।”

বুড়ো রাজা কোনও উত্তর দিলেন না।

কাকাবাবু বললেন, “তখন এসব জায়গাতেও জঙ্গল ছিল।”

গাড়ি চলতে লাগল, আর সন্তু নানান রকম খবর দিতে লাগল বুড়ো রাজাকে। এটা বিধান রায়ের মূর্তি, ঐ যে ঐখানে শিশু উদ্যান, এই জায়গাটার নাম কাঁকুড়গাছি...

বুড়ো রাজা একটাও কথা বলছেন না।

গাড়ি মানিকতলা পেরিয়ে যখন বিবেকানন্দ রোড দিয়ে ছুটছে সেই সময় বুড়ো রাজা হঠাৎ "উঃ" শব্দ করে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

কৌশিক ভার্মা ও কাকাবাবু দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে বললেন, "কী হল ? কী হল ?"

বুড়ো রাজা উত্তর না দিয়ে 'আঃ আঃ' শব্দ করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কৌশিক ভার্মা বললেন, "এ কী ! উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "সামনেই আমার এক বন্ধুর ডাক্তারখানা। ঐ যে ল্যাম্পপোস্টের পাশে—ওখানে গাড়ি থামান !"

কাকাবাবুর বন্ধু ডাক্তার, সামনেই তিনি বসে আছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে বুড়ো রাজাকে ভেতরের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল।

ডাক্তারের ওষুধে একটু পরেই জ্ঞান ফিরল বুড়ো রাজার। ডাক্তারবাবু বললেন, "ওঁকে এক্ষুনি কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা ভাল নয়।"

বুড়ো রাজা বললেন, "না, না—"

কাকাবাবু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আপনার কষ্ট হচ্ছে ? হাসপাতালে গেলেই ভাল হয়ে যাবেন। এখন কলকাতায় ভাল ভাল হাসপাতাল আছে।"

বুড়ো রাজা বললেন, "না, না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো !"

"ফিরে যাবেন ? হ্যাঁ, যাবেন, কয়েকদিন পরে—"

বুড়ো রাজা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "না, এক্ষুনি। তোমাদের এখানে আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না ! এখানকার বাতাস এত খারাপ, এখানে এত শব্দ, এত মানুষ, এত বাড়ি...আমার সহ্য হচ্ছে না...রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে দেখলাম মানুষ ভিক্ষে করছে, রোগা রোগা ছেলে, না না, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো..."

কাকাবাবু কিছু বলতে গেলেন, তার আগেই দু'বার হেঁচকি তুললেন বুড়ো রাজা। অতি কষ্টে ফিসফিস করে বললেন, "আমি পারছি না। এখানে থাকতে পারছি না, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এত ধুলো এখানকার বাতাসে, এত শব্দ..."

বুড়ো রাজা জোর করে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই পড়ে গেলেন। সবাই ধরাধরি করে আবার শুইয়ে দিলেন তাঁকে। বুড়ো রাজার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। খুব আস্তে আস্তে আপন মনে বলতে লাগলেন, "আমি কেন এলাম !

কত ভাল জায়গায় ছিলাম আমি···সেখানে বাতাস কত টাটকা···পাখির ডাক, গাছের পাতার শব্দ, আর ঝর্নার জলের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই, সেখানে কেউ ভিক্ষে করে না, সেখানে কত শান্তি, সেই তো আমার স্বর্গ! কেন এলাম, আমাকে নিয়ে চলো। ···এক্ষুনি এক্ষুনি···আমি যাব···আঃ!"

হঠাৎ বুড়ো রাজার কথা থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সকলের মুখগুলোও কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, উনি কি···"

কাকাবাবু কিছু উত্তর দিলেন না। মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। সন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল, কাকাবাবুর চোখে জল।

সেও আর সামলাতে পারল না। শব্দ করে কেঁদে উঠল।

পাহাড়
চূড়ায়
আতঙ্ক

উঃ, কী শীত, কী শীত ! এখানকার হাওয়ার যেন ভয়ঙ্কর দাঁত আছে, শরীর কামড়ে ধরে একেবারে। সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে একবার কাশ্মীরেও গিয়েছিল, কিন্তু সেখানকার শীতের সঙ্গে এখানকার শীতের যেন তুলনাই হয় না।

হাওয়ার ভয়ঙ্কর দাঁত আছে, এ কথাটা সন্তুরই মনে পড়েছিল। গরম জামা-কাপড় দিয়ে শরীরের সব জায়গা ঢাকা যায়, শুধু নাকটা ঢাকা যায় না। আর কোনও জায়গা খালি না পেয়ে হাওয়া যেন বারবার সন্তুর নাকটা কামড়ে ধরছে। এবং এক সময় মনে হচ্ছে নাকটা আর নেই। গ্লাভস পরা হাত দিয়ে সন্তু মাঝে-মাঝে দেখছে যে, হাওয়াতে তার নাকটা সত্যিই কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে কি না।

তারপর এক সময় সে হঠাৎ বলে উঠল, "দূর ছাই ! আমিও আবার দাঁতের কথা ভাবছি কেন ! আর ভাবব না, কিছুতেই ভাবব না।"

একটা দাঁতের জন্যই এবার এতদূর ছুটে আসা।

জায়গাটার নাম গোরখশেপ। এসব জায়গার নাম কে রাখে কে জানে ! জায়গা মানে কী, বাড়িঘর গাছপালা কিছুই নেই, শুধু পাথর আর বরফ। তবে, চারদিকের উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মধ্যে এই জায়গাটা খানিকটা সমতল। এখানে-সেখানে পড়ে আছে কিছু পোড়া কাঠ, আর অনেক খালি-খালি টিনের কৌটো, তার কোনওটা দুধের, কোনওটা কড়াইশুঁটির, কোনওটা শুয়োরের মাংসের। মাঝে-মাঝেই এই জায়গায় এভারেস্ট-অভিযাত্রীরা তাঁবু গেড়ে থাকে। কয়েকদিন আগেও এখানে ছিল ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের বেস ক্যাম্প।

সামনেই একটা ছোট পাহাড়, তার নাম কালাপাথর। সেটার ওপরে উঠলেই এভারেস্ট-চূড়া স্পষ্ট দেখা যায়। এভারেস্ট ! পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ ! সন্তু রোজ সেই এভারেস্ট-শৃঙ্গকে দেখছে ! তার বয়েসি আর কোনও বাঙালির ছেলে এভারেস্টকে এত কাছ থেকে দেখেনি, নিশ্চয়ই দেখেনি !

সন্তু এবার সঙ্গে এনেছে একটা ক্যামেরা, সে নিজে এভারেস্টের ছবি তুলেছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে সেই ছবির রীল ডেভেলপ আর প্রিন্ট করাবার

জন্য সন্তু ছটফট করে। কিন্তু কবে যে কলকাতায় ফেরা হবে, তার কিছুই ঠিক নেই। এক-এক সময়, বিশেষত রাত্তিরের দিকে, মনে হয়, হয়তো আর ফেরাই হবে না কোনওদিন।

দিনের বেলা ভয় করে না, শীতও তেমন বেশি লাগে না। যখন রোদ ওঠে, তখন বরফের ওপর রোদ ঠিকরে এমন ঝকমক করে যে, খালি চোখে সেদিকে তাকালে যেন চোখ ঝলসে যায়। সেই জন্য সন্তুকে দিনের বেলা রঙিন চশমা পরে থাকতে হয়। কাকাবাবুও সেই রকম পরেন। অথচ নেপালিরা দিব্যি খালি চোখেই সব সময় ঘোরাফেরা করে, তাদের কিছু হয় না।

এখানে সন্তুদের সঙ্গে সাতজন নেপালি রয়েছে, দু'জন শেরপা আর পাঁচজন মালবাহক। তারা থাকে পাশের দুটো তাঁবুতে। সন্তু আর কাকাবাবু থাকেন একটা পাথরের গম্বুজে।

এই জনমানবশূন্য জায়গাটায় এরকম একটা পাথরের গম্বুজ কে বানিয়েছিল, তা এখন আর কেউ বলতে পারে না। গম্বুজটা প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। মোটা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। একতলাটা বেশ চওড়া, তাতে দু'জন মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে। ভেতর দিয়েই উঠে গেছে সিঁড়ি, একদম চূড়ার কাছে একটা ছোট্ট চৌকো জানলা, সেখান দিয়ে আসে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু সে জানলাটাকে কিছু দিয়ে বন্ধ করার উপায় নেই, তা হলে ভেতরে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতে হবে।

শেরপারা বলে যে, এই গম্বুজটা হাজার-হাজার বছর ধরে রয়েছে এখানে। কিন্তু কাকাবাবুর ধারণা, এটার বয়েস একশো বছরের বেশি হবে না। এবং এটা নিশ্চয়ই কোনও সাহেবের তৈরি। গম্বুজটাতে ঢোকার জন্য রয়েছে একটা শক্ত লোহার দরজা। খুব সম্ভবত কোনও সাহেব এখানে বসে এভারেস্টের দৃশ্য দেখবার জন্য এটা বানিয়েছিল। পাহাড় সম্বন্ধে উৎসাহ বা পাগলামি সাহেবদেরই বেশি।

কিন্তু ওপরের জানলাটা দিয়ে এভারেস্ট দেখা যায় না। কালাপাথর নামের ছোট পাহাড়টায় একটুখানি আড়াল পড়ে যায়। তাও কাকাবাবু বলেন, এখন দেখা না-গেলেও একশো-দেড়শো বছর আগে হয়তো এখান থেকেই এভারেস্ট দেখা যেত। এখানকার ভূপ্রকৃতির মধ্যে নানারকম পরিবর্তন চলছে অনবরত। কোনও পাহাড়ের চূড়া ভেঙে পড়েছে, কোনও জায়গা বসে যাচ্ছে, কোনও জায়গায় হয়তো হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোথা থেকে একটা নদী এসে বইতে শুরু করেছে।

সন্তু নিজেই তো এরই মধ্যে একটা দুর্দান্ত ব্যাপার দেখেছিল। সেটা অবশ্য এই জায়গা থেকে নয়। সেই জায়গাটার নাম কুন্ড, অনেকটা পেছন দিকে।

কুন্ড একটা ছোটখাটো গ্রামের মতন, একটা ছোট হাসপাতাল আর ইস্কুলও আছে। সেখানে সন্তুরা দুদিন ছিল বিশ্রাম নেবার জন্য। একদিন বিকেলবেলা

হঠাৎ এমন সাঙ্ঘাতিক শব্দ হল যেন দশখানা জেট প্লেন এক সঙ্গে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে কিছুই নেই। আকাশে মেঘও নেই যে, বজ্রপাত হবে। কিছু নেপালি যেন ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করছে। কাকাবাবু বসে ছিলেন সামনের মাঠে একটা কাঠের টুলে, তিনি উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে সন্তুকে ডাকলেন কাছে আসবার জন্য।

সন্তু বাড়ি ছেড়ে দৌড়ে গেল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "ওই দ্যাখ! এরকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা!"

সন্তু সামনে তাকিয়ে দেখেছিল যে, অনেক দূরে, অন্তত পাঁচ ছ'মাইল তো হবেই, এক জায়গায় পাহাড় জুড়ে শুধু সাদা রঙের ধোঁয়া, আর সেই কান-ফাটানো শব্দটা আসছে ওখান থেকেই।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "ওখানে কী হচ্ছে কাকাবাবু?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "বুঝতে পারলি না?" আভালান্স্? পাহাড়ের মাথা থেকে হিমবাহ ভেঙে পড়ছে!"

বরফ ভাঙার ঐ রকম প্রচণ্ড শব্দ হয়! হাজার-হাজার লোহার হাতুড়িতে ঠোকাঠুকি করলেও এত জোর শব্দ হবে না। সাদা রঙের ধোঁয়া ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে লাগল চারদিকে। ঝড়ের মতন হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছিল সন্তুদের গায়ে। দু'ঘণ্টার মধ্যেও সেই শব্দ থামল না।

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, ঐ হিমবাহ ভেঙে গড়িয়ে এখানে চলে আসতে পারে না?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আসতে পারে। মাঝখানে একটা নদী আছে। সেটা যদি ভরে যায়—"

সন্তু বলেছিল, "এখানে এসে পড়লে কী হবে?"

কাকাবাবু খুব শান্তভাবে বলেছিলেন, "কী আর হবে, আমরা চাপা পড়ে যাব। মাঝে-মাঝেই তো কত গ্রাম এইভাবে চাপা পড়ে যায়।"

কাকাবাবুর সেই উত্তরটা এখনও সন্তুর কানে বাজে। ভয় বলে কোনও জিনিসই যেন কাকাবাবুর নেই। হিমবাহ এসে চাপা দিয়ে দেওয়াটাও যেন কাকাবাবুর কাছে খুব একটা সাধারণ ব্যাপার।

এখানে এই গম্বুজের মধ্যে শুয়ে থেকেও সন্তু মাঝে-মাঝে দূরের কোনও জায়গার গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পায়। কোথাও হিমবাহ ভাঙছে। যদি এখানেও এসে পড়ে? হিমবাহের এমনই শক্তি যে, এই শক্ত পাথরের গম্বুজটাকেও নিশ্চয়ই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিংবা যদি নাও ভাঙে, যদি গম্বুজটার চূড়া পর্যন্ত বরফে ঢেকে যায়? তাহলেও তো তারা এখান থেকে আর কোনওদিন বেরুতে পারবে না!

গম্বুজটা অন্য সময় নেপাল গভর্নমেন্ট বন্ধ করে রাখেন। কাকাবাবু বিশেষ অনুমতি নিয়ে এটা খুলিয়ে এখানে আস্তানা গেড়েছেন। এখানে সন্তুদের ছ'দিন কেটে গেল।

দিনের বেলা তবু এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করা যায়। সন্ধে হয়ে গেলেই আর কিছু করার নেই। গম্বুজের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে চেন টেনে দিলে সন্তুর চেহারাটা হয়ে যায় একটা পাশবালিশের মতন। সেই অবস্থায় আর নড়াচড়া করা যায় না।

কিন্তু সন্ধে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো ঘুমিয়ে পড়া যায় না। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়, কিন্তু বই পড়বার উপায় নেই। ঘরে আলো আছে যথেষ্ট। ব্যাটারি দেওয়া এক ধরনের হ্যাজাক লণ্ঠন এনেছেন কাকাবাবু বিলেত থেকে, তাতে ঠিক নিয়ন আলোর মতন আলো হয়। গম্বুজের মধ্যে সেই আলো জ্বলছে। বইটা পাশে রেখে কাত হয়ে পড়া যায়, কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে হাত বার করা যায় না বলে বইয়ের পাতা ওল্টানো যায় না। বারবার চেন খুলে হাত বার করতে গেলেই ভেতরে হাওয়া ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য এমন শীত করে যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

তার সমস্ত সোয়েটার, কোট, মাফলার গায়ে দিয়েও সন্তু কিছুতেই সন্ধে সাড়ে সাতটার পর আর স্লিপিং ব্যাগের বাইরে থাকতে পারে না। কিন্তু কাকাবাবু পারেন। কাকাবাবুর শরীরে যেমন ভয় নেই, তেমনি বোধহয় শীতবোধও নেই। রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত কাকাবাবু চামড়ার জ্যাকেট গায়ে দিয়ে গম্বুজের চূড়ার কাছে বসে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকেন বাইরে। কখনও-কখনও মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙলেও কাকাবাবু স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে একবার গম্বুজের ওপরটা থেকে ঘুরে আসেন। একজন খোঁড়া লোকের এতখানি উৎসাহ আর ক্ষমতা, চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ সন্তু জুলজুল করে চেয়ে থাকে আর কলকাতার কথা ভাবে। সাড়ে সাতটা, আটটা মোটে বাজে, এখন কলকাতায় কত হৈ-চৈ। কতরকম গাড়ির আওয়াজ, রাস্তাঘাট মানুষের ভিড়ে গমগম করে। আর এখানে কোনও রকম শব্দ নেই। এ জায়গাটা যেন পৃথিবীর বাইরে।

কাকাবাবু নীচে না এলে বাতিটা নেভানো যাবে না। চোখে আলো লাগলে কাকাবাবুর ঘুম হয় না বলে উনি হ্যাজাকটা নিভিয়ে দেন। কিন্তু ওটা সারা রাত জ্বালা থাকলেই সন্তুর বেশি ভাল লাগত। অন্ধকার হলেই শরীরটা কেমন যেন ছমছম করে। ঠিক ভয় নয়, আন্দামানে গিয়ে সন্তু আর কাকাবাবু, যেরকম বিপদে পড়েছিল, সেরকম কোনও বিপদের সম্ভাবনা তো এখানে নেই। হিমবাহ ভেঙে আসার একটা ভয় আছে বটে, কিন্তু একশো বছর এখানে এই গম্বুজটা টিকে আছে যখন, তখন হঠাৎ এই সময়েই হিমবাহ এসে এটাকে

ওড়িয়ে দেবে, তা ঠিক বিশ্বাস হয় না। অবশ্য কিছুই বলা যায় না। তবু সেজন্যও নয়, এত বেশি চুপচাপ বলেই সব সময় একটা ভয়ের অনুভূতি থাকে।

কাকাবাবুর যে কী উদ্দেশ্য, তা সন্তু এখনও কিছুই বুঝতে পারছে না। এখানে দিনের পর দিন এই গম্বুজের মধ্যে বসে থাকার কী মানে হয়! শেরপা দু'জন আর মালবাহকরাও বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। এই নেপালিরা খুব কাজ ভালবাসে, পরিশ্রম করতেও পারে খুব, এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকা যেন ওদের সহ্য হয় না। গত পাঁচ ছ'দিন ধরে ওরা শুধু রান্না করে খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। এদের সর্দারের নাম মিংমা, তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে সন্তুর। মিংমার বয়েস ৩৪/৩৫ হবে, ঠিক যেন বাদামি রঙের পাথর দিয়ে গড়া ওর শরীর। এর আগে একটি অভিযাত্রী-দলের সঙ্গে এভারেস্টের খুব কাছে ও পৌঁছেছিল। ওর খুব শখ একবার এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার। মিংমা সন্তুকে ডেকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, "আংকেলের কী মতলব? আংকেল এখানে থেমে রইলেন কেন? এভারেস্টের দিকে যাবেন না?"

সন্তু এসব কথার কিছুই উত্তর দিতে পারে না।

দিনের বেলা রোদ থাকলে সন্তু এদিক-ওদিক বেড়াতে যায়। কিন্তু কাকাবাবু তাকে একলা ছাড়েন না কক্ষনো। একজন শেরপাকে সঙ্গে রাখতেই হয়। পাহাড়ি রাস্তায় যে-কোনও সময় বিপদ হতে পারে। প্রত্যেকদিন সন্তু কালাপাথর পাহাড়টায় উঠে একবার এভারেস্ট দেখে আসবেই। এভারেস্টের দিকে তাকালেই যেন বুক কাঁপে। ঐ পাহাড়ের চূড়াতেও মানুষ পা রেখেছে, তা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। চাঁদের ওপরেও তো মানুষের পায়ের ধুলো লেগেছে, চাঁদের দিকে তাকালে কি তা বোঝা যায়? কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এই বরফের রাজ্য পেরিয়ে ঐ এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে চান? এ যে অসম্ভব ব্যাপার।

রাতগুলো যেন আর কাটতেই চায় না। কাকাবাবু গম্বুজের চূড়ায় বসে থাকেন আর সন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে।

যে কাঠের বাক্সগুলোতে করে জিনিসপত্র আনা হয়েছিল, তারই একটা খালি বাক্স দুই বিছানার মাঝখানে রাখা হয়েছে একটা টেবিলের মতন করে। হ্যাজাক বাতিটা তার ওপরেই রাখা। তার পাশে একটা ঘড়ি, টর্চ আর একটা ছোট্ট চৌকো কাচের বাক্স। অনেকটা গয়নার বাক্সের মতন, তার মধ্যে গয়নার বদলে রয়েছে একটা মানুষের দাঁতের মতন জিনিস। সেই দাঁতটার দিকে তাকালেই সন্তুর গা শিরশির করে। অথচ সাত রাজার ধন এক মানিকের মতনই কাকাবাবু সব সময় ঐ দাঁতটাকে কাছে-কাছে রাখেন আর মাঝে-মাঝেই ওটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, ঠিক যেন ধ্যান করছেন, এইভাবে।

ঐ দাঁতটার একটা মস্ত বড় ইতিহাস আছে।

॥ ২ ॥

কলকাতায় কিন্তু কাকাবাবু ঐ দাঁতটার কথা কিছুই বলেননি সন্তুকে। সন্তুও জানতই না যে, কাকাবাবু এবার বিলেত থেকে ঐ দাঁতটা নিয়ে এসেছেন। বিলেত থেকে সবাই কত ভাল-ভাল জিনিস আনে, আর কাকাবাবু এনেছেন একটা মরা মানুষের দাঁত!

আন্দামান অভিযানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে এখন কাকাবাবুর ডাক আসে। জেনিভায় এক অ্যানথ্রপলজিক্যাল কনফারেন্সে কাকাবাবু বক্তৃতা দিয়ে এলেন মাস ছয়েক আগে। তারপরই গিয়েছিলেন বিলেতে। তারপর কিছুদিন কাকাবাবু বইপত্রের মধ্যে ডুবে রইলেন একেবারে। তখনই সন্তুর মনে হয়েছিল, কাকাবাবু বোধহয় আবার নতুন কোনও রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন।

একদিন হঠাৎ তিনি সন্তুকে ডেকে বলেছিলেন, "কী রে, এভারেস্টে যাবি? আমি যাচ্ছি, যদি সঙ্গে যেতে চাস্—"

শুনেই সন্তুর বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। এভারেস্ট!

প্রথমে সন্তু যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। এভারেস্টে যাওয়া কি যেমন-তেমন কথা?

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, তুমি, মানে ইয়ে, মানে তুমি সত্যিই এভারেস্টে যাচ্ছ?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "সত্যি ছাড়া কি মিথ্যে বলব নাকি তোকে?"

একজন খোঁড়া মানুষ, যিনি ক্রাচে ভর না দিয়ে চলতে পারেন না, তাঁর মুখে এভারেস্ট যাওয়ার কথা শুনলে কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? অথচ কাকাবাবু আজে-বাজে কথাও বলবেন না ঠিকই। তখন সন্তু ভেবেছিল, কাকাবাবু তাহলে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার কোনও অভিযাত্রী দলের সঙ্গে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই। সন্তু তো তবে যাবেই কাকাবাবুর সঙ্গে, এই সুযোগ কি সে ছাড়তে পারে?

নিউজিল্যান্ডের হিলারি আর আমাদের দার্জিলিংয়ের তেনজিং—এই দু'জনই মানুষজাতির মধ্যে প্রথম পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা এভারেস্টের চূড়ায় পা দেন। তারপর আমেরিকান, ফরাসি, জাপানি আরও কত জাতির লোক এভারেস্টে উঠেছেন। এমন-কী, আমাদের ভারতীয়দের মধ্যেও এক জন না দু'জন উঠেছেন, কিন্তু কোনও বাঙালি তো এখনও সেখানে যেতে পারেনি! সন্তু উঠতে পারলে সারা পৃথিবীতে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। পৃথিবীর কোনও জাতেরই পনেরো বছরের কোনও ছেলে এভারেস্টে উঠতে পারেনি। আর কাকাবাবু যদি জেদ ধরেন, তা হলে তিনি উঠবেনই, সন্তুর এ-বিশ্বাস আছে। তা হলে কাকাবাবুও এক হিসেবে বিশ্বে প্রথম হবেন। কারণ, এক পা খোঁড়া, ক্রাচ বগলে নিয়ে এভারেস্টে চড়ার কথা কেউ আগে কল্পনা করারও সাহস পায়নি।

সন্তু অতি উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়েছিল তো বটেই, তার ওপর এভারেস্ট সম্পর্কে তার জ্ঞান দেখাবার জন্য বলেছিল, "কাকাবাবু, এভারেস্ট তো আবিষ্কার করেছিলেন একজন বাঙালি, তাই না ? সাহেবরা তাঁর নামটা দেয়নি—"

কাকাবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, "এভারেস্ট আবার কেউ আবিষ্কার করবে কী ? এটা কি একটা নতুন জিনিস ? তবে, এটাই যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়-চূড়া, সেটা ঠিক করার ব্যাপারে একজন বাঙালির খানিকটা হাত ছিল বটে !"

সন্তু বলেছিল, "আমি তো সেই কথাই বলছি। তাঁর নাম রাধানাথ শিকদার। ঐ চূড়াটার নাম এভারেস্ট না হয়ে রাধানাথ হতে পারত।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "রাধানাথ শিকদার সার্ভে অফিসে কাজ করতেন। হিমালয়ের অনেক শৃঙ্গের তখন কোনও নামই ছিল না। মিঃ এভারেস্ট ছিলেন ঐ সার্ভে অফিসের বড় সাহেব। তাঁর নামেই ঐ শৃঙ্গের নাম রাখা হয়েছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা কাকাবাবু, ঐ রাধানাথ শিকদার তো আর এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেননি, তা হলে তিনি কী করে বুঝলেন যে ঐটাই সবচেয়ে বেশি উঁচু ?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "পাহাড়ে না উঠেও পাহাড় মাপা যায়। ছোটখাটো পাহাড় মাপে সেগুলোর ছায়া দেখে। তা ছাড়াও যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে অনেক অঙ্ক কষতে হয়। রাধানাথ শিকদার অবশ্য এক সময় দেরাদুনে থাকতেন, তখন পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরেছেন। কিন্তু তুই যাকে "আবিষ্কার" বললি, সেটা হয়েছিল এই কলকাতায়। অঙ্ক কষতে-কষতে তিনি হঠাৎ একদিন দেখলেন যে, এই যে একটা নাম-না-জানা পাহাড়, তখন কাগজপত্রে এটার নাম ছিল পীক নাম্বার ফিফটিন, এটারই উচ্চতা উনত্রিশ হাজার ফুটের বেশি, এত উঁচু পাহাড় আর পৃথিবীতে নেই। তখনই তিনি ছুটে গিয়ে তাঁর নতুন বড় সাহেবকে খবর দিলেন। এভারেস্ট সাহেব অবশ্য তখন রিটায়ার করেছেন, তবু তাঁর নামেই শিখরটির নাম রাখা হল।"

সেদিন এভারেস্ট সম্পর্কে আরও অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল। তারপর ক'দিন কাকাবাবু একেবারে চুপচাপ। যেন ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গেছেন। হঠাৎ একদিন কাকাবাবু চলে গেলেন দার্জিলিঙ। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা কিছুই বললেন না। সেখান থেকে ফিরে গভর্নমেন্টের নেমন্তন্ন পেয়ে আবার চলে গেলেন জার্মানি। দেড়মাস বাদে যেদিন তিনি কলকাতায় ফিরলেন, তার পরদিনই সন্তুদের বাড়িতে এলেন তেনজিং। কী করে যেন কথাটা জানাজানি হয়ে গেল, সন্তুদের বাড়ির সামনে সেদিন সাঙ্ঘাতিক ভিড় জমে গিয়েছিল। তেনজিংকে একটু দেখবার জন্য, তাঁর সই নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

তেনজিংয়ের সঙ্গে কাকাবাবু নিজের ঘরে বসে কথা বললেন অনেকক্ষণ। তখন ঘরে আর কেউ ছিল না। সন্তু ঘুরঘুর করছিল কাকাবাবুর ঘরের কাছে,

কিন্তু কোনও কথাই শুনতে পায়নি। তেনজিং বিদায় নেবার সময় বন্ধুর মতন কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেছিলেন, "গুড লাক! আই উইশ ইউ সাকসেস, মিঃ রায়চৌধুরী! আপনি পারবেন, তখন সবাই বুঝে যাবে, আমার কথা ঠিক কি না! বয়েস হয়েছে, না হলে আপনার সঙ্গে আমিও যেতাম!"

ইস্কুলের বন্ধুদের কাছে সন্তু আগেই বলে ফেলেছিল যে, এবার সে কাকাবাবুর সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে যাবে। সবাই খুব হেসেছিল। বন্ধুদের এই একটা দোষ, কোনও কথাই ওরা আগে থেকে বিশ্বাস করে না। তেনজিং নোরগে ওদের বাড়িতে আসবার পর সন্তু আবার বলেছিল, "দেখলি তো? আমার কাকাবাবুর সঙ্গে কত লোকের চেনা। তেনজিং নিজে আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন!"

সন্তুদেরই ইস্কুলে পুজোর ছুটি শুরু যেদিন, সেদিনই কাকাবাবু বলেছিলেন, "সন্তু, তৈরি হয়ে নাও, সামনের সোমবার আমরা বেরিয়ে পড়ছি।"

সন্তুর ধারণা ছিল এভারেস্ট অভিযানে যেতে হলে বিরাট দলবল লাগে, অনেক জিনিসপত্র আর তাঁবু-টাঁবু নিয়ে যেতে হয়। সেসব কিছুই নয়, কাকাবাবু শুধু সন্তুকে নিয়ে প্লেনে চেপে চলে এলেন নেপালে। কাঠমাণ্ডু শহরে দু'দিন চুপচাপ সন্তু একটা হোটেলে বসে কাটাল। কাকাবাবু একাএকা ঘোরাঘুরি করলেন নানা জায়গায়। সন্তু ভেবেছিল, কাকাবাবু নিশ্চয়ই নেপালে এসে দলবল জোগাড় করছেন।

তাও হল না। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাকাবাবু বললেন, "বাক্স গুছিয়ে নে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরুব।"

কাকাবাবু এক-এক সময় খুব কম কথা বলেন। তখন তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করারও নিয়ম নেই। সন্তু চুপচাপ সব কথা শুনে যায় শুধু।

কাঠমাণ্ডুর হোটেল থেকে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট আসা হল। সন্তু ভাবল, আবার বুঝি কলকাতায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এবার উঠল ওরা একটা ছোট প্লেনে। মাত্র দশ-বারোজন যাত্রী। কিছুক্ষণ ওড়ার পরই সন্তু দেখতে পেল সব বরফের মুকুট পরা পাহাড়ের চূড়া।

প্লেনটা এসে নামল একটা খুব ছোট্ট জায়গায়। এরকম জায়গায় যে প্লেন নামতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। জায়গাটার নাম সিয়াংবোচি। সেখান থেকে দু'জন মাত্র মালবাহক সঙ্গে নিয়ে শুরু হল হাঁটা। সন্তুর তখনও সব ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছিল।

সন্তুর তখনও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছিল। দু'জন মাত্র লোক সঙ্গে নিয়ে এভারেস্টে ওঠা হবে? তাঁবু কোথায়? অন্য সব জিনিসপত্র কোথায়? পাহাড়ি রাস্তায় ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবুকে হাঁটতে দেখে অন্যান্য যাত্রীরা অবাক হয়ে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। এরকম লোককে এত উঁচু পাহাড়ের রাস্তায় কেউ

কোনওদিন দেখেনি। এ রাস্তায় অনেক বিদেশি দেখা যায়। সাহেব তো আছেই, কিছু কিছু মেমও কাঁধে ব্যাগ নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে। সিয়াংবোচিতে জাপানিরা একটা মস্ত বড় হোটেল বানিয়েছে।

কাকাবাবু কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ক্রাচ ঠুকে-ঠুকে ঠিক উঠে যান পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে। সন্তু হাঁপিয়ে যায়, কিন্তু কাকাবাবুর যেন দৈত্যের শরীর।

এইরকম একটি পাহাড়ি রাস্তায় এক দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর একটা পা চিরকালের মতন পঙ্গু হয়ে গেছে। তবু পাহাড়কে ভয় পান না কাকাবাবু।

ফুনটুংগা বলে একটা ছোট জায়গা পেরিয়ে এসে রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসে সন্তু আর কাকাবাবু কমলালেবু, পাঁউরুটি আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় কয়েকটি পাহাড়ি লোক ছুটতে-ছুটতে এসে বলে গেল, "পালাও, পালাও, সাবধান, বুনো ভাল্লুক বেরিয়েছে।"

শুনেই সন্তু চমকে উঠেছিল। চারদিকে পাহাড় আর ফাঁকা রাস্তা, ওরা পালাবে কী করে? ফুনটুংগা ফিরে যেতে গেলে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তা ছাড়া কাকাবাবু তো পালাতেও পারবেন না।

কাকাবাবু কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে পাইপ ধরিয়ে বললেন, "কমলালেবুর খোসা রাস্তার ওপর ফেলেছিস কেন? সব খোসা এক জায়গায় সরিয়ে একটা কাগজের ঠোঙার মধ্যে রেখে দে। পাহাড় কখনও নোংরা করতে নেই।"

রাস্তার এক পাশে জঙ্গল, এক পাশে খাদ, সেই খাদের নীচে দেখা যায় একটা রুপোর হারের মতন সরু নদী। সন্তু ভয়ে-ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল। সন্তুর মনে হল, হঠাৎ সেখান থেকে একটা ভাল্লুক এক লাফে বেরিয়ে আসবে।

এর পরে দু'জন সাহেবও ছুটতে-ছুটতে নেমে এল ওপরের রাস্তা দিয়ে। তারাও কাকাবাবুকে দেখে ইংরেজিতে বলল, "তোমরা এখানে বসে আছ কেন? নীচে নেমে যাও। এদিকে একটা বুনো ভাল্লুক দেখা গেছে।"

কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না।

একটু বাদে আবার শোনা গেল অনেক মানুষের চিৎকার। সন্তু এবার ভাবল, নিশ্চয়ই ভাল্লুকটা ওদের তাড়া করে আসছে।

লোকগুলো কাঁধে করে বয়ে আনছে একজন আহত মানুষকে। তার গা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। লোকটি সেই অবস্থাতেও জ্ঞান হারায়নি, 'আঁ আঁ আঁ' শব্দ করছে।

কাকাবাবুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, সেই লোকগুলো নিজেরাই চিৎকার করে অনেক কথাই বলল, যাতে বোঝা গেল যে, বনের মধ্যে এই লোকটিকে ভাল্লুক আক্রমণ করে ওর পেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে দিয়েছে। লোকটিকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে।

ওরা চলে যাবার পর সন্তু দেখল, রাস্তায় পড়ে আছে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত। মানুষের রক্ত!

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ি ভাল্লুকরা খুব হিংস্র হয়! এক হিসেবে বাঘ-সিংহের চেয়েও হিংস্র, এরা অকারণে মানুষ মারে।"

কোটের ভেতরের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর ভয় করছে?"

সন্তু কী উত্তর দেবে? চোখের সামনেই তো সে দেখল যে, ভাল্লুকে একটা লোকের পেট ফালাফালা করে দিয়েছে। হঠাৎ যদি ভাল্লুকটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? রিভলভার দিয়ে কি ভাল্লুক মারা যায়? সন্তু সব শিকারের গল্পে পড়েছে যে, শিকারীদের হাতে থাকে রাইফেল।

গলা শুকিয়ে এসেছে, তবু সেই শুকনো গলাতেই সন্তু উত্তর দিয়েছিল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই এই পাথরটার আড়ালে গিয়ে বোস্। আমাদের এই রাস্তা দিয়েই উঠতে হবে, বেশিক্ষণ তো সময় নষ্ট করলে চলবে না!"

সন্তু এবার একটু সাহস করে বলল, "কাকাবাবু, সবাই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আমরাও নীচের গ্রামটায় ফিরে গিয়ে আজকে থেকে গেলে পারি না? এমন-কী, সাহেবরাও নেমে যাচ্ছে।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "এমন-কী সাহেবরাও মানে? সাহেবরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সাহসী নাকি?"

সন্তু একটু থতমত খেয়ে বলল, "না। মানে, ইয়ে—"

কাকাবাবু একটুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "কোথাও যাবার জন্য বেরিয়ে আমি কখনও পেছনে ফিরে যাই না। আমার সঙ্গে যেতে হলে এই কথাটা তোকে সব সময় মনে রাখতে হবে।"

তারপর সন্তুকে দারুণভাবে চমকে দিয়ে কাকাবাবু রিভলভার উঁচিয়ে 'ডিসুম্' শব্দে গুলি করলেন।

॥৩॥

গুলির আওয়াজে চার পাশের পাহাড়গুলো যেন কেঁপে উঠল। যেন অনেকগুলো গুলি ঠিকরে গেল অনেকগুলো পাথরে। তারপরেও দূরে-দূরে সেই আওয়াজ হতে লাগল।

কাকাবাবু এমন আচমকা গুলি ছুঁড়েছিলেন যে, সন্তু দারুণ চমকে উঠেছিল। পাহাড়ি জায়গায় প্রতিধ্বনি কেমন হয়, সে সম্পর্কেও সন্তুর প্রথম অভিজ্ঞতা হল।

কাকাবাবু রিভলভারটার ডগায় দুবার ফুঁ দিলেন। তারপর সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই রিভলভার চালানো শিখতে চাস?"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু রিভলভারটা সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "শক্ত করে ধর্! এখন বড় হয়েছিস, ঠিক পারবি। এবারে যে অভিযানে বেরিয়েছি, তাতে পদে-পদে বিপদ হতে পারে। ধর আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তোকে তো বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।"

সন্তু রিভলভারটা ধরে হাতটা বুকের কাছে রেখেছিল। সিনেমায় সে লোকদের ঐভাবে গুলি চালাতে দেখেছে।

কাকাবাবু বললেন, "ওভাবে না! ওভাবে গুলি চালালে তুই নিজেই মরবি! হাতটা সোজা করে সামনে বাড়িয়ে দে। হাতটা খুব শক্ত করে রাখ্, কনুইটা যেন কিছুতেই বেঁকে না যায়। গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই খুব জোরে ঝাঁকুনি লাগে কিন্তু!"

সত্যিকারের রিভলভার হাতে নিলেই একটা রোমাঞ্চ হয়। সন্তু এর আগে দু-একবার কাকাবাবুর রিভলভারটা ছুঁয়ে দেখেছে। একবার, আনতাবড়ি গুলি চালিয়েওছিল। এবার সে টিপ করে ঠিকঠাক গুলি ছুঁড়বে।

কাকাবাবু বললেন, "মনে কর, এই সময়ে যদি হঠাৎ ভাল্লুকটা এসে পড়ে, তুই মারতে পারবি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ।"

কাকাবাবু বললেন, "অত সোজা নয়। আচ্ছা, ঐ যে পাইনগাছটা, ওর মাথায় টিপ করে লাগা তো! সাবধান, কনুই যেন বেঁকে না যায়।"

সন্তু কায়দা করে এক চোখ টিপে খুব ভাল করে দেখে নিল পাইন গাছের মাথাটা, তারপর ট্রিগার টিপল।

এমন জোরে শব্দ হল যে সন্তুর কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। ও চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। তারপর চোখ খুলে দেখল, কাকাবাবু হাসছেন।

কাকাবাবু বললেন, "বেচারা গাছটা খুব বেঁচে গেছে! তোর গুলিতে তার একটা পাতাও খসে পড়েনি।"

সন্তু ভেবেছিল তার গুলিটা ঠিকই লাগবে। এই তো রিভলভারের নলটা ঠিক গাছটার দিকে মুখ করা। তবু গুলিটা বেঁকে গেল?

লজ্জা লুকোবার জন্য সেও কাকাবাবুর মতন কায়দা করে রিভলভারের নলে ফুঁ দিল দু'বার।

কাকাবাবু আবার বললেন, "অত সোজা নয়। আরও অনেকবার প্র্যাকটিস করতে হবে।"

মালবাহক কুলি দুজন নীচের নদীটায় নেমে গিয়েছিল জল খাবার জন্য। পর-পর দু'বার গুলির শব্দ শুনে তারা হন্তদন্ত হয়ে তরতর করে উঠে এল পাহাড় বেয়ে। সন্তুর হাতে রিভলভার দেখে ওরা অবাক।

এদের একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "কেয়া হুয়া, সাব?"

কাকাবাবু বললেন, "এদিকে একটা ভাল্লুক বেরিয়েছে।"

এই পাহাড়িরাও ভাল্লুককে ভয় পায়। ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। এই সময় তিনজন জাপানি নেমে এল ওপরের পথ দিয়ে।

কাকাবাবু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ভাল্লুক সম্পর্কে কিছু শুনেছ ?"

জাপানিরা ভাল ইংরেজি বোঝে না। কথাটা দু-তিনবার বলে বোঝাতে হল তাদের। তারপর তারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জানাল যে, অনেক লোকজন বনের মধ্যে তাড়া করে গেছে, ভাল্লুকটা পালিয়েছে।

একজন জাপানি হেসে বলল, "আমরা খুব আনলাকি ! আমরা ভাল্লুকটা দেখতে পেলাম না।"

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "দেখলি ! একে বলে সাহসী লোক। দিনের বেলা রাস্তা দিয়ে এত লোক যাওয়া-আসা করছে, একটা ভাল্লুক কী করবে ?"

সন্তু বলল, "কিন্তু ভাল্লুকটা যে একটা লোকের পেট চিরে দিয়েছে দেখলাম !"

কাকাবাবু বললেন, "সে নিশ্চয়ই একটা বোকা লোক। চল্, আমরা এবার উঠে পড়ি। ভাল্লুকটা যদি এদিকে এসেও থাকত, গুলির আওয়াজ শুনেই পালিয়েছে। ভাল্লুকেরও তো প্রাণের ভয় আছে !"

মালবাহকদের তিনি বললেন, "ভাল্লুক ভেগে গেছে। মাল উঠাও !"

তারা তবু দাঁড়িয়ে গা মোচড়াতে লাগল।

এইসময় কপকপ কপাকপ শব্দ হল নীচের দিকে। সন্তু পেছনে তাকিয়ে দেখল, দুজন লোক ঘোড়ায় চেপে খুব জোরে এদিকে আসছে। তাদের চেহারা আর পোশাক দেখলেই বোঝা যায়, তারা পুলিশ।

কাছে এসে তারা জিজ্ঞেস করল, "এদিকে কোথায় গুলির শব্দ হল, তোমরা শুনেছ ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। আমি আমার ভাইপোকে শুটিং প্র্যাকটিস করাচ্ছিলাম।"

লোক দুটি তড়াক করে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বলল, "তোমরা গুলি ছুঁড়ছিলে ? এখানে শিকার করা নিষেধ, তোমরা জানো না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তো শিকার করিনি। তাছাড়া, একটা ভাল্লুক যদি সামনে এসে পড়ে, তার দিকে গুলি ছোঁড়াও কি নিষেধ নাকি ?"

একজন লোক সন্তুর হাত চেপে ধরল। অন্য লোকটি রুক্ষ গলায় কাকাবাবুকে বলল, "তোমরা বে-আইনি কাজ করেছ, থানায় চলো !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "থানা কোথায় ?"

লোকটা হাত তুলে দেখাল সিয়াংবোচির দিকে। সিয়াংবোচি খুব বড় জায়গা, হোটেল আছে, সেখানেই থানা থাকা স্বাভাবিক।

কাকাবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, "যে পথ দিয়ে একবার এসেছি,

সেদিকে ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। ওকে ছেড়ে দাও ! ফাঁকা জায়গায় শুটিং প্র্যাকটিস করা কোনও বে-আইনি ব্যাপার হতে পারে না।"

পুলিশটি ধমক দিয়ে বলল, "চলো, ওসব কথা থানায় গিয়ে বলবে চলো !"

কাকাবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "আমার গায়ে হাত দিও না !"

তারপর কোটের ভেতর-পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বার করে বললেন, "পড়তে জানো, এটা পড়ে দ্যাখো ! সিয়াংবোচি থানার অফিসার আমার নাম জানে।"

কাগজটা পড়তে-পড়তে পুলিশটির ভুরু উঁচু হয়ে গেল। সে তার সঙ্গীকেও দেখাল কাগজটা। তারপর দুজনে এক সঙ্গে ঠকাস করে জুতো ঠুকে সেলাম দিল কাকাবাবুকে।

কাকাবাবু ডান হাতটা একটু উঁচু করলেন শুধু।

পুলিশ দুজন অবাক হয়ে কাকাবাবুর চেহারা আর খোঁড়া পা'টা দেখল। তারপর একজন বলল, "স্যার, আমরা দুঃখিত। আগে বুঝতে পারিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা কোনও বে-আইনি কাজ করিনি তবু তোমরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে চাইছিলে।"

সেই পুলিশটি বলল, "মাপ করবেন, স্যার। আমরা সত্যি বুঝতে পারিনি !"

অন্য পুলিশটি জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনি কি সত্যি এভারেস্টে যেতে চান ?"

কাকাবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "দেখা যাক্ !"

সে আবার বলল, "স্যার, আপনাকে আমরা কোনও সাহায্য করতে পারি ?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু না ! শুধু এই মালবাহক দুজনকে বলে দাও, যেন ওরা আমাদের সঙ্গে যেতে কখনও আপত্তি না করে।"

পুলিশ দুজন আরও অনেকবার সেলাম-টেলাম করে বিদায় নেবার পর সন্তুরা আবার চলা শুরু করল।

সন্তুর মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা ছটফট করছিল, মালবাহক দুজনে তা জিজ্ঞেস করল কাকাবাবুকে। পুলিশরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে চাইছিল, তারপর একটা কাগজ দেখেই এত সেলাম ঠুকতে লাগল দেখে ওরা অভিভূত। এসব জায়গায় পুলিশদের প্রায় দেবতার সমান ক্ষমতা। সেই পুলিশরা এই বাঙালিবাবুকে এত খাতির করল !

তারা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "সাব্, ঐ কাগজটাতে কী লেখা আছে ?"

কাকাবাবু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে ওদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ওটা নেপালের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি। তিনি নেপালের অতিথি। একটা বিশেষ গোপনীয় আর জরুরি কাজে তিনি যাচ্ছেন এভারেস্ট-চূড়ার দিকে। প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে লিখে দিয়েছেন যে, সব জায়গার পুলিশ যেন কাকাবাবুকে সব রকমে সাহায্য করে !

একথা শুনে মালবাহক দুজনও সেলাম দিয়ে ফেলল কাকাবাবুকে। একজন

আর-একজনকে বলল, "দেখলি, লেখাপড়া শেখার কত দাম ! এই বাঙালিবাবু লেখাপড়া শিখেছেন বলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এঁকে খাতির করেন। ইশ, আমরা কেন দুটো-চারটে বই পড়তে শিখিনি !" অন্যজন বলল, "আমাদের মহল্লায় একটা ইস্কুল খুলেছে, আমার ভাইকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছি।"

এর পর আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। মাঝখানে একটা বড় জায়গায় বিশ্রাম নেওয়া হয়েছিল তিনদিন। এই জায়গাটার নাম থিয়াংবোচি। এর আগে যে বড় জায়গাটায় জাপানি হোটেল আছে, সে জায়গাটার নাম সিয়াংবোচি। দুটো নাম প্রায় একই রকম, সন্তুর গুলিয়ে যায়। তবে থিয়াংবোচি জায়গাটা যেন অনেক বেশি সুন্দর। বেশ একটা পবিত্র ভাব আছে। এভারেস্টের পায়ের কাছে এই শেষ শহর। এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায়। তাঁবু, পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম আর খাবার-দাবার সেখান থেকেই কিনে নিলেন কাকাবাবু। দুজন শেরপা আর পাঁচজন মালবাহককেও ঠিক করা হল। তবে এত ছোট দল নিয়ে কাকাবাবু এভারেস্টের দিকে যেতে চান শুনে সবাই অবাক। সেখানকার লোক অনেক এভারেস্ট-অভিযাত্রী দেখেছে, কিন্তু একজন খোঁড়া প্রৌঢ় লোক আর একজন কিশোর এভারেস্টে উঠতে চায় শুনে অনেকে হেসেই আকুল। একজন ডাক্তার তো কাকাবাবুকে অনেকবার বারণ করলেন।

কিন্তু কাকাবাবু যে কী-রকম গোঁয়ার, তা তো ওরা জানে না। সেখানে একটা চমৎকার মনাস্টারি আছে। খুব শান্ত আর নিরিবিলি জায়গাটা। সকালবেলা সেই মনাস্টারির দিকে যেতে যেতে সন্তু দেখেছিল, সামনে তিনদিকে তিনটি সাদা পাহাড়ের চূড়া। তার মধ্যে একটি এভারেস্ট ! সেই প্রথম সন্তু এভারেস্ট দেখল, মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, তারপরই কুয়াশায় সব-কিছু মিলিয়ে গিয়েছিল।

থিয়াংবোচিতে ওরা ছিল গভর্নমেন্টের গেস্ট হাউসে। কয়েকজন সাহেব-মেমও সেখানকার অতিথি। তারা সন্তুর সঙ্গে আলাপ করে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমরা এভারেস্টের দিকে যাচ্ছ কেন ? এ তো পাগলামি !'

সন্তু উত্তর দিতে পারেনি। কাকাবাবু যে তাকে বিশেষ কিছুই জানাননি। কাকাবাবুর কাছে কাচের বাক্সে যে জিনিসটা আছে, সেটা তিনি সব সময় খুব সাবধানে রাখেন। সেটা সম্পর্কে শুধু সন্তুকে বলে রেখেছেন, এটার কথা কখনও কারুকে বলবি না !

সেখানে একদিন সন্ধেবেলা কাকাবাবু বাইরে থেকে ফিরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, আমার দাঁতটা কোথায় গেল ?"

আমার দাঁত মানে কাকাবাবুর নিজের দাঁত নয়। কাচের বাক্সর সেই জিনিসটা। সেটা কাকাবাবু নিজেই সব সময় সাবধানে রাখেন।

সন্তু বলল, "আমি তো জানি না।"

কাকাবাবু দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন

সব-কিছু উল্টেপাল্টে। একটু বাদেই সেটা পাওয়া গেল অবশ্য। অতি সাবধান হতে গিয়ে কাকাবাবু নিজেই কখন সেটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন।

সেটাকে পাবার পর কাকাবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, "বাবাঃ! এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি না থাকলে তুই কক্ষনো ঘরের বাইরে যাবি না! সব সময় এটাকে চোখে চোখে রাখবি! এটার কত দাম জানিস!"

সন্তু জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, ওটা কী?"

কাকাবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "এখন তোর জানবার দরকার নেই। সময় হলে বলব!"

তারপর সেখান থেকে শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে চলে আসা হয়েছে এই গোরখশেপে। এখানে অন্য অভিযাত্রীরা বেস ক্যাম্প করে। কাকাবাবু কিন্তু এখান থেকে আর এগোতে চাইছেন না। তাঁবু ফেলা হয়েছে, এখানে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

এখানে আর সন্তুর সময় কাটতে চায় না। সব সময় বরফ দেখতে-দেখতে যেন চোখ পচে যায়। একটা টিবির ওপর চড়ে সন্তু অনেকবার দেখেছে মাউন্ট এভারেস্ট। ওখানে কি সত্যিই যাওয়া যাবে?

শেরপা সর্দার মিংমার সঙ্গে দিনের বেলা সে মাঝে মাঝে খানিকটা দূর পর্যন্ত যায়। মিংমার গায়ে দারুণ জোর আর খুব চটপটে। এর আগে সে দুবার দুটি সাহেবদের দলের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিল। কিন্তু কোনওবারই সাহেবরা তাকে একেবারে চূড়ায় উঠতে দেয়নি। এজন্য তার মনে খুব দুঃখ।

মিংমার ইচ্ছে সেও এভারেস্টের চূড়ায় উঠে তেনজিংয়ের মতন বিখ্যাত হবে, তারপর সে বিলেত আমেরিকায় নেমন্তন্ন খেতে যাবে। সাহেবদের সঙ্গে মিশে মিশে সে ইংরেজি কথা অনেক শিখে নিয়েছে। সাহেবদের দেওয়া পোশাক পরে তাকে খুব স্মার্ট দেখায়।

মিংমা সন্তুকে বলে, "শোনো সন্তু সাব, তোমার আংকল কিছুতেই এভারেস্ট যেতে পারবে না! এক পা নিয়ে কেউ পাহাড়ে ওঠে? এ এক আজব বাত!"

সন্তু বলে, "তুমি আমার কাকাবাবুকে চেনো না! মনের জোরে উনি সব পারেন।"

মিংমা বলে, "আরে রেখে দাও মনের জোর। পাহাড়ে উঠতে তাগত লাগে! আরও কত দূর যেতে হবে, তা তোমরা জানো না! তুমি এক কাজ করো, তোমার আংকলকে বুঝিয়ে বলো, তিনি এখানে থাকুন। তোমাকে নিয়ে আমরা কয়েকজন এগিয়ে যাই। দেখো, তুমি আর আমি ঠিক একদম সাউথ কল্ ধরে চূড়ায় উঠে যাব।"

সন্তু জানে, এসব কথা আলোচনা করে কোনও লাভ নেই। কাকাবাবুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না!

দিনের বেলা যদিও কেটে যায় কোনওক্রমে, রাত আর কাটতেই চায় না।

শীতের জ্বালায় সন্তু সন্ধে হতে না হতেই শুয়ে পড়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। তারপর ঘুম আসে না আর।

কাকাবাবু গম্বুজের মাথার কাছে বসে থাকেন, হাতে দূরবিন নিয়ে। ওখানে বসে তিনি কী দেখতে চান, কে জানে! ওখান থেকে তো এভারেস্টও দেখতে পাওয়া যায় না।

সন্তুর মাথার কাছে আলোটা জ্বলে। কাকাবাবু না নেমে এলে ঐ আলো নেভানো যাবে না। টেবিলের ওপর কাচের বাক্সে রাখা সেই দাঁতের মতন জিনিসটা। ওটা নিশ্চয়ই দাঁত নয়, কোনও দামি পাথর। সন্তু ওটার দিকে তাকাতে চায় না, তবু ওদিকে চোখ চলে যাবেই। এর মধ্যে সন্তু একদিন ওটা নিয়ে স্বপ্নও দেখেছিল। ও জিনিসটা যেন আরও বড় হয়ে একটা কোদালের মতো কোপ লাগাচ্ছে সন্তুর গায়ে!

"সন্তু! সন্তু!"

সন্তুর একটু ঘুম এসে গিয়েছিল, হঠাৎ সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে উঠে বসা যায় না। কে ডাকল তাকে? সন্তুর মনে হল গম্বুজের বাইরে থেকে কেউ যেন ডাকছে তাকে।

আরও দু'বার ফিসফিসে গলায় ওরকম ডাক শুনে সন্তু বুঝতে পারল, গম্বুজের ওপর থেকে কাকাবাবুই ডাকছেন তাকে।

"কী?"

"শিগগির ওপরে উঠে আয়, এক্ষুনি!"

কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্য থেকে খুব তাড়াতাড়ি বেরনো যায় না। সন্তু পড়পড় করে চেনটা টেনে খুলে বেরিয়ে এল। বাইরে আসা মাত্র শীতে কেঁপে উঠল ঠকঠকিয়ে। বিছানার পাশেই রাখা থাকে তার ওভারকোট, সেটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু দূরবিনটা সন্তুর হাতে দিয়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "দ্যাখ তো, কিছু দেখতে পাচ্ছিস? দূরে কিছু নড়ছে?"

॥ ৪ ॥

সন্তু চোখে দূরবিন লাগিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। শুধু আবছা আবছা অন্ধকার।

এখানকার আকাশ প্রায় কখনওই পরিষ্কার থাকে না। সব সময় মেঘলা-মেঘলা, তবু তারই ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে চাঁদের আলো এসে পড়ে।

সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। কই, কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। দু' জায়গায় বরফে জ্যোৎস্না ঠিক্‌রে ঝকঝক করছে। আর কিছু দূরে

কালাপাথর নামে সেই ছোট পাহাড়টা। সেটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার।

কাকাবাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখতে পেয়েছিস ?"

"না তো !"

"একদম সোজা নয়, একটু ডান দিকে।"

সন্তু ডান দিক বাঁ দিক সব দিকেই দূরবিনটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। কোথাও কিছু নেই। কাকাবাবু কী দেখার কথা বলছেন ? এই বরফের দেশে একটা পাখি পর্যন্ত নেই !

"এখনও দেখতে পাসনি ?"

"না, কাকাবাবু !"

কাকাবাবু এবার সন্তুর কাছ থেকে দূরবিনটা নিয়ে নিজের চোখে লাগালেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, "সত্যিই তো এখন আর দেখতে পাচ্ছি না ! অথচ একটু আগে স্পষ্ট দেখলাম যেন ! তাহলে কি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবার জন্য আমার চোখের ভুল হল !"

"কাকাবাবু, ওখানে কী থাকতে পারে ?"

"সেটা ভাল করে না দেখলে বুঝব কী করে ?"

আরও কিছুক্ষণ চোখে দূরবিন এঁটে বসে রইলেন কাকাবাবু। তারপর এক সময় হতাশভাবে বললেন, "না, আজ আর কিছু দেখা যাবে না ! চল, এবার শুয়ে পড়ি !"

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে সন্তু তাড়াতাড়ি কোট-ফোট খুলে ফেলে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে গেল। কাকাবাবু নামলেন ধীরে-সুস্থে, কিন্তু তক্ষুনি শুয়ে পড়লেন না। একটা কালো রঙের খাতার পাতা উল্টে-পাল্টে কী যেন দেখতে লাগলেন।

সন্তু ভাবল, কাকাবাবুর কি শীতও করে না ? খানিকক্ষণ স্লিপিং ব্যাগের বাইরে থেকেই তো সন্তুর কাঁপুনি ধরে গেছে।

বিলিতি আলোটা এমন উজ্জ্বল যে, চোখে লাগে। ওটাকে আবার কমানো বাড়ানো যায়। আলোটা খানিকটা কমে যেতেই সন্তু বুঝতে পারল, কাকাবাবু এবার শুয়ে পড়েছেন।

কাকাবাবু একটা শব্দ করলেন, "আঃ !"

এই "আঃ" শুনেই বোঝা যায়, আজকের মতন কাকাবাবুর সব কাজ শেষ। এই শব্দটা করার ঠিক আধঘণ্টা বাদে কাকাবাবু ঘুমিয়ে পড়েন।

একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার জন্য সন্তুর আর সহজে ঘুম আসছে না। বিছানায় শুয়ে ঘুম না এলে এপাশ-ওপাশ ফিরে ছটফট করা যায়। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সহজে পাশ ফেরার উপায় নেই।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমরা কি সত্যিই এভারেস্টের দিকে যাব ?"

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "দরকার হলে যেতে হবে নিশ্চয়ই !"

সন্তু ভাবল, দরকার আবার কী ? দরকারের জন্য কেউ এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে যায় নাকি ? কাকাবাবুর অনেক কথারই মানে বোঝা যায় না।

"আমরা এভারেস্টে উঠতে পারব, কাকাবাবু ?"

"কেন পারব না ? ইচ্ছে থাকলেই পারা যায়।"

কাকাবাবু খোঁড়া এবং কোনও খোঁড়া লোক অত উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারে, এই কথাটা সব সময় সন্তুর মাথার মধ্যে ঘোরে। কিন্তু একথাটা তো কাকাবাবুকে মুখ ফুটে বলা যায় না। কাকাবাবুর ধারণা, তীব্র ইচ্ছে আর মনের জোর থাকলে মানুষ সব কাজই পারে।

ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় কাকাবাবু চলাফেরা করতে পারেন ঠিকই। কাশ্মীরে ঘুরেছেন, এখানেও তো সিয়াংবোচি থেকে এতটা পাহাড়ি চড়াই-উতরাই হেঁটে এসেছেন। দু'একবার অবশ্য পা পিছলে পড়েছেন, তাতে কিন্তু একটুও দমেননি।

কিন্তু এভারেস্টে ওঠা তো অন্য ব্যাপার। সন্তু ছবিতে দেখেছে যে, এভারেস্ট-অভিযাত্রীরা কোমরে দড়ি বেঁধে আর হাতে লোহার গাঁইতির মতন একটা জিনিস নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে বেয়ে ওঠে, অনেকটা টিকটিকির মতন।

কাকাবাবু কি সেরকম পারবেন ? যতই মনের জোর থাক, কোনও খোঁড়া মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব ! শুধু মনের জোর নয়, কাকাবাবুর গায়েও খুব জোর আছে, কিন্তু তাঁর একটা পা যে অকেজো। একটা দুর্ঘটনায় কাকাবাবুর ঐ পা-টা নষ্ট হয়ে গেছে।

সন্তুর আর একটা কথাও মনে পড়ল। কলকাতায় তাদের বাড়িতে তেনজিং নোরগে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ গোপনে কী সব কথাবার্তার পর বিদায় নেবার সময় তেনজিং কাকাবাবুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, "গুড লাক। আই উইশ ইউ সাকসেস, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি পারবেন...।" একথা সন্তু নিজের কানে শুনেছে। কাকাবাবুকে খোঁড়া দেখেও তেনজিং কেন বলেছিলেন, আপনি পারবেন ? এভারেস্টে ওঠা কি এতই সহজ ?

এই সব ভাবতে ভাবতে সন্তু যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তা সে টেরই পায়নি।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, কাকাবাবু আগেই উঠে পড়েছেন। ঘুম থেকে উঠেই কাকাবাবুর পড়াশুনো করার অভ্যেস। তা তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন। আজও তিনি পড়তে শুরু করেছেন সেই কালো রঙের খাতাটা খুলে। কিছু-কিছু লিখছেনও মাঝে-মাঝে।

গম্বুজের লোহার দরজাটায় দুম্‌দুম্ করে শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু উঠেছিস ? দরজাটা খুলে দে তো !"

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে, তাড়াতাড়ি ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে তারপর

সন্তু দরজাটা খুলল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মিংমা। তার হাতে একটা ফ্লাস্ক। সে ভিতরে ঢুকে পড়ে বলল, "দরজাটা বন্ধ কর দেও, সন্তু সাব !"

সন্তু দরজা বন্ধ করে দেবার আগেই কয়েক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এতগুলো গরম জামা ভেদ করেও তাতে হাড় পর্যন্ত কেঁপে যায়।

মিংমা দুটো প্লাস্টিকের গেলাসে চা ঢালল ফ্লাস্ক থেকে। ঐ গেলাসগুলো খুব গরম হয়ে যায়। কলকাতায় বসে ঐ রকম গেলাসে চা খাওয়ার খুব অসুবিধে, কিন্তু এখানে ঐ গরম গেলাস দু' হাতে চেপে ধরেও খুব আরাম।

কাকাবাবু বললেন, "তুমিও এক গেলাস চা নাও, মিংমা ! তারপর বলো, আজ হাওয়া কী রকম ?"

উবু হয়ে বসে মিংমা বলল, "আজ হাওয়া বহুত কম হ্যায়, সাব ! স্কাই বিলকুল ক্লিয়ার ! ওয়েদার ফারসট্ কিলাস !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ !"

মিংমা উৎসাহ পেয়ে বলল, "সাব, আজ তাঁবু গুটাব ? আজ সামনে যাওয়া হবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ ! আরও কয়েকটা দিন থাকতে হবে এখানে !"

মিংমা আর সন্তু দু'জনেই তাকাল দু'জনের চোখের দিকে। দু'জনের মনেই এক প্রশ্ন, এখানে থাকতে হবে কেন ?

কাকাবাবু বললেন, "আর একটু চা দাও, আছে ?"

বেলা বাড়ার পর যখন রোদ উঠল, তখন সন্তু বেরিয়ে এল গম্বুজের বাইরে। মিংমা ছাড়া যে আর একজন শেরপা আছে, তার নাম নোরবু। সে একটু গম্ভীর ধরনের, মিংমার মতন অত হাসিখুশি নয়। তবে সে বেশ ভাল পুতুল বানাতে পারে। এখানে তো কয়েকদিন ধরে কোনও কাজ নেই, সে তাঁবুর বাইরে বসে ছুরি দিয়ে কাঠের টুকরো কেটে কেটে নানান রকম পুতুল বানায়। সন্তুকে সে একটা ভাল্লুক-পুতুল উপহার দিয়েছে।

মালবাহকরা সকাল থেকেই রান্নাবান্নায় মেতে যায়। আর তো কোনও কাজ নেই, সারাদিন ধরে খাওয়াটাই একমাত্র কাজ। মালবাহকরা রান্না করছে আর কাছেই বসে নোরবু একটা পুতুল বানাচ্ছে।

সন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। পুতুলটা প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু এটা কিসের পুতুল ? কী-রকম যেন অদ্ভুত দেখতে। অনেকটা বাঁদরের মতন, কিন্তু পিঠটা বাঁকা আর হাত দুটো এত লম্বা যে, প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "নোরবু-ভাই, এটা কী ?"

নোরবু মুখ না তুলে বলল, 'টিজুতি !"

সন্তু বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, "টিজুতি ? সেটা আবার

কী ?”

নোরবু বলল, “টিজুতি হ্যায় ! টিজুতি !”

গম্ভীর স্বভাবের নোরবুর কাছ্ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানা যাবে না।

সে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খানিকটা দূরে মিংমা একা-একা দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। সে মাউথ অর্গান বাজিয়ে সময় কাটায়।

সে মিংমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “মিংমা-ভাই, টিজুতি মানে কী ?”

বাজনা থামিয়ে মিংমা হেসে জিজ্ঞেস করল, “কেন, হঠাৎ টিজুতির কথা পুছছ্ কেন ?”

“নোরবু-ভাই একটা পুতুল বানাচ্ছে। বলল, সেটা টিজুতি !”

মিংমা বলল, “ছোট বাচ্চা, তোমার থেকেও থোড়াসা ছোটা, উসকো বোলতা টিজুতি। আর উসসে বড়া, এই হামারা মাফিক, তার নাম মিটি ! আউর বহুত বড়া, আমার থেকেও অনেক বড় তার নাম ইয়েটি !”

সন্তুর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। ইয়েটি মানে কি ইয়েতি ? তা হলে কাকাবাবু ইয়েতির খোঁজে এখানে এসেছেন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! রেঞ্জ দূরবিন দিয়ে আর কী দেখবেন ? কাচের বাক্সের জিনিসটা তা হলে নিশ্চয়ই ইয়েতির দাঁত !

সন্তুর মনে পড়ল, অনেকদিন আগে সে ‘টিনটিন ইন টিবেট’ বলে একটা বই পড়েছিল। সে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার-বইগুলোর খুব ভক্ত। ‘টিনটিন ইন টিবেট’ বইটাতে টিনটিন ইয়েতির সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু সে তো তিব্বতে।

তারপরই তার আবার মনে পড়ল, টিনটিন তো সেই গল্পে পাটনা থেকে নেপালে এসে তারপর তিব্বতের দিকে গিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে যে, ঠিক এই জায়গাটাতেই এসেছিল টিনটিন ?

সে উত্তেজিতভাবে মিংমার হাত চেপে ধরে বলল, “মিংমা-ভাই, তুমি ইয়েতি দেখেছ ?”

মিংমা দু' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “নাঃ !”

সন্তু একটু নিরাশ হয়ে বলল, “দেখোনি ? তা হলে জানলে কী করে যে ওরা তিনরকম হয় ? টিজুতি, মিটি আর ইয়েতি ?”

মিংমা বলল, “সব লোগ এইসা বোলতা !”

“তুমি না দেখলেও আর কেউ দেখেনি ? আর কোনও শেরপা কিংবা তোমাদের গাঁয়ের কোনও লোক ?”

“না, সন্তু সাব ! কেউ দেখেনি। দু-একঠো আদমি ঝুঠ বলে। লেকিন কোনও শেরপা দেখেনি। আমার বাবার এক বহুত বুঢ্ঢা চাচা ছিল,, সেই নাকি দেখেছিল, কিন্তু সে-চাচা বহুদিন হল মরে গেছে।”

“নোরবু-ভাইও দেখেনি ? তা হলে ও টিজুতির পুতুল বানাচ্ছে কী করে ?”

মিংমা হা-হা করে হেসে উঠল। সন্তু বিরক্ত হল একটু। এতে হাসির কী আছে— কোনও জিনিস না দেখলে কেউ তার পুতুল বানাতে পারে ?

মিংমা বলল, "বহুত লোক আগে টিজুতিকা পুতুল বানিয়েছে, নোরবুও সেই দেখে বানাচ্ছে !"

সন্তু বলল, "আগে যারা বানিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ দেখেছে নিশ্চয়ই ! কেউ না দেখলে এমনি-এমনি মন থেকে কেউ ওরকম অদ্ভুত মূর্তি বানায় ?"

মিংমা বলল, "সন্তু সাব, কিতনা আদমি তো কার্তিক, গণেশ, লছমী মাইজির মূর্তি বানায়, তারা কি সেই সব দেবদেবীদের আঁখসে দেখেছে ! গণেশজীর যে হাত্তির মতন মাথা, ঐসা মাফিক কই কভি দেখা !"

কথাগুলো সন্তুর ঠিক পছন্দ হল না। আগেকার দিনে ঠাকুর-দেবতারা পৃথিবীতে নেমে আসতেন ! তখন নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছে। তখন তারা মূর্তি গড়েছে, তাই দেখে-দেখে এখনকার লোকরা বানাচ্ছে।

কাকাবাবু যদি ইয়েতি আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে দারুণ ব্যাপার হবে। পৃথিবীতে এর আগে কেউ জ্যান্ত বা মরা কোনও ইয়েতির ছবি তুলতে পারেনি। সন্তুর কাছে ক্যামেরা আছে, সন্তু যদি কোনওক্রমে একটা ইয়েতির ছবি তুলতে পারে !

সন্তু মিংমাকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে তিব্বত কত দূরে বলতে পারো ? এদিক দিয়ে তিব্বত যাওয়া যায় ?"

মিংমা বলল, "হাঁ, কেন যাওয়া যাবে না ? তুমলোক যিস রাস্তাসে আয়া, সেদিকে নামচেবাজার আছে জানো ? টাউন-মতন জায়গা !"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জানি। নামচেবাজার তো সিয়াংবোচির আগে।"

"ওহি নামচেবাজারসে যদি বাঁয়া দিকে যাও, তারপর থামিচক বলে এক গাঁও পড়বে। সেই গাঁও পার হয়ে যাও, উসকো বাদ বড়া-বড়া সব পাহাড়, সবসে বড়া পাহাড় কাংটেগা। কেন কাংটেগা নাম জানো ? কাংটেগা মানে হল সফেদ ঘোড়া। ঠিক সাদা ঘোড়ার মতন দেখায় সে পাহাড়। ওহি দিকে আছে নাংপা পাস্। সেই নাংপা পাস্ দিয়ে চলে যাও, বাস, টিবেট পঁহুছে যাবে !"

সন্তু প্রায় লাফিয়ে উঠল। তা হলে তো টিনটিনের গল্পের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। নেপালের মধ্য দিয়েই তো টিনটিন আর ক্যাপটেন হ্যাডক গিয়েছিল তিব্বতে।

মিংমাকে আর কিছু না-বলে সন্তু ছুট দিল গম্বুজের দিকে। একটুখানি যেতে-না-যেতেই ধড়াস করে আছাড় খেল।

মিংমা এসে তার হাত ধরে তুলে একটু বকুনি দিয়ে বলল, "সন্তু সাব, কিতনা বার বোলা, বরফের ওপর দিয়ে একদম ছুটবে না ! কভি নেহি ! আইস্তে-আইস্তে চলতে হয় !"

সন্তু একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। তবে একটা সুবিধে, এই বরফের ওপর

জোরে আছাড় খেলেও গায়ে বেশি লাগে না।

কিন্তু সন্তু উৎসাহের চোটে আর স্থির থাকতে পারছে না। সাবধানে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গম্বুজটার দিকে চলল।

কাকাবাবু পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে তখন বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছেন। সন্তু ভেতরে ঢুকে দারুণ উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, এবার আমরা ইয়েতির খোঁজে এসেছি, তাই না?"

কাকাবাবু সন্তুর মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মুচকি হেসে শান্ত গলায় বললেন, "ইয়েতি বলে কিছু আছে নাকি?"

সন্তুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ইয়েতি বলে কিছু নেই? কাকাবাবু ইয়েতির খোঁজে আসেননি?

আঙুল তুলে সে কাচের বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বলল, "তা হলে দাঁতের মতন ওটা কী?"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ দাঁতটা সম্পর্কে তোর খুব কৌতূহল আছে, তাই না? আচ্ছা, আমি ঘুরে আসি একটু। ফিরে এসে তোকে ঐ দাঁতটার ইতিহাস শোনাব!"

॥ ৫ ॥

দুপুর থেকেই বরফ-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এখানে বৃষ্টি মানেই বরফবৃষ্টি, তবে এক-এক সময় খুব নরম, পাতলা পেঁজা-তুলোর মতন তুষারপাত হয়, তার মধ্য দিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম লাগে, তাতে গা ভেজে না। আর এক-এক সময় তুষারপাতে আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়, চার-পাঁচ হাত দূরের কোনও জিনিসও দেখা যায় না। সেই রকম বৃষ্টির মধ্যে হাঁটাচলা করাও অসম্ভব।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর থেকেই সন্তু গম্বুজের মধ্যে শুয়ে আছে। দিনের বেলাতেও এই গম্বুজের মধ্যে আলো খুব কম ঢোকে, তাই ব্যাটারি-লণ্ঠনটা জ্বেলে রাখতে হয়। সেই আলোতে কাকাবাবু তাঁর কালো রঙের খাতাটিতে খসখস করে কী সব লিখে চলেছেন।

মাঝখানে কাঠের বাক্সের ছোট টেবিলটিতে রাখা সেই চৌকো কাচের বাক্সটি, তার মধ্যে ভেলভেটের ওপর সাজানো সেই দাঁতের মতন জিনিসটা। সেটা দাঁত হতে পারে না। মানুষের দাঁতের মতনই আকৃতি, কিন্তু যে-কোনও মানুষের দাঁতের চেয়ে বোধহয় ছ' গুণ বড়! প্রায় দু' ইঞ্চি। মানুষ ছাড়া এরকম দাঁত অন্য কোনও প্রাণীর হয় না, আবার কোনও মানুষেরই এত বড় দাঁত হতে পারে না।

জুতোর দোকানের বাইরে এক-এক সময় একটা বিরাট ঢাউস জুতো সাজিয়ে রাখা হয়। মনে হয়, সেই জুতো কোনও মানুষের জন্য নয়, দৈত্যদের জন্য

তৈরি। সেই রকম এই দাঁতটাও নিশ্চয়ই কেউ মজা করে বানিয়েছে।

সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সন্তুর অনেক সময় মনে হয়, জিনিসটার যেন রং বদলায়। কখনও মনে হয়, সেটা বেশ হলদেটে, কখনও মনে হয় ফুটফুটে সাদা, আবার, এক-এক সময় একটু লালচে ভাবও আসে যেন। সত্যিই কি রং বদলায়, না ওটা সন্তুর চোখের ভুল ?

কাকাবাবু লেখা থামিয়ে পাইপ ধরাতে যেতেই সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি দাঁতটার কথা বলবে বলেছিলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আর বুঝি কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিস না ? ভেবেছিলাম, তোকে আরও কয়েকদিন পরে বলব ! আচ্ছা শোন্ তা হলে !"

পাইপে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এটা দেখে তোর কী মনে হয় ? এটা মানুষের দাঁত ?"

সন্তু একবার বলল, "হ্যাঁ।" তারপর বলল, "না !"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও, ঠিক তোরই মতন, কেউ বলেছেন, এটা মানুষের দাঁত। কেউ বলেছেন, তা হতেই পারে না ! এটা নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। সে-সব কথা বলবার আগে, একজন লোকের কথা বলা দরকার। তাঁর নাম রাল্‌ফ ফন কোয়েনিংসওয়াল্ড। ইনি থাকতেন নেদারল্যান্ডসে, কিন্তু এঁর একটা শখ ছিল, যে-সব জীবজন্তু পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের নিয়ে গবেষণা করা। সেই জন্য তিনি পৃথিবীর বহু জায়গা ঘুরেছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষেও তিনি এসেছেন, চীনেও গেছেন। চীন দেশে, পিকিং শহরের রাস্তায়..."

সন্তু বাধা দিয়ে বলল, "এখন সেই শহরটার নাম বেইজিং !"

কাকাবাবু সন্তুর চোখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ থেমে রইলেন। তাঁর কথার মাঝখানে তিনি অন্য কারুর কথা বলা পছন্দ করেন না।

সন্তু তা বুঝতে পেরে অপরাধীর মতন মুখ করল।

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা বেশ, এখন নাম বেইজিং। যখনকার কথা বলছি, তখন ১৯৩০ সাল, সেই সময় সবাই পিকিং-ই বলত। সে সময় ঐ পিকিং শহরের রাস্তায় একদল লোক নানারকম অদ্ভুত জিনিস বিক্রি করত। এরকম আমাদের দেশের রাস্তায়ও এখনও দেখা যায়। ফুটপাথে একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর নানা রকম জীবজন্তুর হাড়, কঙ্কাল, ধনেশ পাখির ঠোঁট, এই সব বিক্রি করে। রালফ্ ফন কোয়েনিংসওয়াল্ড পিকিংয়ের রাস্তায় এক ফেরিওয়ালার কাছে নানারকম হাড় ও পাখির পালকের সঙ্গে এই রকম তিনটি দাঁত দেখতে পেলেন। দেখে তো তিনি স্তম্ভিত ! এত বড় মানুষের দাঁত ? ফেরিওয়ালাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দাঁতগুলো কোথায় সে পেয়েছে ? সে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। সে খালি বলে, পাহাড় থেকে ! কোয়েনিংসওয়াল্ড খুব কম দামে দাঁত তিনটি কিনে নিলেন।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?"

"কী ?"

"ফেরিওয়ালারা ঐ টুকরো-টুকরো হাড় আর কঙ্কাল বিক্রি করে কেন ? ওগুলো কাদের কাজে লাগে ? ডাক্তারি ছাত্রদের ?"

"হ্যাঁ। ডাক্তারি ছাত্রদেরও কাজে লাগতে পারে। তা ছাড়া, অনেক লোকের ধারণা, সে সময় চীনাদের খুবই বিশ্বাস ছিল যে, এই সব জিনিস গুঁড়ো করে খেলে অনেক রোগ সেরে যায়। কেউ-কেউ আবার বিশ্বাস করত যে, পুরনো দিনের শক্তিশালী প্রাণীদের হাড় গুঁড়ো করে খেলে শরীরের তেজ বাড়ে। এখনও যেমন অনেকের ধারণা, গণ্ডারের শিং খেলে শরীরে দারুণ তেজ হয়।"

"গণ্ডারের শিং মানুষে খায় ?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই তো লুকিয়ে-লুকিয়ে গণ্ডার মারা হয়। গণ্ডার মারা এখন আইনে নিষেধ। তবু কিছু লোক লুকিয়ে-লুকিয়ে গণ্ডার মেরে তার শিংটা আরব শেখদের কাছে বিক্রি করে। এক-একটা শিং-এর দাম তিরিশ-চল্লিশ হাজার। আরবরা ঐ শিং কাঁচা-কাঁচাই খেয়ে ফেলে !"

"তারপর কোয়েনওয়াল্ড কী করলেন ?"

"কোয়েনওয়াল্ড নয়, কোয়েনিংসওয়াল্ড। তিনি তারপর খোঁজ করে দেখলেন পিকিং, হংকং, জাভা, সুমাত্রা, বাটাভিয়ার অনেক ওষুধের দোকানেই এরকম দাঁত বিক্রি হয়। সেগুলোও বেশ বড় বড়, কিন্তু ঐ তিনটির মতন অত বড় নয়। লোকের দাঁতের অসুখ হলে ঐ দাঁত কিনে গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজে, তাতেই সব অসুখ সেরে যায়। এত বড় বড় দাঁত কোন্ প্রাণীর, আর কোথায় এগুলো পাওয়া যায়, সেই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলেন কোয়েনিংসওয়াল্ড। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখলেন যে, ঐ দাঁতগুলোর গোড়ায় একটু যেন হলদে হলদে ধুলো লেগে আছে। সেই ধুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, সেই রকম হলদে রঙের মাটি আছে ইয়াংসি নদীর ধারে পাহাড়ের কোনও-কোনও গুহায়। তখন তিনি ভাবলেন, ঐ দাঁতওয়ালা প্রাণীরা নিশ্চয়ই তাহলে এক সময় ঐ ইয়াংসি নদীর ধারের পাহাড়ের গুহাতেই থাকত। ঐগুলি যদি মানুষের দাঁত হয়, তাহলে সেই মানুষগুলো অন্তত কুড়ি-পঁচিশ ফুট লম্বা হওয়া উচিত। কিন্তু অত বড় লম্বা মানুষের কথা কক্ষনো শোনা যায়নি, প্রাগৈতিহাসিক কালেও মানুষের মতন কোনও প্রাণী অত লম্বা ছিল না। যাই হোক, কোয়েনিংসওয়াল্ড সেই দাঁতওয়ালা কাল্পনিক প্রাণীদের নাম দিলেন জাইগ্যান্টোপিথিকাস। অর্থাৎ দৈত্যের মতন বন-মানুষ। পৃথিবীর অনেক বৈজ্ঞানিকই কিন্তু তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না।"

একটু থেমে কাকাবাবু পাইপ টানতে লাগলেন।

তারপর আবার বললেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন কোয়েনিংসওয়াল্ড জাভায় ছিলেন। তিনি বন্দী হলেন জাপানিদের হাতে।

তাঁকে আটকে রাখা হল একটা ব্যারাকে, তাঁর জিনিসপত্র সব কেড়ে নেওয়া হল। সেখানে থাকতে-থাকতে রোগা হয়ে গেলেন তিনি, মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেল, অনেকেরই ধারণা হল তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাই যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন আগেই ছেড়ে দেওয়া হল তাঁকে। কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, তিনি তাঁর কোমরে একটা ছোট্ট থলির মধ্যে বেঁধে সর্বক্ষণ নিজের কাছে রাখতেন কিছু মহামূল্যবান জিনিস। সে জিনিসগুলো আর কিছু নয়, ঐ তিনটে দাঁত।

"ছাড়া পাবার পর কোয়েনিংসওয়াল্ড নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এলেন আমেরিকায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ক্লাবে একদিন দুপুরে তিনি কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, কথায়-কথায় প্রাচীনকালের মানুষদের প্রসঙ্গ উঠল। একজন অধ্যাপক ঠাট্টা করে বললেন, মিঃ কোয়েনিংসওয়াল্ড, আপনি সেই জাইগ্যান্টোপিথিকাসের খবর রটিয়ে দিয়ে আমাদের খুব চমকে দিয়েছিলেন। দু' ইঞ্চি লম্বা দাঁত মানুষের মতন কোনও প্রাণীর হতে পারে ? তা হলে তার মুখখানা কত বড় হবে ?

"বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড এই কথা শুনে দারুণ চটে গেলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কী, হয় না ? দেখবেন ? প্রমাণ চান ? তা হলে দেখুন।

"সামনেই খাবারের প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক পরিচারিকা। কোয়েনিংসওয়াল্ড কোমর থেকে সেই ছোট্ট থলিটা বার করে দাঁত তিনটে সেই খাবারের প্লেটের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, এগুলো তা হলে কী ?

"অত বড় বড় দাঁত দেখে সেই পরিচারিকাটি 'ও মাগো !' বলে চিৎকার করে উঠল, তার হাত থেকে প্লেটটা পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। পরিচারিকাটি সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান। ছুটে এল আরও অনেক লোক। দাঁত তিনটেও ছিটকে কোথায় চলে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দুটো দাঁত পাওয়া গেল, একটা আর পাওয়া গেল না কিছুতেই। সেখানকার সব চেয়ার, সোফা, মেঝের কার্পেট উল্টেপাল্টে দেখা হল, কিন্তু একটা দাঁত যেন অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ। দাঁতের শোকে বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড কাঁদতে লাগলেন শিশুর মতন। তারপর বেশিদিন আর তিনি বাঁচেনওনি।"

সন্তু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এইটাই কি সেই তৃতীয় দাঁত ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "তোর বুদ্ধি আছে দেখছি। ঠিক ধরেছিস ! হ্যাঁ, এটাই সেই তৃতীয় দাঁতটা। অন্য দুটো দাঁতের একটা আছে আমেরিকার 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'তে। আর-একটা দাঁত কোয়েনিংসওয়াল্ড নিজেই তাঁর মৃত্যুর আগে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু মাইকেল শিপটনকে। তাঁর ধারণা ছিল, ঐ দাঁত মানুষের সৌভাগ্য এনে দেয়। ঐ দাঁত সঙ্গে ছিল বলেই জাপানিরা তাঁকে মারেনি। তৃতীয় দাঁতটা ঐ হার্ভার্ড ক্লাবের এক পরিচারক চুরি করে। গোলমালের মধ্যে সে সেটা সরিয়ে ফেলেছিল চটপট। অনেকদিন

পরে সে সেটা বিক্রি করেছিল স্যার আর্থার রকবটম নামে এক বৈজ্ঞানিকের কাছে। গতবার বিলেতে গিয়ে আমি স্যার আর্থারের ছেলে লেননের কাছ থেকে এই দাঁতটা ধার করে এনেছি। লেনন আমার অনেকদিনের বন্ধু।"

সন্তুর কাছে এখনও সব কিছু পরিষ্কার হল না। তাহলে এই দাঁতটা কিসের ? দাঁতটা পাওয়া গিয়েছিল পিকিংয়ে, এখন সেটাকে নিয়ে এই নেপালে আসার মানে কী ?

সে জিজ্ঞেস করল, "এই দাঁতটা তাহলে কি ইয়েতির, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু বললেন, "ইয়েতি বলে কিছু আছে নাকি ? তুই ইয়েতি সম্পর্কে কী জানিস ?"

"হিমালয়ের এই রকম উঁচু জায়গায় বরফের মধ্যে একরকম মানুষ থাকে, তারা খুব হিংস্র—"

"কেউ তাদের দেখেছে ?"

"অনেকেই তো দেখেছে বলে। অবশ্য কেউ তাদের ছবি তুলতে পারেনি। আমার মনে হয় এখানে ইয়েতি আছে, কারণ শেরপা নোরবু-ভাই বাচ্চা ইয়েতির মূর্তি বানাচ্ছিল !"

"তাই নাকি ? দেখতে হবে তো। তুই লক্ষ করেছিস, সেই মূর্তির পায়ে কটা আঙুল ?"

"তা তো দেখিনি। কেন ?"

"সব জিনিস ভাল করে লক্ষ করতে হয়। ইয়েতির যে-সব পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়, সেই সব ছাপগুলোতেই কিন্তু পায়ের আঙুল মোটে চারটে। মানুষ তো দূরের কথা, গোরিলা কিংবা শিম্পাঞ্জিদেরও পায়ে পাঁচটা আঙুল থাকে। পায়ের চারটে আঙুলওয়ালা মানুষের মতন কোনও প্রাণীর কথা কল্পনাও করা যায় না !"

সন্তু চুপ করে গেল। এতখানি সে জানত না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "যদি ইয়েতি নামে বাঁদর বা ভাল্লুক জাতীয় কোনও প্রাণী থাকেও, সেগুলোও কিন্তু ছ' সাত ফুটের চেয়ে লম্বা নয়। যারা ইয়েতি দেখেছে বলে দাবি করে, তারাও কেউ বলেনি যে, ইয়েতি খুব লম্বা প্রাণী। সুতরাং এতবড় দাঁত ইয়েতির হতে পারে না !"

"তাহলে ?"

"মহাভারতের ঘটোৎকচের কথা মনে আছে ? সে এত লম্বা ছিল যে, কর্ণের বাণে সে যখন মারা যায়, তখন তার দেহের চাপেই মরে গিয়েছিল অনেক কৌরব-সৈন্য ! রামায়ণ-মহাভারত পড়লে মনে হয়, এক সময় বনেজঙ্গলে কিছু খুব লম্বা জাতের মানুষ থাকত, তাদের বলা হত রাক্ষস। হয়তো সেই রকম এক-আধটা রাক্ষস এখনও রয়ে গেছে !"

"এখনও ?"

"স্যার আর্থার রকবটম এই দাঁতটা নিয়ে মাইক্রো-কার্বন পরীক্ষা করেছেন। তাঁর মতে, এটা দেড়শো-দু'শো বছরের বেশি পুরনো নয়। অর্থাৎ এই দাঁত যার মুখে ছিল, সে দেড়শো-দু'শো বছর আগেও বেঁচে ছিল। স্যার আর্থারের মতে, এরা কোনও আলাদা জাতের প্রাণী নয়। সাধারণ মানুষই এক-দু'জন হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে যেতে পারে, যদি তাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের গোলমাল দেখা দেয়।"

"আমরা সেইরকম কোনও লোককে খুঁজতে এসেছি এখানে?"

"না।"

"তবে?"

"আসল কারণটা এখন তোকে বলা যাবে না। যতক্ষণ না ঠিকমতন প্রমাণ পাচ্ছি, ততক্ষণ বলার কোনও মানে হয় না। তবে, আর-একটা কারণ আছে। তোকে বললাম না, বুড়ো কোয়েনিংসওয়াল্ড মৃত্যুর আগে একটা দাঁত দিয়ে যান তাঁর বন্ধু মাইকেল শিপটনকে। এই মাইকেল শিপটনের এক ছেলের নাম কেইন শিপটন। তুই তার নাম শুনেছিস?"

"না।"

"অনেকেই তার নাম জানে। বিখ্যাত অভিযাত্রী। বছর দু'এক আগে সব খবরের কাগজে কেইন শিপটনকে নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছিল। কেইন শিপটন একটা ছোট দল নিয়ে এসেছিল এভারেস্ট অভিযানে। এই গম্বুজটার কাছেই তারা তাঁবু ফেলেছিল। তারপর একদিন সন্ধেবেলা কেইন শিপটন এখান থেকে মাত্র দু'শো তিনশো গজ দূরের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তন্ন-তন্ন করে তাকে খোঁজা হয়েছে, তার মৃতদেহের কোনও সন্ধানই মেলেনি, এই দ্যাখ কেইন শিপটনের ছবি।"

কাকাবাবু কালো খাতাটার ভেতর থেকে একটা ছবি দেখালেন সন্তুকে। খবরের কাগজ থেকে কাটা ছবি। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের সাহেব, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ, তার গলায় হারের মতন কী যেন একটা ঝুলছে।

কাকাবাবু সেখানে আঙুল রেখে বললেন, "এই হারের একটা লকেটে কেইন শিপটন সব সময় রেখে দিত তার বাবার বন্ধুর দেওয়া দাঁতটা। সে ঐ দাঁতটাকে মনে করত সত্যিই একটা সৌভাগ্যের চিহ্ন। কিন্তু ঐ দাঁতটা বুকে ঝুলিয়ে এখানে এসেছিল বলেই বোধহয় কেইন শিপটনের প্রাণ গেল!"

॥ ৬ ॥

কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ তো, বৃষ্টি থেমেছে কি না।"

সন্তু গম্বুজের লোহার দরজাটা খুলে বাইরে উঁকি মারল।

এখানে এই এক অদ্ভুত। যখন-তখন বৃষ্টি, আবার একটু পরেই ঝকমকে রোদ। দুপুরে এমন বরফ-বৃষ্টি শুরু হয়েছিল যে, মনে হয়েছিল, আর থামবেই

না সারাদিন। কিন্তু এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ফুটফুটে নীল।

কাকাবাবু উঠে এসে বললেন, "চল, একটু ঘুরে আসি।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে এই বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা খুব বিপজ্জনক। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ছড়ানো থাকলে তেমন অসুবিধে নেই। কিন্তু এক-এক জায়গায় বরফ পাথরের মতন শক্ত আর সেখানেই পা পিছলে যায়।

একটা তাঁবুর দড়ির ওপর আলতোভাবে বসে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছিল মিংমা। ওদের দেখে সে উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, "কিধার যাতা, সাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "চলো, আকাশ পরিষ্কার আছে, কালাপাথর পর্যন্ত গিয়ে দেখি যদি এভারেস্ট দেখা যায়।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে মিংমা বলল, "সন্তু সাব্, গ্লাভস কাঁহা ? গ্লাভস পরে আসুন। সন্‌ঝে হলেই বহুত শীত লাগবে !"

সত্যিই তো, সন্তু মনের ভুলে খালি হাতে চলে এসেছিল। শীত তো লাগবেই। তা ছাড়া, মাঝে-মাঝেই আছাড় খেয়ে পড়তে হয়, বরফে হাত লাগে। কাকাবাবু আগেই সাবধান করে দিয়েছেন, বেশি ঠাণ্ডার মধ্যে খালি হাতে বরফ ছুঁলে ফ্রস্ট বাইট হতে পারে। বরফ কামড়ায়। তাতে অনেক সময় হয়তো আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়।

সন্তু গম্বুজে ফিরে গিয়ে গ্লাভস পরে এল।

চতুর্দিকে বরফে সাদা হয়ে গেছে। মিংমা আর কাকাবাবু এগিয়ে গেছেন অনেকখানি। বরফের ওপর দিয়ে দৌড়োবার উপায় নেই। সন্তু বকের মতন লম্বা-লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেল ওদের কাছে।

কাকাবাবু শেরপা মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মিংমা, তুমি কেইন শিপটনের নাম শুনেছ ?"

মিংমা বলল, "হাঁ সাব্, সবকোই জানে শিপটন সাবের কথা। হাম দেখা হায় উনকো। ইতনা তাগড়া জোয়ান, মুখমে দাড়ি আর মোচ্। আহা বেচারা মর্ গিয়া।"

"তুমি শিপটন সাহেবের দলের সঙ্গে এসেছিলে নাকি ?"

"না, সাব। উস্ টাইম আমার বুখার হয়েছিল। পেট মে বহুত দরদ্ !"

"তোমার চেনা কেউ এসেছিল শিপটনের সঙ্গে ? নোরবু এসেছিল ?"

"না, সাব, নরবু ভি আসেনি। লেকিন আমার দোস্ত্ শেরিং আয়া থা !"

"শিপটন কী করে মারা গেলেন, তুমি শুনেছ ?"

"হাঁ, সাব। সবাই জানে। এহি তো জায়গামে ছিল উনাদের বেস্ ক্যাম্প। শিপটন সাবকে দেখে সবাই ভেবেছিল, এ সাব ঠিক এভারেস্ট পীক-এ উঠে যাবে। ইতনা থা উনকা তন্দুরস্তি।"

"মারা গেলেন কী ভাবে ?"

"ব্যস, বিলকুল বদ্ নসিব। বহুত হিম্মত আর সাহস ছিল তো, তাই একেলা

একেলা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। পাহাড়মে এহি কানুন হ্যায় সাব, কোথাও কেউ একেলা যাবে না। একেলা যানেসেই ভয়। দু-জন যাও, কুছ্ না হোবে। শিপটন সাব সে-কথা মানেননি। একেলা গেলেন, তারপর কোথায় বরফ তাঁকে টেনে নিল !"

"তার দেহটাও তো পাওয়া যায়নি।"

"নেহি মিলা। গরমিন্টের লোক এসে কত ঢুঁড়ল। আম্‌রিকা থেকে ভি আউর বহুত সাহাবলোক এসে ঢুঁড়ল। তবু মিলল না। শিপটন সাব সির্ফ বরফকা অন্দর গায়েব হো গিয়া।"

"কিন্তু মিংমা, এই বেস ক্যাম্প থেকে একজন লোক একা-একা হেঁটে আর কত দূর যেতে পারে ? বেশি দূর তো যাবে না। এর মধ্যে কেউ কোনও খাদে পড়ে গেলে তার দেহ পাওয়া যাবে না কেন ? খুব বড় খাদ তো এখানে নেই।"

"কভি কভি এইসা হোতা হ্যায়, সাব, বরফ মানুষকো অন্দর টান লেতা হ্যায়। হাঁ সাব, বরফ মানুষকে টেনে নেয়।"

সন্তু বলল, "ক্রিভাস !"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন। সন্তুকে তিনি যতটা ছোট মনে করেন, সে তো ততটা ছোট নয়, সে অনেক কিছু জানে।

সন্তু অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ে কথাটা শিখেছে। সে বলল, "বরফের মধ্যে মাঝে-মাঝে ক্রিভাস্ গর্ত থাকে, তার মধ্যে পা ফস্কে পড়ে গেলেই একেবারে মৃত্যু।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিকই বলেছিস, কিন্তু কথাটা ক্রিভাস্ নয়। ফরাসিতে বলে ক্রভাস, আর ইংরেজিতে বলে ক্রেভিস। তুই দুটো মিলিয়ে একটা বাঙালি উচ্চারণ করে ফেলেছিস।"

মিংমাও ক্রেভিস কথাটা জানে। সাহেবদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছে। সে বলল, "না সাব, ইধার ক্রেভিস নেহি হ্যায়। আরও দূরে আছে। লেকিন বরফ মানুষকে টেনে নেয়, ইয়ে, সাচ বাত হ্যায়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ-রকমভাবে আরও লোক মরেছে ? যাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি ?"

"হর এক্সপিডিশানেই তো একজন দু'জন আদমি মরে। কখনও লাশ পাওয়া যায়, কখনও পাওয়া যায় না ! শেরপা মরে, কুলি মরে, সাহাব লোকভি মরে ! গত বরষমে আমিও তো একবার মরতে মরতে বাঁচ গিয়া !"

সন্তু বলল, "এত বিপদ, তবু তোমরা এখানে আসো কেন ?"

মিংমা গর্বের সঙ্গে বলল, "আমরা পাহাড়ি মানুষ। আমরা বিছানায় শুয়ে মরতে চাই না। বিছানায় শুয়ে মরে ডরপুক আর জেনানারা। আমরা পাহাড়মে, নেহি তো বরফের মধ্যে মরতে চাই। বরফমে মরো, শান্তি, বহুত

শান্তি !"

মিংমা বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে দুটো হাত রাখল, যেন এর মধ্যেই সে মরে গেছে।

কাকাবাবু হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে বললেন, "আমরা যেমন বিকেলবেলা বেরিয়েছি, কেইন শিপটনও বেরিয়েছিল বিকেলে। বিকেলবেলা বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে সে আর কতদূর যাবে ? যতই সাহসী হোক অভিযাত্রী হিসেবে শিপটন নিশ্চয়ই এটুকু জানত যে, রাত্তিরবেলা তাঁবুর বাইরে থাকতে নেই। সুতরাং সে সন্ধের আগেই ফিরে আসবার কথা চিন্তা করেছিল নিশ্চয়। শিপটনের সঙ্গের লোকেরা বলেছে যে, পর পর তিন দিন শিপটন এইরকম বিকেলবেলা একা একা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে একদিন সে তাঁবুতে ফিরে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল তার দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে। তারা কেউ বিশ্বাস করেনি। শিপটনের এমনি বানিয়ে-বানিয়ে মজার কথা বলার অভ্যেস ছিল।"

মিংমা বলল, "হাঁ, শিপটন সাব বহুত জলি আদমি থা। আমার দোস্ত শেরিং বলে যে, শিপটন সাব এমুন কথা বলতেন যে, হাঁসতে হাঁসতে পেটমে বেথা হয়ে যেত !"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শিপটনের একটা ডায়েরি পাওয়া গেছে। তাতেও সে বানিয়ে-বানিয়ে ঐ রকম কোনও মজার কথা লিখেছে কি না সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। ডায়েরিতে সাধারণত কেউ মিথ্যে কথা লেখে না। অথচ সে যা লিখেছে, তাও বিশ্বাস করা যায় না !"

"শিপটন কী লিখেছিলেন, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু তক্ষুনি সন্তুর কথার উত্তর না দিয়ে মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কতবার এক্সপিডিশানে এসেছ, মিংমা ?"

মিংমা মুচকি হেসে বলল, "সওয়া সাতবার আংকল সাব।"

"সওয়া সাতবার মানে ?"

"এহি বার তো আধা ভি নেহি হুয়া, সিকি হুয়া।"

"ও, বুঝেছি। তা এতবার যে তুমি এসেছ, কখনও এইদিকে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছ ? ধরো ইয়েতি কিংবা বড় ভাল্লুক কিংবা কোনও দৈত্যদানো ?"

"নেহি সাব ! কভি নেহি !"

"তোমার চেনাশুনো কেউ দেখেছে ?"

"কভি তো শুনা নেহি !"

"তুমি তেনজিং নোরগের নাম জানো ?"

মিংমা অমনি সেলামের ভঙ্গিতে কপালে এক হাত ছুঁইয়ে বলল, "জরুর। শেরপা লোগকো গুরু হ্যায়, তেনজিং !"

"সেই তেনজিং নোরগে আমায় বলেছেন যে, তাঁর বিশ্বাস ইয়েতি বলে

একরকম মানুষের মতন প্রাণী সত্যিই আছে। কর্নেল হান্টও সেই কথা বলেন। অবশ্য স্যার এডমন্ড হিলারি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চান না। তা তোমরা কেউ ইয়েতির কথা জানো না কিংবা মানো না ?"

মিংমার মুখখানা যেন শুকিয়ে গেল। সে কোনও উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"এদিকে এতবার অভিযাত্রীরা এসেছে, কেউ কিছু দেখেনি ?"

"সাব, একঠো বাত বলব !"

"বলো।"

"সাব, আপ ইয়েতি ঢুঁড়তে এসেছেন, এ-কথা যদি জেনে যায়, তবে কুলি লোগ সব ভেগে যাবে। ইয়েতি কেউ দেখেনি, তবু সবাই ইয়েতির নাম দেবতা মাফিক ভয় করে, ভক্তি ভি করে !"

"তাই নাকি ? তুমিও ভেগে যাবে না তো ?"

মিংমা নিজের বুকে চাপড়ে মেরে বলল, "নেহি সাব। মিংমা কভি ডরতা নেই ! কিসিকো ডরতা নেই !"

"বাঃ ভাল কথা। আমি অবশ্য ইয়েতি খুঁজতে আসিনি।"

এর পর স্বভাব-গম্ভীর কাকাবাবু খানিকটা যেন ঠাট্টার সুরে বললেন, "ইয়েতি খোঁজা কি আমার কাজ ? আমি খোঁড়া মানুষ, ইয়েতি তাড়া করলে কি আমি পালাতে পারব ? আমি এসেছি এভারেস্টে উঠতে।"

যেন ইয়েতির তাড়া খেয়ে পালানোর চেয়ে এভারেস্টে ওঠা অনেক সহজ কাজ ! কথাটা বলে কাকাবাবু আপন মনে হাসতে লাগলেন।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু—"

কাকাবাবু বললেন, "ঐ শিপটনের ডায়রিতে কী লেখা ছিল, সেটা জানতে চাইছিস তো ? বলছি। শিপটন লিখেছে যে, ঐ যে সামনে কালাপাথর নামে ছোট পাহাড়টা, ওর কাছে একদিন সন্ধের মুখে-মুখে ও একজন মানুষকে দেখেছিল, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষটি শিপটনের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা, ঠিক কোদালের ফলার মতন তার দাঁত। অর্থাৎ মনে কর, একজন ঘটোৎকচের মতন মানুষ।"

"তারপর ?"

"সেই মানুষটি শিপটনকে দেখে তেড়েও আসেনি, কাঁচা খেয়েও ফেলেনি, আবার পালিয়েও যায়নি। সে শুধু শিপটনের দিকে একবার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, তার পরের মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।"

"অ্যাঁ ?"

"শিপটন সেই কথাই লিখেছে। তার চোখের সামনেই লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। শিপটন বোধহয় একটা রূপকথা বলতে চেয়েছিল। ইয়েতি সম্বন্ধে যে অনেক রকম গল্প আছে, তার মধ্যে একটা আজগুবি গল্প হচ্ছে,

ইয়েতিরা নাকি বরফের তলায় একরকম ঘাসের মতন গাছ জন্মায়, সেইগুলো খুঁজে-খুঁজে খায়। আর তার গুণে যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।"

মিংমা হো-হো হা-হা করে হাসতে লাগল। যেন সে হাসির তোড়ে মাটিতে লুটোপুটি খাবে!

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এত হাসছ কেন?"

মিংমা বলল, "কেয়া তাজ্জব কি বাত! ইয়েতিরা ঘাস খায় আর তারপরেই ভ্যানিশ হয়ে যায়।".

কাকাবাবু বললেন, "পাহাড়ের অনেক উঁচুতে উঠলে অনেকেই চোখে নানা রকম ভুল দেখে। অনেক অভিযাত্রীই এ-কথা লিখেছেন। গভীর সমুদ্রে যারা একা-একা বোট নিয়ে পাড়ি দেয়, তারাও নাকি দেখেছে যে, জল থেকে বিরাট চেহারার কোনও মানুষ উঠে আসছে। এ অনেকটা মরুভূমিতে মরীচিকা দেখার মতন।"

মিংমা আবার হাসতে হাসতে বলল, "ঘাস খেয়ে ভ্যানিশ। হে-হে হা-হা!"

কাকাবাবু বললেন, "শিপটন ঐ কথা ডায়েরিতে লিখেছে, তারপর সে নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। তা হলে কি সে-ও ঐ ঘাস খুঁজে পেয়ে খেয়ে দেখেছিল?"

মিংমা এই কথাতেও হাসতে লাগল। শেরপারা একবার হাসতে শুরু করলে আর সহজে থামতেই চায় না।

এই সময় সন্তু একটা জিনিস দেখতে পেল। ডান দিকে পনেরো-কুড়ি গজ দূরে একটা ছোট্ট সবুজ চারা গাছ, তাতে একটি সাদা রঙের ফুল ফুটে আছে। এখানে আশেপাশে কোনও গাছ নেই। হঠাৎ বরফের মধ্যে একটা ফুলগাছ এল কী করে?

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল, এইটাই বোধহয় বরফের মধ্যে সেই ঘাসের মতন গাছ, যা খেয়ে ইয়েতিরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

বরফের মধ্যে যে দৌড়তে নেই, সে-কথা ভুলে গিয়ে সন্তু গাছটার দিকে দৌড়ল। কাকাবাবু আর মিংমা সামনের দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন কথা বলতে বলতে।

সন্তু প্রায় গাছটার কাছাকাছি পৌঁছে হোঁচট খেয়ে পড়ল। একটা হাত পড়ল গাছটার ওপরেই। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।

ঠিক যেন কোনও গর্তের ওপর আলগা বরফ বিছানো, সন্তুর মাথাটা ঢুকে গেল বরফের মধ্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রকমভাবে নেমে যেতে লাগল নীচের দিকে। সেই অবস্থায় চ্যাঁচাবার উপায় নেই। তার পা দুটো ছটফট করতে লাগল ওপরে।

কাকাবাবু আর মিংমা কিছুই দেখতে পেলেন না, তখনও তাঁরা কথাবার্তায় মগ্ন।

বরফের মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে সন্তু ভাবল, এই তার শেষ। কাকাবাবু আর মিংমা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তার আর বাঁচার আশা নেই।

কিন্তু মানুষ সব সময় বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে। সন্তুর দম আটকে আসছে, তবু সে পা দুটো বেঁকিয়ে নিজেকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। এক সময় তার মাথা ঠেকল কিসে যেন। বরফের নীচে নিশ্চয়ই শক্ত পাথর আছে।

তখন সন্তু পায়ের চাপ দিয়ে মাথাটা তুলতে লাগল। সম্পূর্ণ মুখটা যখন বাইরে এল তখন মনে হল, আর এক মুহূর্ত দেরি হলে নিশ্বাসের অভাবে সন্তুর বুকটা বুঝি ফেটে যেত। সে হাঁপাতে লাগল জোরে জোরে।

আদৌ কিন্তু সন্তু বাঁচল না। আলগা বরফের মধ্যে গেঁথে যেতে লাগল তার পা দুটো। ঠিক যেমন চোরাবালির মধ্যে মানুষ আস্তে আস্তে ডুবে যায়। সন্তু চিৎকার করল, "কাকাবাবু! মিংমা— !"

ওরা দুজনে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। ডাক শুনে ফিরে তাকাল। দেখে তিনি দৌড়ে আসতে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ধপাস করে পড়ে গেলেন তিনি নিজেই। তিনি বলে উঠলেন, "মিংমা, আমাকে তোলবার দরকার নেই, তুমি সন্তুকে ধরো।"

মিংমা কিন্তু দাঁড়ায়নি। সে দৌড়বার বদলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল সন্তুর দিকে। মিংমা অনেক রকম কায়দা জানে। খানিকটা ঐভাবে এসে সে হঠাৎ শুয়ে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে সন্তুর কাছে এসে বলল, "সন্তু সাব, হামারা হাত পাকাড়ো!"

চোরাবালির মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেই বেশি বিপদ, তাই মিংমা শুয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় সে সন্তুর হাত ধরে টেনে তুলল। তারপর দু'জনেই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে এল দূরে। কাকাবাবুও সেখানে চলে এসেছেন ততক্ষণে।

সন্তু বলল, "ক্রেভিস! ওখানে ক্রেভিস আছে, আমি তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম!"

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, "তুই আমাদের সঙ্গে আসছিলি, আবার ওদিকে গেলি কেন?"

"ওখানে একটা ফুলগাছ দেখেছিলাম।"

"ফুলগাছ? এই বরফের মধ্যে আবার ফুলগাছ আসবে কোথা থেকে?"

"হ্যাঁ, সত্যি সত্যি দেখেছিলাম। আমি হাত দিয়ে ধরেওছিলাম সেটাকে। তারপর বরফের মধ্যে ডুবে গেলাম!"

মিংমা বলল, "কভি কভি হোতা হ্যায়। একঠো দোঠো গাছ ইধার উধার হোতা হ্যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "বরফের মধ্যেও এ-রকম চোরাবালির মতন ব্যাপার থাকে ? এ তো খুব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! কেইন শিপটন তাহলে এ-রকমই একটা কিছুর মধ্যে পড়ে মারা যেতে পারে !"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, ওটা কিন্তু খুব গভীর নয়। আগে তো আমি উল্টোভাবে পড়েছিলুম, মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল, তারপর মাথাটা এক জায়গায় ঠেকে গেল। নইলে তো আমি উঠতেই পারতুম না !"

মিংমা বলল, "মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল ? বহুত জোর বাঁচ গিয়া।"

সন্তুর শরীরে কোথাও আঘাত লাগেনি বটে, কিন্তু তার সারা শরীর তখনও থরথর করে কাঁপছে। একদম মৃত্যুর মুখোমুখি হলে এ-রকম হয়। সে মিংমাকে শক্ত করে চেপে ধরে রইল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ফুলগাছটা কোথায় গেল ?"

সন্তু বলল, "সেটা বরফের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এখানে একটা কিছু চিহ্ন দেওয়া দরকার। আবার যাতে কেউ ভুল করে ওখানে না যায়—"

কিন্তু কী দিয়ে চিহ্ন দেওয়া হবে ? এখানে কোনও কাঠের টুকরো কিংবা পাথর-টাথরও কিছু নেই। মিংমাই বুদ্ধি বার করল একটা।

সে বসে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ মুঠোয় ভরে টিপে টিপে শক্ত করে একটা মূর্তি বানাতে লাগল। দেখতে দেখতে সেটা বেশ একটা ছোটখাটো গোরিলা কিংবা বাঁদরের মতন মূর্তি হয়ে উঠল।

মিংমা হাসতে হাসতে বলল, "দেখিয়ে সাব, এক টিজুটি বন গিয়া। নরবু কাঠের পুতুল বানায়, আমিও বরফের পুতুল বানাতে পারি।"

সন্তু আপন মনেই বলে উঠল, "ইয়েতির ছোটভাই টিজুতি !"

মিংমা গলা থেকে তার লাল রঙের রুমালটা খুলে নিয়ে সেটা পরিয়ে দিল ঐ বরফের মূর্তিটার গলায়। তারপর সেই মূর্তিটাকে তুলে সাবধানে কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, "ওটা আর কতক্ষণ থাকবে। কাল রোদ্দুর উঠলেই তো গলে যাবে !"

মিংমা বলল, "কাল আমি এসে একঠো বড় ফ্ল্যাগ লাগিয়ে দিয়ে যাব ইধারে। কুলি লোগ্ আজ কেউ আসবে না এ সাইডে।"

কাকাবাবু বললেন, "আজ আর কালাপাথরে যাওয়া যাবে না। এক্ষুনি সন্ধে হয়ে যাবে। চলো, বেস ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলো !"

গম্বুজে ফিরে এসে সন্তু স্যান্ডউইচ আর কফি খেয়ে শুয়ে পড়ল। তার শরীর এখনও দুর্বল লাগছে।

সন্তু ঘুমিয়েও পড়ল তাড়াতাড়ি। কাকাবাবু আলো জ্বেলে পড়াশুনো করতে লাগলেন।

এক সময় একটা স্বপ্ন দেখল সন্তু।

সে একা চুপি চুপি কাকাবাবুকে না জানিয়ে গম্বুজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মাঝরাতে। তার এক হাতে একটা শাবল আর অন্য হাতে একটা টর্চ। গম্বুজের সামনের তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে সে এগিয়ে গেল নিঃশব্দে। মালবাহকরা সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু একটা তাঁবু থেকে ভেসে আসছে মাউথ অর্গানের আওয়াজ। নিশ্চয়ই মিংমা। শুয়ে শুয়েও সে মাউথ অর্গান বাজায়।

সন্তু হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বিকেলবেলার সেই জায়গাটায়। মিংমার তৈরি বরফের পুতুলটা ঠিকই আছে। গলায় বাঁধা লাল রুমাল। মিংমার কায়দায় সন্তুও সেখানে শুয়ে পড়ে, তারপর গড়াতে গড়াতে মূর্তিটা ছাড়িয়েও এগিয়ে গেল খানিকটা। তারপর শাবল দিয়ে বরফ খুঁড়তে লাগল। একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করে কাকাবাবুকে সে চমকে দেবে! বরফ সরিয়ে সরিয়ে সে খুঁজতে লাগল ফুলগাছটা। অবশ্য শুধু ফুলগাছটা খুঁজতেই সে এখানে আসেনি। এ জায়গায় বরফের নীচে যে গর্ত, তা খুব গভীর নয়। এক জায়গায় সন্তুর মাথা ঠেকে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা ঠেকে গিয়েছিল কিসে? তখন সে পাথর বলেই ভেবেছিল, কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল, সেটা যেন একটা লোহার পাত। লোহা ছুঁলে আর পাথর ছুঁলে আলাদা আলাদা রকম লাগে। জনমানবশূন্য জায়গায় বরফের নীচে লোহার পাত?…

খুঁড়তে খুঁড়তে সন্তু ঠং করে একটা শব্দ শুনতে পেল। আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল তার। তবে তো সে ঠিকই বুঝেছিল! কাকাবাবু যখন শুনবেন…। উৎসাহের চোখে সে আরও জোরে জোরে খোঁড়বার চেষ্টা করতেই শাবলটা তার হাত থেকে পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। সেটাকে তুলতে যেতেই সন্তুর মাথাটা আবার ঢুকে যেতে লাগল ভেতরে।

স্বপ্নের মধ্যেই সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আহ্, আহ্!"

তারপরই সে ভাবল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিজেই আবার উত্তর দিল, কই, না তো, এই তো আমার মাথাটা ঢুকে যাচ্ছে বরফের মধ্যে, আমি মরে যাচ্ছি।

তারপর সে চোখ মেলে দেখল, আলো জ্বলছে! কোথাকার আলো? কিসের আলো?

এবার ভাল করে সন্তুর ঘুম ভাঙল। সে বুঝতে পারল, সে শুয়ে আছে গম্বুজের মধ্যে, স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে। বাবাঃ, কী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল সে! বরফের নীচে লোহার পাত, এ কখনও হয়?

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখল, কাকাবাবু তাঁর বিছানায় নেই।

আবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল সন্তুর। এত রাতে কাকাবাবু কোথায় গেলেন? স্বপ্নের মধ্যে সন্তু একা একা বরফ খুঁড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি তো কেউ একা একা এখানে বাইরে যায় না রাত্তিরবেলা।

সে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু!"

অমনি গম্বুজের ওপর থেকে কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "কী হল ?"

কাকাবাবু এত রাতেও গম্বুজের ওপর বসে আছেন ? কোনও মানে হয় ? উনি কি রাতে একটুও ঘুমোবেন না ? এ-রকম করলে শরীর খারাপ হবে যে !

"কাকাবাবু, এখন কটা বাজে ?"

"সাড়ে নটা। কেন ?"

এখন রাত মোটে সাড়ে নটা ? যাঃ ! সন্তুর ধারণা সে বহুক্ষণ ঘুমিয়েছে। স্বপ্নটাই তো দেখল কতক্ষণ ধরে। কলকাতায় রাত সাড়ে নটার সময় কত রকম আওয়াজ। কলকাতা এখান থেকে কত দূরে !

খুব অস্পষ্টভাবে মাউথ অর্গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে বাইরে। মিংমা বাজাচ্ছে। সন্তু স্বপ্নের মধ্যেও এই শব্দটা শুনেছিল। আশ্চর্য না !

সন্তু একবার ভাবল, কাকাবাবুকে স্বপ্নটার কথা বলবে। তারপরই আবার ভাবল, না, দরকার নেই। কাকাবাবু নিশ্চয়ই হেসে উঠবেন। বরফের নীচে লোহার পাত ! কাকাবাবু তাকে পাগলও মনে করতে পারেন। অথচ, সন্তুর এখনও স্বপ্নটাকে ভীষণ সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

একটু বাদে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের নীল রঙের আলো গম্বুজের জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। কাকাবাবু গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছেন।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বাইরে বেরিয়েই সন্তু লাফাতে লাগল। ঠিক স্কিপিং করার মতন। বিছানা ছাড়ার পর প্রথম যে শীতের কাঁপুনিটা লাগে, সেটা এইভাবে তাড়াতে হয়। বেশ কিছুক্ষণ লাফাতে শরীরটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে।

সন্তুর লাফালাফির শব্দ শুনে কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শরীর ভাল আছে তো ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, খুব ভাল আছে।"

"কাল রাতে তুই একেবারে অঘোরে ঘুমিয়েছিস। তোকে দু-তিনবার ডাকলুম—"

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ?"

"হ্যাঁ। কাল আমি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি। তোকেও দেখতে চেয়েছিলাম—"

কাকাবাবু স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে খুললেন। তারপর উঠে বসে বললেন, "আমার ক্রাচ দুটো এগিয়ে দে তো !"

সন্তু ক্রাচ দুটো তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখেছ কাল রাত্রে ?"

"দুটো আলোর বিন্দু। অনেক দূরে, প্রায় কালাপাথরের কাছটায়। চোখের ভুল নয়, ভাল করে দেখেছি।"

"আলোর বিন্দু ? ওখানে আলো আসবে কোথা থেকে ?"

"সেই তো কথা ! আমাদের লোকরা রাত্রে অতদূরে যাবে না। আলোর বিন্দু দুটো খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ আবার মিলিয়ে গেল। ধরা যাক, ইয়েতি বলে যদি কোনও প্রাণী থেকেও থাকে, তা হলেও, ইয়েতিরা আলো নিয়ে ঘোরাফেরা করে, এ-রকম কখনও শোনা যায়নি !"

"কাকাবাবু, আলেয়া নয় তো ?"

কাকাবাবু আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, "বরফের মধ্যে আলেয়া ? কী জানি ! সেটাও ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে !"

॥ ৮ ॥

পরদিন সকালেই কাকাবাবু মিংমাকে ডেকে বললেন, "তাঁবু গোটাও। আমরা এবার সামনের দিকে এগোব।"

মিংমা যেন আনন্দে একেবারে নেচে উঠল।

সে বলল, "এভারেস্টে যাব, সাব ? চলিয়ে সাব, আমি আপনাকে কান্ধে পর উঠাকে নিয়ে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব। আমাদের এক নম্বর ক্যাম্প হবে কালাপাথরে।"

মিংমা ছুটে বেরিয়ে গেল অন্যদের খবর দিতে।

কাকাবাবু প্যাকিং বাক্স খুলে বার করলেন একটা ওয়্যারলেস সেট। এটাও তিনি এবার বিদেশ থেকে এনেছেন। বিদ্যুৎ ছাড়াই এটা ব্যাটারিতে চলে।

যন্ত্রটাকে চালু করতেই সেটের মধ্যে কর-র-র কট কট শব্দ শুরু হল। কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই একটু বাইরে যা।"

সন্তু গম্বুজের বাইরে চলে এল। কিন্তু মনে মনে খুব কৌতূহল রয়ে গেল তার। এই যন্ত্রটা কাকাবাবুকে আনতে সে দেখেছে, কিন্তু এর আগে কাকাবাবু ওটা একবারও ব্যবহার করেননি। কাকাবাবু কার সঙ্গে কথা বলছেন, আর এমন কী গোপন কথা, যা সন্তুর সামনে বলা যায় না ?

বাইরে এসে সন্তু দেখল, শেরপা আর মালবাহকরা এরই মধ্যে খটাখট শব্দে তাঁবুর দড়িবাঁধা খুঁটি তুলতে শুরু করেছে। সন্তুও ওদের সঙ্গে হাত লাগাল।

খানিকবাদে কাকাবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "যা সন্তু, এবার তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নে।"

মিংমা বলল, "ইধার সে খানা খা কে জায়গা ? তাতেই সুবিধা হোবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, আকাশ পরিষ্কার আছে, তাড়াতাড়ি রওনা হলে দুপুরের মধ্যে কালাপাথর পৌঁছে যাব। সেখানে খানা পাকানো হবে।"

মিংমা এক গেলাস ধোঁয়া ওঠা চা কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "কম

সে কম এক গিলাস তো চা খেয়ে লিন।”

সন্তু গম্বুজের দিকে যাচ্ছিল, মিংমা তাকেও ডেকে বলল, “আরে সন্তু সাব, তুম ভি থোড়া চায়ে পি লেও।”

এখানে ঠাণ্ডার মধ্যে যতবার চা খাওয়া যায় ততবারই ভাল লাগে। গরম গেলাসটা দু' হাত দিয়ে চেপে ধরলে আরাম লাগে খুব।

চা খেতে খেতে মিংমা জিজ্ঞেস করল, “আংকেল সাব, কালাপাত্থরমে তো আজই পহুঁছে যাব। সিখানে ফিন ক রোজ থাকব আমরা—”

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, “সেখানে থাকব কেন? রাতটা কালাপাথরে ঘুমিয়ে আবার এগিয়ে যাব সামনের দিকে। এভারেস্টে যেতে হবে না?”

মিংমা অবাকভাবে ভুরু তুলে বলল, “তব ইধারমে ইতনা রোজ কাঁহে ঠারা? সাতদিন স্রিফ চুপচাপ বৈঠে বৈঠে...”

কাকাবাবু বললেন, “এখানে থাকার দরকার ছিল। এত ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাই শরীরটাকে সইয়ে নেওয়া হল। ...আচ্ছা বলো তো, মিংমা, কালাপাথর থেকে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছতে কত দিন সময় লাগবে?”

মিংমা বলল, ‘আকাশের দেওতা যদি কৃপা করেন তো সাত রোজ, আট রোজের মধ্যেই পঁহুছে যাব।”

সন্তু বলে উঠল, “মোটে সাত আট দিন লাগবে?”

মিংমা বলল, “হাঁ সাব, উস সে জাদা দিন নেহি লাগে গা। সাউথ কল সে উঠ জায়েগা—তুম রহেগা হামারা সাথ।”

কাকাবাবু বললেন, “ঠিক আছে। তা হলে তো আমাদের সঙ্গে খাবার-দাবার যথেষ্টই আছে।”

মিংমা এর পর বিড় বিড় করে আপন মনেই যেন বলল, “আভি তক ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আমরা কি সত্যিই এভারেস্টে উঠতে যাচ্ছি?”

কাকাবাবু বেশ গলা চড়িয়ে বললেন, “বিশ্বাস হচ্ছে না মানে? আমি কি তোমাদের মিথ্যে কথা বলে এনেছি? আমরা নিশ্চয়ই এভারেস্টে উঠব। চূড়ায় উঠতে পারলে এ দলের সবাই অনেক টাকা পুরস্কার পাবে। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, নেপাল গভর্নমেন্ট দুই গভর্নমেন্টই পুরস্কার দেবে। দলের প্রত্যেককে।”

মিংমা চট করে কাকাবাবুর খোঁড়া পা-টার দিকে একবার তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, “কী রে সন্তু, জিনিসপত্র গুছোতে গেলি না?”

সন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল গম্বুজের দিকে।

ভেতরে ঢুকে সে প্রথমে খুব চমকে গেল, ঘরের মাঝখানে একজন লোক উবু হয়ে বসে আছে।

তারপর দেখল, সেই লোকটি হচ্ছে দ্বিতীয় শেরপা নোরবু।

নোরবুর পক্ষে এই গম্বুজের মধ্যে ঢোকা আশ্চর্য কিছু না। কাকাবাবুর জিনিসপত্র বার করতে হবে। কিন্তু নোরবু কোনও জিনিসপত্র বার করার বদলে

কাচের বাক্সটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছে স্থির হয়ে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী নোরবু ভাই?"

নোরবু যেন চমকে গেল খানিকটা, তারপর সেই অবস্থায় বসে থেকেই মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সন্তু সাব, ইয়ে কেয়া হ্যায়।"

সন্তু বলল, "ইয়ে দাঁত হ্যায়। একঠো দাঁত।"

নোরবু বলল, "কিসকা দাঁত?"

সন্তু বলে ফেলতে যাচ্ছিল যে, ইয়েতির দাঁত ওটা। কিন্তু সামলে নিল, এরা সবাই ইয়েতির নামেই ভয় পায়। মিংমা বলেছিল, ইয়েতির কথা শুনলেই মালবাহকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। কাকাবাবুও এই কাচের বাক্সটা ওদের সামনে কক্ষনো বার করেন না।

সে বলল, "মালুম নেহি।"

নোরবু তবুও জিজ্ঞেস করল, "মানুষ কা দাঁত ইতনা বড়া নেহি হোতা হ্যায়। কিসিকা দাঁত হ্যায় এঠো?"

নোরবু অন্য সময় প্রায় কথাই বলে না। খুব গম্ভীর। তাকে এত কথা বলতে দেখে সন্তু বেশ অবাক হল।

নোরবু বাক্সটা খুলে দাঁতটা বার করতে গেল। সন্তু অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, "আরে আরে, খুলো না, খুলো না।"

নোরবু বেশ রুক্ষভাবে বলল, "কাঁহে?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু বারণ করেছেন। ওটায় কারুর হাত দেওয়া নিষেধ।"

নোরবু বলল, "হাম চিজ তো দেখে গা।"

সন্তু এবার ধমক দিয়ে বলল, "বারণ করছি না, ওটায় হাত দিলে কাকাবাবু রাগ করবেন। নোরবু ভাই, তুমি এই প্যাকিং বাক্সটা বাইরে নিয়ে যাও বরং।"

নোরবু সে কথায় কান না দিয়ে কাচের বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নোরবুর এরকম ব্যবহার দেখে হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল সন্তুর। সে এক্ষুনি গম্বুজের বাইরে গিয়ে কাকাবাবুকে ডেকে আনতে পারে। কাকাবাবু তাকে সব সময় এই বাক্সটা চোখে চোখে রাখতে বলেছেন।

কিন্তু সে কাকাবাবুকে ডাকল না, নোরবুর সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বলল, "কী হচ্ছে কী? এই বাক্সটায় হাত দিতে বারণ করছি না?"

নোরবু যেন কেমন হয়ে গেছে। চোখ দুটো ঘোলাটে মতন। সে সন্তুকে এক ধাক্কায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সন্তু ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, সেই অবস্থাতেই সে ক্যারাটের প্যাঁচে নোরবুর চোয়ালে কষাল এক লাথি।

সন্তুর চেয়ে নোরবু অনেক বেশি জোয়ান, তবু সেই আঘাতেই সে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে।

অমনি সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "এই রে।"

সন্তু ভয় পেয়ে গেছে। নোরবুর হাত থেকে ছিটকে কাচের বাক্সটাও পড়ে গেছে মাটিতে। নিশ্চয়ই ভেঙে চুরমার।

কিন্তু বাক্সটা ভাঙেনি। মাটিতে পড়ে সেটা সামান্য একটু লাফিয়ে উঠল। সেটা আসলে কাচের নয়! খুব সূক্ষ্ম প্লাস্টিকের মতন জিনিসে তৈরি, ঠিক কাচের মতন দেখায়।

মাটিতে পড়ে নোরবু একেবারে হতভম্ব। সন্তুর মতন একটা বাচ্চা ছেলে প্যাঁচ কষিয়ে তাকে ফেলে দিল! সে আবার উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সন্তুর ওপর, সন্তু ঠিক সময় সরে গেল তার তলা থেকে। নোরবু আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল। গায়ে জোর থাকলেও নোরবু লড়াইয়ের কোনও নিয়ম জানে না।

নোরবু আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই কাকাবাবু ঢুকলেন ভেতরে। নোরবুকে পড়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন, "কী হল?"

নোরবু কোনও উত্তর দিল না।

সন্তু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। নোরবু যে হঠাৎ এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করতে শুরু করেছে, সে কথা শুনলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন। ওকে কোনও কঠিন শাস্তিও দিতে পারেন। এমনকী নোরবুকে হয়তো আর অভিযানে সঙ্গে নেবেনই না।

সন্তু বলল, "কিচ্ছু হয়নি। ও এমনি পা পিছলে পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাচের বাক্সটা নিয়ে কী করছিস?"

"এটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"না, ওটা আমার কাছে থাকবে। নোরবু, তুমি লোকজনকে ডেকে এ ঘরের মালপত্র বার করার ব্যবস্থা করো।"

নোরবু কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

॥ ৯ ॥

ঠিক সকাল ন'টার সময় যাত্রা শুরু হল।

সন্তু এর আগে কালাপাথরের ওপরে উঠেছিল একবার। খুব বেশি দূর নয়। যদি তুষারপাত শুরু না হয়, তাহলে ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

মিংমা আর নোরবু চলেছে একেবারে সামনে। তাদের পেছনে সন্তু। মিংমা তার স্বভাব অনুযায়ী নানারকম মজার কথা বলতে বলতে চলেছে। নোরবু গম্ভীর। সে অন্য সময়ও এরকম গম্ভীর থাকে, কিন্তু আজ তার মুখখানাই যেন বদলে গেছে। সন্তু মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছে নোরবুকে। কিন্তু নোরবু একবারও তাকাচ্ছে না তার দিকে।

বরফের ওপর দিয়ে পা টেনে টেনে চলা। কিছুতেই খুব জোরে যাওয়া যায় না। সকলেরই সঙ্গে কিছু কিছু মালপত্র। এমন কী কাকাবাবুরও পিঠের সঙ্গে একটা ব্যাগ বাঁধা। কালাপাথরের ওপরে উঠলে এভারেস্টচূড়া একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়। এভারেস্ট! সত্যিই কি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা হবে? এত ছোট একটা দল নিয়ে? কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে এভারেস্টে উঠবেন? সন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

ঘণ্টা খানেক একটানা চলার পর কাকাবাবু দূর থেকে সন্তুর নাম ধরে ডাকলেন।

সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কাকাবাবু একেবারে পিছিয়ে পড়েছেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি আবার চেঁচিয়ে বললেন, "সন্তু, আমার ওষুধ—।"

কাকাবাবুকে কয়েকটা ওষুধের ট্যাবলেট খেতে হয় দিনে তিনবার। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পকেট থেকে ট্যাবলেটের কৌটো বার করতে তাঁর অসুবিধে হয় বলে সন্তু তখন সাহায্য করে কাকাবাবুকে। কিন্তু এখন তো ওষুধ খাবার সময় নয়। কাকাবাবু নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়েছেন!

সন্তু কাকাবাবুর কাছে ফিরে এল।

কাকাবাবু তাঁর কোটের ডান পকেটটা দেখিয়ে বললেন, "ওখান থেকে ওষুধ বার কর।"

"তোমার কষ্ট হচ্ছে, কাকাবাবু?"

"কিচ্ছু না। শোন্। গম্বুজের চূড়া থেকে রাত্তিরবেলা যে আলোর বিন্দু দেখেছিলাম, তা কতটা দূরে ছিল বলে তোর মনে হয়?"

"ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"আমার আন্দাজ এই রকম জায়গা থেকে।"

সন্তু চারদিকটা দেখল।

কাকাবাবু একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে বললেন, "তুই অন্যদের নিয়ে এগিয়ে যা। কারুর থামবার দরকার নেই। ওদের বলবি, আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি এই জায়গাটা খানিকটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "মিংমাদের এগিয়ে যেতে বলে আমি থাকব তোমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু উত্তর দিলেন, "না, তোর থাকার দরকার নেই। তুই ওদের সঙ্গে যা! ওদের বল, আগে গিয়ে কালাপাথরের কাছে তাঁবু ফেলতে!"

কাকাবাবু একটা পাথরের ওপর বসে নিশ্চিন্তভাবে পাইপ ধরালেন।

শেরপা ও মালবাহকের দলটা অনেক দূরে চলে যাবার পর কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। ডান দিকের এক জায়গায় তাঁর চোখটা থেমে গেল। পকেট থেকে ছোট্ট একটা দূরবিন বার করে সেদিকটা দেখতে লাগলেন ভাল করে। আপনমনেই বললেন, হুঁ!

ডানদিকে বেশ খানিকটা এগোবার পর এক জায়গায় দেখা গেল বরফের মধ্যে পর পর পাঁচ-ছ'টা ছোট গর্ত। ঠিক হাতির পায়ের চাপের গর্তের মতন।

কাকাবাবু চমকালেন না। ধীরে-সুস্থে তাঁর পিঠের ঝোলাঝুলি নামিয়ে রাখলেন। ক্রাচ দুটোও পাশে রেখে তিনি সেই একটি গর্তের পাশে বসলেন।

গর্তটা যে কারুর পায়ের চাপে হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে হাতির পায়ের চেয়ে মানুষের পায়ের ছাপের সঙ্গেই বেশি মিল। শুধু তফাত এই যে, কোনও মানুষের পায়ের চাপে ওরকম গর্ত হতে পারে না। খুব ভাল করে লক্ষ করলে সেই পায়ের ছাপে আঙুলের চিহ্নও বোঝা যায়। তবে পাঁচটা নয়, চারটে আঙুল। বুড়ো আঙুল বা কড়ে আঙুল নেই, সব কটা আঙুলই সমান।

কাকাবাবু বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "ইনক্রেডিবল ! অ্যামেজিং ?"

কোটের পকেট থেকে ছোট ক্যামেরা বার করে তিনি খচাখচ করে গর্তগুলোর ছবি তুলতে লাগলেন। ঠিক ছ'খানা পায়ের ছাপ। আজ সকাল থেকেই রোদ। বরফের ওপর সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপ এই রকম রোদে একটু পরেই গলে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই ছ'টা ছাপ গলেনি।

অনেকক্ষণ ধরে কাকাবাবু ব্যস্ত রইলেন সেই পায়ের ছাপগুলো নিয়ে। নানাভাবে সেগুলো মাপতে লাগলেন আর ছবিও তুললেন অনেকগুলো। তাঁর মুখে যেন একটা অখুশি অখুশি ভাব। চোখের সামনে দেখতে পেয়েও তিনি যেন পায়ের ছাপগুলোকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

একটু পরে দূরে একটা শব্দ হতে তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

বেশ দূর থেকে কে যেন ছুটে আসছে তাঁর দিকে। ওপর দিকে দু'হাত তোলা, মুখ দিয়ে কী যেন একটা আওয়াজও করছে।

কাকাবাবু বিচলিত হলেন না। রিভলভারটা বার করে সে দিকে চেয়ে বসে রইলেন। একটু পরেই তিনি দেখলেন, শুধু একজন নয়, পেছনে আরও কয়েকজন আসছে।

তখন তিনি রিভলভারটা কোটের পকেটে আবার ভরে ফেললেন। ইয়েতি-টিয়েতি কিছু নয়, ছুটে আসছে তাঁর নিজের লোকরাই।

বরফের ওপর দিয়ে দৌড়নো অতি বিপজ্জনক, তবু যেন প্রাণভয়ে, একবারও আছাড় না খেয়ে প্রথমে এসে পৌঁছল মিংমা।

খুব জোরে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে দম নিয়ে মিংমা বলল, "স্যার, ইয়েটি, ইয়েটি, ইতনা বড়া— !"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি ? তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?"

মিংমা বলল, "নোরবু দেখেছে সাব, আপ উঠিয়ে, আভি ভাগতে হবে এখান থেকে !"

এর মধ্যে সন্তু এসে পৌঁছল।

তাকে দেখেই কাকাবাবু খুব ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই দেখেছিস, সন্তু ? নিজের চোখে ?"

সন্তুর মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটোয় ভয় আর বিস্ময় মাখানো। সে বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "কী রকম দেখতে ? মানুষের মতন, না গোরিলার মতন ?"

সন্তু দু-তিনবার ঢোঁক গিলে বলল, "খুব ভাল করে দেখতে পাইনি, অনেকটা দূরে ছিল, আমরা কালাপাথরের কাছাকাছি যেতেই নোরবুভাই আর কুলিরা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল···আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, চোখ তুলেই দেখি, কী একটা বিরাট কালো জিনিস সাঁত করে সরে গেল পাহাড়ের আড়ালে।"

কাকাবাবু দারুণ রেগে ধমক দিয়ে বললেন, "ইডিয়েট ! খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জিনিসটাকে ভাল করে দেখতে পারলি না ? এতই প্রাণের ভয় ? তা হলে এসেছিস কেন ?"

সন্তু মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিংমা বলল, "আপ কেয়া বোল রহা হ্যায়, সাব ? ইয়েটির সামনে গেলে কোনও মানুষ বাঁচে ? বাপ রে বাপ ! আমরা খুব টাইমে ভেগে এসেছি !"

কাকাবাবু চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "তোমরা ভেগে এলে, না ইয়েতিটাই ভেগে গেল। সে কি তোমাদের তাড়া করে এসেছিল ?"

সে-কথার উত্তর না দিয়ে মিংমা বরফের একটা গর্তের দিকে তাকিয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, "ইয়ে কেয়া হ্যায়, সাব ? হে রাম ! হে মহাদেও ! এই তো ইয়েটির পায়ের ছাপ ! ইখানে ভি ইয়েটি এসেছিল !"

এরপর এসে পড়ল নোরবু আর মালবাহকরা। তারা সবাই মিলে একসঙ্গে এমন চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করল যে, প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না।

কাকাবাবু জোরে বললেন, "চুপ ! আস্তে ! কে কী দেখেছ, সব একে একে বুঝিয়ে বলো।"

সবাই এক মুহূর্ত চুপ করে গিয়ে আবার মুখ খোলার আগেই নোরবু এগিয়ে এল কাকাবাবুর সামনে। খানিকটা রুক্ষভাবে বলল, "আভি লৌট চলো সাব ! এক মিনিট টাইম নেহি !"

কাকাবাবু বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। আমি তো আছি। ইয়েতি এলেও আমি তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারব।"

ইতিমধ্যে মালবাহকরাও বড় বড় পায়ের ছাপের গর্তগুলো দেখতে পেয়েছে। তারপর এক দারুণ গণ্ডগোল শুরু হল। মালবাহকরা শুরু করল কান্নাকাটি আর শেরপা দু'জন আরম্ভ করল তর্জন-গর্জন। তারা এক্ষুনি ফিরে যেতে চায়।

কাকাবাবু তাদের একটুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তারপর হাল ছেড়ে

দিয়ে বললেন, "বেশ তো, ফিরে যাও।"

কিন্তু ওরা কাকাবাবু আর সন্তুকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। গভর্নমেন্টের লোক ওদের আসবার সময়ই বলে দিয়েছে কাকাবাবুর সবরকম হুকুম পালন করতে। এখন কাকাবাবুকে বিপদের মুখে ফেলে যেতেও ওরা রাজি নয়। তাহলে ফিরে গেলে শাস্তি পেতে হবে।

কাকাবাবু কিছুতেই যেতে রাজি নন। সন্তু কাকাবাবুর জেদি স্বভাবের কথা জানে। বিরাট কালো ছায়াটা এক পলকের জন্য দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠেছিল দারুণভাবে। তার মনে পড়েছিল কিং কঙের কথা। কিন্তু এখন অনেকটা ভয় কমে গেছে। সেও কাকাবাবুর সঙ্গে থাকবে।

নোরবু হঠাৎ চিৎকার করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল, আর অমনি মালবাহকেরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপরে। কোনওরকম বাধা দেবার আগেই তাদের দু'জন কাঁধে তুলে ফেলল কাকাবাবুকে। অন্য একজন সন্তুর কোটের কলার খিমচে ধরে দৌড়তে লাগল।

সন্তু ইচ্ছে করলে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে পারত কিন্তু ওরা কাকাবাবুকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দেখে, সেও চলতে লাগল সেদিকে।

সবাই বারবার পেছন ফিরে দেখছে। ইয়েতি ওদের তাড়া করে আসছে কিনা দেখবার জন্য।

গম্বুজটার কাছাকাছি ফিরে আসবার পর কাকাবাবু বললেন, "ভালই হল, আমাকে আর এতখানি কষ্ট করে হেঁটে আসতে হল না। এবার আমায় নামিয়ে দাও!"

নোরবু বলল, "নেহি!"

মিংমা বলল, "আমরা আজই থিয়াংবোচি ওয়াপস্ যাব। অতদূর যেতে না পারি যদি তা হলে ফেরিচা গাঁওমে রুখে যাব।"

কাকাবাবুর একটা পা খোঁড়া হলেও তাঁর দুই হাতে যে সাঙ্ঘাতিক জোর, তা এরা জানে না। এক ঝটকায় তিনি নেমে এলেন মাটিতে। তবে, অন্য লোকদের মতন তিনি মাটিতে পড়েই আবার উঠে দাঁড়াতে পারেন না। তাঁর একটু সময় লাগে। সেই সুযোগ মালবাহকরা তাঁকে আবার তোলার চেষ্টা করতে যেতেই কাকাবাবু শুয়ে থাকা অবস্থাতেই রিভলভার উঁচু করলেন। কড়া গলায় বললেন, "মানুষ খুন করা আমি পছন্দ করি না। আমায় গুলি চালাতে বাধ্য কোরো না!"

সবাই ভয়ে সরে দাঁড়াল।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন। তারপর বললেন, "সন্তু, আমার ক্রাচ দুটো দে।"

মিংমার কাছে ক্রাচ ছিল, সে এগিয়ে দিল। কাকাবাবু তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "তুমি যে বলেছিলে, কোনও কিছুতেই ভয় পাও না? এখন

ইয়েতির নাম শুনেই ভয় পেয়ে গেলে ?”

মিংমা বলল, “সাব, আমায় একটা বন্দুক দিন, তাহলে আমার ডর লাগবে না। আমার তো বন্দুক নেই !”

নোরবু মিংমাকে বকুনি দিয়ে হাত-পা নেড়ে নিজস্ব ভাষায় কী যেন বলল। মোটামুটি তার মানে বোঝা গেল এই যে, ইয়েতি সাক্ষাৎ শয়তান, বন্দুকের গুলিতে তাদের কিছু হয় না। ইয়েতি কারুর চোখের দিকে চাইলেই সে মরে যায়।

কাকাবাবু বললেন, “তোমরা যদি ভয় পাও তোমরা চলে যেতে পারো। আমি সকলের টাকাপয়সা মিটিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমরা এখানে থাকব।”

মিংমা খুব কাতরভাবে বলল, “সাব, আপনিও ওয়াপস চলুন আমাদের সঙ্গে। পরে আবার বহুত বন্দুক পিস্তল আর সাহেবলোকদের নিয়ে এসে ইয়েটির সঙ্গে লড়াই করব।”

কাকাবাবু বললেন, “সাহেবলোক ছাড়া বুঝি অন্য কেউ ইয়েতির সঙ্গে লড়াই করতে পারে না ? যাও, যাও, তোমরা যাও !”

সত্যি-সত্যি একটুক্ষণের মধ্যেই সবাই চলে গেল।

চারদিক হঠাৎ যেন দারুণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এ ক'দিন গম্বুজের বাইরে মানুষজনের গলার আওয়াজ পাওয়া যেত তবু, এখন চতুর্দিকে শুধু বরফ আর বরফ, তার মাঝখানে শুধু এই দু'জন। একেবারে নিঝুম দুপুর।

কাকাবাবু বললেন, “খিদে পায়নি ? খাওয়াদাওয়ার কী হবে ? সন্তু, তুই বিস্কুটের টিনটা বার কর। আর দ্যাখ, চীইজ আছে কি না।”

সন্তু বিস্কুটের টিনটা খুঁজতে খুঁজতে মনে মনে ভাবতে লাগল, এখন না-হয় বিস্কুট খেয়ে খিদে মেটানো হবে। কিন্তু এর পর ? শেরপা আর মালবাহকরাই রান্না-বান্না করত। শেরপাদের সাহায্য ছাড়া সন্তুরা তো এখান থেকে পথ চিনে ফিরতেও পারবে না।

বিস্কুট আর চীইজ খেতে-খেতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী রে, সন্তু, ভয় পেয়ে গেলি নাকি ?”

সন্তু শুকনো গলায় বলল, “না !”

“তুই সত্যি-সত্যি কিছু একটা দেখেছিলি ? না নোরবুর চিৎকার শুনেই ভেবেছিস…”

“সত্যিই দেখেছি…তবে মাত্র এক পলকের জন্য…”

“কোনও মানুষ নয় তো ?”

“না, মানুষের চেয়ে অনেক বড়, খুব কালো, সারা গায়ে লোম।”

“মুখ দেখেছিলি ? ভাল্লুক-টাল্লুক নয় তো ?”

“মুখটা দেখতে পাইনি তবে ভাল্লুক নয়…সোজা খাড়া… ।”

“তোর মনে হয়, তুই ইয়েতিই দেখেছিস ?”

"তা ছাড়া আর কী হবে ?"

"তা হলে রাত্তিরবেলা গম্বুজের ওপর থেকে আমরা ইয়েতিই দেখেছিলাম, তাই না ?"

"তুমি তো ইয়েতির পায়ের ছাপও দেখলে। অত বড় বড় পা !"

"হুঁ ! শেষ পর্যন্ত আমরা ইয়েতির পাল্লায় পড়লুম ! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাত্তিরবেলা ইয়েতিরা কি হাতে হ্যারিকেন কিংবা টর্চ লাইট নিয়ে ঘোরে ? আমরা আলো দেখলুম কিসের ?"

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর এই প্রশ্নের একটা উত্তর তার মনে পড়ে গেল। সে উত্তেজিতভাবে বলল, "কাকাবাবু, একটা জিনিস...মানে, এমনও তো হতে পারে যে, রাত্তিরবেলা ইয়েতিদের চোখ আগুনের মতন জ্বলে ? যেমন বনের মধ্যে বাঘ-সিংহের চোখ রাত্তিরে জ্বলজ্বল করে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? বাঘ-সিংহের মতো ? মানুষের মতন চেহারা, অথচ বিরাট লম্বা, রাত্রে চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়...এ-রকম একটা প্রাণী...যদি জ্যান্ত ধরতে পারি কিংবা ছবি তুলতেও পারি...তা হলে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে। আসল ব্যাপার কী জানিস, মানুষের মধ্যে দু'রকম প্রবৃত্তি থাকে। মানুষ একদিকে চায় পৃথিবীর সব রহস্যের সমাধান করতে। সেই জন্য সব জায়গায় খুঁজে-খুঁজে সব কিছু বার করে। আবার মানুষ অন্য দিকে চায় এখনও পৃথিবীতে অজানা, অদেখা, অদ্ভুত রহস্যময় কিছু-কিছু জিনিস থেকে যাক। যেমন এই ইয়েতি।"

একটু থেমে কাকাবাবু বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। এই গম্বুজের মধ্যে আমরা থাকব, এখানে ইয়েতি কিছু করতে পারবে না। আজ সকালেই আমি থিয়াংবোচির সঙ্গে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেছি। ওখান থেকে আর একটি দল পাঠাবে। তারা এসে পড়বে কাল বিকেলের মধ্যেই।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাকাবাবু শুয়ে পড়ে পাইপ টানতে লাগলেন। সন্তু একবার গিয়ে উঁকি মারল গম্বুজের বাইরে। রোদ চলে গিয়ে আবার মেঘ এসেছে। বাইরেটা অন্ধকার-অন্ধকার। দূরের দিকে তাকালে অকারণেই গা ছম ছম করে।

কাকাবাবু বললেন, "গেটটা ভাল করে বন্ধ করে রাখ ! আজ আর বাইরে যাসনি। তবে ইয়েতি নিশ্চয়ই এতদূরে আসবে না।"

কিছুই করার নেই বলে সন্তুও এসে শুয়ে পড়ল। আর ঘুমিয়ে পড়ল একটু বাদেই।

তার ঘুম ভাঙল একটা জোর শব্দে। কে যেন লোহার দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে। কাকাবাবুও উঠে বসেছেন, তাঁর হাতে রিভলভার।

॥ ১০ ॥

দরজায় যত জোরে আওয়াজ হল, সন্তুর বুকের মধ্যে যেন তার থেকেও জোরে আওয়াজ হতে লাগল। এই বরফের রাজ্যের মধ্যে সে আর কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।

কাকাবাবু আর সন্তুর খাট যেখানে পাশাপাশি পাতা, সেখান থেকে গম্বুজের দরজাটা দেখা যায় না। কাকাবাবু বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আছেন, হাতে রিভলভার। তিনি গভীরভাবে কোনও-কিছু চিন্তা করতে বসেছেন যেন এই সাংঘাতিক সময়ে।

দরজার ওপর দুমদুম আওয়াজটা আরও বেড়ে গেল।

কাকাবাবু এবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হু ইজ দেয়ার ?"

কোনও উত্তর এল না। আওয়াজটাও হঠাৎ থেমে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "লোহার দরজাটা বেশ শক্ত। সহজে কেউ ভাঙতে পারবে না। সন্তু, তুই গম্বুজের ওপরে উঠে দ্যাখ তো বাইরে কিছু দেখা যায় কি না।"

সন্তু বিছানায় শুয়ে পড়ার সময় জুতো খুলে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি জুতো পরে নিল আবার। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে গম্বুজের সিঁড়িতে পা দিতেই আবার দুমদুম শব্দ হল দরজায়।

সন্তু তরতর করে উঠে গেল ওপরে। জানলাটা দিয়ে ব্যগ্র হয়ে তাকাল বাইরে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। গম্বুজের ওপর থেকে ঠিক নীচের জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায় না।

সন্তু বেশ জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে ? কে ওখানে ?"

এবারও কোনও সাড়া নেই।

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজাটার কাছে। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "উত্তর দিচ্ছ না কেন ? কে দরজা ধাক্কাচ্ছ ? পরিচয় দাও !"

এর উত্তরে দরজায় আবার দুমদাম শব্দ।

কাকাবাবু আবার বললেন, "কে, মিংমা ? নোরবু ? কে বাইরে ?"

তবু কোনও সাড়া নেই। কাকাবাবু দরজার ছিটকিনিতে হাত দিয়ে বললেন, "কে আছ। সরে দাঁড়াও ! খুলেই আমি গুলি করব !"

ওপর থেকে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, খুলবেন না, খুলবেন না !"

কাকাবাবু দরজার মস্ত বড় ছিটকিনিটা ধরে এমনিই একটা শব্দ করলেন। যেন তিনি দরজাটা খোলার ভান করছেন। আসলে দরজাটা খুললেন না।

সন্তু তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে। তারপর কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, "ওপর থেকে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আমার মনে হয় নোরবু কিংবা মিংমা

আমাদের ভয় দেখাচ্ছে ! না হলে এখানে আর অন্য মানুষ আসবে কী করে ? আর কোনও মানুষ হঠাৎ এসে পড়লেই বা সাড়া দেবে না কেন ?”

সন্তু থমথমে মুখে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। কাকাবাবু এখনও কোনও মানুষের কথা ভাবছেন ? এ তো ইয়েতির কাণ্ড ! সন্তু নিজের চোখেই তো ইয়েতির ছায়া দেখেছে। ইয়েতি দরজা ভেঙে গম্বুজের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। সন্তুর শরীরটা এত কাঁপছে যে কিছুতেই সে নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না।

কাকাবাবু আরও কয়েকবার ইংরেজি, বাংলা, হিন্দিতে ‘কে ? কে ?’ জিজ্ঞেস করলেন। কোনও উত্তর পেলেন না। দুমদুম আওয়াজটাও একটু পরে থেমে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ একদম চুপচাপ।

কাকাবাবু আর সন্তু দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ শব্দটা না হওয়ায় কাকাবাবু বললেন, “এবার দরজাটা খুলে দেখা যাক।”

সন্তু প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, “না ! কাকাবাবু, ওরা সুযোগেরই অপেক্ষা করছে। আমরা দরজা খুললেই—”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “ওরা মানে কারা ? আমি তো ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তোরা যদি ইয়েতি দেখেও থাকিস, কিন্তু ইয়েতি কখনও মানুষকে তাড়া করে এসেছে, এ-রকম তো শোনা যায়নি ! যারা ইয়েতি দেখেছে বলে দাবি করে, তারা সবাই বলেছে, ইয়েতি হয় খুব ভিতু অথবা লাজুক প্রাণী। তারা মানুষ দেখলেই পালিয়ে যায়। তোদের দেখেও তো পালিয়েছে। তারা হঠাৎ গম্বুজের দরজায় এসে ধাক্কা দেবে কেন ?”

একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে কাকাবাবু আবার বললেন, “তুই আমার পেছন দিকে সরে যা, সন্তু ! ইয়েতি হোক বা যাই হোক, রিভলভারের গুলির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।”

কথা বলতে বলতেই কাকাবাবু বড় ছিটকিনিটা খুলে ফেললেন। তারপর এক হ্যাঁচকা টান দিলেন দরজায়।

দরজাটা খুলল না।

কাকাবাবু আরও জোরে টানলেন। এবারও খুলল না।

কাকাবাবু বললেন, “কী হল ? পুরনো আমলের দরজা, ওদিক থেকে ধাক্কা দেওয়ায় বোধহয় খুব এঁটে গেছে। তুই একটু হাত লাগা তো সন্তু।”

তখন কাকাবাবু আর সন্তু দু'জনে মিলেই ঠেলল দরজাটা। কিন্তু তবু দরজাটা খোলার লক্ষণ নেই। সন্তু দুমদুম করে লাথি মারতে লাগল। তবু এক চুলও ফাঁক হল না।

একটু পরেই ওরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এবার কাকাবাবুর কপালেও ঘাম দেখা দিল।

দরজাটা এমনভাবে বাইরে থেকে বন্ধ করল কে? কীভাবেই বা বন্ধ করল? বাইরের দিকে দুটো মোটা কড়ায় তালা দেবার ব্যবস্থা আছে। কাকাবাবুরা এখানে আসবার আগে গম্বুজটার দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়াই ছিল। কাকাবাবু নেপাল সরকারের কাছ থেকে সেই তালার চাবি এনেছিলেন। কেউ যদি বাইরে থেকে অন্য কোনও তালা লাগায়ও, তাহলেও দরজাটা ঠেললে খানিকটা ফাঁক হতই। দুপাল্লার দরজা, বাইরে থেকে কখনওই এমন শক্তভাবে বন্ধ হয় না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "তাহলে বুঝলি তো, এটা ইয়েতির কাজ নয়। মানুষের কাজ!"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "আমরা ভাবছিলুম, দুমদুম করে ওরা বুঝি আমাদের দরজা খুলতে বলছে। আসলে বোধহয় ব্যাপারটা উল্টো। ওরা দরজার বাইরে একটা লোহার পাটি কিংবা ঐ ধরনের কিছু লাগিয়ে দিয়ে গেছে। হাতুড়ি-টাতুড়ি পেটার জন্য ঐ রকম দুমদুম শব্দ হচ্ছিল।"

সন্তুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, তাহলে তারা বেরুবে কী করে? কারা এমন করল? মিংমার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল, সে কিছুতেই এ কাজ করতে পারে না। তাছাড়া তাকে আর কাকাবাবুকে মেরে ফেলে মিংমাদের লাভ কী?

সে মরিয়া হয়ে দরজাটার গায়ে খুব জোরে আর-একবার লাথি কষাল। দরজাটা একটুও নড়ল না।

কাকাবাবু বললেন, "ওতে কোনও ফল হবে না!"

তিনি খাটের কাছে ফিরে গিয়ে বসে পড়ে পাইপ ধরালেন। তারপর আবার হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "সন্তু, ছিটকিনিটা বন্ধ করে দে। ওরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করেছে। আমাদের দিক থেকেও বন্ধ রাখা দরকার। নইলে ওরা হঠাৎ ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।"

সন্তু ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে এল কাকাবাবুর কাছে। তার শরীরে যেন একটুও শক্তি নেই আজ। এই গম্বুজের মধ্যে তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে? এই ছোট্ট একটা আধো-অন্ধকার ঘর, খাবার-দাবারও বেশি নেই, এ-রকম ভাবে আর কতদিন বাঁচা যাবে? এর আগে সন্তু যে-কয়েকটি অভিযানে বেরিয়েছে কাকাবাবুর সঙ্গে, কোনওবার সে এত হতাশ হয়ে পড়েনি। এবারে সবচেয়ে যেটা অস্বস্তিকর লাগছে, সেটা হল এই যে, শত্রু যে কে, তা-ই এখনও জানা গেল না। এই বরফের রাজ্যে কে বা কারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসতে পারে, সে কথাটাই তার মাথায় ঢুকছে না।

সে ভেবেছিল, এবার সে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে এসেছে। পথে অনেক বিপদ থাকবে তো বটেই, কিন্তু কেউ যে শত্রুতা করবে, সে-কথা সে কল্পনাও

করেনি আগে। কাকাবাবুর কথাই ঠিক, ইয়েতি কখনও এইভাবে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না।

কাকাবাবু খানিকটা আপন মনেই বললেন, "বাইরে থেকে কেউ এসে খুলে না দিলে এ দরজা ভেঙে বেরুনো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সাহায্যের জন্য আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু ওদের এসে পৌঁছতে অন্তত দু-তিন দিন লেগে যাবে!"

সন্তু বলল, "দু-তিন দিন? তার মধ্যে তো আমরা এখানে দম বন্ধ হয়েই মারা যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "ওপরের জানলা দিয়ে হাওয়া আসে...তা হলেও দু-তিন দিন এইটুকু ঘরের মধ্যে থাকা খুবই কষ্টকর, ওরা যদি আবার এসে দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে..."

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওরা মানে কারা?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই তো কথা, ওরা মানে কারা, তা তো আমিও বুঝতে পারছি না। কারা রাত্তিরবেলা বরফের মধ্য দিয়ে আলো নিয়ে হাঁটে? অত বড় বড় পায়ের ছাপ কি সত্যিই ইয়েতির? খাটের তলা থেকে তুই ওয়ারলেস সেটটা বার কর।"

দু'কানে হেডফোন লাগিয়ে কাকাবাবু ওয়্যারলেসে খবর পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ কর্-কর্ কর্-গর্র্-গর্ আওয়াজ, তারপর কাকাবাবু হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন, "হ্যালো হ্যালো, পীক্ নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন কলিং বেস, পীক্ নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন...এস ও এস ফ্রম রায়চৌধুরী, হ্যালো, রজার, ক্যান ইয়ু গেট মী...এস ও এস ফ্রম রায়চৌধুরী...ইয়োর কোড প্লীজ...ওভার!"

তারপর কাকাবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে ওদিককার কথা শুনে নিজে আবার বলতে লাগলেন, কী-রকম যেন অদ্ভুত ইংরেজিতে, তার মধ্যে অঙ্কের সংখ্যাই বেশি। সন্তু কিছুই মানে বুঝতে পারল না। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

কাকাবাবু বেশ খানিকটা সময় ধরে কথা বললেন ওয়্যারলেসে। তাঁকে বেশ উত্তেজিত মনে হল। এক সময় তিনি বেশ রাগের সঙ্গে বললেন, "ওভার অ্যাণ্ড আউট!" তারপর খুলে ফেললেন হেডফোন। পাইপটা ধরাতে গিয়ে লাইটার খুঁজে পেলেন না। অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "দূর ছাই, সেটা আবার রাখলুম কোথায়?"

কাকাবাবুর ওভারকোটে অন্তত দশ-এগারোটা পকেট। কখন কোন্ পকেটে তিনি কোন্ জিনিসটা রাখেন, তা নিজেই ভুলে যান। কয়েকটা পকেট হাতড়ে তিনি লাইটারটা পেয়ে গিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর কয়েকটা টান দেবার পর বললেন, "ওরা বেরিয়ে পড়েছিল...কিন্তু অত দেরি করে এলে তো চলবে

না···একমাত্র উপায় যদি হেলিকপটারে আসতে পারে··· কিন্তু হেলিকপটার ওদের ওখানে নেই, আছে একটা নামচেবাজারে···সেখানে খবর দিয়ে যদি আনাতে পারে।”

আবার হঠাৎ চুপ করে গিয়ে কাকাবাবু পাইপ টানতে লাগলেন। তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে আছে।

কাকাবাবু কোনওদিন কোনও অবস্থাতেই ভয় পান না। তিনি বারবার বলেন, গায়ের জোর থাক বা না থাক, মনের জোর থাকলে মানুষ সবকিছু জয় করতে পারে। সন্তুর মনে পড়ল, কণিষ্কর মুণ্ডু খুঁজতে যাওয়া হয়েছিল যে-বার, সেবার একটা ভয়ংকর গুহার মধ্যে পড়ে গিয়েও কাকাবাবু একটুও ঘাবড়াননি। আন্দামানে গিয়ে তিনি নিজে জোর করে জারোয়াদের দ্বীপে নেমেছিলেন। কোনওবার কাকাবাবুকে সে বিচলিত হতে দেখেনি।

গম্বুজের এই বিশাল লোহার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, এটা তো আর জোর দিয়ে খোলা যাবে না। বাইরের সাহায্য দরকার। সে সাহায্য কখন আসবে কে জানে!

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে অসহিষ্ণুভাবে বললেন, “বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা কী হচ্ছে! কারা দরজা বন্ধ করল? তুই আবার ইয়েতি দেখলি! সত্যি করে বল্ তো, ঠিক দেখেছিলি?”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ কাকাবাবু!”

কাকাবাবু বললেন, “আমি দেখতে পেলাম না কেন? আমার দেখাই বেশি দরকার ছিল!”

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, “ছটা বাজে। বাইরে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে গেছে। আজ সারা রাত জেগে থাকতে হবে। তুই বরং এক কাজ কর সন্তু, তুই দূরবিনটা নিয়ে ওপরে জানলার কাছে বসে থাক। দ্যাখ, কোনও আলো-টালো চোখে পড়ে কি না। হেলিকপটারটা যদি আসে, সেটারও আলো দেখতে পাবি।”

সন্তু দূরবীন নিয়ে উঠে গেল ওপরে। সেখানেই বসে রইল ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝখানে একবার নীচে নেমে কিছু বিস্কুট আর চীজ খেয়ে নিল। কাকাবাবু স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল গরম করে দু'কাপ কফি বানালেন। তারপর তিনি খাটের ওপর বসে উরুর ওপর রিভলভারটা রেখে একটা বই পড়তে লাগলেন।

সন্তু দূরবীন নিয়ে গম্বুজের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। কিছুই দেখা যায় না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। আকাশও দেখা যায় না, এরকম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে চোখ ব্যথা করে।

সেখানেই সন্তু কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না। হঠাৎ এক সময় সে রীতিমতন ব্যথা পেয়ে জেগে উঠল। তার মুখে যেন ফুটছে হাজার হাজার

সূচ। সারা শরীরটা কেঁপে উঠল ঠকঠক করে।

চমকে উঠতেই তার হাত থেকে দূরবীনটা খসে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে লাগল শব্দ করে।

নীচ থেকে কাকাবাবু বলে উঠলেন, "কী হল, সন্তু ?"

সন্তু তখন জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করার জন্য ব্যস্ত। কিছুতেই বন্ধ করতে পারছে না, এত জোর হাওয়া। বাইরে দারুণ তুষারঝড় উঠেছে। গম্বুজের ভেতরটা কুচো কুচো বরফ আর হিমশীতল বাতাসে ভরে যাচ্ছে। আর বেশি হাওয়া ঢুকলে তাদের ঠাণ্ডায় জমে যেতে হবে।

অতি কষ্টে জানলা বন্ধ করে নীচে নেমে এল সন্তু। এমন ঠাণ্ডা লেগেছে যে তার চোয়াল দুটো যেন আটকে গেছে। অতি কষ্টে সে বলল, "কাকাবাবু, বাইরে...তু-ষা-র-ঝড় ! দারুণ জো-রে !"

কাকাবাবু বললেন, "তুই আমার কাছে চলে আয় শিগগিরই !"

সন্তু কাকাবাবুর কাছে যেতেই তিনি সন্তুর মুখখানা ধরে খুব জোরে দু'হাত ঘষতে লাগলেন তার গালে। একটুক্ষণ এ-রকম থাকার পর সন্তুর গাল দুটো অনেকটা গরম হয়ে গেল, চোয়ালটাও স্বাভাবিক মনে হল।

কাকাবাবু বললেন, "শিগগির স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়।"

তারপর যেন নিজের ওপরই রাগ করে বললেন, "গোদের ওপর বিষফোঁড়া ! একেই এই কাণ্ড তার ওপর আবার তুষারঝড়। এই ঝড় কখন থামবে কে জানে ! ঝড় না থামলে তো হেলিকপ্টার এদিকে এলেও নামতে পারবে না !"

॥ ১১ ॥

বরফের ঝড়টা চলতে লাগল সারা রাত ধরে।

গম্বুজের ভেতরটা যেন ধোঁয়ায় ভরে গেছে। ওপরের জানলাটা ভাল করে বন্ধ করা যায়নি। পুরো বন্ধ করলেও ভেতরে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিশ্বাসের কষ্ট হবে। খোলা জানলা দিয়ে ঝড়ের হাওয়ার ঝাপটা ঢুকছে সেইজন্য একেবারে অসহ্য শীত।

সন্তুর মনে হল, আজকের রাতটা যেন কাটবে না। এরকম তীব্র বরফের ঝড় এখানে আগে আর একবারও সে দেখেনি। এখানে পৌঁছবার দিনই ব্লিজার্ড উঠেছিল, কিন্তু তা চলেছিল মাত্র দু' ঘন্টা।

শীতের জন্য সন্তু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে গোটা শরীরটাই ঢুকিয়ে নাকটা শুধু বাইরে রেখেছে। কাকাবাবু কিন্তু বিছানার ওপর বসে আছেন সোজা হয়ে। যেন তিনি ধ্যান করছেন।

এক সময় তিনি বললেন, "তুই আর শুধু শুধু জেগে আছিস কেন, সন্তু ? তুই ঘুমো।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঘুমোবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি একটু দেখি, যদি হেলিকপটার আসে। কিংবা অন্য কেউ দরজা খুলে ঢোকার চেষ্টা করলেও আমাদের তৈরি থাকতে হবে।"

সন্তুর ঘুম আসে না। সে খুব মনোযোগ দিয়ে বাইরের আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করে। যদি কোনও হেলিকপটারের আওয়াজ শোনা যায়। সেই হেলিকপটারে আসবে তাদের উদ্ধারকারীরা। অবশ্য, হেলিকপটার আসবে কি না, ওয়্যারলেসে কাকাবাবুর সঙ্গে সে রকম পাকা কথা কিছু হয়নি। তাছাড়া, এ রকম ঝড়ের মধ্যে কি হেলিকপটার ওড়ে ? উদ্ধারকারীদেরও তো প্রাণের ভয় আছে ?

এক সময় রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হল। এখানে ভোরবেলা পাখি ডাকে না। আকাশে জমাট মেঘ কিংবা বরফের ঝড় থাকলে ভোরের আলোও দেখা যায় না। দিনের বেলাতেও অন্ধকার থাকে।

ভোরের একটু আগেই ঝড় থেমেছে। ওপরের জানলার কাছে দেখা যাচ্ছে খানিকটা ফ্যাকাসে আলো। সন্তু প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করেও ঘুমিয়ে পড়েছিল এক সময়। চোখ মেলেই দেখল, কাকাবাবু তাঁর খাটের ওপর ঠিক একই জায়গায় একই রকমভাবে ঠায় বসে আছেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখন ক'টা বাজে, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু বললেন, "সকাল হয়ে গেছে, সাড়ে আটটা বাজে, এবার উঠে পড়। ঝড়টাও থেমে গেছে মনে হচ্ছে।"

সন্তু স্লিপিং ব্যাগের জিপ টেনে খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। হঠাৎ যেন শীত কমে গেছে অনেকখানি। দু'দিকে হাত ছড়িয়ে সে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। তখন সন্তুর মনেই নেই যে তারা গম্বুজের মধ্যে বন্দী।

কাকাবাবু বললেন, "রাত্তিরে আর কিছু হয়নি। হেলিকপটারটাও এল না। কী জানি ওরা কী করছে ?"

অমনি সন্তুর আবার মনে পড়ে গেল সব। তাদের কেউ উদ্ধার করতে না এলে এই গম্বুজের মধ্যে তাদের মরতে হবে। এখান থেকে বেরুবার আর কোনও উপায় নেই।

সন্তু গিয়ে বাইরের দরজাটা একবার ঠেলে দেখল। সেটা আগের মতনই বন্ধ। সন্তু কিংবা কাকাবাবুর সাধ্য নেই সেটা খোলার।

কাকাবাবু বললেন, "ফ্ল্যাস্কের মধ্যে চা করে রেখেছি। দু-একটা বিস্কুট আর চা খেয়ে নে। তারপর তুই বসে বসে পাহারা দিবি। আমি ঘুমোব। অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই এখন।"

চা খাওয়ার আগেই সন্তু একবার ওপরে উঠে গেল জানলার কাছে। ঝড় থেমে গেছে অনেকক্ষণ, বাইরেটা একেবারে ধপ-ধপ করছে, এমন সাদা। নতুন বরফের ওপর রোদ পড়লে যেন আলো ঠিকরে বেরোয়। দূরের বরফঢাকা

প্রান্তরকে মনে হয় আয়নার মতন। চারদিক এখন এমন সুন্দর, অথচ এর মধ্যেও যে কত রকম বিপদ রয়েছে, তা বোঝাই যায় না।

নীচে নেমে এসে সন্তু চা আর চারখানা বিস্কুট খেয়ে নিল। কিন্তু তার আরও খিদে পাচ্ছে। অথচ খাবারও বেশি নেই স্টকে। এমন বন্দী হয়ে কতদিন থাকতে হবে কে জানে! দু' তিন দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে সব খাবার।

কাকাবাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন টান টান হয়ে। চোখ বুজে বললেন, "রিভলভারটা আমার পাশেই রইল। কেউ যদি আচমকা দরজা খুলে ফেলে, কোনও কথা না বলে সোজা গুলি চালাবি। পারবি তো?"

সন্তু ঘাড় নাড়ল।

কাকাবাবু একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সন্তু দরজাটার দিকে চেয়ে বসে রইল চুপ করে। কিন্তু এরকমভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়! কাল দুপুরের পর থেকেই তারা এই গম্বুজের মধ্যে বন্দী। পুরো একটা দিনও কাটেনি, তবু যেন মনে হচ্ছ কতকাল ধরে তারা এখানে আছে। সন্তু ভাবল, জেলখানায় যারা বন্দী থাকে, তাদের কী অবস্থা হয়? অবশ্য, জেলখানার বন্দীরাও অন্য মানুষজন দেখতে পায় কিংবা গলার আওয়াজ শুনতে পায়। এ জায়গাটা যে সাঙ্ঘাতিক নিস্তব্ধ, তাই সময়কেও এখানে লম্বা মনে হয়।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু তার মাকে একটা চিঠি লিখতে শুরু করল। সিয়াংবোচি থেকে মাকে শেষ চিঠি লিখেছিল সন্তু। এখান থেকে চিঠি পাঠাবার কোনও উপায় নেই। এই গম্বুজ থেকে জীবন্ত অবস্থায় বেরুতে পারবে কি না, তারও তো ঠিক নেই। তবু চিঠি লেখা যাক। কোনও-না-কোনওদিন এখানে কেউ আসবে নিশ্চয়ই, তখন চিঠিটা পেয়ে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

চিঠিখানা অর্ধেক মাত্র লেখা হয়েছে, এই সময় দরজায় দুম করে একটা শব্দ হল।

শব্দটা যত জোরে হল, সন্তুর বুকের মধ্যেও যেন তত জোরে আওয়াজ হল একটা। হাত থেকে পড়ে গেল কলমটা।

আবার দু'বার শব্দ।

সন্তু তাকিয়ে দেখল, সেই শব্দেও কাকাবাবু জাগেননি। সে টপ করে রিভলভারটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তখন বাইরে থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "এনিবডি ইনসাইড দেয়ার?"

মানুষের গলার আওয়াজ পেয়েই যেন সন্তুর বুকে প্রাণ ফিরে এল। সে অসম্ভব উৎসাহের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'ইয়েস! উই আর হিয়ার!"

বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল, "কোড নাম্বার? এনি কোড নাম্বার?"

সন্তু বলল, "ওয়েট, প্লিজ ওয়েট! আই অ্যাম কলিং মাই আংকল।"

ততক্ষণে কাকাবাবু জেগে উঠেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "কী

হয়েছে ?”

সন্তু বলল, “বাইরে…লোক এই মাত্র এল…কী জিজ্ঞেস করছে।”

কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়াই এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এলেন দরজার কাছে। সন্তুর হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “হু ইজ দেয়ার ?”

বাইরে থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, “মিঃ রায়চৌধুরী ?”

কাকাবাবু বললেন, “পীক নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ফরটিন…ইজ দ্যাট বেস ? প্লীজ ওপন দা ডোর।”

সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপর আওয়াজ হতে লাগল দমাস দমাস করে। তারপর বাইরে থেকে ওরা কিছু বলতেই কাকাবাবু সন্তুর ঘাড় ধরে বললেন, “পিছিয়ে আয়, পিছিয়ে আয়, শিগগির…”

সন্তুরা ততক্ষণে সরে এসেছে। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, “ওরা গুলি করে তালা ভাঙছে! ওরা কখন এল, হেলিকপটারের আওয়াজ শুনতে পেলাম না।”

কাকাবাবু তো ঘুমিয়ে ছিলেন, সন্তু জেগে থেকেও শুনতে পায়নি। চিঠি লেখায় সে এমনই মগ্ন ছিল।

বাইরে থেকে ওরা এবার দরজাটা ঠেলছে। সন্তুর মনে পড়ল এদিক থেকেও ছিটকিনি বন্ধ। সে ছুটে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দিতেই দরজা খুলে গেল।

পুরো সামরিক পোশাক পরা দু'জন লোক ঢুকলেন ভেতরে। একজন নেপালি। অন্যজন ভারতীয়! দু'জনেরই হাতে ছোট মেশিনগানের মতন অস্ত্র।

নেপালি অফিসারটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে, মিঃ রায়চৌধুরী ?”

কাকাবাবু বললেন, “কারা আমাদের আটক করে রেখেছিল। আমাদের প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। অনেক গুরুতর কথা আছে।”

সন্তু আর কিছু না শুনে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। তার এখন নাচতে ইচ্ছে করছে। সে প্রথমেই বরফের মধ্যে ডিগবাজি দিল দু'বার। তারপর দু'হাত তুলে বৈষ্ণবদের ভঙ্গিতে নাচ শুরু করল।

খানিকটা দূরে থেমে আছে একটা হেলিকপটার। তার সামনের পাখাটা এখনও ঘুরছে। চালকের আসনে বসে আছে একজন নেপালি।

যে-দু'জন মিলিটারি অফিসার গম্বুজের মধ্যে ঢুকেছেন, তাঁদের একজন নেপাল সরকারের প্রতিনিধি, অন্যজন ভারত সরকারের। একজনের নাম জং বাহাদুর রানা, অন্যজন গুরুদত্ত ভার্মা। দু'জনেই কাকাবাবুর দু'হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। তারপর রানা বললেন, “আপনার কিছু হয়নি তো, মিঃ রায়চৌধুরী !

আমরা যে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছি, সে জন্য আমরা আনন্দিত। কী হয়েছিল বলুন তো ব্যাপারটা।"

কাকাবাবু বললেন, "বলছি, অনেকটা সময় লাগবে। সত্যিই আপনারা ঠিক সময় এসেছেন। আসুন, বসা যাক।"

ভার্মা বললেন, "বাইরের লোকটি কে ?"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরের লোক ? বাইরের আবার কোন্ লোক ? আর তো কেউ ছিল না ?"

ভার্মা বললেন, "ঐ লোকটাই কি তাহলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ? কিন্তু বেচারি নিজেই শেষটায়—"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না তো ? চলুন তো দেখি বাইরের কোন লোক ?"

কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

গম্বুজের দরজাটা খোলার পর বাইরে যে জায়গাটা দরজায় ঢাকা পড়ে গেছে, সেখানে বরফের মধ্যে টানটান হয়ে শুয়ে আছে একজন মানুষ। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, লোকটি মরে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকটি একজন চীনা, বছর পঁয়তিরিশের মতন বয়েস, পরনে প্যান্টশার্ট। কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে বসে দেহটা উল্টে দিলেন। কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। লোকটির মৃত্যু হল কী ভাবে ? অবশ্য বরফের ঝড়ের মধ্যে সারারাত বাইরে থাকলে কারুর পক্ষেই বাঁচা সম্ভব নয়।

রানা বললেন, "ঐ লোকটি বোধ হয় গম্বুজে আশ্রয় নিতে এসেছিল। আপনারা দরজায় যে ধাক্কার শব্দ শুনেছেন, সেটা এরই।"

ভার্মা বললেন, "তা হলে দরজাটা বন্ধ করল কে ?"

রানা বললেন, "তা হলে এই লোকটিই কি দরজা বন্ধ করতে এসেছিল, তারপর ব্লিজার্ডের মুখে পড়ে আর ফিরতে পারেনি ?"

ভার্মা বললেন, "একজন চীনা এখানে আসবে কী করে ? আর গম্বুজের দরজাটা বা বন্ধ করবে কেন ?"

কাকাবাবু ততক্ষণে মন দিয়ে মৃত লোকটির শরীর পরীক্ষা করছেন। চেষ্টা করছেন লোকটির হাতের কনুই এবং পায়ের হাঁটুর কাছে মোড়বার। কিন্তু লোকটির শরীর একেবারে শক্ত। কাকাবাবুর খানিকটা ডাক্তারি বিদ্যেও আছে। তিনি অবাকভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

খানিকবাদে মুখ তুলে তিনি বললেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার !"

রানা এবং ভার্মা দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "কাল আমরা গম্বুজের মধ্যে ঢুকেছি দুপুরের দিকে। এখনও চব্বিশ ঘন্টাও কাটেনি। কিন্তু আমি যে-টুকু ডাক্তারি জানি, তাতে

বলতে পারি যে, এই লোকটির মৃত্যু হয়েছে অন্তত আটচল্লিশ ঘন্টা আগে। রাইগর মর্টিস অনেক আগেই সেট করে গেছে! তাহলে এই লোকটি এখানে এল কী করে?"

রানা বললেন, "বলেন কী, আটচল্লিশ ঘন্টা আগে? তাহলে কাল আপনারা একে দেখননি?"

কাকাবাবু বললেন, "না। শুধু তো আমি একা নই, কাল দুপুর পর্যন্ত এখানে শেরপা আর মালবাহকরাও ছিল। কেউ দেখেনি। এখানে ফাঁকা জায়গায় কোনও লোক লুকিয়েও থাকতে পারে না।"

ভার্মা বললেন, "এ যে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। আপনার তাহলে নিশ্চয়ই কোনও ভুল হচ্ছে, মিঃ রায়চৌধুরী!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতে পারে। কী ভাবে লোকটি এখানে এল তা আমি জানি না। তবে, এই লোকটি যে কাল রাতে বা আজ সকালে মারা যায়নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। দু'দিন কেন তিন-চারদিন আগেও এর মৃত্যু হতে পারে!"

সন্তু হেলিকপটারটা দেখবার জন্য ঐ দিকে যাচ্ছিল মনের আনন্দে। একবার পেছন ফিরে দেখল, কাকাবাবু আর অন্য দু'জন লোকই গম্বুজের বাইরে হাঁটু গেড়ে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছেন। অমনি তার কৌতূহল হল। সে আবার ফিরে এল গম্বুজের দিকে।

কাছাকাছি এসে সে থমকে গেল। একটি সম্পূর্ণ অচেনা লোকের মৃতদেহ। মুখটা হাঁ করা, চোখ দুটো খোলা। যেন সন্তুর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সন্তুর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এ কে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরাও তো সেই কথাই ভাবছি!"

॥ ১২ ॥

চোখের সামনে একজন মরা মানুষকে দেখে সন্তুর শরীরটা ঘুলিয়ে উঠল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

চীনা ভদ্রলোকটির গায়ে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট। থুতনিতে অল্পঅল্প দাড়ি। চোখ দুটি খোলা। দৃষ্টিতে ভয়ের বদলে যেন খানিকটা বিস্ময়ের ভাব মাখানো।

সন্তু মৃতদেহটির দিকে তাকাতে চায় না, কিন্তু কাকাবাবুদের কথাবার্তা শোনার জন্যও দারুণ কৌতূহল। সে কাকাবাবুর পেছনে গিয়ে বসে পড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "এই চীনা ভদ্রলোকটি কোথা থেকে এখানে এলেন, তা কিছুই বোঝা গেল না। অথচ আমরা এখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে

পারি না। অনেক কাজ আছে।"

ভার্মা বললেন, "এই মৃতদেহটি কি এখানেই পড়ে থাকবে? একে এখানেই কবর দিয়ে দেওয়া হোক। চীনারা মৃতদেহ পোড়ায় না, কবরই দেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে চটপট বরফ খুঁড়ে ফেলা যাক। সন্তু গাঁইতিটা নিয়ে আয় তো!"

জং বাহাদুর রানা হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান, একটা কথা আছে। এই চীনা ভদ্রলোক একজন বিদেশি, এর গায়ে যে কোটটা আছে, সে-রকম কোট আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। ইনি এখানে কী করে এলেন, তা জানা আমাদের সরকারের কর্তব্য। এঁর মৃত্যুর কারণটা জানা দরকার। এই দেহ পোস্টমর্টেম করতে হবে।"

ভার্মা বললেন, "তার মানে এই দেহটা এখন কাঠমাণ্ডুতে পাঠাতে হবে?"

রানা বললেন, "হ্যাঁ।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এদিকে কোনও চীনা অভিযাত্রী দল কি এসেছিল শিগগির?"

ভার্মা বললেন, "না তো!"

রানা বললেন, "এভারেস্টের দিকে একটি চীনা অভিযাত্রী দল গিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, আড়াই কিংবা তিন বছর হবে।"

"সে দলের কেউ কি হারিয়ে গিয়েছিল?"

"সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। তবে চারনম্বর ক্যাম্পের কাছে দু'জন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল, একথা জানি। সে জায়গা তো এখান থেকে অনেক দূরে।"

"যদি ধরা যায় সেই দলেরই কেউ হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা দুর্ঘটনায় পড়েও কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছিল, তবু তার পক্ষে এখানে একা-একা এতদিন বেঁচে থাকা কী করে সম্ভব?"

"কিংবা হয়তো মৃত্যু হয়েছিল তখনই, বরফের তলায় চাপা পড়ে শরীরটা এরকম অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।"

কাকাবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "তারপর ইয়েতিরা কাল রাত্রে বরফ খুঁড়ে মৃতদেহটা বার করেছে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য!"

ভার্মা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি দেখছি ইয়েতিদের অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস করেন না! অথচ, আপনি নিজেই ইয়েতির দাঁত সঙ্গে করে এনেছেন!

কাকাবাবু এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, "হুঁ!"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাই হোক, এবারে যা ব্যবস্থা করার করুন। সময় নষ্ট করে তো লাভ নেই।"

রানা আর ভার্মা দু'জনে ধরাধরি করে মৃতদেহটা তুলল। সন্তুও হাত

লাগাল। তারপর ওরা চলে এল হেলিকপটারের কাছে।

কাকাবাবু খানিকটা আফশোষের সুরে বললেন, "মৃতদেহটা তো এই হেলিকপটারেই পাঠাতে হবে। অথচ এখন হেলিকপটারটা আমাদের খুব কাজে লাগত।"

রানা বললেন, "ঘণ্টা দু'একের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে পারবে। কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত যাবে না, সিয়াংবোচি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেই চলবে। তারপর ওরা ব্যবস্থা করবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সঙ্গে খাবার-দাবার কিছু আছে ? কাল দুপুরের থেকে আমাদের ভাল করে কিছু খাওয়া হয়নি। দেখুন না, এই ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে।"

রানা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক খাবার আছে। কিন্তু আমি একটা প্রস্তাব দেব ? আমাদেরও আর এখানে থাকবার দরকার কী ? আমরা সবাই তো এই হেলিকপটারে ফিরে গেলে পারি।"

কাকাবাবু দারুণ অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন রানাসাহেব ?"

রানা হাসতে হাসতে বললেন, "কেন, পাগল হবার মতন কী করলুম ?"

কাকাবাবু বললেন, "একটা কাজ করতে এসেছি, সেটা শেষ না করে ফিরে যাব ? তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন ? তা হলে লেখাপড়া শিখেছি কেন ? যদি ইচ্ছে হয়, আপনারা চলে যান, আমি থাকব।"

সেই মুহূর্তে কাকাবাবুর জন্য খুব গর্ব হল সন্তুর। সে জানে, তার কাকাবাবু ছাড়া এরকম কথা জোর দিয়ে আর কেউ বলতে পারে না।

ভার্মা বললেন, "রানাসাহেব, আপনি মিঃ রায়চৌধুরীকে তো ভাল করে চেনেন না, তাই ওকথা বললেন। উনি কোনও একটা কাজ শুরু করে তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। সে কাজ যত বিপজ্জনকই হোক না কেন ! দারুণ গোঁয়ার লোক ! আন্দামানে জারোয়াদের দ্বীপের কাছাকাছি কোনও মানুষ ভয়ে যায় না। উনি নিজে জোর করে সেখানে নেমেছিলেন !"

রানা বললেন, "কিন্তু উনি কী কাজের জন্য এখানে এসেছেন সেটাই তো আমরা ভাল করে জানি না।"

কাকাবাবু বললেন "বলছি। আগে খাবার বার করুন।"

হেলিকপটারে একটা ত্রিপল ছিল। সেটাকে ভাঁজ করে পাতা হল বরফের ওপর। তারপর নামানো হল অনেকগুলো সসেজ, হ্যামবার্গার, স্যান্ডউইচ আর দুটো ফ্লাস্কভর্তি গরম কফি।

সুন্দর রোদ উঠেছে আজ। আকাশ ঝক্‌ঝকে নীল। কে বলবে যে কালকেই সারা রাত এখানে তুষারের ঝড় বয়ে গেছে। রোদ্দুরের স্পর্শে দারুণ আরাম লাগছে এখন।

রানা হেলিকপটার-চালককে কয়েকটি নির্দেশ দিলেন। মৃতদেহটি নিয়ে হেলিকপটার উড়ে চলে গেল। তারপর তেরপলের ওপর গোল হয়ে বসে ওরা খাওয়া শুরু করল।

রানা বললেন, "ধরা যাক, এখানে ইয়েটি আছে। কিন্তু সে-জন্য তো পরে আরও অনেক লোকজন নিয়ে ফিরে আসা যায়। আমরা তিনজনে মিলে খোঁজার চেষ্টা করাটা নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে না ?"

সন্তু বসে আছে রানার পাশেই। সে মুখ তুলে ওঁর দিকে তাকাল।

রানা সন্তুর ঘাড়ে চাপড় মেরে বললেন, "দুঃখিত, দুঃখিত। তিনজন নয়, চারজন। আমাদের এই কিশোর বন্ধুটিও যথেষ্ট সাহসী। কিন্তু এই চারজনে মিলেই বা কী করব ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার কথা-মতন আমিও বলছি, ধরা যাক, এখানে ইয়েতি আছে। আমি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখেছি, তার ছবিও তুলেছি। আর আমার এই ভাইপো সন্তু শপথ করে বলেছে যে সে ইয়েতির মতন অতিকায় কোনও প্রাণী এক পলকের জন্য দেখেছে। শেরপা আর কুলিরা তো সেই দেখেই পালাল। তা হলে একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু—"

ভার্মা কাকাবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, "আচ্ছা, মিঃ রায়চৌধুরী, ঐ শেরপা আর কুলিরাই আপনাদের গম্বুজের মধ্যে আটকে রেখে দরজা ঐ রকমভাবে বন্ধ করে দিয়ে যায়নি তো ?"

সন্তু বলল, "না, তা হতে পারে না।"

কাকাবাবু বললেন, "শেরপা আর কুলিরা অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল।"

"যদি তারা আবার ফিরে আসে। আসতেও তো পারে।"

"কিন্তু আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করে ওদের কী লাভ ?"

"লাভ নিশ্চয়ই আছে। আপনাদের ফেলে রেখে ওরা পালিয়েছে, সে-জন্য নেপাল সরকারের কাছ থেকে ওদের নিশ্চয়ই শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু আপনাদের মেরে ফেলতে পারলে পরে ওরা বলতে পারে যে আপনারা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন সেইজন্যই ওরা ফিরে গেছে।"

রানা বললেন, "শেরপারা খুব বিশ্বাসী হয়। তারা এরকম কাজ কক্ষনো করে না।"

সন্তু বলল, "মিংমা আমায় খুব ভালবাসত। সে কক্ষনো আমাদের মারতে চাইবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "শেরপারা যদি গম্বুজের দরজা বন্ধ করেও দেয়, তবু চীনে লোকটা কোথা থেকে এল ? তাকে নিশ্চয়ই শেরপারা আনেনি।"

রানা সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি সত্যিই ইয়েটি দেখেছ ?"

সন্তু বললো, “হ্যাঁ।”

ভার্মা এবং রানা দু'জনেই সচকিতভাবে দূরের কালাপাথর পাহাড়টার দিকে একবার তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, “যা বলছিলাম···ধরে নেওয়া যাক, ইয়েতি আছে। এখন দিনের বেলা, আপনাদের দু' জনের কাছেই আছে এল এম জি, আমার কাছে আছে রিভলভার। পৃথিবীতে অন্য কোনও প্রাণী দাঁত, নখ ছাড়া আর কিছু অস্ত্র ব্যবহার করতে জানে না। সুতরাং আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তা ছাড়া, আমি মনে করি, মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কোনও প্রাণী পৃথিবীতে থাকতে পারে না। এতকাল ধরে ইয়েতির কথা শোনা যাচ্ছে, অথচ কোনও সভ্য মানুষ একটাও ইয়েতিকে ধরতে পারেনি, এমনকী একটা ছবিও তুলতে পারেনি কেন? ইয়েতি কি এতই বুদ্ধিমান? সেটাই আমাদের দেখা দরকার।”

রানা বললেন, “মিঃ রায়চৌধুরী, এই রহস্যের সন্ধানের জন্যই কি আপনি এখানে এসেছেন?”

কাকাবাবু বললেন, “আপনারা কেইন শিপটনের কথা ভুলে যাচ্ছেন। মানুষের দাঁতের চেয়েও খুব বড় একটা দাঁত, ধরা থাক ইয়েতির দাঁত, সে সব সময় গলায় ঝুলিয়ে রাখত। সেই কেইন শিপটন এখানে এসে ইয়েতি দেখতে পেয়েছিল। অন্তত সে কথা সে তার ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছে। তারপর কেইন শিপটন এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কি ইয়েতি ধরে নিয়ে গেছে? ইয়েতি কি মানুষ খায়? কেইন শিপটনের হাড়গোড়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি।”

রানা বললেন, “অনেক খুঁজে দেখা হয়েছে। উনি সত্যিই যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “কেইন শিপটনের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে ইয়েতির কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার।”

ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “আপনিও কি সেই জন্য একটা ইয়েতির দাঁত নিয়ে এসেছেন? যদি আপনিও অদৃশ্য হয়ে যান?”

কাকাবাবু এতক্ষণ বাদে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, “সত্যি কথা বলতে কী, আমি সেইজন্যই এখানে এসেছি। আমি অদৃশ্য হবার বিদ্যেটা শিখতে চাই।”

রানা বললেন, “তা হলে এখন আপনি কী করতে চান?”

কাকাবাবু বললেন, “আমরা সবাই মিলে এক্ষুনি কালাপাথরের দিকে এগোই না!”

রানা বললেন, “হেলিকপটারটা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না? ঘন্টা দু' একের মধ্যেই তো ফিরে আসবে।”

কাকাবাবু বললেন, “হেলিকপটারটা গেলে কিছুই দেখা যাবে না। অবশ্য

হেলিকপটারটা আমাদের কাজে লাগবে পরে। চলুন, আমরা নিজেরাই হেঁটে যাই, অন্তত সন্তু যেখানে ইয়েতি দেখেছিল সেই পর্যন্ত। দিনের আলো অনেকক্ষণ থাকবে।"

ভার্মা বললেন, "চলুন তা হলে যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু নিজেই আগে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর বললেন, "কেইন শিপটন যে দলের সঙ্গে এসেছিল, তারপর আর কোনও অভিযাত্রী দল এই পথ দিয়ে এভারেস্টের দিকে যায়নি। আর একটি জাপানি দল এসেছিল, তারা এই জায়গা থেকে ফিরে যায়। কী যেন একটা রহস্যময় অসুখ হয়েছিল তাদের।"

রানা জিজ্ঞেস করলেন, "খাবারের পাত্র আর কফির ফ্লাস্ক দুটো এখানেই থাক তা হলে !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ ! এখানে তো চোরের ভয় নেই। আর, আশা করি ইয়েতিরা কাপ ডিশ কিংবা ফ্লাস্ক ব্যবহার করে না।"

সন্তু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কাকাবাবু, ঐ দেখুন !"

সকলে একসঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

গম্বুজটার পাশ দিয়ে নীল কোট পরা একজন লোক এই দিকে হেঁটে আসছে।

রানা আর ভার্মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লাইট মেশিন গান দুটি তুলে ধরলেন লোকটির দিকে। কাকাবাবুও রিভলভারটা বার করলেন।

সন্তুই আবার হাত তুলে বলল, "মারবেন না, মারবেন না !"

॥ ১৩ ॥

নীল কোট পরা লোকটা দু'হাত তুলে তুলে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ঠিক ছুটতে পারছে না লাফিয়ে-লাফিয়ে আসছে বরফের ওপর দিয়ে। রানা আর ভার্মা লাইট মেশিনগান উঁচিয়ে আছেন লোকটির দিকে।

একটু কাছে আসতেই দেখা গেল, লোকটা মিংমা।

কাকাবাবু বললেন, "এ তো আমাদের একজন শেরপা !"

সন্তু বলল, "আমি আগেই চিনতে পেরেছিলাম।"

মিংমা কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে বলল, "সাব !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে ? রাস্তায় তোমাদের কোনও বিপদ ঘটেছে ? ফিরে এলে কেন ?"

মিংমা বলল, "সাব, আমি মাফি মাঙতে এসেছি। আপনাদের ছেড়ে চলে যাবার পর আমার দিলের মধ্যে বহুত দুখ্ হচ্ছিল। আমি জবান দিয়েছিলাম আপনাদের সঙ্গে যাব, শেরপা কখনও জবান নষ্ট করে না, কখনও ভয় পায় না।"

জং বাহাদুর রানা মিংমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে নেপালি ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবার কেন ফিরে এসেছ, সত্যি করে বলো ? যদি কোনও মতলব থাকে—"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "থাক, এখানে আর কোনও নাটক করার দরকার নেই। মিংমা, তুমি কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও ? তুমি না যেতে চাইলেও আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। আর যদি যেতে চাও তো আসতে পারো।"

মিংমা বলল, "সাব, আমি আর আপনাদের সঙ্গ ছাড়ব না। আপনাদের জন্য আমি জান্ দিতেও তৈয়ার। আপনাদের ছেড়ে চলে যাবার পর, আজ সকালে আমার মন বলল, ওরে মিংমা, তুই এ কী করলি ? একজন খোঁড়া বাঙ্গালী ভয় পেল না, আর তুই শেরপার বাচ্চা হয়ে জানের ডরে ভেগে এলি ? ছিয়া ছিয়া ছিয়া !"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি কথায় সময় নষ্ট করার কোনও দরকার নেই। চলো, তাহলে এগোনো যাক !"

মিংমা কাকাবাবুর কাঁধের হ্যাভারস্যাকটা প্রায় জোর করেই নিজে নিয়ে নিল। তারপর বলল, "আংকল সাব, আপনার যদি হাঁটতে কষ্ট হয়, তা হলে এই মিংমা আপনাকে কাঁধে করেও নিয়ে যেতে পারে।"

কাকাবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "আবার বেশি কথা বলছ ! এগোও ! তোমরা সামনে সামনে চলো।"

মিংমাকে পেয়ে সন্তু খুব খুশি। মিংমার মতন হাসিখুশি, ছটফটে মানুষটি যে ভয় পেয়ে তাদের ছেড়ে পালাবে, এটা সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সে মিংমার পাশে-পাশে চলতে-চলতে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কতদূর চলে গিয়েছিলে ?"

মিংমা বলল, "সে-কথা থাক, সন্তু সাব। ও কথা ভাবতেই আমার সরম্ লাগছে। কাল রাতে তোমাদের কোনও বিপদ হয়নি তো ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দারুণ বিপদ ! কারা যেন আমাদের গম্বুজের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল বাইরে থেকে।"

মিংমা দারুণ অবাক হয়ে বলল, "সে কী ? এখানে কে দরজা বন্ধ করবে ? আপনা আপনি দরজা টাইট হয়ে যায়নি তো ?"

জং বাহাদুর রানা জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে থেকে লোহার পাটি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছিল। ইয়েটি তো এরকমভাবে দরজা বন্ধ করতে পারে না ! তা হলে কে করেছিল ? তোমরা করোনি তো ?"

মিংমা চোখ গোল গোল করে বলল, "আমরা ? কেন আমরা দরজা বন্ধ করব ?"

রানা বললেন, "সাহেবদের মেরে ফেলতে পারলেই তো তোমাদের সুবিধে ছিল ! তা হলে আর কেউ তোমাদের নামে দোষ দিতে পারত না ?"

মিংমা বলল, "আমি পশুপতিনাথজীর নামে কিরিয়া কেটে বলছি, ওরকম কাজ আমরা কক্ষনো করি না। তাছাড়া, কাল রাতে আমরা বহুত দূরে ছিলাম !"

ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "মিংমা, তুমি সত্যিই ইয়েতি দেখেছ ?"

মিংমা বলল, "ইয়েটি ছিল কিংবা আউর কুছ ছিল, কেয়া মালুম ! লেকিন একটা বহুত বড়া জানোয়ারকা মাফিক কুছ্ দেখা !"

"ঠিক কোন্ জায়গাটায় দেখেছিলে ?"

"ঐ যে সামনে কালাপাথ্থর নামে পাহাড়টা দেখছেন, ঠিক ওর নজদিগে !"

"আমাদের সেই জায়গাটা দেখাতে পারবে ?"

"হাঁ সাব !"

"আমরা তা হলে এখন ঐ জায়গাটা পর্যন্ত যাব ! কী বলেন, মিঃ রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, দূর থেকে বললেন, "হ্যাঁ। আপনারা এগিয়ে যান।"

ভার্মা বললেন, "আমরা মাঝে-মাঝে দাঁড়াচ্ছি আপনার জন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার নেই। আপনারা এগিয়ে যান, আমি ঠিক ধরে ফেলব আপনাদের। জানেন তো, স্লো অ্যান্ড স্টেডি, উইনস দা রেস !"

রানা বললেন, "তা ঠিক। আপনার বেশি কষ্ট করার দরকার নেই, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি আস্তে-আস্তে আসুন !"

কাল সারা রাত তুষারপাতের জন্য খুব পাতলা ঝুরো-ঝুরো বরফ জমে আছে চারদিকে। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো গেঁথে যাচ্ছে সেই বরফে। সেই জন্য হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে তাঁর। কিন্তু নিজের অসুবিধের কথা কারুকে জানতে দিতে চান না তিনি।

রোদ্দুরের তাপে এক-এক জায়গায় বরফ গলে জল হয়ে আছে। সেখানে যে-কোনও মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে। জং বাহাদুর রানা একবার আছাড় খেয়ে পড়তেই মিংমা গিয়ে তাঁকে টেনে তুলল। তারপরই পড়লেন ভার্মা। কাকাবাবু কিন্তু একবারও আছাড় খেলেন না। সকলের থেকে খানিকটা পেছনে তিনি আসতে লাগলেন খুব সাবধানে, পা টিপে-টিপে।

সন্তু পাতলা শরীর নিয়ে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আকাশ আজ খুবই পরিষ্কার। এই রকম দিনে এভারেস্টের চূড়া দেখা যায়। কালাপাথর পাহাড়টার জন্য এখান থেকে আড়াল পড়ে গেছে। সন্তু এখানে এসে কয়েকবার এভারেস্টের চূড়া দেখেছে, তার নিজের ক্যামেরায় ছবিও তুলেছে। তবু আর-একবার দেখতে পাবে বলে উত্তেজনা জাগছে তার শরীরে। বিশাল

মহান কিছুর কাছাকাছি এলেই মানুষ একটু অন্যরকম হয়ে যায়।

মিংমা পেছন থেকে এসে সন্তুর হাত চেপে ধরে বলল, "সন্তু সাব, অত সামনে-সামনে যেও না! ঐ দুই বড়া সাবদের আগে যেতে দাও।"

সন্তু বলল, "কেন?"

"যদি ইয়েটি এসে তোমাকে আগে ধরে নিয়ে যায়?"

সন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না। এর মধ্যে ইয়েতির কথা সে ভুলে গিয়েছিল। আবার মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই একবার কেঁপে উঠল তার বুক।

জোর করে সাহস এনে সে বলল, "দু খানা এল এম জি আছে আমাদের সঙ্গে। ইয়েতি কী করবে?"

মিংমা ফিসফিস করে বলল, "সন্তু সাব, ইয়েটি ভ্যানিশ করে নিয়ে যেতে পারে!"

সন্তু খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, "যাঃ!"

"আমিও আগে মানতাম না। লেকিন নিজের আঁখসে তো দেখলাম কাল! এক্ দো সেকেন্ড ছিল, তারপরই ভ্যানিশ করে গেল! কেয়া ঠিক নেহি!"

সন্তু বলল, "হুঁ!"

সন্তু সেই কালো-মতন বিরাট প্রাণীটাকে এক পলকের জন্য দেখেই ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারপর যখন আবার তাকিয়েছে, সেটা আর নেই। অত তাড়াতাড়ি কোথায় পালাল? সত্যি কি কোনও প্রাণী অদৃশ্য হতে পারে?

মিংমা সন্তুকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল। ভার্মা আর রানা খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলেন, ওঁরা এগিয়ে এলেন। সন্তুর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটা বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, কিন্তু রানা আর ভার্মার অসুবিধে হচ্ছে বেশ। একবার করে আছাড় খেয়ে ওঁরা বেশি সাবধান হয়ে গেলেন। দু' জনের হাতেই লাইট মেশিনগান, নামে লাইট হলেও খুব হালকা তো নয়!

ভার্মা সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, দাঁড়িয়ে পড়লে যে! এখানেই ইয়েতি দেখেছিলে নাকি?"

সন্তু বলল, "না, আরও অনেক দূর আছে!"

"আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলো। যদি সত্যিই ইয়েতি দেখতে পাই, গুলিতে তাকে একেবারে ফুঁড়ে দেব! জ্যান্ত হোক, মরা হোক, একটা ইয়েতি নিয়ে যদি দেখাতে পারি, তা হলে সারা পৃথিবীতে আমাদের নাম ছড়িয়ে যাবে! এ পর্যন্ত কেউ ইয়েতির অস্তিত্ব ঠিকভাবে প্রমাণ করতে পারেনি!"

রানা বললেন, "এই ছেলেটি নিজের চোখে দেখেছে, একে অবিশ্বাসই বা করা যায় কী করে! শেরপা কিংবা কুলিদের না হয় কুসংস্কার থাকতে পারে—"

ভার্মা বললেন, "আর এক যদি কোনও ভাল্লুক-টাল্লুকের মতন জানোয়ার দেখে থাকে··"

রানা বললেন, "এখানে ভাল্লুক আসবে কোথা থেকে ? এ পথ দিয়ে কত অভিযাত্রী গেছে, কেউ কোনও দিন কোনও ভাল্লুক দেখেনি।"

ভার্মা বললেন, "কেউ তো আগে ইয়েতিও দেখেনি !"

রানা বললেন, "কেইন শিপটন দেখেছিলেন। অন্তত তাঁর ডায়েরিতে সেই কথা লেখা আছে। আমার মনে হয়, তিব্বতের দিক থেকে ইয়েটিই হোক বা অন্য কোনও বড় জানোয়ারই হোক, এদিকে ছিটকে চলে এসেছে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুও পায়ের ছাপ দেখেছেন। মোটেই ভাল্লুকের মতন নয়, মানুষের মতন। তবে, চারটি আঙুল।"

ভার্মা বললেন, "তাও বটে !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ভার্মা সাহেব, আপনি এরকম ভাল বাংলা শিখলেন কোথা থেকে ?"

ভার্মা হেসে বললেন, "আমি কলকাতায় লেখা-পড়া করেছি। আমি থাকতুম হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে। তোমাদের বাড়ি ভবানীপুর, তাই না ? সে জায়গাও চিনি।"

রানা বললেন, "আমি পড়েছি দার্জিলিঙের নর্থ পয়েন্ট স্কুলে। আমার অনেক বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে আমি দু' তিনবার থেকেছি।"

মিংমা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "সাব, দেখিয়ে।"

তিনজনেই চমকে গিয়ে মিংমার দিকে তাকাল। মিংমা সামনে বরফের মধ্যে এক জায়গার দিকে আঙুল উঁচিয়ে আছে।

সেখানে একটা মস্ত বড় পায়ের ছাপ।

ভার্মা আর রানা সেখানে বসে পড়লেন। সন্তু পেছন ফিরে কাকাবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করল, কিন্তু কাকাবাবুকে দেখতে পেল না।

ভার্মা বলল, "একটা মাত্র পায়ের ছাপ ? নিশ্চয়ই টাটকা, কারণ কাল রাত্তিরে তুষারপাত হয়েছিল, তার আগের হলে মিলিয়ে যেত !"

রানা বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক এখানে। আরে—, মিঃ রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না।"

ভার্মা বললেন, "কোথাও বসে বিশ্রাম করছেন বোধহয়।"

সন্তু বলল, "বরফ তো উঁচু-নিচু নয়, কোথাও বসলেই বা দেখতে পাব না ? বেশি দূরে তো ছিলেন না ?"

ভার্মা বললেন, "হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাননি তো ? ফিরে গিয়ে আমাদের দেখা দরকার।"

রানা বললেন, "কিন্তু এখানে হঠাৎ এই একটা পায়ের ছাপ এল কী করে ?"

তিনি এল এম জি-টা উঁচিয়ে একবার চারদিকে ঘুরে তাকালেন।

মিংমা খুব জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, "আংকল সাব ! আংকল সাব !"

কোনও উত্তর এল না।

সন্তু বলল, "আমি কাকাবাবুকে খুঁজে আসছি!"

ভার্মা বললেন, "আমি আর মিঃ রানা এখানে থাকছি, তুমি আর মিংমা দেখে এসো। উনি আহত হয়ে থাকলে আমাদের ডেকো।"

সন্তু মাঝে-মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে কাকাবাবুর প্রতি লক্ষ রাখছিল। কাকাবাবু কখনও চোখের আড়াল হননি। দুশো আড়াই শো গজ দূরে ঠুক-ঠুক করে আসছিলেন। ভার্মা আর রানার সঙ্গে কথা বলার সময় সন্তু কাকাবাবুর দিকে নজর রাখতে ভুলে গিয়েছিল। এরই মধ্যে কাকাবাবু কোথায় গেলেন!

খানিকটা ফিরে এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সন্তু প্রায় কেঁদে উঠে বলল, "মিংমা!"

মিংমাও একই সঙ্গে দেখতে পেয়েছে।

বরফের ওপরে পড়ে আছে কাকাবাবুর একটা ক্রাচ আর খানিকটা টাটকা রক্ত। আর কিছু না।

॥ ১৪ ॥

ভার্মার মুখ দেখে মনে হল, জীবনে তিনি এ-রকম অবাক কখনও হননি। চোখ দুটো একেবারে স্থির হয়ে গেছে। ফিসফিস করে তিনি বললেন, "এ কী ব্যাপার? মিঃ রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন?"

রানা বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! এই তো আমাদের পেছনেই ছিলেন, খানিকটা আগেই দেখতে পাচ্ছিলাম! কোনও কারণে উনি কি গম্বুজে ফিরে গেলেন?"

ভার্মা বললেন, "তা কী করে হবে? এত তাড়াতাড়ি উনি কী করে ফিরে যাবেন? উনি কি দৌড়তে পারেন? তাছাড়া আমাদের না বলে যাবেনই বা কেন?"

ভার্মা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বরফের ওপর পড়ে থাকা ক্রাচটার দিকে।

রানা বললেন, "উনি ক্রাচ ছাড়া হাঁটবেনই বা কী করে? ওখানে রক্তই বা পড়ে আছে কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না যে!"

সন্তুও এত অবাক হয়ে গেছে যে, কোনও কথা বলতে পারছে না। বিশেষত রক্ত দেখে তার বুকটা কাঁপছে।

মিংমা হঠাৎ খুব জোরে চিৎকার করে উঠল, "আংকল সাব! আংকল সাব!"

জায়গাটা এমনই নিস্তব্ধ যে, মিংমার চিৎকারে যেন এই স্তব্ধতা ফেটে একেবারে ঝন্‌ঝন্‌ করতে লাগল। বহু দূরে প্রতিধ্বনি, যেন তিনদিক থেকে মিংমাকে ভেংচিয়ে কেউ বলতে লাগল, আংকল সাব, আংকল সাব!

মিংমা আরও দু'বার ডাকতেই রানা বললেন, "থাক, আর চিৎকার করতে হবে না। মিঃ রায়চৌধুরী কী আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন নাকি ?"

ভার্মা বললেন, "ইয়েতি অদৃশ্য হতে পারে, এ-কথা আমিও শুনেছি। কোনও ইয়েতি এসে যদি মিঃ রায়চৌধুরীকে ধরে নিয়ে যায়..."

রানা বললেন, "ইয়েটি ? আপনিও ইয়েটিতে বিশ্বাস করেন ?"

ভার্মা বললেন, "তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে বলুন ? এই জন্যই আমি তখন মিঃ রায়চৌধুরীকে বলেছিলাম, মাত্র এই ক'জন লোক নিয়ে এখন কালাপাথরের দিকে যাবার দরকার নেই।"

মিংমা এই সময় বরফের ওপর শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো আস্তে আস্তে এগোতে লাগল কাকাবাবুর ক্রাচটার দিকে।

ভার্মা বললেন, "ও কী ? ও-রকম করছে কেন ?"

রানা বললেন, "ও দেখতে চাইছে, ওখানে কোনও ক্রিভাস আছে কিনা। একমাত্র চোরা কোনও ক্রিভাসের মধ্যে পা দিয়ে মিঃ রায়চৌধুরী নীচে ডুবে যেতে পারেন।"

ভার্মা যেন নিজের অজান্তেই ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "আমরাও তো ঐখান দিয়েই এসেছি !"

রানা বললেন, "অনেক সময় ছোট-ছোট ক্রিভাস থাকে, ঠিক সেটার ওপর পা দিলেই বিপদ ! মিংমা ঠিক কাজই করেছে, শুয়ে থাকলে হঠাৎ তলিয়ে যাবার ভয় থাকে না।"

সন্তু বলল, "রক্ত ! ওখানে রক্ত কী করে আসবে ? বরফের ওপর পড়ে গেলে তো বেশি জোর লাগে না ? রক্তও বেরোবে না।"

ভার্মা বললেন, "ঠিক বলেছ সন্তু, রক্ত কী করে এল ?"

মিংমা একটু-একটু করে এগিয়ে গিয়ে ক্রাচটাকে ধরে ফেলল। তারপর বরফের ওপর চাপড় মারতে লাগল জোরে জোরে। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ছিটকাতে লাগল সেই আঘাতে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল সেখানকার বরফের মধ্যে কোনও গর্ত-টর্ত নেই।

মিংমা আশেপাশের খানিকটা জায়গাও চাপড়ে দেখল ঐ এরকমভাবে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিরাশ গলায় বলল, "নেহি সাব ! ইধার কিরভাস নহি !"

রানা বললেন, "আশ্চর্য ! একটা মানুষ কি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ?"

ভার্মা বললেন, "ব্যাপারটা মোটেই আমার ভাল ঠেকছে না। আমাদের আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা ঠিক নয়।"

রানা বললেন, "আমরা কি ফিরে যাব বলতে চান ? মিঃ রায়চৌধুরীর খোঁজ না করেই ? ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বিশেষ রিকোয়েস্ট আছে, যাতে আমরা ওঁর নিরাপত্তার ভার নিই।"

ভার্মা বললেন, "আর কীভাবে খোঁজ করবেন ? চারদিকে ধূ-ধূ করছে

বরফ। এখানে কোনও মানুষের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আর মিঃ রায়চৌধুরীর মতন একজন খোঁড়া লোক দৌড়েও কোথাও চলে যেতে পারেন না। তাহলে তিনি গেলেন কোথায় ?”

রানা বললেন, “সেটাই তো প্রশ্ন। তিনি গেলেন কোথায় ? একটা না একটা ব্যাখ্যা এর নিশ্চয়ই আছে !”

ভার্মা বললেন, “দেখুন, শেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের সেই লাইনটা আমার মনে পড়ছে। ‘দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্‌ন অ্যান্ড আর্থ, হোরিশিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট অব ইন ইওর ফিলসফি !’ আপনারা যা-ই বলুন, বাতাসে মাটিতে এখনও এমন রহস্য আছে, যা মানুষের অজানা !”

রানা বললেন, “সে কী, মিঃ ভার্মা ! আপনি কি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন নাকি ?”

এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ভার্মা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বরফের ওপর। তারপর হাতজোড় করে কী যেন মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

একটু বাদে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আমার ভীষণ শীত করছে। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। চলুন, গম্বুজটার কাছে ফিরে যাই।”

রানা কী-রকম যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। আপন মনে বললেন, “গম্বুজের কাছে ফিরে যাব ? মিঃ রায়চৌধুরীর কী হবে ?”

ভার্মা বললেন, “গম্বুজের কাছে ফিরে গিয়ে দেখা যাক। কোনও কারণে বা যে-কোনও উপায়ে উনি তো সেখানে যেতেও পারেন। হয়তো কোনও দরকারি জিনিস ফেলে এসেছিলেন।”

রানা বললেন, “গম্বুজটা কত দূরে ! উনি অতদূরে ফিরে গেলেন, আর আমরা টেরও পেলাম না ?”

ভার্মা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, “উনি আমাদের সামনে কোথাও যাননি, এ কথা তো ঠিক ? ওঁকে খুঁজতে হলে আমাদের পেছনের দিকেই খুঁজতে হবে। আমার অসম্ভব শীত করছে। পা দুটো যেন জমে যাচ্ছে একেবারে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমিও মরে যাব !”

সন্তু রানার মুখের দিকে চেয়ে বলল, “আমি একটা কথা বলব ?”

রানা বললেন, “কী ?”

ভার্মা বললেন, “চলো, গম্বুজের মধ্যে চলো, সেখানে বসে তোমার কথা শুনব।”

সন্তু বলল, “আমি একবার একটা ক্রিভাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম ! ঐ মিংমা আমায় টেনে তুলেছিল।”

মিংমা বলল, “হাঁ সাব !”

সন্তু বলল, “আমি অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিলাম বরফের মধ্যে। তারপর…একটা অদ্ভুত জিনিস মনে হয়েছিল। আমার পা কিসে যেন ঠেকে

গেল। একটা শক্ত কিছুতে। আমার ধারণা, সেটা একটা লোহার পাত।"

ভার্মা এবং রানা দু'জনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ?"

সন্তু বলল, "লোহার পাত।"

ভার্মা ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, "বরফের নীচে লোহার পাত ? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?"

রানা আগ্রহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করে বুঝলে লোহার পাত ? পাথরও তো হতে পারে। বরফের খানিকটা নীচে তো পাথর থাকবেই !"

সন্তু বলল, "পায়ের তলায় পাথর ঠেকলে একরকম লাগে। আর লোহার পাতের মতন প্লেন কোনও জিনিস ঠেকলে অন্যরকম লাগে। আমার সেই অন্যরকম লেগেছিল।"

ভার্মা বললেন, "লোহার ঝনঝন শব্দ হয়েছিল ?"

সন্তু মাথা নিচু করে বলল, "তা অবশ্য হয়নি। কিংবা হলেও আমি শুনতে পাইনি। শুধু আমার অন্যরকম লেগেছিল।"

রানা জিজ্ঞেস করল, "সে জায়গাটা কোথায় ?"

সন্তু আঙুল তুলে বলল, "সে জায়গাটা এখানে নয়। ঐ দিকে। সেখানে একটা কাঠির ওপর একটা লাল রুমাল বেঁধে রেখেছিল মিংমা। হয়তো খুঁজলে সে জায়গাটা বার করা যেতে পারে।"

ভার্মা বললেন, "আমরা শুধু এখানে সময় নষ্ট করছি। এদিকে হয়তো মিঃ রায়চৌধুরী কোনও কারণে আহত হয়ে গম্বুজে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করছেন। ধরা যাক, সন্তু যেখানে বরফে ডুবে গিয়েছিল, সেখানে বরফের নীচে একটা লোহার পাত পড়ে আছে। কেউ-না-কেউ হয়তো কখনও ফেলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে এখানকার রহস্যটার সম্পর্ক কী ? অ্যাঁ ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর মুখে শুনেছি, কেইন শিপটন নামে একজন অভিযাত্রী এই রকম জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। কাকাবাবু তাঁর খোঁজেই এসেছেন। তারপর কাকাবাবুও সেই জায়গা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এর মধ্যে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে না ?"

ভার্মা বললেন, "এর মধ্যে আবার কেইন শিপটনের কথা এল কী করে ? কে বলল, মিঃ রায়চৌধুরী কেইন শিপটনের খোঁজ করতে এখানে এসেছিলেন ? কেইন শিপটন বিদেশি, তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। এ নিয়ে ভারত সরকার মাথা ঘামাবে কেন ? তোমার কাকাবাবু ইয়েতির রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করবেন বলে ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছিলেন। ইয়েতি সম্পর্কে আমার একটা থিয়োরি আছে, চলুন গম্বুজে ফিরে গিয়ে বলব !"

রানা সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী বলতে চাইছিলে ?"

সন্তু বলল, "যেখানে রক্ত পড়ে আছে, ঐ জায়গার বরফটা একটু খুঁড়ে

দেখলে হয় না ? যদি ওর নীচে কিছু থাকে ? ক্রাচ ছাড়া কাকাবাবুর পক্ষে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় !”

ভার্মা বললেন, “মিংমা তো দেখল যে ওখানকার বরফ শক্ত, তার নীচে তোমার কাকাবাবু যাবেন কী করে ? মিছিমিছি বরফ খুঁড়ে লাভ নেই কোনও। চলুন, মিঃ রানা, গম্বুজের দিকে চলুন, আমি আর থাকতে পারছি না।”

রানা গম্ভীরভাবে বললেন, “আপনার যদি খুব শীত করে তাহলে আপনি গম্বুজের দিকে এগোন, মিঃ ভার্মা। এই ছেলেটি যখন বলছে, তখন বরফ খুঁড়েই দেখা যাক। মিঃ রায়চৌধুরীর জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে আমরা বাধ্য।”

ভার্মা বললেন, “আকাশের অবস্থাটা একবার দেখুন !”

সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই আকাশের অবস্থা হঠাৎ আবার বদলে গেছে। কী সুন্দর ঝকঝকে রোদ ছিল কিছুক্ষণ আগেও। এখন কালো-কালো মেঘ উড়ে আসছে যেন কোথা থেকে। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে। অথবা ঝড় ওঠাও আশ্চর্য কিছু নয়। ঝড়ের মধ্যে বাইরে এরকমভাবে থাকা বেশ বিপজ্জনক।

মিংমা তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা গাঁইতি বার করে বলল, “আমি ঝটপট খুঁড়ে দেখছি, সাব। বেশি টাইম লাগবে না।”

বলা মাত্রই সে ঝপাঝপ কোপ মারতে লাগল বরফের মধ্যে। দারুণ মজবুত মিংমার শরীর, তার হাত চলল একেবারে যন্ত্রের মতন। সন্তু তার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দেখতে-দেখতে মিংমা অনেকখানি গর্ত খুঁড়ে ফেলল। ভার্মা আর রানা এসে সেই গর্তের মধ্যে উঁকি দিলেন। দু'জনেরই মুখে সন্দেহ। সত্যিই একজন মানুষ এতখানি শক্ত বরফের মধ্যে তলিয়ে যাবেন কী করে !

এক সময় মিংমার গাঁইতির ঠং করে শব্দ হল, আর সন্তু চমকে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

মিংমা আরও দু'তিনবার গাঁইতি চালিয়েই থেমে গেল। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও পরিশ্রমে তার কপালে ঘাম জমেছে। বাঁ হাত দিয়ে ঘাম মুছে সে সন্তুর দিকে তাকিয়েই করুণ গলায় বলল, “লোহার পাত না আছে, সন্তু সাব। পাত্থর হ্যায়, পাত্থর !”

নিচু হয়ে সে এক টুকরো পাথর তুলে আনল।

ভার্মা বললেন, “বলেছিলাম না, নিছক পণ্ডশ্রম !”

রানা বললেন, “তাই তো !”

ভার্মা বললেন, “আর দেরি করবেন না ঝড় উঠবে, শিগগির চলুন !”

রানা বললেন, “হ্যাঁ, আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। চলুন, যাওয়া যাক !”

মিংমা সন্তুর হাত ধরে বলল, “চলো সন্তু সাব !”

সন্তু খুব জোরে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। লোকজনের সামনে সে কখনও কাঁদতে চায় না। কিন্তু তার মনে হল তারা যেন কাকাবাবুকে এখানে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। অথচ, ঝড়ের মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও যাবে না।

ঝড় তখনই উঠল না বটে, কিন্তু আকাশটা ক্রমশ বেশি কালো হয়ে আসতে লাগল। ওরা সবাই মিলে ফিরে চলল গম্বুজের দিকে।

ভার্মা বললেন, "ঝড় উঠলে আরও কী বিপদ হবে জানেন ? হেলিকপটারটা ফিরতে পারবে না ! তাহলে সারা রাত আমাদের ঐ ভুতুড়ে গম্বুজের মধ্যে থাকত হবে ! ওরে বাপরে বাপ ! এখানে সত্যিই ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটছে !"

আর কেউ কোনও কথা বলল না। প্রায় চল্লিশ মিনিট হেঁটে ওরা এসে পৌঁছল গম্বুজটার কাছে। মিংমা দৌড়ে গিয়ে গম্বুজটার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটু পরেই গম্বুজের ওপরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মিংমা বলল, "নেহি সাব, আংকল সাব ইধার ভি নেহি হ্যায় !"

রানা বললেন, "যাঃ, শেষ আশাটাও গেল।"

প্রায় তক্ষুনি ফট-ফট শব্দ পাওয়া গেল আকাশে। হেলিকপটারটা ফিরে আসছে। ভার্মা বললেন, "বাঃ, চমৎকার ! তা হলে রাত্রে এখানে থাকতে হবে না। চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না।"

সন্তু বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাব ?"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ। আমি চলে যেতে চাইছি বলে কি তোমরা আমাকে ভীতু ভাব ? যে-শত্রুকে চোখে দেখা যায়, তার সঙ্গে লড়তে আমি কখনও ভয় পাইনি। কিন্তু অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে আমি জানি না। তোমার কাকাবাবু যে মিসিং, সে খবর ভারত সরকারকে এক্ষুনি জানাতে হবে। তারপর বড় সার্চ পার্টি এনে খুঁজতে হবে তাঁকে।"

রানা চিন্তিতভাবে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে আর থেকে কোনও লাভ নেই। ঝড় আসবার আগেই আমাদের ওড়া উচিত।"

সন্তু হঠাৎ বলল, "আমি যাব না !"

ভার্মা বললেন, "তুমি যাবে না ?"

সন্তু ওদের থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে গোঁয়ারের মতন বলল, "আমি কিছুতেই যাব না ! কিছুতেই না !"

তারপর ওঁরা দু'জনে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন সন্তুকে। সন্তু কিছুতেই রাজি নয়। সার্চ পার্টি তো আসবেই, ততদিন পর্যন্ত সন্তু এই গম্বুজের মধ্যে অপেক্ষা করবে !

ভার্মা বললেন, "ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে নাকি ? একা এখানে থাকবে !"

মিংমা বলল, "আমি সন্তু সাবের সঙ্গে থাকতে পারি।"

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই হল। আর দেরি করার উপায় নেই বলে রানা আর

ভার্মা উঠে পড়লেন হেলিকপটারে। ওদের বললেন, গম্বুজের লোহার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে। কাল সকালেই আবার হেলিকপটারটা ফিরে আসবে।

প্রবল গর্জন করে আবার হেলিকপটারটা উঠে গেল ওপরে। গম্বুজের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু আর মিংমা।

॥ ১৫ ॥

জ্ঞান ফেরার পর কাকাবাবু চোখ মেলে দেখলেন পাতলা-পাতলা অন্ধকার। তিনি ভাবলেন বুঝি রাত হয়ে গেছে। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছেন, তা তো তিনি জানেন না।

পাশে হাত দিয়ে দেখলেন, বরফ নয়, তিনি শুয়ে আছেন পাথরের ওপর। এখানে তিনি কী করে এলেন ? তিনি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ওরা তাঁকে ধরাধরি করে এনে এই পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়েছে ? সন্তু কোথায় ? রানা আর ভার্মাই বা কোথায় গেল ?

কাকাবাবু ডাকলেন, "সন্তু ! সন্তু !"

তারপরই তাঁর মনে পড়ল, তিনি তো হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাননি, কেউ তাঁর মাথায় খুব শক্ত কোনও জিনিস দিয়ে মেরেছিল। তিনি মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন, মাথায় চটচট করছে রক্ত। বেশ ব্যথাও আছে।

তা হলে সত্যিই কেউ তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে এসেছে ?

কাকাবাবু উঠে বসলেন। তাঁর হাত-পা তো বাঁধেনি কেউ। কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন এবং খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রিভলভারটাও আছে !

কাকাবাবু চোখে অন্ধকারটা সইয়ে নিলেন। ওপর দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখতে পেলেন না। মনে হল, একটা কোনও মস্ত বড় গুহার মধ্যে তিনি আছেন। বাঁদিকে অনেক দূরে খানিকটা ধোঁয়া-ধোঁয়া মতন অস্পষ্ট আলো ভেসে বেড়াচ্ছে, সে-আলোটা কিসের তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

এপাশ-ওপাশ হাতড়েও তিনি ক্রাচ দুটো খুঁজে পেলেন না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ক্রাচ দুটো না থাকলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েন, ইচ্ছেমতন চলাফেরা করতে পারেন না। তিনি আবার ভাবলেন, যে বা যারাই তাঁকে ধরে আনুক, রিভলভারটা নিয়ে নেয়নি কেন ?

বেশ দূরে তিনি মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কান খাড়া করে তিনি কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, কে যেন মাইক্রোফোনে কিছু বলছে। কথার শেষে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে একটা। সব ব্যাপারটা তাঁর অবিশ্বাস্য মনে হল। হিমালয়ে এই বরফের

রাজ্যে মাইক্রোফোন ?

তিনি মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝতে চাইলেন যে, তিনি এখনও ঘুমিয়ে আছেন কি না। অমনি মাথার যন্ত্রণাটা খুব বেড়ে গেল। তিনি এমনই অবশ হয়ে পড়লেন যে, আবার শুয়ে পড়তে হল তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ তিনি শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। খানিকটা সুস্থ হবার পর তিনি রিভলভারটা বার করে পাশে নামিয়ে রেখে ওভারকোটের অন্য পকেটগুলো খুঁজতে লাগলেন। তাঁর কাছে নানারকম ওষুধ থাকে। কয়েকটা ট্যাবলেট পেয়ে গেলেন তিনি। অন্ধকারেই টিপে-টিপে বুঝে একটা ট্যাবলেট বেছে নিলেন। এটা ব্যথা কমাবার ওষুধ। কিন্তু ট্যাবলেট গিলতে গেলে জল লাগে, এখানে জল পাবার কোনও উপায় নেই। ওষুধটা খুব তেতো, তবু চুষে চুষে সেটাকে খেয়ে ফেললেন কাকাবাবু।

তারপর গলা থেকে স্কার্ফটা খুলে মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধলেন। বেশিক্ষণ রক্ত পড়লে তিনি এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়বেন।

এ-জায়গাটায় শীত বেশ কম। হাতের গ্লাভস খুলে ফেলার পরেও আঙুল কনকন করে না। নাকের ডগায় আড়ষ্ট ভাব নেই। এটা তা হলে মাটির নীচের কোনও গুহা। কোনও জায়গা থেকে নিশ্চয়ই হাওয়া আসে, কারণ নিশ্বাস নিতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

হঠাৎ কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠলেন। কী যেন একটা জিনিস ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর পিঠের ওপর।

তিনি মুখ ফিরিয়ে দু'হাতে জিনিসটাকে এক ঝটকা মারলেন। অমনি সেটা মাটির ওপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। একটা সাদা রঙের কুকুর !

কুকুরটা হিংস্রভাবে ডেকে আবার তেড়ে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু তাঁর সুস্থ পা দিয়ে সেটাকে এক লাথি মারলেন খুব জোরে। খানিকটা দূরে ছিটকে গেল কুকুরটা, আবার এসে ঘ্যাঁক করে তাঁর পা কামড়ে ধরল। কাকাবাবু জোর করে সেটাকে ছাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তিনি খুব মোটা প্যান্ট পরে আছেন বলে কুকুরটা দাঁত বসাতে পারেনি।

কুকুরটা মাথা নিচু করে, পেছনের একটা পা আছড়াতে আছড়াতে রাগে গজরাচ্ছে। যে-কোনও মুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাকাবাবু রিভলভারটা তুললেন। এক গুলিতেই কুকুরটাকে তিনি সাবাড় করে দিতে পারেন। কিন্তু কাকাবাবু কুকুর ভালবাসেন। কুকুরটাকে তাঁর মারতে ইচ্ছে হল না। কুকুরটা জার্মান স্পিৎস জাতের, বেশি বড় নয়। এই জাতের এক-একটা কুকুর খুব হিংস্র হয় বটে, কিন্তু এর কামড়ে তো মানুষ মরে না !

তিনি কুকুরটাকে শান্ত করার জন্য চুঃ চুঃ শব্দ করতে লাগলেন। তবু কুকুরটা আর একবার লাফিয়ে তাকে কামড়াতে এল। কাকাবাবু আগে থেকেই রেডি ছিলেন, সজোরে কষালেন এক লাথি।

কুকুরটা এবার ডাকতে-ডাকতে কাকাবাবুর পেছন দিকে চলে এল। কাকাবাবুও ঘুরে বসলেন সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা তো জ্বালাবে খুব। অথচ এমন সুন্দর একটা কুকুরকে মেরে ফেলারও কোনও মানে হয় না! কয়েকবার লাথি খেয়ে কুকুরটাও আর সহজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, একটা কোনও সুযোগ খুঁজছে।

হাতের কাছে কিছু না পেয়ে কাকাবাবু কুকুরটার দিকে একটা গ্লাভস ছুঁড়ে মারলেন। কুকুরটা অমনি সেটা কামড়ে ধরে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। তারপর হঠাৎই সেটা মুখে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল দূরে। একটু বাদেই সেটা আবার ফিরে এল। তার মুখটা খালি। কাকাবাবু ভাবলেন, এই রে, গ্লাভসটা নষ্ট হয়ে গেল! কোথায় রেখে এল সেটাকে? যাই হোক, একটা যখন গেছে, তখন আর একটা রেখেই বা কী হবে! কাকাবাবু সেটাও ছুঁড়ে মারলেন কুকুরটার দিকে। সে সেটাকে মুখে নিয়ে খুব ঝাঁকাতে লাগল যেন বেশ একটা মজার খেলা পেয়েছে। আবার সে সেটা নিয়ে পালিয়ে গেল একই দিকে। আর ফিরে এল না।

কাকাবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেন কুকুরটার জন্য। আর তার পাত্তা নেই। কাকাবাবু ভাবতে লাগলেন, একটা পোষা কুকুর সেই গুহার মধ্যে কী করে এল? স্পিৎস কুকুর সাধারণত পোষাই হয়। হিমালয়ের এতখানি উচ্চতায় কোনও জন্তু-জানোয়ারই দেখা যায় না। চারদিকে বরফের রাজত্ব, এর মধ্যে একটা পোষা কুকুর! কিছুক্ষণ ভাবার পর কাকাবাবু আপন মনেই বললেন, হুঁঃ।

তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন দুপুরবেলার ঘটনা। কেউ একজন পেছন থেকে তাঁর মাথায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। তাহলে সন্তু আর অন্যদের কী হল? তাদেরও কি মেরে এই গুহার মধ্যে কোথাও ফেলে রেখেছে? রানা আর ভার্মার কাছে লাইট মেশিনগান ছিল, তাদের মারা অত সহজ নয়। কিন্তু তাঁকে যখন মারা হল, তখন ওরা কেউ বাধা দিল না কেন? ওরা কোথায়? বিশেষ করে সন্তুর জন্য তিনি খুব উতলা বোধ করলেন। এক্ষুনি ওদের খোঁজ করা দরকার।

তিনি আস্তে আস্তে উঠে পড়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। দেয়ালের গা'টা এবড়ো-খেবড়ো। সেটা ধরে-ধরে এগোলেন খানিকটা। দূরে যেখানে আলোর মতন ধোঁয়া ভাসছে, তিনি সেইদিকে যেতে চান। কুকুরটাও ঐদিকেই পালিয়েছে।

মাইক্রোফোনে কথা বলার মতন যে আওয়াজটা খানিক আগে শোনা গিয়েছিল, সেটা থেমে ছিল এতক্ষণ। এবার আবার সেই শব্দটা বেজে উঠল। কাকাবাবু মানে বোঝার চেষ্টা করলেন। অনেক দূর থেকে খুবই অস্পষ্ট আসছে শব্দটা—তবু তিনি এবার একটু-আধটু বুঝতে পারলেন। কোনও কথা কেউ

বলছে না, শুধু কয়েকটা এলোমেলো সংখ্যা আর অক্ষর। এন সি ও থ্রি টু নাইন ফাইভ...আর জি টি ফোর ফাইভ জিরো জিরো জিরো...টি ও ওয়ান এইচ এইট এইট জিরো জিরো জিরো...

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলেন। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আওয়াজটা থেমে গেল, তারপর খানিকক্ষণ ঝনন ঝনন রেশ রইল। কাকাবাবুর কপাল কুঁচকে গেল। এইসব অক্ষর ও সংখ্যার মানে কী? কে কাকে বলছে? কিংবা এমনও হতে পারে, অন্য কিছু শব্দ আসছে, তিনি ভুল শুনছেন! কিসের শব্দ?

আর দু-এক পা এগোতে গিয়েই কাকাবাবু হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন কিছুতে হোঁচট খেয়ে। তাঁর মাথায় আবার গুঁতো লাগল এবং ব্যথাটাও বেড়ে গেল। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এখন আর জ্ঞান হারালে চলবে না। তিনি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। দূরের আলোর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যই কাছের অন্ধকার এখন বেশি অন্ধকার লাগছে।

একটু পরে ব্যথাটা একটু কমল, চোখেও খানিকটা দেখতে পেলেন। কিসে আঘাত লাগল সেটা বোঝবার জন্য হাত বুলোতে লাগলেন চার দিকে। একটা কিছুতে হাত লাগল। ভাল করে হাত দিয়ে দেখলেন, সেটা একটা লোহার বাক্স। তিনি বাক্সটা টেনে খোলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। অনেক টানাটানি করেও তিনি সেটা খুলতে পারলেন না। গুহার মধ্যে তালাবন্ধ লোহার বাক্স! কাকাবাবু বাক্সটার ওপর উঠে বসে আবার ভাবতে লাগলেন ব্যাপারটা। এই গুহাটা কোথায়?

কাকাবাবু বেশিক্ষণ ভাবনার সময় পেলেন না। দূরে কুকুরটার ডাক শোনা গেল আবার। কাকাবাবু দেখলেন, দূরে সেই আলোর ধোঁয়ার মধ্যে কুকুরটা লাফালাফি করছে। কুকুরটা আবার এসে জ্বালাতন করবে। কাকাবাবুর খুব ইচ্ছে হল কুকুরটাকে আদর করতে। কুকুরটা যদি এত দুষ্টুমি না করত তাহলে ওকে কাছে ডেকে আদর করা যেত।

কুকুরটা কিন্তু এদিকে এল না। দূরেই খানিকটা লাফালাফি করে মিশে গেল ডান পাশের অন্ধকারের মধ্যে। আলোর ধোঁয়াটা কোথা থেকে আসছে সেটা জানা দরকার। মনে হচ্ছে যেন ওখানে একটা গর্ত আছে। কারণ ধোঁয়াটা এখন আসছে নীচের দিক থেকে।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে এগোতে যাবেন, সেই সময় কুকুরটা আলোর ধোঁয়ার মধ্যে ফিরে এল আবার। এবার সেদিকে তাকাতেই কাকাবাবুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। কুকুরটার পাশে একটা বিরাট ছায়ামূর্তি। মাত্র এক পলক দেখা গেল সেটাকে। তারপরই মিলিয়ে গেল আবার।

কাকাবাবু দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইলেন। মূর্তিটাকে দেখে মানুষ মনে হল না, বরং যেন বিশাল একটা বাঁদরের মতন। লেজ আছে কি না বোঝা

গেল না, কিন্তু বাঁদরের মতন সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল। কাকাবাবু বুঝলেন, এই রকম মূর্তিই সন্তু আর মিংমারা দেখেছে। এই তবে ইয়েতি ? কাকাবাবু রিভলভারটা শক্ত করে ধরে রইলেন।

আবার কুকুরটা ডেকে উঠল, আবার মূর্তিটাকে দেখা গেল, আবার মিলিয়ে গেল। এইরকম দু-তিনবার। কাকাবাবু বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কী হচ্ছে ওখানে।

এরপর সেই বিশাল বাঁদরের মতন মূর্তিটা আলোর ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়াল ; আর মিলিয়ে গেল না। কুকুরটা ওর চারদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকছে আর লাফাচ্ছে। কিন্তু কুকুরটা ঐ মূর্তিটাকে কামড়াবার চেষ্টা করছে না। এক সময় মূর্তিটা খপ করে দু'হাতে তুলে নিল কুকুরটাকে। কাকাবাবু ভাবলেন, এইবার ও বুঝি কুকুরটাকে মেরে ফেলবে। তিনি রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খুলে ওদিকে টিপ করলেন।

কিন্তু মূর্তিটা কুকুরটাকে মারল না, মাটিতে ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা ডাকতে-ডাকতে ছুটে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু লোহার বাক্সটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তিনি লাথি ছুঁড়তে পারবেন না, কুকুরটা যদি ঝাঁপিয়ে কামড়াতে আসে, তিনি দু'হাত দিয়ে আটকাবেন।

কুকুরটা খানিকটা এসেই আবার ফিরে গেল মূর্তিটার কাছে। সেখানে কয়েকবার ডেকে আবার এদিকে ফিরল। তখন মূর্তিটাও এক পা এক পা করে আসতে লাগল এদিকে। কাকাবাবু প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

মূর্তিটা দুলে দুলে আস্তে আস্তে হাঁটে। সোজা এদিকেই আসছে। আলোর ধোঁয়াটা ওর পেছনে বলে কাকাবাবু ওর মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

কুকুরটা কাকাবাবুর একেবারে সামনে এসে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কাকাবাবু সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। আর লুকোবার কোনও উপায় নেই, প্রাণীটা আসছে তাঁরই দিকে। তাঁর থেকে পাঁচ-ছ' হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাকাবাবু রিভলভারটা সোজা তুলে ধরলেন প্রাণীটার বুকের দিকে। প্রাণীটা তাঁর চেয়েও লম্বা। কিন্তু যত বড় বাঁদরই হোক রিভলভারের এক গুলিতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবেই। প্রাণীটা এক দৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বিকট একটা আওয়াজ করল। অনেকটা যেন অট্টহাসির মতন। কাকাবাবু ওর চোখ থেকে চোখ সরালেন না। প্রাণীটার চোখ দুটো গোল ধরনের, ভুরু নেই। সারা গায়ে বাঁদরের চেয়েও বড় বড় লোম। হাত দুটো খুব লম্বা।

প্রাণীটা দু'হাত তুলে আবার একটা ভয়ংকর চিৎকার করে এগোতে লাগল কাকাবাবুর দিকে। স্পষ্টই সে কাকাবাবুকে আক্রমণ করতে চায়। কাকাবাবু খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। এটা যদি ইয়েতি হয়, এটাকে মেরে ফেলা উচিত নয়। পৃথিবীর কেউ কখনও জ্যান্ত ইয়েতি ঠিকমতন দেখেনি। রহস্যময় প্রাণী

হিসেবে একে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু কাকাবাবুর নিজের প্রাণও তো বাঁচাতে হবে। তিনি ওকে একেবারে না মেরে পায়ে গুলি মেরে আহত করবেন ভাবলেন। সেই আওয়াজেও ও ভয় পাবে। রিভলভারের নলটা একটু নিচু করে তিনি ট্রিগার টিপলেন।

কিন্তু গুলি বেরুল না, শুধু খট করে একটা আওয়াজ হল। কাকাবাবু ব্যস্তভাবে আবার ট্রিগার টিপলেন, এবারও গুলি বেরুল না। সেই এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর রিভলভারে গুলি নেই। একটা ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল তাঁর শরীরে।

॥ ১৬ ॥

কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে— দুপুরবেলা তাঁর রিভলভারে গুলিভরা ছিল। কিন্তু এখন ওটার মধ্যে একটাও গুলি নেই। কেউ গুলি বার করে নিয়েছে।

বাঁদরের মতন প্রাণীটা খুব কাছে এগিয়ে এসেছে বলে কাকাবাবু প্রাণপণ শক্তিতে খালি রিভলভারটাই ছুঁড়ে মারলেন প্রাণীটার মাথা লক্ষ করে।

সেটা লাগলে নিশ্চয়ই প্রাণীটার মাথা ফেটে যেত। কিন্তু প্রাণীটা তার আগেই চট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে খুব কায়দা করে লুফে নিল রিভলভারটা। তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীভৎসভাবে হাসির মতন শব্দ করল।

কাকাবাবু কয়েক পলক স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। তারপর তিনিও খুব জোরে হেসে উঠলেন হো-হো করে।

জন্তুটা কাকাবাবুর হাসি শুনে যেন একটু চমকে গেল। কুকুরটা পর্যন্ত ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল খানিকটা। জন্তুটা কাকাবাবুর দিকে চেয়ে মাথা দোলাতে লাগল একটু একটু। তারপর আবার একটা বিকট শব্দ করে দু'হাত উঁচু করে কাকাবাবুর গলা টিপে দেবার জন্য এগোতে লাগল।

কাকাবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জন্তুটা খুব কাছে আসতেই তিনি নিজেই আগে খপ করে চেপে ধরলেন ওর এক হাত। তারপর এক হ্যাঁচকা টান দিলেন।

কাকাবাবুর একটা পা দুর্বল, কিন্তু তাঁর দু'হাতে অসুরের মতন শক্তি। সেই হ্যাঁচকা টানে টাল সামলাতে না পেরে সেটা একেবারে কাকাবাবুর গায়ের ওপরে এসে পড়ল। কাকাবাবু প্রবল শক্তিতে জন্তুটাকে তুলে একটা আছাড় মারতে চাইলেন, কিন্তু তার আগেই জন্তুটা কোনওক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল। আর ক্রুদ্ধ আওয়াজ করতে লাগল ভয়ংকরভাবে।

কাকাবাবুর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়ু আর মিঃ কেইন শিপটন, আই প্রিজিউম ?"

জন্তুটা আওয়াজ করে থামল। তারপর সেও ইংরেজিতে উত্তর দিল, "ইউ আর রঙ, মিঃ রায়চৌধুরী।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যেই হোন, দয়া করে ঐ মুখোশ আর ধড়াচূড়াগুলো খুলে ফেলবেন ! তা হলে কথা বলার সুবিধে হয়।"

লোকটি মাথার পেছন দিকে হাত দিয়ে কিছু করতেই বাঁদর কিংবা ইয়েতির মুখোশটা খুব সহজেই খুলে গেল। কিন্তু তখনও লোকটির মুখে আর-একটি মুখোশ। একটা হলদে রঙের পলিথিন বা ঐ জাতীয় কোনও কিছুর মুখোশ মুখের সঙ্গে সাঁটা। চোখে চশমা, কিন্তু তার কাচ দুটো রুপোর মতন ঝকঝকে। লোকটির পোশাকের রংও হলদে আর খুব টাইট পোশাক। লোকটি খুব বেশি লম্বা নয়। কিন্তু বাঁদরের চামড়ার মধ্যে তাকে বেশি লম্বা দেখাচ্ছিল, সম্ভবত উঁচু জুতোর জন্য।

কাকাবাবু মুখে খানিকটা বিরক্তির ভাব এনে বললেন, "এরকম অদ্ভুত পোশাকের মানে কী ? আপনি বুঝি মুখ দেখাতে চান না ?"

লোকটি কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "একটা বাঁদরের পোশাক পরে ইয়েতি সেজে আপনি আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন ? আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছেন ? আমি যখন অজ্ঞান হয়েছিলাম, তখন আপনি বা অন্য কেউ আমার রিভলভার থেকে গুলি বার করে নিয়েছেন, সেটাও আমাকে ঠকাবার জন্য, তাই না ?"

লোকটি কোমরে দু'হাত দিয়ে চুপ করে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাকাবাবু এবার বেশ কড়া গলায় বললেন, "আমাকে এখানে জোর করে ধরে আনা হয়েছে কেন ? আপনি কে ?"

লোকটি এবার ছোট করে একটু হাসল। তারপর বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, মনে হচ্ছে, আমিই আপনার হাতে ধরা পড়েছি। আর আপনি আমায় জেরা করছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমায় কেন ধরে এনেছেন, তা জিজ্ঞেস করব না ? আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?"

লোকটি বলল, "আপনি বিখ্যাত লোক, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনার নাম অনেকেই জানে।"

লোকটি পকেট থেকে একটি ছোট্ট রুপোলি রঙের রিভলভার বার করে খেলা করার মতন দু' তিনবার লোফালুফি করল। তারপর হঠাৎ সেটা সোজা উঁচিয়ে ধরল কাকাবাবুর দিকে। আস্তে আস্তে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, এটাতে কিন্তু গুলি ভরা আছে। আর এর একটার বেশি গুলি খরচ করতে হয় না।"

কাকাবাবু একটুও ভয় না পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটি

ট্রিগারে আঙুল রেখে বলতে লাগল, "ওয়ান, টু, থ্রি..."

কাকাবাবু আবার বেশ জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "কেন, এরকম ছেলেমানুষির মতন ব্যাপার করছেন বারবার ? আপনি কি ভাবছেন, এইভাবে ভয় দেখিয়ে আমায় কাবু করবেন ? মৃত্যুভয় থাকলে কেউ খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয় পাহাড়ে চড়তে আসে ?"

এইসময় দূরে আবার সেই মাইক্রোফোনে কথা বলার মতন আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। কেউ ইংরেজিতে কতকগুলো অক্ষর আর সংখ্যা বললে।

লোকটি মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর রিভলভারটা নামিয়ে বলল, "সত্যিই, এরকমভাবে আপনাকে ভয় দেখানো যাবে না। তাছাড়া ভয় পাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। মুখে তার ছাপ পড়ে। আপনাকে আমরা খুব ভদ্রভাবে, আস্তে আস্তে, অনেক সময় নিয়ে, মেরে ফেলব।"

কাকাবাবু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "আপনারা আমাকে খুন করবেন ?"

লোকটি বলল, "তাছাড়া আর উপায় কী, বলুন ? আপনি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছেন।"

"আমাকে খুন করা শক্ত। এর আগে অনেকে চেষ্টা করেছে। কেউ তো পারেনি।"

"আমি দুঃখিত, মিঃ রায়চৌধুরী, এখান থেকে জীবিত অবস্থায় বেরুবার সত্যিই কোনও উপায় নেই আপনার। আপনি বেশি কৌতূহল না দেখালে আপনাকে এভাবে মরতে হত না।"

"আমাকে যদি মারতেই হয়, তাহলে শুধু শুধু দেরি করছেন কেন ? আর এত কথাই বা বলছেন কেন ?"

"জানেন তো, খুব ভয় পেলে অনেকে হার্টফেইল করে। ভয় দেখিয়ে আপনাকে মেরে ফেলতে পারলে আমাদের অনেক সুবিধে হত।"

"ভয় দেখিয়ে মানুষ মারাই যদি আপনার শখ হয়, তাহলে আপনি বা আপনারা ভুল লোককে বেছেছেন।"

"হা-হা-হা, মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি খুব চালাকের মতন কথা বলেন। আপনার সত্যিই মনের জোর আছে। আপনাকে এক্ষুনি মেরে ফেলা হচ্ছে না, তার কারণ, আপনি জানেন কি, মৃতদেহও কথা বলে ?"

"কী ?"

"মনে করুন, আপনাকে গুলি করে কিংবা মাথায় ডাণ্ডা মেরে কিংবা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হল। তারপর আপনার মৃতদেহটা নিয়ে কী করা হবে। বুঝতেই পারছেন, এটা—"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "দেখুন ক্রাচ ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে আমার একটু অসুবিধে হয়। আমি একটু বসতে পারি কি ?"

তারপর কাকাবাবু লোহার বাক্সটার ওপর বসে পড়ে কোটের পকেট থেকে

পাইপটা বার করলেন। কিন্তু পাইপের তামাক যে পাউচটায় থাকে, সেটা পেলেন না। অন্য পকেটগুলো হাতড়েও দেখলেন, তামাকের পাউচটা নেই।

লোকটি বলল, "দুঃখিত, এখানে ধূমপান নিষেধ। সেই জন্যই আপনার পকেট থেকে তামাকটা বার করে নেওয়া হয়েছে।"

কাকাবাবু শুধু পাইপটাই দাঁতে কামড়ে ধরে খুব শান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, তারপর বলুন, আমার মৃতদেহটা নিয়ে কী করা হবে ?"

লোকটি বলল, "বুঝতেই পারছেন, এই জায়গাটা মাটির নীচে। সেইজন্যই এখানে ধূমপান চলে না। আপনার মৃতদেহটা এখানে রাখা যাবে না, কারণ পচে গিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরুবে। সেইজন্য আপনার মৃতদেহটা ওপরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে। একদিন না একদিন কেউ সেটা খুঁজে পাবেই। ওপরে ঠাণ্ডায় বরফের মধ্যে মৃতদেহ সহজে নষ্ট হয় না। কেউ খুঁজে পাবার পরই আপনার মৃতদেহ কথা বলে উঠবে।"

কাকাবাবু বললেন, "অর্থাৎ আমার মৃতদেহটি পোস্টমর্টেম করলেই ধরা পড়ে যাবে যে কীভাবে আমায় মারা হয়েছে। বিষ খাইয়ে, নয় গুলি করে। না মাথায় হাতুড়ি মেরে।"

"ঠিক তাই। আপনি বুদ্ধিমান, আপনাকে বেশি বোঝাতে হয় না। ঐরকম অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু দেখলেই সরকারের সন্দেহ হবে, তখন এই জায়গাটায় খোঁড়াখুঁড়ি বাড়বে। আমরা এখানে বেশি লোকজনের আসা যাওয়া পছন্দ করি না। সেইজন্যই স্বাভাবিক মৃত্যুই সবচেয়ে সুবিধাজনক। দু'তিনমাস বাদে আপনার স্বাভাবিক মৃতদেহটা যদি কেউ খুঁজে পায়, যাতে আপনাকে খুন করার কোনও চিহ্ন নেই, তাহলে আর কেউ কোনও সন্দেহ করবে না। ভাববে, আপনি পাহাড়ের মধ্যে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। কী, ঠিক নয় ?"

"হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দিন তো! আমি স্বাভাবিকভাবে দু'তিনমাসের মধ্যে মরতে যাব কেন ? আমার তো আরও অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছর বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে !"

"হা-হা-হা ! বাঁচতে কে না চায় ! আপনিও নিশ্চয়ই আরও তিরিশ-চল্লিশ বছর বাঁচতে পারতেন, যদি আপনি কলকাতায় থাকতেন, কিংবা দার্জিলিং বেড়াতে যেতেন কিংবা আর-কিছু করতেন। এখানে এসে আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে কে বলেছিল ? কেনই বা আপনি গম্বুজটার ওপরে রাত জেগে চোখে দূরবিন এঁটে বসে থাকতেন ?"

"হুঁ, আমার সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছুই জানেন দেখছি। আমার পেছনে আপনারা কোনও চর লাগিয়েছিলেন। কিংবা আমি ওয়্যারলেসে যে খবর পাঠাতাম, সেটা আপনারাও শুনে ফেলেছেন। কিন্তু যাই বলুন, দু' তিনমাসের মধ্যে আমার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর কোনও আশা নেই।"

"আছে, আছে, মিঃ রায়চৌধুরী, আছে। আপনাদের দেশ ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে

বেশি লোক খুব স্বাভাবিকভাবে কেন মরে বলুন তো ?”

“এবার বুঝলাম ! আপনারা আমাকে না খাইয়ে মারতে চান।”

“না, না, না, না—একেবারে না-খাইয়ে নয়। কিছু খেতে দেব। আপনাদের দেশের বেশিরভাগ লোকেই শুধু একবেলা খায়। আপনিও একবেলা খেতে পাবেন। দু'খানা টোস্ট। একটি পাঁচ বছরের শিশুকে যদি শুধু দু'খানা টোস্ট খাইয়ে রাখা যায়, তা হলে সে তিনমাসের বেশি বাঁচে না। আপনার মতন একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ দেড়মাস দু'মাসের বেশি পারবেন না।”

“যে চীনা ভদ্রলোকটিকে আপনারা গম্বুজের দরজার পাশে রেখে এসেছিলেন, তাকেও ঐভাবেই মেরেছেন ?”

“ওরে বাবা, ঐ চীনা ভদ্রলোক এক অদ্ভুত মানুষ। আপনি বিশ্বাস করবেন কি, মাত্র দু'খানা করে টোস্ট খেয়ে উনি আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন ? অতি নিরীহ, শান্তশিষ্ট ভালমানুষ, কখনও গোলমাল করতেন না। আমরা ওঁকে পছন্দই করতাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাঁকে আমরা কিছুতেই বাইরে যেতে দিতে পারি না—”

“আশ্চর্য !”

“সত্যি আশ্চর্য নয় ? মাত্র দু'খানা করে টোস্ট খেয়ে আড়াই বছর...”

“তা তো বটেই। কিন্তু আমি ভাবছি, আপনারা আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে আছেন ?”

“আমরা ঠিক কতদিন এখানে আছি, আন্দাজ করুন তো ?”

কাকাবাবু দাঁত দিয়ে পাইপটাকে কামড়াচ্ছিলেন। এবার সেটাকে মুখ থেকে নামিয়ে ফেললেন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। মন দিয়ে কিছু চিন্তা করার সময় পাইপের ধোঁয়া না টানলে তাঁর চলে না। তিনি পাইপটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললেন, আজ থেকে পাইপ টানা ছেড়ে দিলাম। কলকাতার বাড়িতে যে আট-ন'টা পাইপ আছে, সেগুলোও অন্য লোকদের দিয়ে দেব।

কুকুরটা খানিক আগে চলে গিয়েছিল, এই সময় আবার ফিরে এল। এবার কিন্তু সে আর কামড়াবার চেষ্টা করল না কাকাবাবুকে। কুঁইকুঁই করে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কাকাবাবু আস্তে করে তার মাথা চাপড়ে দিলেন, কুকুরটা সরে গেল না।

মুখোশ-পরা লোকটি বলল, “আপনি খোঁড়া বলেই আপনাকে বেঁধে রাখা হয়নি, আপনি বেশি দূর যেতে পারবেন না। এক পায়ে লফিয়ে লাফিয়ে আপনার পক্ষে বেশি ঘোরাঘুরি না করাই ভাল। আপনাকে বিছানা পাঠিয়ে দেব, শুয়ে থাকবেন।”

কাকাবাবু বললেন, “ধন্যবাদ। আমার বিছানায় দুটো বালিশ লাগে।”

“ঠিক আছে, কোনও অসুবিধে নেই। রবারের বালিশ, সেটা ফুলিয়ে আপনি যত ইচ্ছে উঁচু করে নেবেন। আর কিছু ?”

"এই কুকুরটা আমার গ্লাভস চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"ফেরত পাবেন। আর...ইয়ে, আপনার টোস্ট দু'খানি কি আপনি কড়া চান, না নরমভাবে সেঁকা ?"

কাকাবাবু এক মুহূর্তের মধ্যে কুকুরটাকে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারলেন লোকটির মুখের ওপর। এবং সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় চোখের নিমেষে সামনে ঝুঁকে পড়ে লোকটির একটা পা ধরে মারলেন এক হ্যাঁচকা টান।

তাল সামলাতে না পেরে লোকটি দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল।

॥ ১৭ ॥

সন্তু সারা রাত না ঘুমিয়ে ছটফট করল। কাকাবাবু কী করে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। মানুষ কখনও অদৃশ্য হতে পারে না। কাকাবাবু নিশ্চয়ই কোনও খাদের মধ্যে পড়ে গেছেন। অথচ, সেখানে কাছাকাছি কোনও খাদের চিহ্নও নেই।

মাঝে মাঝে তন্দ্রার মধ্যে সন্তু একটা স্বপ্নই দেখতে লাগল বারবার। সে নিজে যেন বরফের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে, তারপর এক সময় তার পা ঠেকে যাচ্ছে লোহার পাতের মতন কোনও শক্ত জিনিসে।

তারপর তন্দ্রা ভেঙে গেলেই সন্তুর মনে হয়, এটা তো স্বপ্ন নয়, সত্যি। সে সত্যিই তো একবার বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল এই রকমভাবে।

ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সে মিংমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

মিংমা ঘুমোয় একেবারে পাথরের মতন, আবার একটু ডাকলেই সে তড়াক করে উঠে বসে। দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, সন্তু সাব, তুমি নিদ যাওনি ?"

সন্তু বলল, "মিংমা, কাকাবাবু যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সে জায়গাটা তুমি তো খুঁড়ে দেখলে। সেখানে পাথর ছিল, লোহার মতন কিছু দেখতে পাওনি ?"

মিংমা বলল, "না, সন্তু সাব, শুধু পাথরই ছিল।"

"আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না ! আচ্ছা মিংমা, আমি একদিন যেখানে বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম, সেই জায়গাটা তোমার মনে আছে ?"

"সেখানে তো একটা রুমালের নিশানা রেখে এসেছিলাম, কী জানি সেটা বরফে চাপা পড়ে গেছে কি না। বাতাসেভি উড়ে যেতে পারে।"

"চলো, এক্ষুনি সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে !"

"কিন্তু আংকলসাব যেখান থেকে গায়েব হয়ে গেলেন, সেখান থেকে তো ও জায়গাটা বহুত দূরে !"

" তা হোক ! তবু সে জায়গাটা পেলেই আমার চলবে।"

“সন্তু সাব, আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। বরফকা নীচে পে পাত্থর থাক কি লোহা থাক, তাতে কী ফারাক আছে ?”

“বরফের নীচে পাথরই থাকে, লোহা থাকে না। যদি লোহার পাত থাকে, সেটা অস্বাভাবিক। সেটা ভাল করে দেখা দরকার। চলো, শাবল-গাঁইতি নিয়ে আমরা এখুনি বেরিয়ে পড়ি।”

“এখুনি ? আগে হেলিকপটার আসুক। রানা সাব আর ভার্মা সাব ওয়াপস আসবেন বলেছেন।”

“ওদের আসতে যদি দেরি লাগে ? তার আগে চলো, আমরা জায়গাটা খুঁজে দেখি !”

“তার আগে একটু চা খেয়ে নিই কম সে কম ? এতনা ঠাণ্ডার মধ্যে একটু চা না খেলে যে হাত-পা চলবে না !”

“তাহলে তাড়াতাড়ি চা বানাও !”

গম্বুজের মধ্যে জিনিসপত্র সবই আছে। স্পিরিট স্টোভ জ্বেলে মিংমা গরম জল চাপিয়ে দিল।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে লাফাতে লাগল জোরে জোরে। এতে শরীরের আড়ষ্টতা কাটে, খানিকটা গা গরম হয়।

একবার সে ভাবল, মিংমার চা তৈরি হতে হতে সে বাইরে গিয়ে একটু ছুটে আসবে গম্বুজটার চারদিকে।

সে গিয়ে গম্বুজটার দরজা খুলতে যেতেই মিংমা বলল, “দাঁড়াও সন্তু সাব, একেলা যেও না, আমরা দু'জনে সাথ সাথ বাইরে যাব।”

সন্তু বলল, “আমি বেশিদূর যাচ্ছি না, এই বাইরে একটুখানি !”

সন্তু লোহার দরজাটা খুলল। তারপর খুব সাবধানে মুখ বাড়াল বাইরে। এখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি, বাইরে নরম, ঠাণ্ডা আলো। দূরে কালাপাথর পাহাড়টার রং এখন লালচে হয়ে গেছে।

দরজাটা ভাল করে খুলে সন্তু এক পা বাইরে এসে দাঁড়াল। কেন যেন অকারণেই তার গা ছমছম করছে। চারদিক এমন নিস্তব্ধ বলেই বুঝি ভয় হয়। রাত্তির বেলাও কোনও শব্দ শোনা যায়নি।

ডান দিকে তাকিয়েই সন্তু চমকে উঠল। গম্বুজের পাশের চাতালে একগাদা মুর্গির পালক ছড়ানো। শুধু পালক নয়, চোখ আর চামড়া সমেত মুর্গির মুণ্ডুও দু-তিনটে।

সন্তু চাপা গলায় ডাকল, “মিংমা—”

তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সে দৌড়ে চলে এল ভেতরে। মিংমা তখন চা ছাঁকতে শুরু করেছে। সন্তুকে দৌড়ে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, “কেয়া হুয়া ?”

সন্তু বলল, “পালক, অনেক পালক...”

মিংমা কিছুই বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে সন্তু সাব ? পালক ? কিসকা পালক ? পালক দেখে তোমার ডর লাগল ?"

সন্তু বলল, "মুর্গির পালক। এখানে এল কী করে ? কারা যেন মুর্গির গলা মুচড়ে মেরেছে !"

মিংমা প্রথমে মাথা নিচু করে একটু ভাবার চেষ্টা করল। তবু ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "চা ঠাণ্ডা হো জায়গা। আগে চা পিয়ে লাও !"

সন্তু চায়ের গেলাসটা ধরে রাখতে পারছে না, এমনই হাত কাঁপছে তার ! সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন ভুতুড়ে লাগছে। সে হলফ করে বলতে পারে, কাল বিকেল পর্যন্ত ওখানে কোনও মুর্গির পালক ছিল না। তাছাড়া এই বরফের দেশে মুর্গির পালক আসবেই বা কী করে ?

চায়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দশেক বিস্কুট খেয়ে ফেলল মিংমা। তারপর প্রায় বিড়ির সমান একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে আরামে দুবার টান দিয়ে বলল, "এবার চলো তো সন্তু সাব, দেখি কোথায় তোমার মুর্গির পালক।"

সন্তু আর মিংমা বেরিয়ে এল বাইরে। হাওয়ায় মুর্গির পালকগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। আস্ত মুণ্ডু থেকে চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনে হয় কেউ যেন ওদের গলা টিপে মেরেছে।

মিংমা একটা ছোট্ট শিস দিয়ে বলল, "বড়ি তাজ্জব কী বাত ! ইধার মুর্গা কোউন লায়ে গা ? জিন্দা মুর্গা !"

তারপর তারা দুজনেই একসঙ্গে পরের জিনিসটি দেখতে পেল। বরফ মেশা বালিতে টাটকা পাঁচ-ছটা খুব বড় পায়ের ছাপ ! দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকাল, একটাও কথা না বলে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দৌড়ে ফিরে এল গম্বুজটার মধ্যে। মিংমা দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। নিজের বুকের ওপর এক হাত চেপে ধরে বলল, "ইয়েটি ! ইয়েটি ! ইয়েটি !"

সন্তু বলল, "আমাদের কাছে রিভলভার নেই, কোনও অস্ত্র নেই !"

মিংমা আবার বলল, "ইয়েটি ! ইয়েটি !"

সন্তু বলল, "ইয়েতি মুর্গি খায় ! কিন্তু এখানে মুর্গি পেল কী করে ?"

মিংমা খানিকটা দম নিয়ে বলল, "হেলিকপটার নেহি আনে সে...আমরা বাহার যেতে পারব না !"

সন্তু বলল, "ইয়েতিটা কি এখনও এখানে আছে ? কোনও সাড়া-শব্দ শুনতে পাইনি। আচ্ছা মিংমা, ইয়েতি কি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ? মানে, ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে ?"

মিংমা একটা হাত ঘুরিয়ে বলল, "কেয়া মালুম !"

তারপর আরও ঘণ্টা-দেড়েক ওরা রইল গম্বুজের মধ্যে বন্দী হয়ে। দুজনেই বসে থাকল ওপরে জানলাটার কাছে ঠেসাঠেসি করে, কিন্তু হেলিকপটারের

কোনও পাত্তা নেই। ইয়েতিরও কোনও চিহ্ন নেই। সেটা কি লুকিয়ে আছে ওদের ধরবার জন্য ?

সন্তুর আস্তে আস্তে ভয় কেটে গেল। একসময় তার মনে হল, এরকমভাবে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে বাইরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করাও অনেক ভাল। এর আগে সে যত ইয়েতির গল্প পড়েছে, তাতে কোনও ইয়েতিই কিন্তু মানুষকে মারেনি। ইয়েতি মানুষের কাছে দেখা দিতে চায় না। এখানকার ইয়েতি রাত্তিরবেলা গম্বুজের ধারে বসে মুর্গি খেয়ে গেছে, কিন্তু ওদের কোনওরকম বিরক্ত করেনি।

সন্তু বলল, "মিংমা চলো, বাইরে যাই !"

মিংমা বলল, "আভি ? দাঁড়াও, হেলিকপটার জরুর আসবে।"

সন্তু তাকে কিছু না বলে নেমে গিয়ে খুলে ফেলল গম্বুজের দরজাটা। মিংমাও নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী করছ, সন্তু সাব ?"

সন্তু কোনও উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। সে লক্ষ করল, ভয়ে তার বুক কাঁপছে না আর। সে দৌড়ে গোল করে ঘুরে এল গম্বুজটা। সেখানে কেউ নেই।

সন্তু এবার বলল, "মিংমা, সেই জায়গাটা খুঁজতে যাবে ?"

মিংমা বলল, "কোন জায়গা ?"

"যেখানে তুমি রুমালের নিশানা রেখেছিলে।"

"আর একটু ঠারো। হেলিকপটার এসে যাক !"

"না, আর আমার দেরি করতে ভাল লাগছে না। তুমি যাবে তো চলো।"

সন্তু গম্বুজের মধ্যে ঢুকে একটা স্নো-অ্যাক্স নিয়ে বেরিয়ে এল। সে যাবেই দেখে মিংমাও অগত্যা জিনিসপত্র নিয়ে আসতে লাগল তার পিছু পিছু। সন্তু সোজা হাঁটছে দেখে মিংমা এক সময় বলল, "ডাহিনা, ডাহিনা চলো, সন্তু সাব।"

অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করল ওরা দু'জনে। কোথাও সেই লাল রুমালের চিহ্ন নেই। ইয়েতির ভয়ে ওরা বারবার পেছন ফিরে চেয়ে সব দিক দেখে নিচ্ছে। আকাশে আজ বেশ চড়া রোদ, সব দিক পরিষ্কার, এর মধ্যে কারুর কোথাও লুকিয়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সন্তুর বারবার মনে হচ্ছিল, হয়তো এই বিশাল প্রান্তরের মধ্যে সে কোথাও কাকাবাবুকে শুয়ে থাকতে দেখবে। কাকাবাবু তো আর সত্যিই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন না।

এক জায়গায় এসে মিংমা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সে যেন ঠিক বিপদের গন্ধ পায়। সন্তুর হাত চেপে ধরে সে বলল, "আউর যাও মত ! খতরা হ্যায় !"

সেখানে বরফের ওপর শুয়ে পড়ল সে। তারপর হাতটা লম্বা করে জোরে একটা গাঁইতির ঘা দিল। অনেকখানি বসে গেল গাঁইতিটা। বুঝতে কোনও ভুল হয় না যে ঐ জায়গাটা ফাঁপা !

সন্তু দারুণ উত্তেজনা বোধ করল। পেয়েছে, এবার তারা ঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে। এই জায়গাটাতেই সন্তু বরফের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল সেদিন।

মিংমা এদিক-ওদিক গাঁইতি চালিয়ে বুঝে নিল, ঠিক কতখানি জায়গা ফাঁপা সেখানে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বরফ কোপাতে লাগল, সন্তুও যোগ দিল তার সঙ্গে।

এখানে একটু পরিশ্রম করলেই নিশ্বাসের কষ্ট হয়। এমনিতেই এখানকার বাতাস বেশ ভারী। খানিকক্ষণ কুপিয়েই সন্তু বেশ হাঁপিয়ে গেল। কিন্তু মিংমার কী অসাধারণ শক্তি, সে কিছুতেই ক্লান্ত হয় না। এর মধ্যে সে বেশ একটা বড় চৌবাচ্চার মাপে গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। তারপর সে গর্তের এক পাশ থেকে ঝুঁকে নীচে গাঁইতি চালাতে লাগল। একসময় সে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার মধ্যে।

আরও কয়েকবার বেশ জোরে গাঁইতি চালাবার পর মিংমা মুখ তুলে সন্তুকে বলল, "তুম ঠিক বোলা, সন্তু সাব নীচে লোহা হ্যায় !"

সন্তুও তখন লাফিয়ে নেমে পড়ল গর্তটার মধ্যে। দু'জনে মিলে আরও খানিকটা বালি-মেশানো বরফ সরিয়ে ফেলার পর দেখা গেল, সেখানে পাতা রয়েছে একটা লোহার পাত। কিন্তু তাতে কবজা কিংবা গুপ্ত দরজা কিছুই নেই।

সন্তু বলল, "এখন দেখা দরকার, এই লোহার পাতটা কত বড় ! এখানে বরফের তলায় কে এরকম লোহার পাত রাখবে ? কোনও অভিযাত্রীদল নিশ্চয়ই এতবড় লোহার পাত বয়ে নিয়ে আসে না !"

মিংমা কপালের ঘাম মুছল বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে। আবার খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে ! লোহার পাতটা কত বড় কে জানে ! লোহার পাতটা দেখে অবশ্য মিংমাও খুব অবাক হয়েছে। একটা কোনও দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে তার মাথার চুল।

আবার নতুন উৎসাহে সে বরফ পরিষ্কার করতে লাগল। লোহার পাতটা বেড়েই চলেছে। কতখানি জায়গা জুড়ে যে একটা পাতা আছে, তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

মিংমা এক সময় জিজ্ঞেস করল, "আউর কেয়া করনা, বোলো সন্তু সাব !"

সন্তুও ঠিক বুঝতে পারছে না। এরকমভাবে আর কতক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি চলবে ? এ তো একজন দু'জন মানুষের কাজ নয়। তবে একটা দারুণ জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে, এটাকে আর হারালে চলবে না কিছুতেই।

এই সময় খ্যার খ্যার শব্দ শোনা গেল হেলিকপটারটার। দূরের আকাশে দেখা গেল একটা কালো বিন্দু। মিংমা আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, "আ গয়া ! আ গয়া !"

কিন্তু আর কিছু বলতে পারল না মিংমা। ওরা আগে লক্ষই করেনি যে,

লোহার পাতটার এক জায়গায় চুলের মতন সরু দাগের জোড়া আছে। সেই জায়গাটা ফাঁক হয়ে একটা দিক ঢালু হয়ে যেতেই সন্তু গড়িয়ে পড়ে গেল নীচের অন্ধকারে। মিংমাও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তারই মধ্যে সে দু' হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল খাদের ওপরটা।

দুটো লোহার পাতের মাঝখানে আটকে গেল মিংমার পায়ের তলা থেকে কোমর পর্যন্ত। সে যন্ত্রণায় আঁ-আঁ করে আর্তনাদ করতে লাগল।

॥ ১৮ ॥

কাকাবাবু রিভলভারটা তুলেই দেয়ালের দিকে সরে গেলেন। তারপর রিভলভারটা টিপ করে রাখলেন লোকটির মাথার দিকে।

পড়ে যাবার পর লোকটি কোনও শব্দও করল না, একটুও নড়ল না। একই জায়গায় পড়ে রইল, উপুড় হয়ে। কাকাবাবু ভাবলেন, পাথরে মাথা ঠুকে কি অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটি? কিন্তু অত জোরে তো পড়েনি! ও অন্য কোনও কায়দা করার চেষ্টায় আছে?

কাকাবাবু কঠোরভাবে বললেন, "আপনি উঠে বসুন, তারপর আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন। কোনওরকম ছেলেমানুষি করতে যাবেন না, আমার টিপ খুব ভাল, এক গুলিতে আপনার মাথাটা ছাতু করে দিতে পারি।"

লোকটি তবু নড়ল না।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেই সে তখন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাকাবাবু কুকুরটাকে ছুঁড়ে দেবার পরই সেটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। খানিকটা দূরে গিয়ে কুঁই-কুঁই করে ডাকছে। কাকাবাবু সেদিকে মনোযোগ দিলেন না। লোকটির উদ্দেশে আবার বললেন, "আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তার মধ্যে উঠে না বসলে আমি আপনার গায়ে গুলি করব! এক...দুই..."

সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ জোরালো সার্চ লাইটের আলোয় ভরে গেল সুড়ঙ্গটা। এতই জোর আলো যে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল কাকাবাবুর। তিনি এক হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলেন।

লোকটি এবার উঠে বসল আস্তে-আস্তে।

কাকাবাবু তাকে হুকুম দিলেন, "আলোর দিকে পেছন ফিরে বসুন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন না।"

এবার গম-গম করে উঠল মাইক্রোফোনের আওয়াজ। কে যেন একজন বলল, "অ্যাটেনশান প্লীজ! মিঃ রায়চৌধুরী, ক্যান ইউ হীয়ার মি? মিঃ রায়চৌধুরী, আপনার হাতের পিস্তলটা ফেলে দিন! প্লীজ।"

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে কোথায় লাউড স্পীকার ফিট করা আছে। কিছু দেখতে পেলেন না। ভাল করে তাকাতেই পারছেন না তো !

মাইক্রোফোনের আওয়াজে আবার সেই কথাটা ভেসে এল।

কাকাবাবু এবার উত্তর দিলেন, "হু'এভার ইউ আর···সামনে এসে কথা বলুন, আমি এখন পিস্তল ফেলব না।"

মাইক্রোফোনের আওয়াজটা থেমে গেল। হঠাৎ দারুণ স্তব্ধ মনে হল জায়গাটা। মুখোশপরা লোকটি কাকাবাবুর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোন দেশের লোক ?"

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "উত্তর না দিলে আমি গুলি করব !"

লোকটি তবু অবাধ্য ভঙ্গিতে ঝাঁকাল তার কাঁধ দুটো।

এইসময় গটগট শব্দ হতেই কাকাবাবু চমকে তাকালেন। ঠিক একইরকম হলদে মুখোশপরা তিনজন লোক অনেকটা মার্চ করার মতন একসঙ্গে হেঁটে আসছে এদিকে। তাদের হাতে বেশ লম্বা রিভলভারের মতন কোনও অস্ত্র।

তারা কাছাকাছি আসতেই কাকাবাবু বললেন, "সাবধান, আর এগোবেন না ! তাহলে আমি এই লোকটিকে মেরে ফেলব।"

লোকগুলো তবু থামল না, তাদের মধ্যে একজন ইংরেজিতে বলল, "মারুন ! ওকে মারুন !"

চোখ-ধাঁধানো আলোর মধ্যে মুখটা একপাশে ফিরিয়ে কাকাবাবু রিভলভারের নলটা উঁচু করে ট্রিগারে হাত দিলেন।

লোক তিনটি কাকাবাবুর একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, "কই, ওকে মারলেন না ? ট্রিগার টানলেন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষ মারা আমার পেশা নয়। বিশেষত কোনও নিরস্ত্র লোককে অস্ত্র দিয়ে আমি আক্রমণ করি না কখনও !"

সেই লোকটি বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, দয়া করে এখানে গোলমালের সৃষ্টি করবেন না। আপনার ওপর আমরা কোনও অত্যাচার করতে চাই না—"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে ?"

"আপনার কোনও প্রশ্ন করাও চলবে না এখানে। আমরাই প্রশ্ন করব। আপাতত আমরা আপনার চোখ বেঁধে দিতে চাই।"

"না !"

"আমাদের জোর করতে বাধ্য করবেন না।"

"আপনারা দেখছি ভদ্রতার প্রতিমূর্তি ! শুনুন, আমি মানুষ মারার জন্য গুলি চালাই না ঠিকই, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কারুর পা খোঁড়া করে দিতে পারি। আপনারা আমার গায়ে হাত দিলেই আমি এই লোকটির পায়ে গুলি করব।"

"ঠিক আছে, ওকে গুলি করুন না ? খোঁড়া করে দিন ! ওর একটু শাস্তি পাওয়া দরকার !"

আগের লোকটি এবার ভয় পাবার ভঙ্গিতে বলে উঠল, "ওরে বাপ রে, না না ! আমার মাথায় খুব জোর লেগেছে, উনি এত জোর ল্যাং মেরেছেন !"

দু'জন লোক কাকাবাবুর কাঁধে হাত রাখতেই তিনি ওদের ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালালেন। অমনি তাঁর রিভলভারের মধ্যে ঘর-র ঘর-র শব্দ হল আর মুখটায় এক ঝলক আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু গুলি বেরুল না।

লোকগুলি হেসে উঠল হা-হা শব্দে। মাটিতে বসা লোকটিও যোগ দিল সেই হাসিতে।

কাকাবাবু একই সঙ্গে অবাক ও বিরক্ত হয়ে রিভলভারটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

একজন মুখোশধারী বলল, "এবার বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে, ওটা একটা খেলনা পিস্তল !"

কাকাবাবু সেটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "একটা খেলনা পিস্তল দিয়ে আর ইয়েতির পোশাক পরিয়ে এই ক্লাউনটিকে আপনারা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন কেন ? আপনারা কি ভেবেছিলেন, আমার মতন মানুষ এতে ভয় পাবে ?"

তিনজন মুখোশধারীর মধ্যে একজনই সব কথা বলছিল। সে বলল, "আমাদের এখানকার জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই, তাই আপনার সঙ্গে একটু মজা করা হল। আমাদের হাতের এগুলো কিন্তু খেলনা নয় ! দেখবেন ?"

লোকটি সেই রিভলভারের মতন অস্ত্রটা কাঁধের ওপর রেখে পেছন দিকে গুলি চালাল। সাধারণ রিভলভারের থেকে শব্দ হল অনেক বেশি, দেয়ালে গুলি লেগে পাথরের চলটা ছিটকে পড়ল নানান দিকে, তার একটা কাকাবাবুর গায়েও লাগল।

লোকটি এরপর বলল, "নাম্বার সেভেন, উঠে দাঁড়াও, মিঃ রায়চৌধুরীর চোখ দুটো ভাল করে বেঁধে দাও !"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আপনারা আমার চোখ বাঁধতে চাইছেন কেন ?"

"ছিঃ ছিঃ রায়চৌধুরী, ভুলে গেলেন এরই মধ্যে ? বললুম না যে আপনার কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।"

দু'জন লোক কাকাবাবুকে দু'পাশ থেকে ধরে দাঁড় করাল। কাকাবাবু শক্তভাবে বললেন, "আপনারা চারজন মিলে জোর করে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু আমি চোখ খোলা রাখতে চাই। আর আমার ক্রাচ দুটো ফেরত পেলে খুশি হব।"

"আপনি চোখ খোলা রাখতে চান ? আচ্ছা, দেখা যাক, আপনি চোখ খোলা রাখতে পারেন কি না, আমরা জোর করব না !"

লোকগুলি তাদের প্যান্টের পকেট থেকে ঠুলির মতন বিশেষ ধরনের চশমা বার করে নিল। তারপর একজন চেঁচিয়ে বলল, "লাইট!"

তখন আলোটা আরও জোর হয়ে গেল। কাকাবাবু চোখ বুজে ফেললেন। লোকগুলি হেসে উঠল। তাদের দলপতি বলল, "দেখলেন তো, চোখ খোলা রাখতে পারলেন না।"

কাকাবাবু উলটো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "এবার চোখ চাইতে পারছি।"

"কিন্তু আমরা যদি সব সময় এতটা আলো জ্বেলে রাখি, তাহলে আপনি কি শুধু একদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? তা কি হয়?"

"আপনারা আমার চোখ বেঁধে কোথায় নিয়ে যেতে চান?"

"উঁহু, প্রশ্ন নয়, কোনও প্রশ্ন নয়!"

একজন একটা কালো রঙের বালিশের ওয়াড়ের মতন জিনিস গলিয়ে দিল কাকাবাবুর মাথায়। তারপর পেছন দিকটা টেনে ফাঁস বেঁধে দিল।

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমার হাত দুটো বাঁধবেন না?"

"না। তার দরকার নেই।"

"তা হলে এটা তো আমি যে-কোনও সময় গিঁট খুলে দিতে পারি।"

"চেষ্টা করে একবার দেখুন তো। পারশিয়ান নটের কথা শুনেছেন? স্বয়ং আলেকজান্দার পর্যন্ত যে গিঁট খুলতে পারেননি, এ হচ্ছে সেই ধরনের গিঁট।"

"হুঁ, কিছু লেখাপড়া জানা আছে দেখছি। আপনারা শিক্ষিত লোক, অথচ মুখোশ পরে রিভলভার হাতে নিয়ে থাকেন, অর্থাৎ গুণ্ডা, বদমাইসদের মতন কোনও বে-আইনি কাজ করছেন!"

"আপনি অরণ্যদেবের কমিকস পড়েন? অরণ্যদেবও তো মুখোশ পরে থাকেন, তাঁর কাছে রিভলভারও থাকে, কিন্তু তিনি কি গুণ্ডা?"

"ডোনট বি রিডিকুলাস! কোথায় যেতে হবে চলুন! আপনারা আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছেন, কিন্তু আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে আপনারা সবাই ধরা পড়বেন এবং জেলে যাবেন!"

"সত্যি, মিঃ রায়চৌধুরী? আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন?"

"আমি কারুকে মিথ্যে ভয় দেখাই না! ভাল্লুকের ছাল দিয়ে তৈরি ইয়েতির মতন একটা পোশাক পরে লোকদের ভয় দেখান আর খড়মের মতন কোনও জিনিস দিয়ে বরফের ওপর পায়ের ছাপ এঁকে আসেন। এসব ভেলকি বেশিদিন চলে না!"

"তিনদিন পরেই তাহলে আমরা ধরা পড়ে যাব বলছেন? কে ধরতে আসবে?"

"মিলিটারি পুলিশ। আপনাদের এখানে যত বড় দলবলই থাক, তবু কোনও

সরকারের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনাদের নেই !"

"কিন্তু মিলিটারি পুলিশ কী করে আমাদের সন্ধান পাবে ?"

"ইয়েতি যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়, এক পলক দেখা দেবার পরই মিলিয়ে যায়—এসব শুনে আমি বুঝেছিলুম যে, এখানে মাটির নীচে কোনও কাণ্ডকারখানা আছে ।"

"সেকথা বোঝা স্বাভাবিক ! বিশেষ করে আপনার মতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো বুঝবেনই । কিন্তু মিলিটারি পুলিশ বুঝবে কী করে যে মাটির নীচে ঠিক কোন জায়গায় আমরা আছি ? তারা তো সারা হিমালয়টা খুঁড়ে ফেলতে পারে না !"

কাকাবাবু চুপ করে গেলেন ।

দলপতি বললেন, "অর্থাৎ সেকথা আপনি আমাদের বলে দিতে চান না । তাই না ? আমি যদি বলি, আপনি আমাদের মিথ্যেই ভয় দেখাচ্ছেন ! আমাদের সন্ধান বাইরের লোকের পাওয়ার কোনও উপায়ই নেই ।"

কাকাবাবু বললেন, "উপায় নিশ্চয়ই আছে । ধরে নিন যে, আমার একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে । আমি মনে-মনে খবর পাঠাতে পারি । আমি যেখানেই থাকি, আমার বন্ধুরা তা ঠিক টের পেয়ে যায় । আমাকে উদ্ধার করার জন্যই তারা এখানে এসে পড়বে !"

মুখোশধারীরা একসঙ্গে অট্টহাসি করে উঠল ।

দলপতি আবার বলল, "আপনার যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাও আমি জানি । সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ! এবার চলুন, অন্য জায়গায় গিয়ে কথাবার্তা হবে ।"

দু'জন দু'পাশ থেকে ধরে কাকাবাবুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল । কাকাবাবুর একবার মনে হল, ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় আসামীদের এইভাবে চোখমুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু এরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে একথা তাঁর বিশ্বাস হল না ।

একজন মুখোশধারী বলল, "ইস, সত্যিই মিঃ রায়চৌধুরীর ক্রাচ দুটোর কথা খেয়াল করা উচিত ছিল । ওঁর হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে !"

অন্য একজন বলল, "ওঁকে উঁচু করে তুলে নিয়ে যাওয়া যাক !"

কাকাবাবু আপত্তি করার আগেই ওরা সবাই মিলে কাকাবাবুকে শূন্যে তুলে নিয়ে দৌড়তে লাগল । বাধা দেওয়া নিষ্ফল বলে কাকাবাবু চুপ করে রইলেন ।

বেশ খানিকটা যাবার পর ওরা এক জায়গায় এসে থামল, কাকাবাবুকে নামিয়ে দিল মাটিতে । অন্য একজন কেউ বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "মিঃ রায়চৌধুরীকে ঐ চেয়ারটায় বসিয়ে দাও । তারপর খুলে দাও মুখের ঢাকনাটা ।"

কাকাবাবু অনুভব করলেন, ওরা পেছনের দিকে ফাঁসটা খোলার চেষ্টাই করল না, একটা ছুরি দিয়ে চচ্চড় করে চিরে দিল কাপড়টা । পারশিয়ান নটই বটে !

সামনে তাকিয়েই কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "এ কী ?"

॥ ১৯ ॥

কাকাবাবু প্রথমটায় সত্যিকারের ভয় পেয়ে আঁতকে উঠলেন।

পাথর কেটে বানানো হয়েছে একটা চৌকো মতন টেবিল। তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সন্তু। দেখলেই মনে হয়, সে মরে গেছে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দু'জন মুখোশধারী তাঁর হাত চেপে ধরে আছে। কাকাবাবু প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

তিনি ধরা গলায় বললেন, "এ কী ! সন্তু এখানে এল কী করে ? তোমরা সন্তুকে নিয়ে কী করেছ ?"

মুখোশধারীরা কোনও উত্তর দিল না। ডান পাশ থেকে অন্য একজন কেউ বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী। ডু ইউ রেকগনাইজ মী ?"

কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা খুব উঁচু চেয়ারে একজন সাহেব বসে আছে, আগাগোড়া কালো রঙের পোশাক পরা। এর মুখে কোনও মুখোশ নেই। মাথার চুলগুলো টকটকে লাল। তার গলায় ঝুলছে একটা সোনার হার, তাতে ঝুলছে একটা লকেট। লকেটটা আর কিছুই না, মানুষের দাঁতের চেয়েও অনেক বড় একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

কাকাবাবু প্রথমে ভাল করে দেখতে পেলেন না। তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সন্তুকে যে তিনি এত ভালবাসেন, সেটা আগে তেমন ভাবে বোঝেননি। অনেক দুঃখকষ্টেও তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে না। লোকজনের সামনে কাঁদবার মতন মানুষই তিনি নন। কিন্তু এখন তিনি চোখের জলও মুছতে পারছেন না, মুখোশধারীরা তাঁর হাত পেছন দিকে মুড়ে চেপে ধরে আছে।

তিনি ঘৃণার সঙ্গে বললেন, "তোমায় চিনব না কেন ? তুমি কেইন শিপটন। আমার ভাইপোকে তোমরা মেরে ফেলেছ। এইটুকু একটা ছেলেকে মারতেও তোমাদের দ্বিধা হয় না ? তুমি এতবড় খুনী ? ছিঃ !"

কেইন শিপটন হা-হা করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু আবার বললেন, "তোমার বাবাকে আমি চিনতুম। কতবড় লোক ছিলেন তিনি, তাঁর ছেলে হয়ে তোমার এই কাণ্ড ! আমি তোমার সম্পর্কে সব খবর নিয়েছি। অল্প বয়েস থেকেই তোমার হঠাৎ বড়লোক হবার শখ। সেইজন্যই তুমি একবার ভাড়াটে সৈন্য হয়ে আফ্রিকার কঙ্গোতে নিরীহ লোকদের খুন করতে গিয়েছিলে। তারপর এক এভারেস্ট-অভিযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে এখানে এসেছিলে। মিথ্যে মিথ্যে ইয়েতির গল্প রটিয়ে উধাও হয়ে

গিয়েছিলে একদিন। এখানে তুমি কোনও বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার হয়ে কাজ করছ। আমি সব বুঝেছি। তা বলে ঐটুকু একটা ছেলেকে মেরে ফেললে! তোমার কি বিবেক বলে কিছুই নেই? ওর বদলে তো তুমি আমাকে মারতে পারতে! আমিই তোমার আসল শত্রু!"

কেইন শিপটন হাত তুলে বলল, "অনেক কথা বলেছ, এবার থামো রায়চৌধুরী। তোমার এই ভাইপো একটা টেরিবল কিড। আজ পর্যন্ত কেউ যা পারেনি, এমন-কী তুমিও পারোনি, ও তাই পেরেছে। ও আমাদের এই মাটির নীচের বাঙ্কারে ঢোকার দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওর আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক, তবু ওর মৃত্যু বিফলে যায়নি। ও দেশের কাজ করার জন্য মরেছে। ও যখন দরজা আবিষ্কার করে এখানে ঢুকেছে, তখন বাইরে কোনও চিহ্ন রেখে এসেছে নিশ্চয়ই। বাইরে থেকে সাহায্য আসবে, তোমরা সবাই ধরা পড়বে!"

কেইন শিপটন বলল, "ডোন্‌ট বী টু অপটিমিসটিক, রায়চৌধুরী। দরজা আমরা আবার সীল করে দিয়েছি, বাইরে থেকে আর বোঝবার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া তোমার খেলনাটাও কোনও কাজে লাগবে না।"

কেইন শিপটন এবার হুকুমের সুরে বলল, "আনড্রেস হিম!"

অমনি চার-পাঁচজন মুখোশধারী কাকাবাবুকে জাপটে ধরে তাঁর পোশাক খুলে ফেলতে লাগল। বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই বলে কাকাবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাকাবাবুর ওভারকোট, ওয়েস্টকোট, সোয়েটার, শার্ট সব খুলে ফেলার পর একেবারে নীচের উলের গেঞ্জির সঙ্গে লাগানো ছোট যন্ত্র দেখতে পাওয়া গেল। মুখোশধারীরা যন্ত্রটা খুলে নিয়ে দিল কেইন শিপটনের হাতে।

কেইন শিপটন সেটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল, "হুঁ, কিউট লিটল থিং! শোনো রায়চৌধুরী, তুমি গম্বুজে বসে রেডিও টেলিফোনে যে-সব খবর পাঠাতে, সেই সব খবরই আমরা ইনটারসেপ্ট করেছি। তোমার বুকের এই যন্ত্রটায় মাঝে-মাঝে বিপ-বিপ শব্দ হয়, আর সিয়াংবোচির রিসিভিং সেন্টারে সেটা ধরা পড়ে। তার থেকে তারা জানতে পারে, তুমি কখন কোথায় আছ! তুমি আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে এসেছিলে। কিন্তু এটাও আমরা জানতে পেরে গেছি, সেইজন্যই গত চব্বিশ ঘন্টা আমরা সমস্ত ওয়েভ লেংথ জ্যাম করে দিয়েছি, তোমার এই যন্ত্রের পাঠানো আওয়াজ কেউ ধরতে পারবে না, বুঝলে? সুতরাং তুমি এখন কোথায় আছ, তা জানার সাধ্য বাইরের কারুর নেই। ক্লিয়ার?"

কাকাবাবু এর উত্তরে সংক্ষেপে বললেন, "আমার পোশাকগুলো ফেরত পেতে পারি? আমার শীত করছে।"

যদিও মাটির নীচে এই জায়গাটা বেশ গরম, তবু মাঝে-মাঝে এক-এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসছে যেন কোথা থেকে। কাকাবাবু পোশাক পরতে লাগলেন,

মুখোশধারীরা একটু দূরে সরে দাঁড়াল। ওদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে কাকাবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সন্তুকে।

মুখোশধারীরা এসে কাকাবাবুকে আবার ধরে ফেলার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সন্তুর গা গরম। কোনও মরা মানুষের গা এরকম গরম হয় না।

কেইন শিপটন বলল, "হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছে। ছেলেটি ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ওকে ঘুমের ওষুধের ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে, যাতে ও এখানকার কিছুই দেখতে না পায়, কিম্বা বুঝতে না পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। তবে ওকে ঐ রকম হাত-পা ছড়ানো অবস্থায় শুইয়ে রেখেছন কেন? দেখলেই মনে হয় যেন এক্ষুনি ওর পোস্টমর্টেম করা হবে।"

কেইন শিপটন বলল, "ওর ভাগ্য এখন আপনার হাতে নির্ভর করছে। ওকে আমরা মেরে ফেলতে পারি অথবা ওপরে নিয়ে গিয়ে এই অবস্থায় শুইয়ে রেখে আসতে পারি, এখানকার কথা ওর কিছুই মনে থাকবে না।"

কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে লাগলেন। সন্তু এখানে একা এল কী করে? সন্তু যে এখানকার গুপ্ত দরজাটা আবিষ্কার করে ঢুকে পড়েছে, তখন আর কেউ সন্তুকে দেখেনি? সন্তু একা ছিল? রানা, ভার্মা, মিংমা—ওরা সব কোথায় গেল? এরা যদি সন্তুকে একা-একা ওপরে শুইয়ে রেখে আসে এরকম অবস্থায়, তা হলেও কি সন্তু বাঁচবে? এখন দিন না রাত তা বোঝার উপায় নেই। যদি রাত হয়, তা হলে বাইরে ঠাণ্ডায় সন্তু জমে যাবে।

উত্তরে তিনি বললেন, "আমার উপর নির্ভর করছে মানে? এই ছেলেটিকে বাঁচাবার বদলে তোমরা আমার কাছ থেকে কী চাও?"

কেইন শিপটন বলল, "আমাদের এখানকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর দু' মাসের মধ্যে আমরা এ-জায়গাটা ছেড়ে চলে যাব। যন্ত্রপাতি সব বসানো হয়ে গেছে, এই সব যন্ত্র এখন নিজে থেকেই চলবে।"

কাকাবাবু পেছন ফিরে একবার তাকালেন। কাছেই একটা জায়গা গোলভাবে রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বেশ গভীর গর্ত-মতন আছে। সেখান থেকে আবছা নীল রঙের আলো উঠে আসছে, আর হালকা ধোঁয়া ভাসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের যন্ত্রপাতি? গুপ্তচরের কাজের জন্য নিশ্চয়ই! তোমরা কোন দেশের হয়ে কাজ করছ?"

"সেটা তোমার জানবার দরকার নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দু' মাস পরে আমরা এখান থেকে চলে যাব, শুধু একজন লোক এখানে থাকবে। সেই লোকটি কে বলো তো? তুমি!"

"আমি ?"

"হ্যাঁ। তোমাকে আর আমরা ওপরে উঠতে দিতে পারি না। তুমি বড্ড বেশি জেনে গেছ। তোমাকে আমরা খেতে না দিয়ে আস্তে-আস্তে মেরে ফেলতে পারি, অথবা তুমি যদি আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি থাকো, সেটা তোমার পক্ষেই ভাল। খাবার-দাবার এখানে সবই পাবে, বেশ আরামেই থাকবে। তিন-চার মাস অন্তর-অন্তর আমাদের লোক এসে তোমার যা-যা দরকার সব দিয়ে যাবে। শুধু একটা কথা, জীবনে আর কখনও তুমি ওপরে উঠতে পারবে না।

"তুমি মূর্খের মতন কথা বলছ, কেইন শিপটন। ধরো আমি তোমাদের কথায় রাজি হলুম, তারপর তোমরা এখান থেকে চলে গেলেই তো আমি এখানকার সব যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলতে আরম্ভ করব। জেনেশুনে আমি বিদেশি গুপ্তচরদের সাহায্য করব ? কিসের জন্য ? টাকা ? আমি যদি আর কোনওদিন ওপরে উঠতে না পারি, তা হলে টাকা দিয়ে আমি কী করব ?"

"রায়চৌধুরী, এখানকার যন্ত্রপাতি ভাঙবার সাধ্য তোমার নেই। এখানে এমন যন্ত্র আছে, যা ছোঁয়া মাত্র তুমি মরে যাবে !"

"কোনও নিউক্লিয়ার ডিভাইস ?"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি সেটা আগেই বুঝবে।"

"বুঝিনি তবে সন্দেহ করেছিলাম। এখানে যে বিদেশি গুপ্তচরচক্র খুব বড় রকমের একটা কিছু কারবার করছে, এই সন্দেহের কথা আমি ভারত সরকার আর নেপাল সরকারকে বারবার জানিয়েছি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করেনি।"

"সেইজন্যই তুমি একটা ঐ পিকিং-দাঁত সঙ্গে নিয়ে ইয়েতি কিংবা প্রি-হিস্টোরিক ম্যানের সন্ধানের ছুতো করে এখানে এসেছিলে।"

"সেরকম একটা দাঁত তো তুমিও গলায় ঝুলিয়ে রেখেছ !"

"এতে সৌভাগ্য আছে। এটা গলায় ঝোলাবার পর থেকে আমি আর কোনও কাজে ব্যর্থ হইনি।"

"নিছক কুসংস্কার। তোমার মতন সাহেবরাও কুসংস্কার মানে ! আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস, এই রকম দাঁতওয়ালা আদিমকালের কিছু মানুষ এখনও এদিকে কোথাও আছে। কোনও গহন-দুর্গম অঞ্চলে।"

"তাদের খোঁজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলেই পারতে। আমাদের ব্যাপারে নাক না-গলালে তোমাকে এই বিপদে পড়তে হত না। যাই হোক, শোনো। আমরা চলে যাবার পরেও যে এখানে কোনও লোক রাখার দরকার আছে তা নয়। তোমাকে এই প্রস্তাব দিচ্ছি, তার কারণ, এটাই তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তুমি আমাদের সাহায্য না করলে, আমরা তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব কেন ?"

“আমাকে মৃত্যু-ভয় দেখিও না, কেইন শিপটন। একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যত ঘটনা ঘটে, আমার জীবনে অন্তত তার দশগুণ বেশি ঘটনা ঘটেছে। সেই হিসেবে আমি দশবার বেঁচে আছি। এখন যে-কোনও দিন আমার মৃত্যু হলেও আমার কোনও দুঃখ নেই। আমি তোমাদের পরিষ্কার জানিয়ে রাখছি, আমার শেষ নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব তোমাদের ধরিয়ে দেবার। আমার ওপরে তোমরা যতই অত্যাচার করো, তবু তোমাদের মতন ঘৃণ্য গুপ্তচরদের আমি কোনও সাহায্যই করব না! তবে—”

“আরও কিছু বলবে? আজকে আমরা সবাই এখানে বেশ ছুটির মুডে আছি, তাই তোমার এই সব লম্বা-লম্বা লেকচার শুনছি। অন্য দিন আমরা এই সময় খুব কাজে ব্যস্ত থাকি। তবে কী?”

“আমি চাই, এই ছেলেটি বেঁচে থাক। আমার ভাইপো সন্তু, ওর এত কম বয়েস···অবশ্য দেশের কোনও কাজ করতে গিয়ে যদি মরে যায়, তাতে দুঃখ নেই। তোমরা আমাকে এখানে আটকে রাখতে চাও রাখো, কিন্তু ওকে ছেড়ে দাও।”

“কিন্তু তুমি তোমার খোঁড়া পা নিয়েই কারুকে লাথি মারবে, কারুর গলা টিপে ধরবে, এসব ঝামেলা তো আমরা বারবার সহ্য করব না। তুমি যদি আমাদের সাহায্য করতে রাজি না থাকো, তা হলে তোমার হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রাখা হবে।”

“তাই রাখো। কিন্তু এই ছেলেটিকে অজ্ঞান অবস্থায় বাইরে ফেলে রেখে এলে ও বাঁচবে কী করে? তুষারপাত হলেই তো মরা যাবে।”

“সেটা ওর ভাগ্য। বাঁচতেও পারে, মরে যেতেও পারে। ও যেখানে শুয়ে থাকবে, তার পাশে দেখা যাবে ইয়েতির কয়েকটা পায়ের ছাপ। ও যদি কোনও গুহার গল্পও বলে, তা হলে অন্যরা ভাববে সেটা ইয়েতির গুহা। ইয়েতিই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।”

এই সময় কাকাবাবুর চোখ চলে গেল সন্তুর দিকে। সন্তুর চোখের পাতা দুটো যেন কেঁপে উঠল দু' একবার। একটা হাত পাশে ঝুলছিল, সেটা আস্তে বুকের ওপর রাখল।

কেইন শিপটনও এই ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে। সে অমনি ব্যস্ত হয়ে বলল, “কুইক, কুইক, ইঞ্জেকশান দাও! দা কিড মাস্ট নট সি হিজ আঙ্কল হীয়ার।”

দু'জন মুখোশধারী ছুটে গেল একটা ঘরের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে বেরিয়ে এল।

সন্তু এবার একটু পাশ ফিরে কাতরভাবে শব্দ করল, আঃ! তখনও তার চোখ বোজা।

কেইপ শিপটন অন্য মুখোশধারীদের বলল, “শিগগির রায়চৌধুরীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!”

তারা কাকাবাবুকে আবার চেপে ধরতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "না, ওকে আর ইঞ্জেকশান দিও না !"

॥ ২০ ॥

মিংমার মনে হল যেন তার শরীরটা কোমরের কাছ থেকে কেটে দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে। দারুণ যন্ত্রণায় সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল। মাথার ওপর দিয়ে হেলিকপটারটা ঘুরছে, সেদিকে সে একটা হাত নাড়তে লাগল প্রাণপণে, কিন্তু হেলিকপটার থেকে তাকে কেউ দেখতে পেল না।

একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে গেলে মানুষ অনেক সময় এক-একটা অসম্ভব কাজ করে ফেলে। দুদিকের লোহার পাত মিংমার কোমরের কাছে কেটে বসে যাচ্ছে, সেই অবস্থাতেও কোনওক্রমে এক ঝাঁকুনিতে সে ওপরে উঠে এল। সঙ্গে সঙ্গে আবার জুড়ে গেল লোহার পাতটা।

ওপরে উঠে আসার পরই কিন্তু মিংমার আর কথা বলার ক্ষমতাও রইল না, নড়াচড়ার সাধ্যও রইল না। সে দু'তিন পা মাত্র গিয়েই ধপাস করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

হেলিকপটারটা কয়েক চক্কর ঘুরে তারপর নামল বেশ খানিকটা দূরে। তার থেকে তিনজন লোক নেমে এগিয়ে গেল গম্বুজটার দিকে। ভার্মা আর রানার সঙ্গে এবার এসেছেন টমাস ত্রিভুবন। ইনি নেপালি খ্রিস্টান, এক সময় বিদেশি অভিযাত্রী দলগুলির স্থানীয় ম্যানেজারের কাজ করতেন, এইসব জায়গা তাঁর নখদর্পণে। এখন বেশ বুড়ো হয়েছেন, সিয়াংবোচিতেই থাকেন। মাথার চুলগুলো সব সাদা।

গম্বুজের মধ্যে কেউ নেই দেখে ওঁরা অবাক হলেন। ভার্মা বললেন, "আরেঃ, ছেলেটা আর শেরপাটা গেল কোথায় ?"

রানা বললেন, "ওদের তো গম্বুজের মধ্যেই থাকতে বলেছিলাম। ওরা আবার কোনও বিপদে পড়ল নাকি ?"

ভার্মা বললেন, "ঐ কাকাবাবু, মানে মিঃ রায়চৌধুরী একটা পাগল ! নিজের তো প্রাণের মায়া নেই-ই, তাছাড়া, এরকম দুর্গম জায়গায় কেউ একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে আসে !"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "রানা, একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছ ? গম্বুজের বাইরে মুর্গির পালক !"

ভার্মা বললেন, "কাল ওরা দু'জনে এখানে পিকনিক করেছে মনে হচ্ছে।"

রানা বললেন, "কিন্তু ওরা মুর্গি পাবে কোথা থেকে ? এই জায়গায় জ্যান্ত মুর্গি ? স্ট্রেঞ্জ ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ। আরে এদিকে দেখুন। পায়ের ছাপ। কত বড় পায়ের ছাপ !"

ভার্মা বললেন, "ইয়েতি ! এখানে ইয়েতি এসেছিল !"

বলতে-বলতে ভার্মা কোটের পকেট থেকে রিভলভার বার করলেন। তাঁর মুখে দরুণ ভয়ের ছাপ।

টমাস ত্রিভুবন পায়ের ছাপগুলোর কাছে বসে পড়লেন। বিড়বিড় করে বললেন, "এরকম ছাপ আমি আগেও দেখেছি। দু' বছর আগে শেষ যেবার এসেছিলাম, তখন আরও অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছি এখানে···এই জায়গাটায় কিছু একটা রহস্য আছেই।"

রানা গম্বুজের মধ্যে ঢুকে কাকাবাবুর একটা ক্যামেরা নিয়ে এলেন, তারপর পটাপট ছবি তুলতে লাগলেন সেই পায়ের ছাপের।

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "সেবার এসে দেখেছিলাম, এরকম ইয়েটির পায়ের ছাপের পাশে-পাশে একটা ছোট কুকুরের পায়ের ছাপ ! ইয়েটি আছে কি না আমি জানি না, কিন্তু কোনও কুকুর কি এরকম জায়গায় থাকতে পারে ? ইমপসিবল্ ব্যাপার নয় ? এখানেই কোথাও আমি দেখেছিলাম একটা লোহার পাত। রাত্রে খুব বরফ পড়ার পর সেটাকে আর খুঁজে পাইনি !"

ভার্মা বললেন, "লোহার পাত ? হা-হা-হা-হা ! এটা কিন্তু ইয়েতির পায়ের ছাপের চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার ! কোনও অভিযাত্রী টীম কি পাহাড়ের এত উঁচুতে লোহার পাত বয়ে আনবে ? আর কেনই বা আনবে !"

রানা বললেন, "সন্তু নামের ঐ ছেলেটিও কিন্তু লোহার পাতের কথা বলেছিল ! দুজনের কথা মিলে যাচ্ছে !"

ভার্মা বললেন, "সে ছেলেটিও তো বাজে কথা বলেছিল। শুধু-শুধু কতখানি জায়গা খুঁড়ে দেখা হল, কিছু পাওয়া গিয়েছিল ? এই সব পাহাড়ি জায়গায় অনেক রকম চোখের ভুল হয়।"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "আমি আর একটা কথা বলব ? আমার এ কথা অনেকে বিশ্বাস করে না। আমি এই জায়গা দিয়ে অনেকবার গেছি। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, এই গম্বুজটা থেকে কয়েক শো গজের মধ্যে একটা খাদ আর গুহার মতন ছিল। কয়েক বছর ধরে সেই খাদ কিংবা গুহা কিছুই দেখতে পাই না, সমস্ত জায়গাটা প্লেন হয়ে গেছে। অথচ সেরকম কোনও ভূমিকম্প-টম্পও হয়নি যে, একটা গুহা বুজে যাবে !"

ভার্মা বললেন, "গুহা শুধু নয়, খাদও বুজে গেল বলছেন ?"

ভার্মা রানার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন আর মাথার কাছে একটা আঙুল নাড়িয়ে বোঝালেন যে, বুড়ো বয়েসে টমাস ত্রিভুবনের মাথাটি একেবার খারাপ হয়ে গেছে।

টমাস ত্রিভুবন আপন মনে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, "এখান থেকে যে প্রায়ই লোকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তার সঙ্গে ঐ গুহা আর খাদ বুজে যাবার কোনও সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। দরকার হলে আমি ম্যাপ এঁকে আপনাদের

বুঝিয়ে দিতে পারি যে, কোন জায়গায় গুহাটা ছিল !”

রানা বললেন, “কাঠমাণ্ডুতে আমি খবর পাঠিয়েছি। একটা বড় সার্চ পার্টি কালকের মধ্যেই এসে পৌঁছবে !” ওদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আজ রাতটা আমরা এখানে কাটিয়ে দেখব, ইয়েটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কি না।”

ভার্মা বললেন, “এখানে রাত কাটাব ? আমি মশাই রাজি নই ! ওরে বাপ রে বাপ। পটাপট লোকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ! ইয়েতিকে অমন হালকা ভাবে নেবেন না !”

রানা চমকে উঠে বললেন, “তার মানে ?”

ভার্মা বললেন, “আসবার ঠিক আগেই আমি আর টি-তে খবর নিয়েছিলাম। কাঠমাণ্ডুর দিকে ওয়েদার খুব খারাপ। প্লেন উড়তে পারবে না। দু' তিনদিনের মধ্যে ওদের এদিকে আসাবার কোনও সম্ভাবনা নেই।”

টমাস ত্রিভুবন চারদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলেন। এবার বললেন, “একজন লোক আসছে !”

সবাই সেদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। রানা পকেট থেকে বাইনোকুলার বার করে চোখে লাগিয়ে দেখে বললেন, “এই তো সেই শেরপা কী যেন ওর নাম !”

মিংমা প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে। তার কোমরের দু'দিকে অনেকখানি কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে অঝোরে। সে ব্যথা সহ্য করছে দাঁতে দাঁত চেপে।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “সাব···উধার চলো···লোহাকা দরওয়াজা !···সন্তু সাব অন্দর গির গিয়া···হামকো চোট লাগা !”

ভার্মা বললেন, “লোকটা কী বলছে পাগলের মতন ! এই, সন্তু কোথায় গেল ? ঠিক করে বলো।”

মিংমা বলল, “অন্দর গির গিয়া···বহুত বড়া লোহাকা দরওয়াজা···’

ভার্মা বললেন, “লোকটার একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে ! বললুম, ভুতুড়ে জায়গা !”

রানা নেপালি ভাষায় মিংমাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা গম্বুজ থেকে বেরিয়েছিলে কেন ? কোথায় গিয়েছিলে ? এখানে মুর্গির পালক এল কী করে ?”

মিংমা খুব জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিতে গেল। কিন্তু আর একটা কথাও বেরোল না তার মুখ দিয়ে, আবার সে মাটিতে পড়ে গেল।

রানা তক্ষুনি তার পাশে এসে বসে পড়ে বললেন, “অজ্ঞান হয়ে গেছে ! এ কী, এর সারা গায়ে রক্ত !”

ভার্মা বললেন, “ও সন্তুকে খুন করেনি তো ?”

রানা এবার মুখ তুলে কঠোরভাবে বললেন, “এখন তো মনে হচ্ছে, আপনিই

পাগল হয়ে গেছেন, মিঃ ভার্মা ! ও সন্তুকে খুন করবে কেন ? কী ওর স্বার্থ ? ও একবার পালিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছিল ওদের টানে।"

ভার্মা বললেন, "সেইজন্যই তো সন্দেহ হচ্ছে। ওর কোনও মতলব আছে বলেই হয়তো ফিরে এসেছে।"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "একটু গরম দুধ বা চা খাওয়াতে পারলে ওর জ্ঞান ফিরবে, তখন ওর কাছ থেকে সব খবর নেওয়া যেতে পারে ! শুনলেন তো, এও লোহার দরজার কথা বলছে !"

ভার্মা বললেন, "পাহাড় আর বরফের রাজত্বে লোহার দরজা ! এ যে রূপকথা ! আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমাদের সবারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে।"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "গম্বুজের মধ্যে চা তৈরি করার ব্যবস্থা নেই ?"

রানা বললেন, "আছে। ভেতরে ওষুধ-পত্তরও আছে কিছু-কিছু। আপনার তো এসব ব্যাপারে কিছু জ্ঞান আছে, দেখুন তো কোনও ওষুধ একে খাওয়ানো যায় কি না। এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা খুবই দরকার।"

ভার্মা বললেন, "তার চেয়ে একটা কাজ করলে হয় না ? এই লোকটা যখন এত অসুস্থ, তখন ওকে হাসপাতালে দেওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চলুন ওকে নিয়ে আমরা সিয়াংবোচি ফিরে যাই এক্ষুনি।"

রানা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী, সন্তুর খোঁজ করব না ?"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, ফিরে এসে করব। কিন্তু এই লোকটাকেও তো বাঁচানো দরকার। এর আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই বলে মনে হচ্ছে। দেখুন, সমস্ত পোশাক রক্তে ভিজে যাচ্ছে একেবারে। ওর ক্ষতটা কোথায় দেখেছেন ?"

রানা বললেন, "কোমরের কাছে। আশ্চর্য !"

ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য নয় ? এখানকার সব ব্যাপারটাই অদ্ভুত ! মানুষের কোমরের কাছে কাটে কী করে ? বুকে-পিঠে, হাতে-পায়ে চোট লাগতে পারে, কিন্তু কোমরের কাছে...এক যদি ভাল্লুক বা ইয়েতি কামড়ে ধরে..."

রানা বললেন, "লোহার দরজা হোক আর যাই হোক, ও বলছে, সন্তু কোনও একটা জায়গায় পড়ে গেছে। আমরা এখনও গেলে সন্তুকে উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু সে-জায়গাটা ও ছাড়া তো আর কেউ দেখাতে পারবে না !"

টমাস ত্রিভুবন গম্বুজ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "গরম জল চাপিয়ে দিয়েছি। এই নিন, এই ওষুধটা ওকে খাইয়ে দিলে ও অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে, তাতে শিগগির ওর জ্ঞান ফিরতে পারে।"

রানা বললেন, "ওকে আমি তুলে নিয়ে গম্বুজের মধ্যে শুইয়ে দিচ্ছি। কোমরে এক্ষুনি একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা দরকার।"

রানা যেই মিংমাকে তোলবার জন্য নিচু হয়েছেন, অমনি ভার্মা বললেন, "তার আর দরকার নেই। মিঃ ত্রিভুবন, ওষুধটা ফেলে দিন !"

ওঁরা দু'জনে চমকে তাকাতেই দেখলেন ভার্মার রিভলভারটা ওঁদের দিকে তাক করা।

রানা বললেন, "এ কী ! এর মানে কী !"

ভার্মা বললেন, "আপনারা দু'জনেই গম্বুজের মধ্যে ঢুকুন ! চটপট ! এক মুহূর্ত দেরি করলেই আমি গুলি চালাব !"

রানা বললেন, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? না, আপনি সত্যিই আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছেন ?"

রিভলভারটা সামনে রেখে ভার্মা এগোতে এগোতে বললেন, "আর একটাও কথা নয়, ভেতরে ঢুকে পড়ো...বারবার বললাম ফিরে যেতে...এখন মরো। তোমরা যতটুকু জেনেছ, তার বেশি আর জানতে দেওয়া যায় না !"

রানা আর টমাস ত্রিভুবন বাধ্য হয়েই গম্বুজের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। টমাস ত্রিভুবন বিড়বিড় করে বললেন, "আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, এই লোকটা বারবার অন্য কথা বলে আমাদের সময় নষ্ট করতে চাইছিল। এর কোনও মতলব আছে।"

ওঁরা দু'জনে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভার্মা লোহার দরজাটা বাইরে থেকে টেনে তালা লাগিয়ে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, "এখানে তোমরা নির্বাসনে থাকো ! ভেতরের ওয়্যারলেস সেটটা আমি আগেই খারাপ করে দিয়ে গেছি, এখান থেকে খবর পাঠাবারও কোনও উপায় নেই !"

তারপর ফিরে ভার্মা তাকালেন মিংমার দিকে। একবার ভাবলেন, ওকে ঐ অবস্থাতেই ফেলে চলে যাবেন। তারপর আবার ভাবলেন, ঝুঁকি না নিয়ে ওকে একেবারে খতম করে দেওয়া যাক।

রিভলভারটা পকেটে রেখেছিলেন, আবার বার করে গুলি করতে গেলেন মিংমাকে।

মৃত্যুর ঠিক মুখোমুখি এসে মানুষ যে অসম্ভব কাজ করতে পারে দ্বিতীয়বার প্রমাণ দিল মিংমা। একটু আগেই তার জ্ঞান ফিরেছিল, সে সব দেখেছিল। ভার্মা আবার পকেট থেকে রিভলভার বার করতেই সে বিদ্যুৎবেগে একটা লাথি কষাল ভার্মার পেটে। আচমকা সেই আঘাতে ভার্মা মাটিতে পড়ে যেতেই মিংমা তার বুকের ওপর চেপে বসল। একখানা প্রবল ঘুঁষিতে প্রায় থেঁতলে দিল ভার্মার নাকটা।

॥ ২১ ॥

মিংমা ঠিক তিনটি ঘুঁষি মারে ভার্মাকে। চতুর্থ ঘুঁষিটা তোলার পর সে নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তার শক্তি ফুরিয়ে আসছে। লোহার পাত তার কোমরের দু' দিকে কেটে বসেছিল, সেখান থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে।

অসম্ভব ব্যথায় সে আর জ্ঞান রাখতে পারছে না।

ঘোলাটে চোখে সে তাকাল এদিক-ওদিক। রিভলভারটা ভার্মার হাত থেকে ছিটকে খানিকটা দূরে পড়ে আছে। মিংমা সেটাকে নেবার জন্য টলতে-টলতে এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই পড়ে গেল ধপাস করে।

প্রায় পাশাপাশি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল ভার্মা আর মিংমা। একটু দূরে রিভলভারটা।

গম্বুজের মধ্যে বন্দী অবস্থায় রানা আর টমাস ত্রিভুবন কিছুই বুঝতে পারলেন না বাইরে কী হচ্ছে! ভার্মার ব্যবহারে রানা এতই অবাক হয়ে গেছেন যে, এখনও চোখ দুটি বিস্ফারিত করে আছেন।

টমাস ত্রিভুবন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ ভার্মা লোকটা কে?"

রানা বললেন, "ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরীকে সাহায্য করবার জন্য ভারত সরকার ওকে পাঠিয়েছেন। এর আগেও ভারত সরকারের নানান কাজ নিয়ে ঐ ভার্মা এদিকে এসেছে।"

"ওর পরিচয়পত্র সব ঠিকঠাক আছে কি না, আপনি নিজে দেখেছেন?"

"না, আমি নিজে দেখিনি। তবে কাঠমাণ্ডুতে আমাদের সরকারি অফিসে নিশ্চয়ই ওকে পরিচয়পত্র পেশ করতে হয়েছে।"

"সে পরিচয়পত্র জাল হতে পারে। যাই হোক, ও আমাদের এখানে আটকে রাখল কেন? ও বলল, আমরা বড় বেশি জেনে ফেলেছি। কী জেনেছি?"

"মাটির মধ্যে একটা লোহার দরজার কথা। মিংমার ঐ কথাটাতেই ভার্মা বারবার বাধা দিচ্ছিল।"

টমাস ত্রিভুবন একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ওপর গিয়ে বসলেন। তারপর রানাকে বললেন, "আপনি একটা কাজ করবেন? গম্বুজের দরজাটা ভেতর থেকে ভাল করে বন্ধ করে দিন। ভার্মা বাইরে থেকে দরজা আটকে দিয়েছে। ও যাতে হঠাৎ আবার ভেতরে ঢুকতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করা দরকার।"

রানা দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে আগে সেটাতে কান লাগিয়ে বাইরে কোনও শব্দ হচ্ছে কিনা শোনার চেষ্টা করলেন। কিছুই শুনতে পেলেন না। দরজা আটকে ফিরে এলেন।

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "এখানে বিস্কিট, মাখন, জ্যাম অনেক আছে। চা-কফি আছে। আমাদের না-খেয়ে মরতে হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে কতদিন থাকতে হবে!"

রানা বললেন, "কাঠমাণ্ডু থেকে আজই রেসকিউ পার্টি এসে পড়বার কথা। অবশ্য ভার্মা বলল, ওদিকে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে বলে তিন-চারদিন প্লেন বা হেলিকপ্টার চলবে না!"

"সেটা সত্যি কথা না-ও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, ও নিজেই কোনও মিথ্যে খবর পাঠিয়ে রেসকিউ পার্টি ক্যানসেল করে দিয়েছে। দাঁড়ান,

আগে একটু চা খাওয়া যাক। শুধু-শুধু দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। চা খেলে মাথাটা পরিষ্কার হবে!"

টমাস ত্রিভুবন স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল চাপিয়ে দিলেন। রানা কিন্তু টমাস ত্রিভুবনের মতন শান্ত থাকতে পারছেন না। ছটফট করে ঘুরছেন ঐটুকু ছোট্ট জায়গার মধ্যে। নিজের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বললেন, "এখান থেকে খবর পাঠাবারও কোনও উপায় নেই। কেউ জানতে পারবে না আমাদের খবর। ওয়্যারলেস সেটটাকেও খারাপ করে দিয়েছে!"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "সেটটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে দেখব। ও ব্যাপারে আমার কিছুটা জ্ঞান আছে, দেখি সারিয়ে ফেলতে পারি কি না। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটা জিনিস লক্ষ করেছেন? আমরা হেলিকপটারের কোনও আওয়াজ পাইনি! তার মানে, আমাদের বন্দী করে ও পালায়নি এখনও।"

রানা বললেন, "পালাবে না। এখানেই ওর দলবল আছে। মিঃ রায়চৌধুরী যখন অদৃশ্য হয়ে যান, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে এখানে মাটির তলায় কিছু ব্যাপার আছে। একটা লোক তো আর এমনি এমনি আকাশে উড়ে যেতে পারে না!"

"লোহার দরজা যখন আছে, তখন তার ভেতরে মানুষও আছে। তারা কুকুর পোষে, ভেতরে জ্যান্ত মুর্গি রাখে। কুকুরের পায়ের ছাপ আমি আগেরবার এসে দেখেছি। এবারে এসে দেখলুম মুর্গির পালক। তার মানে বেশ পাকাপাকি থাকবার ব্যবস্থা। এরা কারা?"

"নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তচর-দল।"

"কিন্তু মাটির তলায় বসে কী গুপ্তচরগিরি করবে? আর এই বরফের দেশে গোপন কিছু দেখবার কী আছে?"

"আজকালকার গুপ্তচরবৃত্তির জন্য চোখে দেখার দরকার হয় না। নিশ্চয়ই ওরা মাটির তলায় কোনও শক্তিশালী যন্ত্র বসিয়েছে। কাছাকাছি তিনটে দেশের সীমানা। তিব্বত অর্থাৎ চীন, রাশিয়া, ভারত—"

"হুঁ। এই ভার্মাটাও ওদের দলের লোক।"

চা তৈরি হয়ে গেছে, কাগজের গেলাসে চা ঢেলে টমাস ত্রিভুবন একটা এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। রানার মুখখানা দুশ্চিন্তায় মাখা, সেই তুলনায় টমাস ত্রিভুবন অনেকটা শান্ত।

আরাম করে চা-টা শেষ করার পর টমাস ত্রিভুবন বললেন, "এই গম্বুজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা বসবার জায়গা আছে আমি জানি। সেখান দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। দেখুন তো এখানে কোনও বাইনোকুলার পান কি না!"

রানা বাইনোকুলার খুঁজতে লাগলেন আর টমাস ত্রিভুবন বসলেন রেডিও-টেলিফোন সেটটা নিয়ে। একটু নাড়াচাড়া করেই তিনি বলেন, "ইশ, এটাকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। ভার্মা কখন এটাকে ভাঙল বলুন

তো।"

রানা বললেন, "কোন এক ফাঁকে ভেঙেছে, আমরা লক্ষই করিনি। আপনাকে শুধু শুধু এই বিপদের মধ্যে নিয়ে এলাম! আপনার আসবার কথাই ছিল না!"

ত্রিভুবন বলেলেন, "আমি এর আগেও তিনবার বিপদে পড়েছি জীবনে। একটা কথা ভেবে দেখুন তো, ভার্মা আমাদের দু'জনকে গুলি করে মেরেই ফেলতে পারত। আমাদের কিছুই করার ছিল না। না-মেরে যে আমাদের এখানে আটকে রেখেছে, তার মানে আমাদের এখনও বাঁচার আশা আছে।"

রানা আফশোসের সুরে বললেন, "ইশ, কেন যে আমার লাইট মেশিনগানটা হেলিকপটারে ফেলে এলাম!"

ত্রিভুবন বললেন, "সেটা আনলেও কোনও লাভ হত না হয়তো। আপনি তো ভার্মাকে আগে সন্দেহ করেননি। সে হঠাৎ আপনার হাতে গুলিই চালিয়ে দিত। বাইনোকুলার পেলেন না?"

"না! মিঃ রায়চৌধুরীর গলাতেই একটা বাইনোকুলার ঝোলানো ছিল, যতদূর মনে পড়ছে। ওঃ হো! আমার নিজের পকেটেই তো একটা রয়েছে! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম! আপনি বাইনোকুলার খুঁজতে বললেন, আর আমি অমনি খুঁজতে আরম্ভ করলাম।"

এত বিপদের মধ্যেও ত্রিভুবন হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "আপনার ওভারকোটের অন্য পকেটগুলোও খুঁজে দেখুন তো, রিভলভার-টিভলভার আছে কি না!"

রানা কোটের সব-কটা পকেট চাপড়ে দেখে নিয়ে বললেন, "না, নেই। আমার নিজস্ব কোনও রিভলভারই নেই!"

"চলুন তাহলে গম্বুজের ওপরে উঠে দেখা যাক।"

গম্বুজের ওপরে ছোট জানলাটা দিয়ে একজনের বেশি দেখা যায় না। বাইনোকুলারটা হাতে নিয়ে একবার রানা আর একবার ত্রিভুবন বাইরে দেখতে লাগলেন। বাইনোকুলার দিয়ে সাধারণত দূরের জিনিস দেখবার চেষ্টা করে। ওঁরাও দূরে দেখতে লাগলেন। গম্বুজের কাছেই যে ভার্মা ও মিংমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, তা ওঁদের নজরে পড়ল না।

বাইরে আলো কমে এসেছে। এরপর একটু বাদেই হঠাৎ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসবে। হেলিকপটারটা দূরে থেমে আছে। ছোট হেলিকপটারে বেশি লোক আঁটে না বলে এবার কোনও পাইলট আনা হয়নি, রানা নিজেই চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। অবশ্য ভার্মাও হেলিকপটার চালাতে জানে, ইচ্ছে করলে সে পালাতে পারত।

একসময় বাইনোকুলারটা টমাস ত্রিভুবনের হাত ফসকে সিঁড়িতে পড়ে গেল। রানা বললেন, "ঠিক আছে, আমি তুলে আনছি।" তখন টমাস ত্রিভুবন

খালি চোখে তাকালেন বাইরে। অমনি তিনি দেখতে পেলেন ভার্মা আর মিংমাকে। তাঁর বুকটা ধক করে উঠল। উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, "রানা, রানা, এদিকে আসুন ! শিগগির !"

বাইনোকুলারটা কুড়িয়ে রানা দৌড়ে চলে এলেন ওপরে। ত্রিভুবন নিজে জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে রানাকে দেখতে দিলেন। রানা দেখেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, "মাই গড ! ওরা দু'জনেই মরে গেছে ?"

ত্রিভুবন বললেন, "না, তা কী করে হয় ! দু'জনে কী করে একসঙ্গে মরবে ? মিংমা তো অজ্ঞান হয়েই ছিল।"

"কিন্তু ঐ জায়গায় ছিল না। আরও কনেকটা বাঁ পাশে। কোনওক্রমে মিংমা উঠে এসেছিল। আমরা কোনও গুলির শব্দও পাইনি !"

"মনে হচ্ছে, কোনও কারণে দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

"রিভলভারটা পড়ে আছে কাছেই।"

"কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! যদি ভার্মা ব্যাটা আগে জ্ঞান ফিরে পায়, তা হলে ও মিংমাকে এবার মেরে ফেলবে !"

"আর যদি মিংমা আগে জ্ঞান ফিরে পায়, তা হলে আমরা এক্ষুনি মুক্ত হতে পারি। মিংমা আমাদের দরজা খুলে দেবে !"

"মিংমাকে আগে জাগতেই হবে ! ওকে কীভাবে জাগানো যায় ? এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে—"

"না, তাতে লাভ নেই। তাতে ভার্মাই আগে জেগে যেতে পারে।"

"একটা কিছু করতেই হবে ! মিংমাই আমাদের বেশি কাছে। যদি এখান থেকে ওর গায়ে জল ছুঁড়ে দেওয়া যায় ?"

"অতটা দূরে কীভাবে জল ছুঁড়বেন ?"

অবশ্য সেরকম কিছুই করতে হল না। একবার দূরের দিকে চেয়ে ওঁরা দু'জন আবার দারুণ চমকে উঠলেন।

আলো খুবই কমে গেছে। চতুর্দিকে হালকা অন্ধকার। তার মধ্যে দেখা গেল, মানুষের চেয়ে বড় আকারের দুটি প্রাণী এই গম্বুজের দিকে এগিয়ে আসছে।

অসম্ভব উত্তেজনায় রানা চেপে ধরলেন টমাস ত্রিভুবনকে। ফিস-ফিস করে বললেন, "ইয়েটি ! ইয়েটি !"

টমাস ত্রিভুবন ভাল করে দেখে বললেন, "তাই তো মনে হচ্ছে !"

ইয়েতির মতন প্রাণী দুটোর গায়ে ভাল্লুকের মতন বড় বড় লোম, তারা দুলে-দুলে হাঁটে। মাঝে-মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দেখে নেয়। তাদের মুখে কোনও শব্দ নেই।

বিস্ময়ে, রোমাঞ্চে এবং খানিকটা ভয়ে রানা একেবারে তোতলা হয়ে গেলেন। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "তা-তা-তা-হলে আ-আ-ম-ম-রা স-ত্যি

ই-ই-য়ে-টি দে-দে-দে-খ-লা-ম !"

টমাস ত্রিভুবন বললেন, "চুপ ! কোনও শব্দ করবেন না। ইশ, অন্ধকার হয়ে গেল, ওদের ছবি তোলা যাবে না !"

ইয়েতির মতন প্রাণী দুটো ভার্মা আর মিংমার মাথার কাছে দাঁড়াল, গম্বুজের দিকে তারা একবারও দেখছে না। হঠাৎ ওরা এক অদ্ভুত খেলা শুরু করল, ওদের মধ্যে একজন মিংমাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল অন্যজনের দিকে। সে খুব কায়দা করে লুফে নিল মিংমাকে। তারপর আবার সে ছুঁড়ে দিল এদিকে। এইভাবে তারা মিংমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগল।

রানা ফিসফিস করে বললেন, "মিংমা মরে যাবে। ওরা মিংমাকে মেরে ফেলবে ! ইশ, যদি লাইট মেশিনগানটা থাকত ইয়েটি দুটোকে খতম করতে পারতাম। পৃথিবীতে যারা বিশ্বাস করে না, তারা দেখত সত্যিকারের ইয়েটির লাশ।"

ত্রিভুবন রানাকে জোরে চিমটি কেটে বললেন, "চুপ ! চুপ ! দেখুন, ওরা এবার কী করছে !"

ইয়েতির মতন প্রাণী দুটো মিংমাকে একসময় নামিয়ে দিল মাটিতে। তারপর ওদের একজন ভার্মাকে তুলে নিল। কিন্তু ভার্মাকে নিয়ে ওরা লোফালুফি খেলল না। তাকে নিয়ে ওরা চলে গেল দূরের ঘন অন্ধকারের দিকে।

॥ ২২ ॥

সন্তু যেন একটা অন্ধকার সমুদ্রে ভাসছিল। একবার চোখ মেলেও সে কিছু দেখতে পেল না। বুঝতেও পারল না সে কোথায় আছে। মাথার ভেতরটা খুব ক্লান্ত, তার ইচ্ছে করল ঘুমিয়ে পড়তে।

হঠাৎ যেন কিছু চ্যাঁচামেচির শব্দ এল তার কানে। তার মধ্যে কাকাবাবুর গলা। অমনি একটা ঝাঁকুনি লাগল তার সারা শরীরে। সে পাশ ফিরে তাকাল।

প্রথমে তার মনে হল ভূত। কয়েকটা ভূত কাকাবাবুকে চেপে ধরেছে। তারপরেই বুঝতে পারল, ভূত-টুত কিছু নয়, কয়েকজন মুখোশ-পরা মানুষ।

সন্তু উঠে বসতে গেল। তার আগেই দু'জন মুখোশধারী চেপে ধরল তাকে। তাদের একজনের হাতে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ।

বন্দী অবস্থায় কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, পালা ! যেমন করে হোক পালা !"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই কিছু চিন্তা না করেই পা তুলে একজন মুখোশধারীর পেটে কষাল খুব জোরে এক লাথি। তাতে তার হাত থেকে কাচের সিরিঞ্জটা মাটিতে

পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল !

কেইন শিপটন রেগে বলে উঠল, "ক্লামজি ফুল ! শিগগির আর একটা নিয়ে এসো !"

কেইন শিপটন নিজে উঠে এগিয়ে আসবার আগেই সন্তু টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপরই অন্ধের মতন দৌড়ল।

কাকাবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন, "সন্তু, পালা পা··· ।" তক্ষুনি তাঁর মুখ চাপা দিয়ে দিল কেউ।

সন্তু দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখল সামনেই একটা লোহার রেলিং। মুখোশধারীরা তাকে তাড়া করে আসছে বুঝতে পেরে সে সেই রেলিং ধরে ভল্ট খেয়ে চলে গেল অন্যদিকে। সেইভাবে ঝুলতে-ঝুলতে তাকিয়ে দেখল, [illegible] একতলার সমান নীচে অনেক মেশিন-টেশিন রয়েছে। মুখোশধারীরা তাকে ধরে ফেলবার আগেই সে হাত ছেড়ে দিল, ধপাস করে পড়ল নীচে।

সন্তুকে পা[illegible]ত দেখে কেইন শিপটন কাকাবাবুর কোটের কলার ধরে টানতে-টানতে এনে শুইয়ে দিল পাথরের টেবিলের ওপর। তারপর রিভলভারের মতন দেখতে, কিন্তু সাধারণ রিভলভারের চেয়ে বেশ বড় একটা অস্ত্র তুলে বলল, "তুমি ঐ ছেলেটিকে এক্ষুনি ফিরে আসতে বলো। নইলে তুমি মরবে !"

কাকাবাবু বললেন, "না ! সন্তু, ফিরে আসিস না !"

কেইন শিপটন বলল, "আমি ঠিক দশ গুনব ! তার মধ্যে ফিরে আসতে বলো ঐ ছেলেটাকে। ওয়ান টু···"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই কিছুতেই ধরা দিবি না !"

কেইন শিপটন বলল, "থ্রী, ফোর···"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ ? তুমি তা হলে আমাকে কিছুই চেনো না, কেইন শিপটন। তুমি আমায় মারতে পারো, কিন্তু তুমি কিছুতেই এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না।"

কেইন শিপটন বলল, "ফাইভ, সিক্স···"

কাকাবাবু গলা চড়িয়ে বললেন, "সন্তু কিছুতেই আসবে না। তুমি যতই ভয় দেখাও···"

সন্তু নীচে লাফিয়ে পড়ে প্রথমটায় ঝোঁক সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। তাতে অদৃশ্য কোনও কিছুতে ঠোকা লেগে গেল তার মাথায়। তারপরই সে বুঝতে পারল, মাঝখানের জায়গাটা শক্ত কাচ দিয়ে ঘেরা, সেই কাচে সে ধাক্কা খেয়েছে। কাচের দেয়ালের মধ্যে অনেকগুলো বড়-বড় যন্ত্র, সেগুলি থেকে নীল আলো বেরুচ্ছে।

পায়ে খানিকটা ব্যথা লেগেছে সন্তুর, কিন্তু এমন কিছু না। দ্রুত চোখ

বুলিয়ে দেখল, গোল জায়গাটার চারদিকে চারটি সুড়ঙ্গ রয়েছে, সুড়ঙ্গগুলো অনেক লম্বা, শেষ পর্যন্ত দেখাই যায় না। এদিকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ করে নেমে আসছে কয়েকজন মুখোশধারী তাকে ধরবার জন্য।

সন্তু একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পালাতে গিয়েও শুনতে পেল কেইন শিপটনের কথাগুলো আর কাকাবাবুর উত্তর। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

কেইন শিপটন 'নাইন' গোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে চিৎকার করে বলল, "ডোন্ট কিল মাই আংকল। আই অ্যাম কামিং!"

ঘোরানো সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো মুখোশধারী দুটির দিকেও হাত তুলে সে বলল, "আই অ্যাম কামিং!"

ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, "না, আসিস না, সন্তু। আমাদের দুজনকেই এরা মারবে। দুজনে এক সঙ্গে মরে লাভ নেই!"

সন্তু সে-কথা গ্রাহ্য করল না। কাকাবাবুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে সে কিছুতেই পালাতে পারবে না। সে আবার চেঁচিয়ে বলল, "ইয়েস, আই অ্যাম কামিং!"

এক পা এক পা করে এগোতে লাগল সে। মুখোশধারী দু'জন তাকে ধরবার জন্য অপেক্ষা করছে। ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে সন্তুর বুকের মধ্যে। এরা কারা? এরা কি সত্যিই তাকে আর কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে!

এগোতে এগোতে সন্তু দেখল, এক জায়গায় দেয়ালে ইলেকট্রিকের মিটারের মতন অনেকগুলো জিনিস। আর একটা লম্বা লিভার অর্থাৎ লোহার হাতলের মতন জিনিস সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। সেটা বেশ খানিকটা উঁচুতে।

বিদ্যুৎ-চমকের মতন একটা চিন্তা খেলে গেল সন্তুর মাথায়। সে লাফিয়ে সেই লিভারটা ধরেই ঝুলে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল!

তারপর নানারকম চ্যাঁচামেচি আর হৈ-চৈ। ওপর থেকে কেইন শিপটন কড়া গলায় কী যেন হুকুম দিলেন। মুখোশধারী দু'জন অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজে ছুটে এল সন্তুকে ধরবার জন্য।

লিভারটা ধরে ঝুলে দোল খেতে খেতে সন্তু সামনের দিকে লাথি চালাতেই তার জোড়া পায়ের লাথি লাগল একজনের বুকে। সেই লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়ল আর একজনের গায়ে। পেছনের লোকটা সেই ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়ে আন্দাজে গুলি চালাল সন্তুর দিকে।

ততক্ষণে সন্তু লিভারটা ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে পড়েছে। গুলিটা লাগল লোহার লিভারটাতে, সেটা ভেঙে ছিটকে উড়ে গেল। আর আলো জ্বলবার কোনও উপায় রইল না।

কেইন শিপটন চিৎকার করতে লাগল, "বোকার দল! ছেলেটাকে কেউ ধরতে পারলে না? শিগগির আলো জ্বালো, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে! আমরা দম বন্ধ হয়ে মরব!"

অন্ধকারে জড়াজড়ি করে সবাই ছুটে এল আলোর সুইচ-বোর্ডের দিকে। সন্তু একবার ভাবল, ওপরে কাকাবাবুর কাছে যাবে। কিন্তু আবার ভাবল, সিঁড়ি দিয়ে অনেকে নামছে। ওদিকে যেতে গেলে সে ধরা পড়ে যাবে। দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে সে উল্টো দিকে সরে যেতে লাগল। তারপর এক জায়গায় দেয়াল নেই টের পেয়ে বুঝল, এদিকে একটা সুড়ঙ্গ। সে ছুটল সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে। খানিকটা গিয়েই একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল, তারপর আবার উঠে ছুটল।

কেইন শিপটন নিজেই নেমে এসেছে সুইচ বোর্ডের কাছে। সবাইকে গালাগালি দিতে দিতে বলল, "ইডিয়েটের দল, একটা সামান্য বাচ্চা ছেলেকে ধরতে পারে না···টর্চ দাও, কার কাছে টর্চ আছে—"

কারুর কাছেই টর্চ নেই, একজন একটা সিগারেটের লাইটার জ্বালল। সেই সামান্য আলোয় দেখা গেল, সুইচ বোর্ডের একদিক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ওদিকে কাকাবাবু যখন বুঝলেন তাঁর কাছাকাছি আর কেউ নেই, তিনি আস্তে আস্তে টেবিলটা থেকে নামলেন। তাঁর পক্ষে ছুটে পালানো সম্ভব নয়। এই অন্ধকারের মধ্যে তো আরও অসম্ভব। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন। আগেই তিনি দেখেছিলেন যে, কেইন শিপটন যে-চেয়ারটায় বসেছিল, তার পেছনে একটা লোহার দরজা আছে। প্রথমে দিক ঠিক করে নিয়ে তিনি একটু-একটু করে এগোলেন সেই দরজাটার দিকে। এক সময় হাতের ছোঁয়াতেই দেয়ালের বদলে লোহা টের পেলেন।

দরজাটা খোলাই ছিল, একটু জোরে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কাকাবাবু ভেতরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলেন আবার। চারদিকে হাত বুলিয়ে দেখলেন, দরজাটা বেশ মজবুত। ছিটকিনিও রয়েছে। ভেতর থেকে সেটাকে আটকে দিলেন শক্ত করে।

তারপর ঘরের মধ্যে ভাল করে তাকাতেই তিনি চমকে উঠলেন খুব।

একটু দূরে একটা টাকার সাইজের গোল লাল আলো খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। সেই আলোটা দেখলেই ভয় হয়। মনে হয় যেন কোনও এক চক্ষু দানব দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে।

কাকাবাবু বুঝলেন, ওটা কোনও যন্ত্র। কিন্তু সব দিক একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তার মধ্যে এই যন্ত্রের লাল আলোটা জ্বলছে কী করে ? নিশ্চয়ই ওটার জন্য কোনও আলাদা ব্যবস্থা আছে। কাকাবাবু যন্ত্রটার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ল, কেইন শিপটন একবার বলেছিলেন, এখানে এমন যন্ত্র আছে, যাতে হাত ছোঁয়ালেই মৃত্যু অনিবার্য। এটা সে-রকম কোনও যন্ত্র নয় তো ?

কাকাবাবু কান পেতে শুনলেন, যন্ত্রটার মধ্য থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। তিনি আর যন্ত্রটার দিকে এগোলেন না। লাল আলোটা এমন তীব্র যে, ওদিকে

চেয়ে থাকাও যায় না। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে বলে তিনি আস্তে-আস্তে বসে পড়লেন। পাশে হাত রাখতেই আবার চমকে উঠলেন তিনি। একটা কোনও লোমশ জিনিসে তাঁর হাত লাগল। অমনি নড়ে উঠল সেই জিনিসটা, তারপরই ডেকে উঠল।

এটা সেই কুকুরটা। এই ঘরের মধ্যে এসে ঘুমিয়ে ছিল, কাকাবাবুর ছোঁয়া লাগতেই আবার জেগে উঠেছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যেই এই দুষ্টু কুকুরটাকে নিয়ে কাকাবাবু আবার এক মহা মুশকিলে পড়লেন। কুকুরটা দেখতে ভারী সুন্দর, আকারেও বেশি বড় নয়, কিন্তু ঘেউ-ঘেউ করে সে তেড়ে কামড়াতে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবুর ওপরে ওর রাগও আছে। কাকাবাবু প্রথম দু'একবার কুকুরটার কামড় খেলেন। তারপর বেশি সাহস পেয়ে কুকুরটা তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তিনি খপ করে সেটাকে ধরে ফেলেন দু'হাতে। কুকুরটা ছটফট করেও আর নিজেকে ছাড়াতে পারল না। কাকাবাবু এক হাতে কুকুরটার মুখ শক্ত করে চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন তাকে।

নীচের তলায় সন্তু একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এক ধাক্কা খেল। গুহাটা সেখানেই শেষ। আবার পেছন ফিরতে গিয়েই তার মনে হল, দূরে কিছু লোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরা কি এদিকেই আসছে?

কোণঠাসা ইঁদুরের মতন সন্তু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

তারপরেই আলো জ্বলে উঠল। কেইন শিপটন এর মধ্যে আলোর সুইচ ঠিক করে ফেলেছে।

সন্তু দেখল, সুড়ঙ্গের মুখে দু-তিনজন মুখোশধারী দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে লম্বা পিস্তল। আর দেখল, তার ঠিক সামনেই আর-একটা ছোট সুড়ঙ্গের পথ। সেটায় ঢুকতে গেলে সামনে একটুখানি দৌড়ে যেতে হবে, তাতে দূরের মুখোশধারীরা তাকে দেখে ফেলতে পারে। সেটুকু ঝুঁকি নিয়েই সন্তু এক দৌড়ে সেই সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ ২৩ ॥

আলো জ্বলে উঠতেই কাকাবাবু ঘরের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তখনও তিনি কুকুরটার মুখ শক্ত করে ধরে আছেন। কুকুরটাকে নিয়ে মহা মুশকিল, ছেড়ে দিলেই ও কামড়াতে আসে। অনেক রকম আদর করলেও সে শান্ত হয় না, সারা শরীর কুঁকড়ে সে ছাড়া পেতে চাইছে।

ঘরটার একদিক জুড়ে রয়েছে বিরাট একটা যন্ত্র। তার ঠিক মাঝখানে সেই আলোটা জ্বলছে। যন্ত্রটা দেখলেই কেমন যেন ভয়-ভয় করে, মনে হয় যেন এক একচক্ষু দানব। কিছু প্যাকিং বাক্স ছড়ানো আছে চারদিকে, কাকাবাবু

দু'একটা বাক্স খুলে দেখলেন তার মধ্যে রয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতির অংশ।

লাল চক্ষুওয়ালা যন্ত্রটার দিকে কাকাবাবু চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাঁর বেশি জ্ঞান নেই, ওটা কিসের যন্ত্র তিনি বুঝতে পারলেন না। একবার ভাবলেন, এটা কি কম্পিউটার ? হিমালয়ের এই দুর্গম জায়গায় মাটির নীচে ঘর বানিয়ে কী ভাবে এরা এই এতবড় একটা যন্ত্র বসাল সে-কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাকাবাবু।

এক পা এক পা করে তিনি যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, এই যন্ত্রটায় হাত দিলেই যে কিছু বিপদ ঘটবে, তা তো হতে পারে না। কুকুরটা এই ঘরের মধ্যে ছিল, কুকুরটা এই যন্ত্রটা নিশ্চয়ই দু' একবার ছুঁয়েছে, ওর তো কিছু হয়নি !

কাকাবাবু যন্ত্রটার খুব কাছে এগিয়ে যেতেই পেছন দিকের দরজায় দুম-দুম শব্দ হল।

কাকাবাবু ফিরে দেখলেন, দরজাটা লোহার তৈরি এবং খুব মজবুত। তিনি খিল আটকে দিয়েছেন, আর বাইরে থেকে খোলার সাধ্য কারুর নেই। এখন এই ঘরের মধ্যেই তিনি নিরাপদ।

বাইরে থেকে কেইন শিপটনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ডোনট বিহেভ লাইক আ ফুল। দরজা খুলে দাও !"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি দুঃখিত, এখন দরজাটা খুলতে পারছি না !"

কেইন শিপটন বলল, "শিগগির খোলো !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ব্যস্ত আছি একটু। প্লীজ আমায় বিরক্ত কোরো না।"

কেইন শিপটন বলল, "এক্ষুনি খুলে দাও, নইলে ব্লাস্ট করে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলব !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের দরজা তোমরা ভাঙবে, এতে আমার কী করার আছে। ইচ্ছে হলে ভাঙো।"

কাকাবাবু যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন রঙের অনেকগুলো বোতাম যন্ত্রটার গায়ে সার-সার সাজানো। কাকাবাবু সাহস করে একটা বোতাম টিপলেন।

অমনি যন্ত্রটার মধ্য থেকে খুব জোরে আওয়াজ বেরিয়ে এল, "টু টু নাইন। কে ওয়াই সেভেন সেভেন। আলফা ওমেগা..."

আওয়াজটা এত হঠাৎ আর এত জোরে হল যে, কাকাবাবু চমকে খানিকটা পিছিয়ে এলেন। যন্ত্র তো কথা বলতে পারে না, নিশ্চয়ই ওর মধ্যে রেকর্ড করা আছে। এগুলো কোনও সাঙ্কেতিক সূত্র।

কেইন শিপটন বলল, "খবরদার ঐ যন্ত্রে আর হাত দিও না, তুমি মরে যাবে। দরজা খোলো, তোমার ভাইপো সম্পর্কে জরুরি কথা আছে।"

এ দুটোই যে ধাপ্পা, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না কাকাবাবুর। তিনি হাসলেন।

কেইন শিপটনকে তিনি বললেন, "তার চেয়েও জরুরি কাজে আমি ব্যস্ত আছি, ওসব কথা পরে হবে!"

কাকাবাবু আর-একটা বোতাম টিপতেই ফটাস্ করে যন্ত্রটার খানিকটা স্প্রিংয়ের ডালার মতন খুলে গেল। ভেতরটায় কাচের ঢাকা দেওয়া অনেকগুলো ঘড়ির মতন জিনিস। সেগুলোর মধ্যে ঝিকিঝিকি শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবু ওতে হাত দিলেন না। তিনি আর-একটা বোতাম টিপলেন, তখন যন্ত্রটা দিয়ে বীপ্ বীপ্ বীপ্ বীপ্ শব্দ হতে লাগল।

দরজার বাইরে থেকে কেইন শিপটন পাগলের মতন চিৎকার করছে। কাকাবাবু ওর কথায় আর কোনও উত্তর দিলেন না। কেইন শিপটন কেন এত ক্ষেপে যাচ্ছে তা কাকাবাবু এবার বুঝতে পারলেন। এই যন্ত্রটা বাইরে খবর পাঠায়। কাকাবাবু নানারকম বোতাম এক সঙ্গে টিপে দিলে যন্ত্রটা নানারকম উল্টোপাল্টা খবর এক সঙ্গে পাঠাতে শুরু করবে। তার ফলে, যে-দেশে এই খবরগুলো যাওয়ার কথা সেখানে বুঝে যাবে যে এখানে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কেইন শিপটন তা জানাতে চায় না।

কেইন শিপটন বলল, "রায়চৌধুরী, শোনো। তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি। তুমি যদি দরজা খুলে বেরিয়ে আসো, আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না। তোমাকে মুক্তি দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি, হঠাৎ এত উদার হলে যে?"

"যন্ত্রটায় হাত দিও না! তুমি জানো না, ওর মধ্যে একটা বোতাম টিপলে এই পুরো জায়গাটাই বিস্ফোরণে উড়ে যাবে?"

"এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?"

"আমি সত্যিই বলছি!"

"বেশ তো। তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার যখন কোনও উপায় নেই, তখন এই পুরো জায়গাটা আমি বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতেই চাই!"

"তোমাকে আমরা বাঁচার সুযোগ দিচ্ছি। তোমার ভাইপোকেও আমরা ছেড়ে দেব!"

"আমার ভাইপো কোথায়?"

"সে এখানেই আছে।"

"তাকে কথা বলতে বলো। তার গলা শুনতে চাই।"

এবার কেইন শিপটন চুপ করে গেল। তার মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে। সন্তুকে এখনও ওরা ধরতে পারেনি। সাত-আটজন লোক মিলে সন্তুকে তাড়া করলেও এখনও সন্তুকে ওরা ধরতে পারেনি। সন্তু নানান সুড়ঙ্গের মধ্যে ওদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

কেইন শিপটন তার সঙ্গীদের প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "এখনও তোমরা ছেলেটাকে ধরতে পারলে না ? অপদার্থের দল !"

কাকাবাবু একটুক্ষণ থেমে রইলেন। কেইন শিপটন যে বলল, একটা বোতাম টিপলে পুরো জায়গাটাই বিস্ফোরণে উড়ে যাবে, সে-কথা কি সত্যি ? গুপ্তচরদের মধ্যে অনেক সময় এরকম ব্যাপার থাকে। ধরা দেবার বদলে তারা নিজেরাই সব কিছু ধ্বংস করে দেবার ব্যবস্থা রাখে। কিন্তু এখান থেকে পালাবার কি আর অন্য রাস্তা নেই ? কেইন শিপটনের দলবল পালাতে চাইছে না কেন ?

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "কেইন শিপটন, এবার আমি তোমাদের হুকুম দিচ্ছি, শোনো। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, পালাও ! আমি পরপর সবকটা বোতামই টিপব শেষ পর্যন্ত !"

কেইন শিপটন বলল, "ব্লাডি ফুল, তা হলে তুমিও মরবে !"

"তোমাদের হাতে মরার চেয়ে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে মরা অনেক ভাল !"

"রায়চৌধুরী, এদিকে এসো, দরজার কাছে, প্লীজ, একটা কথা শোনো—"

কাকাবাবু এরই মধ্যে একটা অজগর সাপের ফোঁসফোঁসানির মতন শব্দ শুনতে পেলেন। শব্দ কিন্তু ঐ যন্ত্রটা থেকে আসছে না। একটু লক্ষ করতেই কাকাবাবু টের পেলেন শব্দটা আসছে দরজার বাইরে থেকে। এটাও বুঝতে পারলেন, শব্দটা আগুনের। লোহা-গালানো আগুন দিয়ে ওরা দরজাটা গালিয়ে ফেলতে চাইছে। কিংবা দরজার গায় একটা ফুটো করতে পারলেই সেখান দিয়ে ওরা কাকাবাবুকে গুলি করতে পারবে। সেই সময়টুকু কাটাবার জন্য কেইন শিপটন কথা বলে কাকাবাবুকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে।

আর কোনও উত্তর না দিয়ে কাকাবাবু যন্ত্রটার এক পাশে সরে এসে দাঁড়ালেন, দরজাটা গালিয়ে ফেললে আবার তাঁকে ধরা পড়তেই হবে। এবার আর ওরা ছাড়বে না।

তিনি বোতামগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোন্ বোতামটা সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক সেটা বোঝার উপায় নেই। কাকাবাবু নিজের মৃত্যুর জন্য চিন্তা করেন না, কিন্তু সন্তুর কথা ভেবে একটু দ্বিধা করতে লাগলেন। সন্তু এখনও ধরা পড়েনি, বিস্ফোরণে সব কিছু উড়িয়ে দিলে সন্তুও মারা পড়বে !

এখনও চোদ্দটা বোতাম টেপা বাকি আছে, এর মধ্যে সেইটা কোন্‌টা ? অথচ বেশি সময়ও হাতে নেই। কাকাবাবু একটা হলুদ বোতাম টিপে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে এমন একটা ব্যাপার হল যে, কাকাবাবু আনন্দে "ওঃ !" বলে উঠলেন। হলুদ বোতামটা টিপতেই মাথার ওপর সর-সর শব্দ করে ঘরের ছাদটা খুলে গেল। দেখা গেল আকাশ। কাকাবাবুর মনে হল, তিনি যেন কতকাল পরে আকাশ দেখলেন ! বুক ভরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন বারবার।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল তাঁর গায়ে।

ছাদটা খুলে গেলেও দেয়ালগুলো বেশ উঁচু। কাকাবাবুর পক্ষে লাফিয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব। এখনও তাঁর মুক্তি পাবার তেমন আশা নেই। কিন্তু তিনি প্রথমেই একটা কাজ করলেন।

এক হাতে তিনি তখনও কুকুরটাকে শক্ত করে ধরে ছিলেন, এবার দু' হাতে কুকুরটাকে ধরে খুব জোরে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "যাঃ!"

কুকুরটা বাইরে বরফের ওপর পড়ে ঘেউ-ঘেউ করে প্রচণ্ড জোরে ডাকতে লাগল।

॥ ২৪ ॥

ছুটতে-ছুটতে সন্তু দেখল, সুড়ঙ্গটা এঁকেবেঁকে যে কতদূর গেছে, তার কোনও ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে আলো, মাঝে-মাঝে অন্ধকার। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল, কেউ তাকে ধরবার জন্য ছুটে আসছে কি না। কারুকে দেখতে পেল না।

সুড়ঙ্গের পাশে পাশে দু' একটি খুপরি-খুপরি ঘর আছে। একটা ঘরে ঢুকে পড়ল সন্তু। ঘরের ভেতরটায় আবছা অন্ধকার। একটুখানি চোখ সইয়ে নিয়ে ঘরটার দিকে ভাল করে তাকাতেই সে আঁতকে উঠল। অজান্তেই তার মুখ দিয়ে "আঁ! আঁ!" শব্দ বেরিয়ে এল।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরপর চারটি ইয়েতি। সাধারণ মানুষের প্রায় দেড়গুণ লম্বা। যেন তারা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিশ্রাম করছে। সন্তু ভয় পেতে না চাইলেও ধক-ধক করতে লাগল তার বুক। সে এক পা এক পা পিছিয়ে যেতে লাগল। এবং পড়ে গেল হোঁচট খেয়ে।

কিন্তু ইয়েতিরা তাকে তাড়াও করল না, হাত বাড়িয়ে ধরবারও চেষ্টা করল না। তারা দাঁড়িয়ে রইল একইভাবে।

পড়ে গিয়েও সন্তু হাঁচোড়-পাঁচোড় করে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। তখনই সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল খুব কাছেই, সুড়ঙ্গের একটি বাঁকে। সন্তুকে যারা ধরবার চেষ্টা করছে, নিশ্চয়ই তারা। পালাবার সময় নেই, এসে পড়বে এক্ষুনি।

তখন, বলতে গেলে এক মুহূর্তের মধ্যে দুটো-তিনটে চিন্তা খেলে গেল সন্তুর মাথায়। তাকে বাঁচতে হবে...বাঁচতে গেলে ঐ ঘরটার মধ্যেই আবার ঢুকতে হবে...দেয়ালে পিঠ দিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা ইয়েতি নয়। সঙ্গে-সঙ্গে সে দৌড়ে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়েই একটা ইয়েতির পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তারপরই সেই ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তিনজন লোক। তাদের মুখে হলুদ মুখোশ, এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলভার। টর্চের আলো ফেলে

তারা দেখতে লাগল ঘরের ভেতরটা। একজন ঢুকেও পড়ল ঘরের মধ্যে।

বাইরের একজন ইংরেজিতে বলল, "ছেলেটা গেল কোথায় ? এইদিকেই এসেছে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "আওয়াজ শুনলাম, মনে হল এই ঘরেই ঢুকেছে।"

আর-একজন বলল, "না, আমার মনে হয় ছেলেটা ওপরে উঠে গেছে।"

ভেতরের লোকটি বলল, "এখানে তো দেখছি না—"

বাইরের একজন বলল, "একবার ওপরে যাওয়া উচিত, ওপরে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে কিন্তু—"

লোকগুলো জুতোর দুপদাপ শব্দ করে এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের সামনের দিকে।

এই সময়টুকু সন্তু নিশ্বাস বন্ধ করে ছিল। তার খালি ভয় হচ্ছিল, তার পা দুটো ওরা দেখতে পেয়ে যাবে কি না। লোকগুলো চলে যেতেই তার শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে গেল, সে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

ঘরটার মেঝেতে খড় ছড়ানো আছে। ইয়েতির মতন পোশাকগুলোতেও খড় ভরাই ; পোশাকগুলো যাতে কুঁচকে না যায়, সেইজন্য খড় ভরে সোজা করে রাখা আছে। সন্তু একটু সুস্থ হবার পর পোশাকগুলোতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখল। প্রথম দেখেই সন্তু এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে ভাল করে তাকায়নি। নইলে চোখের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারা যেত। ওদের চোখের জায়গায় কিছুই নেই। শুধু দুটো গর্ত।

সন্তুর একবার ইচ্ছে হল, সে এই একটা পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়ে ইয়েতি সেজে থাকবে। তা হলে ওরা আর তাকে কিছুতেই খুঁজে পাবে না ! কিন্তু পোশাকগুলোর তুলনায় তার চেহারা অনেক ছোট। তাছাড়া··· সন্তুর আর-একটা কথা মনে পড়ল, ওপরে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে, কাকাবাবু তো তার মতন আর ছুটে পালাতে পারবেন না। কাকাবাবুকে ওরা এতক্ষণে মেরে ফেলেছে ! যাই হোক না কেন, তাকে একবার ওপরে যাবার চেষ্টা করতেই হবে।

ঘরটা থেকে খুব সাবধানে বেরুল সন্তু। দু পাশে উঁকি দিয়ে দেখল, কেউ নেই। লোকগুলো তাহলে ওপরেই উঠে গেছে বোধহয়। সুড়ঙ্গটা দিয়ে পা টিপে টিপে খানিকটা গিয়ে সন্তু বুঝতে পারল, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুড়ঙ্গটার দু'পাশ দিয়েই মাঝে-মাঝে দু'-একটা শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে গেছে। এর আগে ছুটে আসবার সময় সে কখন কোনটা দিয়ে এসেছে, তা এখন আর বোঝবার উপায় নেই।

আবার আর-একটা ঘর চোখে পড়ল একপাশে। সে-ঘরটার কোনও দরজা নেই। ভেতরে কী রকম যেন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। একটু উঁকি দিয়ে

দেখল সন্তু। ঘরটার ভেতরে একটা খাঁচার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো জ্যান্ত মুর্গি, তাছাড়া পাশাপাশি দুটি রেফ্রিজারেটর, মেঝের এক কোণে স্তূপাকার আলু আর পেঁয়াজ। এটা এদের ভাঁড়ারঘর। সন্তুর মনে পড়ল, ওপরে গম্বুজের বাইরে একদিন মুর্গির পালক আর রক্ত দেখতে পেয়েছিল। এরাই ওখানে একদিন একটা মুর্গি নিয়ে গিয়ে মেরে তাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।

সেখানে বেশিক্ষণ রইল না সন্তু, তাকে ওপরে যেতেই হবে। আবার সুড়ঙ্গপথে এগোতে লাগল সে। যেদিকে আলো দেখছে, সেদিকেই যাচ্ছে, তা ছাড়া পথ চেনার আর কোনও উপায় নেই।

আর-একটা ঘরের কাছাকাছি গিয়ে থমকে যেতে হল সন্তুকে। সে-ঘরের ভেতর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর জোরে-জোরে নিশ্বাস টানার শব্দ।

সে-ঘরটাতেও কোনও দরজা নেই। ঐ ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হবে সন্তুকে। ভেতরের লোকরা যদি তাকে দেখে ফেলে? সন্তু পেছন ফিরে তাকাল, আবার ঐ দিকে যাবে? কিন্তু সামনের দিকটাতেই বেশি আলো, খুব সম্ভবত ঐ দিকেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে শব্দটা শুনতে লাগল সন্তু। কীরকম যেন "কুঁ-কুঁ" আওয়াজ হচ্ছে, তারপরই দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন। মনে হয় কোনও অসুস্থ লোক। এটা কি ওদের হাসপাতাল-ঘর? তাহলে ভয় পাবার কিছু নেই, অসুস্থ লোকেরা তাকে দৌড়ে ধরতে পারবে না।

সাহস করে ঘরটায় উঁকি মারল সন্তু। আবার বুকটা কেঁপে উঠল তার। ওখানে কারা বসে আছে, মানুষ না ভূত? শুধু জাঙ্গিয়া-পরা দু' জন লোক দরজার সোজাসুজি দেয়ালের কাছে বসে আছে, দেখে মনে হয় যেন মানুষের কঙ্কাল। তারা নিশ্বাস ফেলছে আর "কুঁ কুঁ" শব্দ করছে বলেই বোঝা যায় তারা বেঁচে আছে।

লোক দুটির চোখের দৃষ্টি স্থির, তারা চেয়ে আছে সন্তুর দিকে। একজনকে দেখে মনে হয় চিনেম্যান, অন্যজন কোন জাত তা বোঝবার উপায় নেই। তার মুখে লম্বা ঝোলা দাড়ি।

সন্তু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "হু আর ইউ?"

লোক দুটি কোনও উত্তর দিল না, একভাবে চেয়েই রইল।

ওদের দেখে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল সন্তুর। ওরা যেন দারুণ অসহায়, বুকের মধ্যে শুধু প্রাণটা ধুকপুক করছে। ওরা নিশ্চয়ই এই গুপ্তচরদের দলের লোক নয়। এই রকমই একজন চিনেম্যানের মৃতদেহ সন্তু দেখেছিল গম্বুজের বাইরে।

এক পা এগিয়ে এসে সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "কে? আপনারা কে? আপনাদের কী হয়েছে?"

লোক দুটির কথা বলার কোনও ক্ষমতা নেই। এই লোক দুটিকেও না খেতে দিয়ে আস্তে-আস্তে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেলে তারপর ওদের দেহ ওপরে বরফের ওপর ফেলে রেখে আসা হবে। তখন কেউ ওদের খুঁজে পেলেও ভাববে, বরফের রাজ্যে পথ হারিয়ে ফেলে ওরা না খেতে পেয়ে মরেছে।

কিন্তু সন্তু এসব কথা জানে না। সে ওদের কোনও রকম সাহায্যও করতে পারছে না। এখানে দেরি করাও অসম্ভব, তাকে ওপরে যেতেই হবে কাকাবাবুর কাছে।

সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লোক দুটো যেন আরও জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগল তারপর। বেশ খানিকটা এগিয়েও ওদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল সন্তু। সে দু'হাতে কান চেপে ধরল।

ক্রমেই সুড়ঙ্গের সামনের দিকে আলো বাড়ছে, মানুষের গলার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে। কান থেকে হাত সরিয়ে সন্তু ভাল করে শোনবার চেষ্টা করল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কেউ যেন কাকে খুব ধমক দিচ্ছে। ঐ আওয়াজটা আসছে ওপরের দিক থেকে। লোহার সিঁড়িটা তা হলে ঐ দিকেই হবে।

একা-একা অতজন শত্রুর মধ্যে উপস্থিত হয়ে সন্তু কী করবে, তা সে জানে না। কিন্তু কাকাবাবু ওখানে আছেন, তাকে তো যেতেই হবে। এক পা এক পা করে সে এগোতে লাগল। এবার খানিকটা দূরে দেখা গেল নীল রঙের আলো। ঐখানে কাচের বাক্সের মধ্যে গোল যন্ত্রটা আছে, সে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। ক্রমশ ওপরের কথাগুলোও শোনা যেতে লাগল স্পষ্ট।

একজন কেউ বলছে, "ওপন দা ডোর···তোমার ভাইপো এখানে আছে। দরজা না খুললে তাকে মেরে ফেলব !"

শুনেই সন্তু বুঝতে পারল, ভাইপো মানে তার কথাই বলা হচ্ছে। কাকাবাবু তা হলে এখনও বেঁচে আছেন। ওরা কাকাবাবুকে মিথ্যে বলছে যে, সন্তু ধরা পড়েছে। তবে কি এখন সন্তুর ওখানে যাওয়া উচিত ? সন্তুকে ধরতে পারলে তো ওদের এখন সুবিধেই হবে। কাকাবাবুকে ভয় দেখিয়ে দরজা খোলাতে পারে। এখন তার পক্ষে লুকিয়ে থাকাই ভাল।

আর-একটু এগিয়ে সন্তু আরও কথা শোনবার চেষ্টা করল। কাকাবাবুর গলার আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে না। কেইন শিপটন একাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনেক কথা বলছে, তার মধ্যে একটা যন্ত্রে হাত দিতে বারবার নিষেধ করছে কাকাবাবুকে। যন্ত্রটা কোথায় আছে !

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, এরই মধ্যে লোহার সিঁড়ি দিয়ে চারজন মুখোশধারী আবার নেমে এল নীচে। সন্তু পেছন ফিরে ছুট লাগাবার আগেই তাদের টর্চের আলো এসে পড়ল তার গায়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওদের হাতে রিভলভার আছে, ওরা

দেখামাত্র গুলি করবে। সন্তু এটা শিখে রেখেছে যে মাটিতে শুয়ে পড়লে সহজে গায়ে গুলি লাগে না।

লোকগুলো দৌড়ে আসতে লাগল তার দিকে। তাদের মধ্যে একজন হুকুম দিল, "ডোনট শুট! গেট হিম অ্যালাইভ!"

এই কথা শোনামাত্রই সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে দৌড় লাগাল। গুলি না করে ওরা তাকে জ্যান্ত ধরবে। আসুক তো কেমন ওরা দৌড়ে ধরতে পারে!

লোকগুলো টর্চের আলো ফেলে রেখেছে সন্তুর ওপর। সন্তু চায় একটা অন্ধকার জায়গা। ডানদিকের আর একটা শাখা-সুড়ঙ্গ দেখে সন্তু বেঁকে গেল সেদিকে। সেদিকটা অন্ধকার। এটা যদি বন্ধ গলি হয়, তা হলে আর সন্তুর নিস্তার নেই। তবু তাকে ঝুঁকি নিতেই হবে।

একটুখানি যেতে-না-যেতেই সন্তুর মুখে টর্চের আলো পড়ল। সামনে দিয়ে দু' তিনজন তেড়ে আসছে। লোকগুলো এরই মধ্যে এদিকে এসে পড়েছে। পেছনে ফিরে সন্তু উল্টোদিকে ছুটতে গিয়েই দেখল বাঁকের মাথায় টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন!

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন সন্তু একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। সে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না, কিছুতেই না। অথচ আর কোনও উপায় নেই, পালাবার পথ নেই। এই সুড়ঙ্গটার পাশে কোনও ঘরও নেই। দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে দু দল মুখোশধারী। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "না, আমায় ধরতে পারবে না, কিছুতেই না!"

আর তখনই ওপরে বিরাট জোরে একটা শব্দ হল। এত জোর শব্দ যেন কানে তালা লেগে যায়। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন সব কিছু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। এই সুড়ঙ্গের দেয়াল থেকেও দু' চারটে পাথরের চলটা ছিটকে গেল চারদিকে।

॥ ২৫ ॥

গম্বুজের জানলাটার কাছেই বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রানা, সেইরকমভাবেই কেটে গেছে সারারাত। টমাস ত্রিভুবন এসে ঘুমিয়ে ছিলেন নীচে। ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠলেন তিনিই আগে। স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে চা বানালেন, তারপর এক কাপ চা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ডাকলেন রানাকে।

রানা আড়মোড়া ভেঙে চোখ কচলে বাইরের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "লুক, টমাস, লুক!"

টমাস ত্রিভুবন তাড়াতাড়ি এসে মুখ বাড়ালেন জানলা দিয়ে। তিনিও চমকে

উঠলেন প্রথমে।

ইয়েতিরা লোফালুফি করে কিছুক্ষণ খেলবার পর মিংমাকে ফেলে গিয়েছিল মাটিতে। তখন রানা আর ত্রিভুবন ধরেই নিয়েছিলেন যে, মিংমা আর বেঁচে নেই। কিন্তু মিংমা কখন যেন উঠে বসেছে। রাত্রে কোনও এক সময় বরফ পড়েছিল। সেই বরফ জমে আছে মিংমার মাথায়, কাঁধে, পিঠের ওপর। এমনই নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে মিংমা যে, মনে হয় যেন রাত্রিতে ঠাণ্ডায় জমে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে।

রানা জিভ দিয়ে আফশোসের শব্দ করে বললেন, "পুয়োর ফেলো, আহা বেচারা!"

ত্রিভুবন বললেন, "মরে গেছে ভাবছেন? আমার কিন্তু তা মনে হয় না!"

"সারারাত বাইরে বরফের মধ্যে পড়ে থাকলে কেউ বাঁচতে পারে?"

"শেরপাদের কতখানি জীবনীশক্তি তা বোধহয় আপনি ঠিক জানেন না। আমি ওদের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি তো, আমি দেখেছি, ওরা মৃত্যুর কাছে কিছুতেই হার মানতে চায় না।"

তিনি দুটো হাত মুখের কাছে এনে খুব জোরে চিৎকার করলেন, "মিংমা! মিংমা! মি-ং-মা!"

মিংমার শরীরটা একটুও নড়ল না তাতে। তখন ত্রিভুবন ও রানা দুজনে মিলে একসঙ্গে ডাকতে লাগলেন মিংমার নাম ধরে। তাতেও কাজ হল না কিছুই।

ত্রিভুবন বললেন, "একটা বন্দুক বা রিভলভার দিয়ে যদি ফায়ার করা যেত, তাহলে সেই শব্দ শুনে ও জাগত নিশ্চয়ই।"

রানা হতাশভাবে বললেন, "বৃথা চেষ্টা! ঐ রকমভাবে কোনও মানুষ বসে থাকে? দেখছেন, একটুও নড়ছে না!"

ত্রিভুবন কোনও কথা না বলে নেমে গেলেন নীচে। একটু পরেই তিনি একটা সাঁড়াশি, একটা ছোট হাতুড়ি, কয়েকটা চীজ-ভর্তি টিন হাতে ওপরে উঠে এলেন আবার। রানাকে বললেন, "আমি বুড়ো হয়েছি, ঠিক ছুঁড়তে পারব না, আপনি এগুলো টিপ্ করে ছুঁড়ে মিংমার গায়ে লাগাতে পারবেন? মিংমা যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে তো আমাদের এখান থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায়ই নেই।"

রানা জানলাটার একটা কাচের পাল্লা খুলে দিলেন ভাল করে। খুব ঘন-ঘন লোহার শিক বসানো বলে ভাল করে বাইরে হাত বাড়ানো যায় না। এই অবস্থায় এখান থেকে কিছু টিপ করে বাইরে ছোঁড়া খুবই শক্ত।

তবু রানা খুব সাবধানে টিপ করে একটা চীজের টিন ছুঁড়ে মারলেন। সেটা গিয়ে পড়ল অনেক দূরে। পর-পর তিন-চারটে জিনিসই সেরকম হল।

ত্রিভুবন বললেন, "আপনি একটু সরুন তো, দেখি আমি একবার চেষ্টা

করি।”

বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ত্রিভুবন ছুঁড়ে মারলেন সাঁড়াশিটা। সেটা গিয়ে ঠিক লাগল মিংমার পিঠে। খানিকটা বরফও খসে পড়ল, কিন্তু মিংমার শরীরে কোনও স্পন্দন দেখা গেল না।

রানা ত্রিভুবনের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, “আঘাতটা তেমন জোর হয়নি, আরও জোরে মারতে হবে।”

আরও তিনবার চেষ্টা করার পর আবার একটা টিন লাগল মিংমার মাথায়। তখন তার শরীরটা ধপ করে পড়ে গেল বরফের ওপরে।

ত্রিভুবন আর রানা সঙ্গে-সঙ্গে গলা মিলিয়ে ডেকে উঠলেন, “মিং-মা ? মিং-মা ?”

মিংমা আস্তে আস্তে মুখটা ফেরাল এবার।

আনন্দে, উত্তেজনায় রানার হাত চেপে ধরে ত্রিভুবন বলে উঠলেন, “দেখলেন, দেখলেন, আমি আপনাকে বলেছিলুম না…শেরপাদের জীবনীশক্তি !”

রানা চেঁচিয়ে উঠলেন, “মিং-মা, মিং-মা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছ ? গম্বুজের দরজাটা খুলে দাও।”

শোয়া অবস্থা থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসল মিংমা। দেখলেই বোঝা যায়, তার শরীরে এখন একটুও শক্তি নেই। দু'হাত তুলে সে কী যেন বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু এতই ক্ষীণ তার গলার আওয়াজ যে, কিছুই বোঝা গেল না।

ত্রিভুবন বললেন, “মিংমা, লক্ষ্মী ভাইটি, একটু কষ্ট করে এসে, দরজা খুলে বার করে দাও আমাদের।”

মিংমা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, পড়ে গেল ধপ করে।

ত্রিভুবন বললেন, “মিংমা, চেষ্টা করো, তোমাকে পারতেই হবে, গম্বুজের মধ্যে এলে তুমি আগুনের সেঁক নেবে, গরম চা পাবে, ব্র্যান্ডি, ওষুধ…”

মিংমা দাঁত চেপে দুই কনুইতে ভর দিয়ে উপুড় হল, তারপর সেই অবস্থায় বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করল গম্বুজের দিকে। তিন চার ফুট কোনওক্রমে সেইভাবে এসেই আবার নেতিয়ে গেল তার মাথা, শুয়ে পড়ল কাত হয়ে।

রানা বললেন, “যাঃ, শেষ হয়ে গেল !”

ত্রিভুবন বললেন, “না, বিশ্রাম নিচ্ছে ! একটু বেশি সময় লাগলেও ক্ষতি নেই।”

সত্যিই খানিকটা পরে ফের মুখ তুলল মিংমা। আবার সেইভাবে এগুবার চেষ্টা করল। একটুখানি যায়, আবার বিশ্রাম নেয়। এইরকমভাবে গম্বুজের কাছাকাছি এসে পড়ে একবার সে বিশ্রামের জন্য সেই যে মাথা নোয়াল, আর তোলেই না। কেটে গেল দশবারো মিনিট। অধীর উৎকণ্ঠায় রানা আর ত্রিভুবন যেন আর থাকতে পারছেন না। রানা তাঁর ঠোঁট এমনভাবে কামড়ে

ধরেছেন যেন রক্ত বেরিয়ে যাবে।

ত্রিভুবন বললেন, "কী হল, মিংমা ? আর একটুখানি !"

মুখ তুলে অসহায় চোখ দুটি মেলে মিংমা বলল, "আমি আর পারছি না, সাব ! আমার শরীরে আর একটুও তাগত নেই !"

রানা বললেন, "পারতেই হবে, মিংমা ! একটু-একটু করে এসে, দরজাটা খুলে দিলে তুমিও বাঁচবে, আমরাও বাঁচব !"

মিংমা প্রাণপণে খানিকটা চেষ্টা করেও এমনভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে পড়ে গেল যে, বোঝা যায়, ওর জ্ঞান চলে গেছে !

ত্রিভুবন বললেন, "ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু মানুষের সাধ্যেরও তো একটা সীমা আছে !"

"অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই।"

দু'জনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মিংমার দিকে। শরীরটা একটুও নড়ছে না, বুকের নিশ্বাস পড়ছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না।

ত্রিভুবন বললেন, "এরকমভাবে চেয়ে থাকতে-থাকতে যে আমাদের চোখ ব্যথা হয়ে যাবে ! দাঁড়ান, আর একটু চা করে আনি—"

ত্রিভুবন নীচে নামবার জন্য ফিরতেই রানা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, "দাঁড়ান, শুনতে পাচ্ছেন ?"

"কী ?"

"শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না ?"

"কই, না তো ! কিসের শব্দ শুনব এখানে ? বেশি উত্তেজিত হয়ে মাথাটা খারাপ করবেন না। ধৈর্য ধরা ছাড়া আমাদের আর এখন কোনও উপায় নেই !"

"ঐ যে শুনুন, ভাল করে শুনুন !"

এবার সত্যিই শোনা গেল গোঁ গোঁ আর ফট ফট ফট ফট শব্দ। খুব তাড়াতাড়ি সেই শব্দ কাছে এসে পড়ল। তারপরই দেখা গেল দুটো হেলিকপটার !

রানা আর ত্রিভুবন আনন্দে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুটো হেলিকপটার থেকে এগারোজন মিলিটারি নেমেই সারবন্দী হয়ে ছুটে আসতে লাগল গম্বুজটার দিকে। ত্রিভুবন আর রানা জানলা দিয়ে রুমাল ওড়াতে লাগলেন ওদের চোখ টানবার জন্য।

গম্বুজের দরজাটা খুলে যেতেই আগে কোনও কথা না বলে ওঁরা দু'জন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে তুলে নিয়ে এলেন মিংমাকে। ভেতরে এসেই মিংমার ঠোঁট ফাঁক করে তার গলায় ঢেলে দিলেন খানিকটা ব্র্যান্ডি। সস্‌প্যানে করে গরম জল ঢালতে লাগলেন তার গায়ে। মিলিটারিদের মধ্যে দু'জন মিংমার বুকে ম্যাসাজ করে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করতে লাগল।

ত্রিভুবন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যাক্, বেঁচে যে আছে, তাই যথেষ্ট। আর কোনও চিন্তা নেই।"

বীরেন্দ্র নামে একজন ব্রিগেডিয়ার দশজন কমান্ডো নিয়ে এসেছেন বিপদ থেকে উদ্ধারের কাজে। এই কমান্ডোদের এমনই ট্রেনিং যে, এরা এক-এক-জনই অন্তত দশ-পনেরোজনের সমান লড়াই করতে পারে। এরা জানে না এমন কোনও কাজ নেই।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "এবার আমাদের লাইন অব অ্যাকশান কী হবে, বলুন ?"

ত্রিভুবন বললেন, "আমি যতদূর বুঝেছি, এখানে এক জায়গায় বেশ বড় কয়েকটা গুহা ছিল, আমি নিজেও দেখে গেছি এক সময়। এখন সেই গুহাগুলো নেই। কোনও ফরেন এজেন্সি সেই গুহাগুলো ঢেকে দিয়ে মাটির নীচে গুপ্ত আস্তানা বানিয়েছে। মিঃ রায়চৌধুরী আর সন্তু সেখানে বন্দী। মিংমা একটা লোহার দরজার কথা বলেছিল, সেটা ব্লাস্ট করে ভেতরে ঢুকতে হবে। আপনাদের সঙ্গে ডিনামাইট আছে কি ?"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র বললেন, "পাহাড়ে রেসকিউ অপারেশনে এসেছি, আর ডিনামাইট স্টিক সঙ্গে থাকবে না, এ আপনি ভাবলেন কী করে ?"

রানা বললেন, "কিন্তু সেই লোহার দরজাটা খুঁজে বার করার জন্য মিংমার সাহায্য দরকার।"

ওঁরা সবাই মিংমার দিকে তাকালেন। মিংমা চোখ মেলেছে।

ত্রিভুবন বললেন, "মিংমা, তুমি যে আমাদের সেই লোহার দরজাটার কথা বলেছিলে, সেটা কোন্ জায়গায় দেখিয়ে দিতে পারবে ?"

মিংমা বললেন, "হ্যাঁ, পারব।"

তারপরই তার চোখে জল এসে গেল। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল, "আপনারা সন্তু সাব, আর আংকল সাবকে বাঁচান। আমি উঠতে পারছি না। আমার দুটো পা থেকেই জোর চলে গেছে! আমি আর কোনওদিন হাঁটতে পারব না।"

ত্রিভুবন বললেন, "নিশ্চয়ই পারবে! দু' একদিন বিশ্রাম নিলে আর ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমরা তোমাকে বয়ে নিয়ে যাব, তুমি সেই জায়গাটা দেখিয়ে দাও !"

দু'জন কমান্ডো মিংমাকে কাঁধে তুলে নিল। ওরা বেরিয়ে পড়ল সবাই। এত অসুস্থ অবস্থাতেও মিংমা জায়গাটা চিনতে ভুল করল না। কাল রাতে বরফ পড়ে সব জায়গা প্রায় একাকার হয়ে গেছে। সকালের রোদ্দুরে কিছু বরফ গলতেও শুরু করে দিয়েছে।

মিংমার দেখিয়ে দেওয়া জায়গাটায় কয়েকজন কমান্ডো বরফ খুঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল লোহার দরজাটা। চটপট সেই দরজাটার চারদিকে বসিয়ে

দেওয়া হল চারটে ডিনামাইট স্টিক। মিংমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অনেক দূরে। অন্যরাও ছড়িয়ে পড়ল দূরে-দূরে। ডিনামাইট চার্জ করার পর কতদূর পর্যন্ত ছিটকে আসতে পারে তা হিসেব করে কমান্ডোরা সবাইকে সেই নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে বলল। কয়েকজন কমান্ডো তৈরি হয়ে রইল হাতের মেশিনগান উঁচিয়ে।

রানা আর ত্রিভুবন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন। ডিনামাইট চার্জ করার আগেই তাঁরা কানে হাত চাপা দেবার জন্য তৈরি। ঠিক এই সময় তাঁরা শুনতে পেলেন পেছন দিকে একটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক।

দু'জনেই দারুণ চমকে গেলেন। এই বরফের রাজ্যে কুকুর? পেছন দিকে তাকিয়ে তাঁদের মনে হল, সেখান থেকেও বেশ খানিকটা দূরে একটা কুকুর প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে।

ত্রিভুবন বললেন, "কুকুর যখন আছে, তখন মানুষও আছে ওখানে!"

তাঁর কথা বলা শেষ হতে না হতেই ডিনামাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল!

ওদিকে গুহার মধ্যে কাকাবাবু যে যন্ত্র-ঘরটার মধ্যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সে-ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। কেইন শিপটন অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আগুনে সেই লোহার দরজার একটা অংশ গলিয়ে ফেলেছে। লম্বা নলওয়ালা একটা পিস্তল হাতে নিয়ে প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কেইন শিপটন। তার পেছনে অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে একজন মুখোশধারী সহচর।

ঘরের ছাদটা খোলা দেখে রাগে-ক্ষোভে একসঙ্গে অনেকগুলো গালাগালি দিয়ে উঠল কেইন শিপটন! তার প্রিয় কুকুরটা বাইরে, ওপরে চ্যাঁচাচ্ছে।

সে বলে উঠল, "ড্যাম ইট! দ্যাট ফেলো এসকেপ্‌ড! ঐ বদমাস রায়চৌধুরীটাকে ক্যাপচার করতেই হবে! ও যেন কিছুতেই পালাতে না পারে।"

তারপর সহচরটিকে হুকুম দিল, "শিগগিরই নাম্বার ফোর, নাম্বার সেভেন আর নাম্বার নাইনকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো। বাইরে যেতে হবে।"

সহচরটি চলে যেতেই কেইন শিপটন শিস দিয়ে ডাকল, "ডোগি, ডোগি, কাম হিয়ার।"

কুকুরটা কিন্তু ডাকতে-ডাকতে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে।

কেইন শিপটনের লম্বা ছিপছিপে চেহারা, সে ইচ্ছে করলেই লাফিয়ে খোলা ছাদের এক পাশের দেয়াল ধরে ফেলতে পারে। সেই রকমই করবার জন্য তৈরি হয়ে সে পিস্তলটাকে দাঁতে কামড়ে ধরল, তারপর লাফ দেবার জন্য যেই নিচু হয়েছে, অমনি পেছন থেকে শক্ত লোহার মতন দুটো হাত টিপে ধরল তার গলা।

ব্যাপারটা এমনই আকস্মিক যে, কিছু বুঝবার আগেই যেন কেইন শিপ্‌টনের দম বন্ধ হয়ে এল, মাথা ঝাঁকুনি দিয়েও সে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না নিজেকে। চোয়াল আল্‌গা হয়ে গিয়ে পিস্তলটা ঠকাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার কানের পাশে ঠাণ্ডা গলায় কে একজন বলল, "ইয়োর গেম ইজ আপ্‌, কেইন্‌ শিপটন!"

রহস্যময় যন্ত্রটার পাশে অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন কাকাবাবু। ঘরের ছাদটা খুলে গেলেও খোঁড়া পায়ে কাকাবাবু লাফিয়ে উঠতে পারতেন না ওপরে। তিনি ঠিকই করে রেখেছিলেন, ঘরে ঢুকে কেইন শিপ্‌টন তাঁকে দেখা মাত্র তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন যন্ত্রটার ওপরে, এক সঙ্গে সব কটা বোতাম টিপে দেবেন। তাতে সব সুদ্ধু ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক্‌।

কিন্তু ছাদটা খোলা দেখে, বিশেষত বাইরে কুকুরের ডাক শুনে কেইন শিপ্‌টন আর ঘরের ভেতরটা ভাল করে খুঁজে দেখেনি। একটু অসতর্কও হয়ে পড়েছিল সে। সেই সুযোগ নিয়ে কাকাবাবু বজ্র আঁটুনি দিয়েছেন তার গলায়।

কাকাবাবু টেনে কেইন শিপটনকে দেয়ালের দিকে নিয়ে আসতে লাগলেন। কেইন শিপটনের গায়েও জোর কম নয়। তার সঙ্গে কাকাবাবু বেশিক্ষণ যুঝতে পারবেন না। কোনওক্রমে একবার মাটি থেকে পিস্তলটা তুলে নিতে পারলেই হল।

কেইন শিপটনের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তবু সে শরীরের সব শক্তি এক জায়গায় করে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিতে গেল একবার।

তার আগেই প্রলয় কিংবা মহাভূমিকম্পের মতন প্রচণ্ড শব্দে সব কিছু কেঁপে উঠল, কাকাবাবু আর কেইন শিপটন দু'জনে ছিটকে পড়লেন দু'দিকে।

ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়তে লাগল, ধোঁয়ায় ঢেকে গেল সব-কিছু। এক মুহূর্তের জন্য কাকাবাবুর মনে হল তিনি যেন পাথরের স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছেন, তারপরই তাঁর জ্ঞান চলে গেল।

ডিনামাইট চার্জে ওপরের ইস্পাতের দরজাটা উড়ে যেতেই গুহার ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেল কমাণ্ডোরা। প্রথমে তারা সাবমেশিনগান থেকে এক ঝাঁক গুলি চালাল, তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল নিজেরা।

বিস্ফোরণের আওয়াজে ভেতরের মুখোশধারী লোকগুলো একটুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। দু'তিনজন পাথরের টুকরোর ঘা খেয়ে আহত হল। তারপরই কমাণ্ডোরা এসে পড়ায় শুরু হয়ে গেল খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু কমাণ্ডোরা ভেতরে ঢুকতে লাগল যেন ঝড়ের বেগে, কয়েকজন মুখোশধারী আহত হবার পর বাকিরা আত্মসমর্পণ করতে লাগল একে একে।

সন্তুকে যারা ধরতে এসেছিল, তারা আরও অনেকখানি নীচে ছিল বলে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি প্রথমে। দু'জন সন্তুকে ধরে রইল, রিভলভার দিয়ে সাব-মেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না বুঝতে পেরে তারা

রিভলভার ফেলে দিয়ে দু'হাত উঁচু করে ধরা দিল।

সন্তুর কাছে যে দু'জন রইল, তাদের একজন সন্তুর ডানপাশ থেকে তার কপালের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছে। আর একজন রিভলভার উঁচিয়ে রইল সন্তুর পেছনে। তারপর পেছনের লোকটি সন্তুকে হুকুম দিল, "নাউ মুভ, ওয়াক স্ট্রেট অ্যাহেড, কোনও রকম চালাকি করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাব।"

সন্তু এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে গেল বলে তার মন খারাপ লাগছে। ওপরে কারা গোলাগুলি চালিয়েছে, তাও সে ঠিক বুঝতে পারেনি। সিঁড়িটার কাছাকাছি আসতেই সে দেখতে পেল কমান্ডোদের।

একজন মুখোশধারী চেঁচিয়ে বলল, "ইফ ইউ ট্রাই টু হোল্ড আস্, উই উইল শূট দিস বয়। আমাদের রাস্তা ছেড়ে দাও, নইলে এই ছেলেটা আগে মরবে!"

কমান্ডোরা থমকে গেল। মুখোশধারীদের হুকুমে সন্তু উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। একবার সে চোখ তুলে দেখতে পেল রানাকে। এই একজন চেনা লোককে মিলিটারিদের সঙ্গে দেখেই সে সব বুঝতে পারল।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্রর কানে-কানে রানা কী যেন বললেন। বীরেন্দ্র ঘাড় নাড়লেন। মুখোশধারীরা সন্তুকে নিয়ে চলে এল ওঁদের কাছে। একজন বলল, "আমরা এই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাব। তোমরা আটকাবার চেষ্টা করলেই ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী কোথায়?"

সন্তুই উত্তর দিল, "কাকাবাবু ঐ বাঁ দিকের ঘরটার মধ্যে আছেন বোধহয়।"

রানা পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "সন্তু, ভয় পেয়ো না, ঠিক সাত পা যাবার পর তুমি মাটিতে বসে পড়বে!"

সন্তুর মাথার পাশে আর পেছনে দুটো রিভলভার। সে পা গুনতে লাগলো, এক...দুই...তিন...চার...

সাত গোনার পর সে বসে পড়তেই এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল। সন্তুর ধারণা হল, সে নিজেও বুঝি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে গুলিতে। মাটিতে তিন পাক গড়িয়ে গেল সে। তারপরই উঠে দাঁড়াল, তার কিছু হয়নি। মুখোশধারী দু'জন মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

সেদিকে তাকাবার সময় নেই সন্তুর, সে ছুটে এল রানার দিকে। রানা আর ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র দু'জনেই বললেন, "তোমার লাগেনি তো? যাক—"

রানা বললেন, "সেই বিশ্বাসঘাতক ভার্মাটা কোথায়? এখানেই আছে নিশ্চয়, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

সন্তু ঢুকে গেল উঁচু বেদী মতন জায়গাটার পাশের ঘরটায়। এইখানে দাঁড়িয়েই কেইন শিপটন কাকাবাবুকে ভয় দেখাচ্ছিল। রানা আর বীরেন্দ্রও সন্তুর সঙ্গে সঙ্গে এলেন সেই ঘরটার মধ্যে। ঘরের ছাদটা খোলা দেখে ওরা

অবাক হয়ে গেল প্রথমেই। তারপরই ওরা দেখতে পেল একটা বিশাল যন্ত্রের ঠিক সামনে কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর গায়ের ওপর ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো দেয়াল-ভাঙা পাথরের টুকরো।

সন্তু হাঁটু গেড়ে বসে ডাকছিল, "কাকাবাবু ! কাকাবাবু !"

দু'তিনবার ঝাঁকুনি দিতেই কাকাবাবু চোখ মেললেন। তারপরই উঠে বসে বললেন, "সে কোথায় গেল ? কেইন শিপটন ?"

রানা জিজ্ঞেস করলেন, "সে কে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই তো পালের গোদা ! এখানেই ছিল, তাকে কাবু করেছিলুম প্রায়··তারপর···কুকুরটাও ডাকছে না আর···সে নিশ্চয়ই এই পথ দিয়ে পালিয়েছে···"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র দু'জন কমান্ডোকে এ-ঘরে ডেকে আনলেন। তারা চটপট লাফিয়ে উঠে গেল ওপরে। ওপর থেকে জানাল যে, সেখানে একজন মানুষের পায়ের ছাপ আছে বরফের ওপরে।

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র বললেন, "তাহলে তো ওকে ধরতেই হবে। কিছুতেই পালাতে দেওয়া চলবে না ! আর ইউ অল রাইট, মিঃ রায়চৌধুরী ? কেইন শিপটনকে ধরবার জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাকাবাবু বললেন, "না ! আমি আর যাব না, যথেষ্ট হয়েছে !"

রানা বললেন, "আমরাও ওপরে একটা কুকুরের ডাক শুনেছিলুম বটে···সেদিকে আর মন দিতে পারিনি···অবশ্য এখানে একা-একা কেইন শিপটন আর পালাবে কী করে ? ধরা সে পড়বেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ধরা পড়ুক না পড়ুক, সে-সব এখন আপনাদের দায়িত্ব। আমি চেয়েছিলাম ওদের গোপন আস্তানাটা খুঁজে বার করতে। সেটুকু তো অন্তত পেরেছি ! সেটুকুই যথেষ্ট !"

এতক্ষণ বাদে তিনি যেন সন্তুকে দেখতে পেলেন। সন্তুর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তুই ঠিকঠাক আছিস তো সন্তু ? লাগেনি তো তোর ? বাঃ ! এখনও তোর একটা কাজ বাকি আছে। খুঁজে দ্যাখ তো আমার ক্রাচ দুটো কোথায় ? কাছাকাছিই কোথাও হবে হয় তো !"

রানা বললেন, "আপনার ঐ ভার্মা লোকটা কী করেছে জানেন ? সে যে এদেরই দলের লোক, তা বুঝেছিলেন ?"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "থাক, ওসব কথা পরে শুনব। এখন কোনওভাবে একটু চা খাওয়াতে পারেন ? মনে হচ্ছে কতদিন যেন চা খাইনি ! এ ব্যাটাদের এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে কি না বলতে পারেন ?"

রানার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনি বলেন কী, মিঃ রায়চৌধুরী ! এত গোলাগুলি, মারামারির মধ্যে আমি চায়ের খোঁজ করব ?"

কাকাবাবুর যেন এখন আর অন্য কোনও বিষয়েই কোনও আগ্রহ নেই। তিনি আবার বললেন, "এখন একটু চায়ের জন্য মনটা খুব ছটফট করছে। ওপরে আমাদের গম্বুজে স্টোরে ভাল চা আছে। চলুন, সেখানে গিয়ে আমি চা তৈরি করে খাওয়াব ! তারপর আমি কয়েক ঘন্টা বেশ ভাল করে ঘুম লাগাব। যথেষ্ট ধকল গেছে, এবার একটু ঘুম দরকার। বুঝলেন, মিঃ রানা, ঘুমের মতন এমন ভাল জিনিস আর কিছু নেই। আমি তো অলস ধরনের লোক, ঘুমোতে খুব ভালবাসি !"

রানা এবার জোরে হেসে উঠে বললেন, "যা বলেছেন ! আপনি অলসই বটে ! খোঁড়া পা নিয়ে হিমালয়ের এতখানি ওপরে এসে আপনি একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "পঙ্গুরাও গিরি লঙ্ঘন করে, এমন একটা কথা আছে জানেন না ?"

ব্রিগেডিয়ার বীরেন্দ্র তাঁর কমান্ডোদের নানারকম নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন। কয়েকজন এরই মধ্যে চলে গেছে কেইন শিপটনের খোঁজে। তিনি কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে মোট কতজন লোক ছিল, আপনি বলতে পারেন ? ঢোকার-বেরুবার রাস্তা কটা ? ওরা কি আপনার ওপর টর্চার করেছে ?"

কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "এখন নয়, এখন ওসব কথা আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না। বললুম না, আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে, আর ঘুম পাচ্ছে।"

এই সময় সন্তু ক্রাচ দুটো খুঁজে এনে দিতেই তিনি খুব খুশি হয়ে উঠে বললেন, "বাঃ, আর কী চাই !' চমৎকার ! চলুন, মিঃ রানা। এবার ওপরে গিয়ে পৃথিবীটাকে একটু ভাল করে দেখি, একটু খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই ! চল রে, সন্তু ! তুই এবার দারুণ কাণ্ড করেছিস !"

কাকাবাবু আদর করে এক হাতে সন্তুর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিলেন।
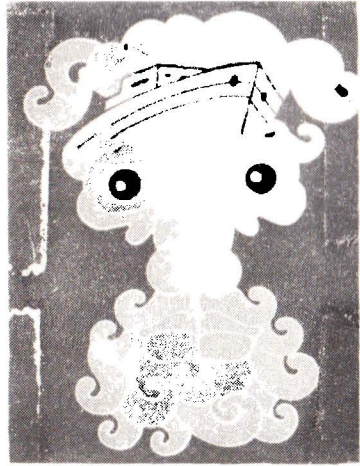
খালি জাহাজের রহস্য

খালি জাহাজের রহস্য

খবরের কাগজটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে কাকাবাবু বললেন, "কী রে সন্তু, একটু বেড়াতে যাবি ?"

কথাটা শুনেই সন্তুর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাকাবাবুর একটু বেড়াতে যাওয়া মানে তো হিমালয় কিংবা আন্দামান। কিংবা আরও দূর বিদেশেও হতে পারে। কয়েকদিন ধরেই কাকাবাবু দক্ষিণ আমেরিকার কথা বলছিলেন।

সন্তু বলল, "হ্যাঁ যাব। কোথায় কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু মর্নিং ওয়াক করতে যান, সেই জন্য জামা-জুতো পরেই ছিলেন। ক্রাচটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল না, ট্রেনে করে একটু ঘুরে আসি।"

প্লেনে নয়, ট্রেনে যেতে হবে শুনে সন্তু একটু দমে গেল। তা হলে তো বিদেশে যাওয়া হবে না। অবশ্য ট্রেনে চেপে বেড়াতেও সন্তুর ভাল লাগে।

সে বলল, "ক'টার সময় ট্রেন ? বাক্সটাক্স গুছিয়ে নিই তা হলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কিছু নিতে হবে না। চল এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি, স্টেশানে গেলে একটা কোনও ট্রেন পেয়ে যাব। তুই শুধু ওপরের ঘর থেকে আমার হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে আয়, আর বৌদিকে বলে আয় যে, আমাদের ফিরতে একটু রাত হতে পারে।"

সন্তু সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিল। কিন্তু জোজোকে খবর দেওয়া গেল না। ছুটির দিন, জোজো অনায়াসে সঙ্গে যেতে পারত।

বাড়ির বাইরে এসে কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ দেখি, একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় নাকি ?"

মিনিট পাঁচেক রাস্তা দূরে ছোট পার্ক আছে, সেইখানে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। সন্তু ছুটে গেল সেদিকে। মনে তার বেশ খটকা লেগেছে। একদিনের জন্য ট্রেনে করে বেড়াতে যাওয়া ? কাকাবাবুর তো আগে কখনও এরকম শখ হয়নি। কিংবা কাকাবাবু কখনও একদিন দু'দিনের জন্য কোথাও গেলেও সন্তুকে তখন সঙ্গে নেন না। অনেক দূরে গেলেই সন্তুকে তাঁর দরকার হয়।"

স্ট্যান্ডে একটা মোটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, সন্তু সেটার কাছে পৌঁছবার আগেই

এক ভদ্রলোক ধাঁ করে সেটায় উঠে বসলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর ছোট-ছোট পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সন্তু একটু নিরাশ হল। আবার কতক্ষণে ট্যাক্সি আসবে কে জানে !

তক্ষুনি একটা সাদা রঙের গাড়ি থামল সন্তুর গা ঘেঁষে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমান বলল, "কী রে সন্তু, কোথায় যাবি ? উঠে পড়, গাড়িতে উঠে পড় !"

বিমানের রং খুব ফর্সা আর মাথাভর্তি বড় বড় চুল, পাতলা লম্বা চেহারা। বিমানের ডাকনাম সাহেব। ছোটবেলায় তাঁকে সবাই সাহেব-বাচ্চা বলে ভুল করত। সবচেয়ে মজার কথা হল, বিমান প্লেন চালায়, এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট। নামের সঙ্গে কাজের এমন মিল খুব কম দেখা যায়।

সন্তু বলল, "না বিমানদা, আমি একটা ট্যাক্সি খুঁজছি।"

বিমান বলল, "তুই আবার এত সকালে ট্যাক্সিতে কোথায় যাবি ? চল, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।"

সন্তু আমতা আমতা করতে লাগল। কোথায় যাবে তা তো সে নিজেই জানে না। তারপর ট্রেনে যাবার কথা মনে পড়ায় বলল, "কাকাবাবুর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে যাব।"

বিমান বলল, "কাকাবাবু যাবেন ? আমি নিয়ে যাচ্ছি, এখন আমার কোনও কাজ নেই। আমার দু'দিন ছুটি।"

কাকাবাবুর নানারকম পছন্দ-অপছন্দ আছে, বিমানদার সঙ্গে যেতে রাজি হবেন কি না কে জানে ! কিন্তু বিমানদাকে তো আর 'না' বলা যায় না। সন্তু তাই উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাড়ির সামনে পৌঁছেই সন্তু বলল, "একটাও ট্যাক্সি পাওয়া যাচ্ছে না কাকাবাবু। সেইজন্যে বিমানদাকে বলে—"

কাকাবাবু বললেন, "তা বেশ তো, বিমান, তুমি আমাদের একটু শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দেবে নাকি ?"

বিমান বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন। শিয়ালদা যাবেন ? সন্তু যে বলল হাওড়া ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমরা শিয়ালদা দিয়ে একটু ক্যানিং যাব।"

বিমান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ক্যানিং যাবেন ? সেখানে কী আছে ?"

কাকাবাবু কখন কোথায় যেতে চান সে সম্পর্কে সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। সে ভাবে, সময় হলে তো জানতেই পারবে !

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ক্যানিং-এ কোনও মানুষ যায় না ! অনেকেই তো ওদিকে বেড়াতে যায়। আমরা ভাবছি ক্যানিং থেকে সুন্দরবন ঘুরে আসব।"

বিমান বলল, "সুন্দরবন ? সে তো খুব সাংঘাতিক জায়গা। কবে

ফিরবেন ? আপনাদের সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই...”

কাকাবাবু বললেন, “আজই রাত্তিরে ফিরে আসব।”

“আজই ? সুন্দরবন এত কাছে নাকি ? আমার ধারণা, সে তো অনেক দূর, সেখানে গভীর জঙ্গল, বাঘ-ভাল্লুক থাকে...”

“বিমান, তুমি প্লেন চালিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াও, অথচ নিজের দেশের খবর রাখো না। সুন্দরবন কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর-আশি মাইল দূরে।”

“এত কাছে ? তা হলে তো গাড়িতেই যখন-তখন যাওয়া যায়। তা হলে আমি কখনও সুন্দরবন দেখিনি কেন ? আমার চেনাশুনো কেউই সুন্দরবন যায়নি।”

“গাড়ি করে পুরোটা যাওয়া যায় না, কারণ মাঝখানে দু'একটা নদী পার হতে হয়, সেখানে ব্রিজ নেই। ক্যানিং বা নামখানা থেকে যেতে হয় লঞ্চে, সেইজন্যই বেশি সময় লাগে।”

বিমান তবু বিস্মিত চোখে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “সুন্দরবন এত কাছে ? সেখান থেকে বাঘ-ভাল্লুকরাও তো যে-কোনও সময় কলকাতায় এসে পড়তে পারে !”

কাকাবাবু বললেন, “সুন্দরবনে ভাল্লুক নেই, বাঘ আছে। খুব খিদে পেলে ওখানকার বাঘেরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি গ্রামে উৎপাত করে। কলকাতা পর্যন্ত আসার দরকার হয় না। বাঘেরা শহর পছন্দ করে না।”

বিমান বলল, “কাকাবাবু আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি ? এই সুযোগে তাহলে সুন্দরবনটা দেখে আসা হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “যেতে পারো কিন্তু তোমার গাড়িটা কী হবে ? শিয়ালদা স্টেশনে তোমার গাড়িটা সারাদিন ফেলে রাখবে ?”

“কেন, গাড়ি নিয়েই ক্যানিং পর্যন্ত চলে যাই। ট্রেনে যাওয়ার দরকার কী ? কোন রাস্তা দিয়ে ক্যানিং যাওয়া যায় বলুন তো ?”

“আগে গড়িয়ার দিকে চলো। তারপর নরেন্দ্রপুরের রাস্তা ধরবে।”

বিমান গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। বিমান সঙ্গে যাচ্ছে বলে বেশ খুশি হল সন্তু। বিমানদা খুব আমুদে ধরনের মানুষ। হঠাৎ যদি বিমানদার সঙ্গে দেখা না হত কিংবা সন্তু প্রথমেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে যেত, তাহলে এরকমভাবে গাড়ি করে বেড়াতে যাওয়াও হত না।

যাদবপুর ছাড়িয়ে গাড়িটা একটু ফাঁকা রাস্তায় পড়বার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “বিমান, তুমি যে চললে, তোমার আজ ডিউটি নেই ?”

বিমান বলল, “আমার আজ আর কাল ছুটি, পরশু একটা নিউইয়র্কের ফ্লাইট আছে। আপনি ঠিকই বলেছেন কাকাবাবু, আমরা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই, অথচ নিজের দেশের অনেক কিছুই দেখা হয় না। কিন্তু সুন্দরবনে যাচ্ছেন, সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক কিছু নিলেন না ?”

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তো শিকার করতে যাচ্ছি না। তাছাড়া বাঘ মারা এখন নিষেধ।"

"কিন্তু হঠাৎ যদি সামনে একটা বাঘ এসে পড়ে? বাঘ কি আমাদের ছাড়বে?"

"সুন্দরবনে সব জায়গাতেই তো বাঘ নেই। এ যাত্রায় আমার বাঘের কাছাকাছি যাবারও ইচ্ছে নেই। আমি যাচ্ছি একটা মোটরলঞ্চ দেখবার জন্য।"

"মোটরলঞ্চ দেখতে যাচ্ছেন? কিনবেন নাকি?"

"না লঞ্চ কিনব কেন? একটা ফাঁকা লঞ্চ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সুন্দরবনের কাছে এসে ঠেকেছে না?"

"ও, সেইটা?"

ক'দিন ধরেই এই লঞ্চটা নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে। সন্তুও পড়েছে। একটা বিদেশি লঞ্চ এসেছে সুন্দরবনে। কিন্তু তার ভেতরে কোনও মানুষ নেই। লঞ্চটি দেখতে ভারী সুন্দর, ভেতরটা খুব সাজানো-গোছানো। শয়নঘর, রান্নাঘর আছে। খাবারের টেবিলে দুটো সসেজ, খানিকটা চিজ আর দু' পিস পাউরুটি, পাশে আধকাপ কফি ছিল, কেউ যেন খেতে খেতে হঠাৎ উঠে গেছে। একটা রেডিও বাজছিল। কিন্তু লঞ্চের মালিকের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এমনকী কাগজপত্রও কিছু নেই।

কেউ-কেউ বলছে, ঐ লঞ্চে কোনও বিদেশি গুপ্তচর ছিল, কোনও কারণে হঠাৎ লঞ্চ থেকে নেমে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে আছে। কেউ বলছে, ঐ লঞ্চটা ছিল স্মাগলারদের, সমুদ্রের বুকেই অন্য কোনও স্মাগলারদের দল এদের আক্রমণ করে সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছে, লোকগুলোকেও মেরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। আরও অনেক রকম কথাই শোনা যাচ্ছে।

বিমানের গাড়িতে একটা ইংরেজি খবরের কাগজ রয়েছে। সে সেটা তুলে বলল, "আজকের কাগজে লঞ্চটার একটা ছবি বেরিয়েছে। পুলিশ এটাকে আটকে রেখেছে।"

সন্তু সকালবেলায় খবরের কাগজ পড়েনি। সে বিমানদার কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। সাদা ধপধপে লঞ্চটা। কাছেই কয়েকটা খালি-গায়ে বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সুন্দরবন তো দেখা যাচ্ছে না।

বিমান বলল, "আমার মনে হয়, স্পাই-টাই সব বাজে কথা। আজকাল কোনও স্পাই লঞ্চে করে ঘোরে নাকি? অত সময় কোথায় তাদের? তারা প্লেনে ঘোরাফেরা করে। আমার কী মনে হয় জানেন, ওটা কোনও ফিশিং বোট। জাপান বা কোরিয়া থেকে দু'একটা মাছ-ধরার লঞ্চ ঝড়ের মধ্যে পড়ে এদিক-সেদিক চলে যায়। ভেতরের লোকজন বেচারারা নিশ্চয়ই ঝড়ের সময় ছিটকে জলে পড়ে গেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হতে পারে। কিন্তু খাবারের টেবিলে খাবার পর্যন্ত সাজানো আছে, অথচ ভেতরে লঞ্চের লাইসেন্স কিংবা মালিকের পাসপোর্ট বা অন্য কোনও কাগজপত্র কিছুই নেই কেন ? সবই কি ঝড়ে উড়ে গেল ? তাছাড়া ফিশিং বোটের চেহারা অন্যরকম হয় !"

বিমান বলল, "স্মাগলারদের ব্যাপার অবশ্য হতে পারে। পৃথিবীর সব দেশেই সমুদ্রের ধারে চোরা-চালানিদের কাণ্ডকারখানা চলে। এখানে তো আবার জঙ্গল রয়েছে, আরও সুবিধে !"

কাকাবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, "আরে, আরে, করছ কী ? এটা কি তুমি এরোপ্লেন পেয়েছ নাকি ?"

একটু ফাঁকা রাস্তা পেয়েই বিমান গাড়িতে এমন স্পিড দিয়েছে, যেন সেটা এক্ষুনি মাটি ছেড়ে আকাশে উড়বে !

বিমান গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়ে হেসে বলল, "মনে থাকে না ! জানেন, একদিন চৌরঙ্গিতে খুব জ্যামের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম। তখন আমার ইচ্ছে করছিল, আমার গাড়িটা টেক অফ্ করে অন্য গাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাই।"

কাকাবাবু খুব হাসতে লাগলেন।

সন্তু বলল, "এরকম গাড়ি বার করলেই হয়, যা মাঝে-মাঝে উড়ে যেতেও পারবে। মাটিতেও চলবে, আবার জলের ওপর দিয়েও ভেসে যাবে !"

বিমান বলল, "হবে, হবে ! বিজ্ঞানের যা উন্নতি হচ্ছে, আর দু'চার বছরের মধ্যেই এরকম গাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, বিমানদা, তুমি যে এতদিন প্লেন চালাচ্ছ, তোমার প্লেন কোনওদিন হাইজ্যাকিং হয়নি ?"

বিমান বলল, "আমার প্লেনে কখনও হয়নি। কিন্তু হাইজ্যাকিং দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে !"

কাকাবাবুও কৌতূহলী হয়ে বললেন, "তাই নাকি ? কবে ?"

বিমানের পাশে সন্তু বসেছে। কাকাবাবু বসেছেন পেছনের সিটে। বিমান এবারে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "বলছি। তার আগে, কাকাবাবু, আপনার কাছে একটা পারমিশান চাই। আপনার সামনে আমি সিগারেট খেতে পারি ?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "না ! আমার সামনে খাওয়া চলবে না !"

বিমান বেশ অবাক হয়ে গেল। এরকমভাবে পারমিশান চাইলে সবাই বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেতে পারো, নিশ্চয়ই পারো।' অথচ কাকাবাবু 'না' বলছেন !

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, আগে আমার পাইপ খাবার দারুণ নেশা ছিল। পাইপ কিংবা চুরুট মুখে না দিয়ে থাকতেই পারতুম না। সেবারে, হিমালয়ে গিয়ে এই নেশাটা প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এখনও কেউ আমার সামনে সিগারেট কিংবা চুরুট বা পাইপ খেলে সেই ধোঁয়ার গন্ধে আমার মনটা

চনমন করে। সেইজন্যই বলছি, আমার সামনে খেও না, আড়ালে খেতে পারো। এখন যদি খুব ইচ্ছে করে, গাড়ি থামাও, আমি নেমে বাইরে দাঁড়াচ্ছি!"

বিমান লজ্জা পেয়ে বলল, "না, না, না, আমার সেরকম নেশা নেই, মাঝে-মাঝে এক-আধটা খাই। আমিও একেবারে ছেড়ে দেব ভাবছি।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কবে তুমি হাইজ্যাকিং দেখলে বিমানদা?"

বিমান বলল, "বছর দু'এক আগে। আমি তখন ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমেরিকার ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্যান-অ্যামের প্লেনে উঠেছি, একটা ডি. সি. টেন, যাব ক্যানাডার এডমান্টন শহরে এক বন্ধুর কাছে। সেই প্লেনের কমান্ডারের নাম টেড স্মিথ, আমার সঙ্গে তার আগে থেকেই চেনা ছিল। কক্‌পিটে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে গল্প করছি। এমন সময় দড়াম করে দরজা খুলে দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে সেখানে ঢুকল। ছেলেমেয়েগুলোর বয়েস হবে বাইশ-তেইশের মতন, দেখে মনে হয় মেক্সিক্যান। দু'জনের হাতে দুটো রিভলভার, একজনের হাতে একটা গ্রিনেড। মেয়েটাকেই মনে হল দলের লিডার, সে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলল, 'প্লেন ঘোরাও, কিউবার হ্যাভানা এয়ারপোর্টে চলো!' আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটা ধমকে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? যাও, ভেতরে যাও!' তারপর..."

গল্পে বাধা পড়ল। রাস্তার মাঝখানে কিসের যেন একটা ভিড়। দুটো গোরুর গাড়ি আর একটা লরি থেমে আছে রাস্তা জুড়ে।

বিমান বলল, "এই রে, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে মনে হচ্ছে!"

বিমান তার গাড়িটা রাস্তার পাশে মাঠে নামিয়ে ফেলল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ও কী করছ?"

"পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি!"

"না, না, তা হয় নাকি? গাড়ি থামাও, দেখি এখানে ব্যাপারটা কী হয়েছে!"

গাড়ি থেকে ওরা নেমে পড়ল তিনজনে।

একটা গোরুর গাড়ির সঙ্গে একটা জিপগাড়ির ধাক্কা লেগেছে। জিপগাড়িটাই পেছন থেকে এসে মেরেছে ধাক্কাটা। তার ফলে গোরুর গাড়িটা উল্টে গিয়ে গোরু দুটোর গলায় ফাঁস লেগে যায়। গোরু দুটো মরে যায়নি অবশ্য, কিন্তু নিশ্চয়ই খুব আহত হয়েছে, তারা প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করছে।

সন্তুর বুকটা মুচড়ে উঠল। গোরুর এরকম কাতর আর্তনাদ সে কখনও শোনেনি।

গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের অবশ্য বিশেষ কিছুই হয়নি। জিপগাড়িটাও রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে আধখানা নেমে পড়েছে, কিন্তু ড্রাইভার অক্ষত। ড্রাইভারের পাশে একজন লোক ছিল, প্রথম ধাক্কাতেই সে ছিটকে বাইরে পড়ে যাওয়ায় মাথায় খুব চোট লেগেছে। সেই লোকটাকে কেউ তুলে এনে রাস্তার মাঝখানে শুইয়ে দিয়েছে, মাথা একেবারে রক্তে মাখামাখি।

একদল লোক সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নানা রকম মন্তব্য করছে শুধু।

কাকাবাবু ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই আহত লোকটার কাছে এগিয়ে গেলেন। হাঁটু গেড়ে বসে লোকটার এক হাত তুলে নাড়ি দেখে অস্ফুট ভাবে বললেন, "এখনও বেঁচে আছে।"

তারপর ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া গলায় বললেন, "আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছেন সবাই? থানায় খবর দিয়েছেন? এখানে কাছাকাছি হাসপাতাল কোথায়? এই লোকটিকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেননি? চিকিৎসা করলে এখনও ও বেঁচে যাবে!"

ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক বলল, "এখান থেকে থানা অনেক দূরে, হেল্‌থ সেন্টারও বেশ দূরে।"

কাকাবাবু বললেন, "দূরে বলে কি খবর দেওয়া যায় না? আপনাদের কারুর সাইকেল নেই? মানুষ বিপদে পড়লে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতে নেই, একটা কিছু করতে হয়। বিমান, ধরো তো, এই লোকটিকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিই!" জিপগাড়ির ড্রাইভারটি এসে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়াল। দেখে মনে হয় সে বেশ মারধোর খেয়েছে। জামা-কাপড় ছেঁড়া। সে বলল, "স্যার, আমার গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "আসুন!"

লোকটিকে ধরাধরি করে তোলা হল গাড়িতে। পেছনের সিটে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল, জিপের ড্রাইভার বসল তার মাথাটা কোলে নিয়ে। কাকাবাবু সামনের সিটে চলে এলেন।

গাড়ি ছাড়বার পর বিমান জিজ্ঞেস করল, "অ্যাকসিডেন্ট হল কী করে? শুধু শুধু একটা গোরুর গাড়িকে ধাক্কা মারতে গেলেন কেন?"

জিপের ড্রাইভার বলল, "ব্যাড লাক, স্যার, আমার কোনও দোষ নেই। গোরুর গাড়িটা রাস্তার পাশ দিয়ে চলছিল, হঠাৎ চলে এল মাঝখানে। এই সব গোরুর গাড়িগুলোর এই দোষ, কখন যে কোন দিকে যাবে, তার ঠিক নেই। গোরু তো আর ইঞ্জিন নয় যে, সব সময় মালিকের কথা শুনবে! এদিকে আমার হল কী স্যার, আমি খুব জোরে ব্রেক চাপলুম, কিন্তু ব্রেক নিল না। ব্রেক ফেল। আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন, আপনি জানেন যে, ব্রেক ফেল করলে আর করার কিছু নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু গোরু কেন, ইঞ্জিন কিংবা যন্ত্রপাতিও সব সময় মানুষের কথা শোনে না! আপনারা আসছেন কোথা থেকে?"

জিপের ড্রাইভার বলল, "ক্যানিং থেকে। আমার গাড়ির কন্ডিশান ভাল নয়, অনেকদিন সারভিসিং করানো হয়নি। আমি আসতে রাজি হইনি, স্যার, কিন্তু এই লোকটা দুশো টাকা অফার করে বলল, এক ঘন্টার মধ্যে বারুইপুর পৌঁছে

দিতে হবে।"

সন্তু পেছন ফিরে আহত লোকটিকে ভাল করে দেখল। অতি সাধারণ একটা শার্ট আর ধুতি পরা। মুখখানা দেখলেও মনে হয় না যে, এই ধরনের লোক দুশো টাকা দিয়ে জিপ ভাড়া করে এক ঘন্টার মধ্যে বারুইপুর পৌঁছতে চাইবে। সন্তু ভাবল, আহা রে, লোকটা অত তাড়াতাড়ি নিশ্চয়ই কোনও জরুরি কাজে বারুইপুর পৌঁছতে চাইছিল। এখন না বারুইপুরের বদলে স্বর্গে পৌঁছে যায়!

পাঁচ-ছ কিলোমিটার যাবার পরেই রাস্তার ধারে একটা হেল্‌থ সেন্টার চোখে পড়ল। আহত লোকটি আর জিপ-ড্রাইভারকে নামিয়ে দেওয়া হল সেখানে।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে জিপ-ড্রাইভারকে বললেন, "আপনাদের দু'জনের নাম আর ঠিকানা এতে লিখে দিন!"

জিপ-ড্রাইভারের কাছে কলম-টলম নেই। কিন্তু আহত লোকটির বুক পকেটে একটা ডট পেন রয়েছে, ড্রাইভার সেটা তুলে নিয়ে লিখতে লিখতে বলল, "স্যার, আমার নাম সুরেনচন্দ্র সাঁপুই, আমার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, কিন্তু এর নাম তো আমি জানি না স্যার। আমার সাথে চেনা নেই স্যার। বলল তো বাসন্তী জাহাজঘাটার কাছে বাড়ি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে।"

কাকাবাবুর কালো ব্যাগটার মধ্যে ছোট্ট ক্যামেরা থাকে। সেটা খুলে তিনি আহত লোকটির মুখের কয়েকটা ছবি তুললেন। জিপ ড্রাইভারেরও একটা ছবি নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এবার আমরা চলি, অ্যাঁ?"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করার পর বিমান জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আপনি লোক দুটোর ছবি নিলেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাকসিডেন্ট কেস তো, হয়তো পুলিশ এর পরে আমাদের সাক্ষী দেবার জন্য ডাকতে পারে। লোকদুটোর চেহারা ততদিনে বোধহয় ভুলেই যাব। আচ্ছা, বিমান, যে-লোকটা আহত হয়েছে, তাকে তোমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হল না?"

বিমান বলল, "কোন্ দিক দিয়ে বলুন তো?"

"লোকটির চেহারা বা পোশাক দেখে মনে হয় সাধারণ একজন গ্রামের লোক। ক্যানিং থেকে ট্রেনে বারুইপুর যেতে দু'তিন টাকা লাগে। অথচ লোকটা দুশো টাকা দিয়ে জিপ ভাড়া করে এক ঘন্টার মধ্যে যেতে চেয়েছিল, এটা কি ওকে মানায়?"

সন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলল, "আমার ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল, কাকাবাবু!"

বিমান বলল, "এমনও তো হতে পারে যে, এখন কোনও ট্রেন নেই ক্যানিং থেকে। ঐ লোকটা কোনও অসুস্থ লোককে দেখতে যাচ্ছে!"

কাকাবাবু বললেন, "সে রকম যে হতে পারে না তা নয় ! তবে, লোকটার নাড়ি দেখবার জন্য আমি বাঁ হাত ধরেছিলাম। সে হাতে একটা ঘড়ি পরা। অত্যন্ত দামী সুইস ঘড়ি। সুন্দরবনের একজন গ্রামের লোকের হাতে এরকম ঘড়ি যেন মানায় না।"

সন্তু বলে উঠল, "স্মাগলার !"

বিমান বলল, "গ্রামের কিছু-কিছু লোক কিন্তু খুব বড়লোক হয় ! জোতদার না কী যেন বলে তাদের। অনেক সময় আমাদের প্লেনে এরকম কিছু প্যাসেঞ্জার ওঠে, তারা ইংরিজি বলতে পারে না। কোনওরকম আদব-কায়দা জানে না, কিন্তু পকেটে গোছা-গোছা নোট !"

কাকাবাবু বললেন, "ক্যানিং থানায় গিয়ে ঘটনাটা রিপোর্ট করতে হবে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বিমানদা, তারপরে কী হল ? সেই যে তোমাদের প্লেনটা হাইজ্যাকিং হল..."

গল্পে একবার বাধা পড়লে আর ঠিক সেইরকম জমে না।

বিমান বলল, "তারপর আমাদের প্লেনটাকে কিউবার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হল। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম ককপিটেই। একজন হাইজ্যাকার টেড স্মিথের ঘাড়ের কাছে রিভলভার উঁচিয়ে রইল। আমার এক-একবার ইচ্ছে করছিল, ছেলেটাকে এক ঘুষি মারি। কিন্তু মেয়েটির হাতে গ্রিনেড, ওটা যদি একবার ছুঁড়ে মারে, তাহলে গোটা প্লেনটাই ধ্বংস হয়ে যাবে আকাশে, তাই সাহস পেলুম না।"

কাকাবাবু বললেন, "একবার অ্যারিজোনায় এরকম একটা প্লেন ধ্বংস হয়ে সব যাত্রী মারা গিয়েছিল।"

বিমান বলল, হ্যাঁ। "তারপর আমরা হ্যাভানায় নামলুম। ছ' ঘন্টা প্লেনের মধ্যে বসে থাকার পর আমাদের বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। কিউবার সরকার খুব চালাক। হাইজ্যাকারদের সব ক'টা শর্ত মেনে নিল, তারপর তারা প্লেন থেকে নেমে আসতেই বন্দী করা হল তাদের। কিউবার সরকার আমাদের ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে আবার ফেরত পাঠিয়ে দিল।"

সন্তু বেশ হতাশ হল। সে খানিকটা গুলি-গোলা চালানো, মারামারির গল্প আশা করেছিল। সে বলল, "মোটে এই !"

রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর দেখেই বোঝা গেল ক্যানিং শহর এসে গেছে।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ক্যানিং কি বেশ বড় জায়গা ?"

কাকাবাবু বললেন, "এককালে এর নাম ছিল ক্যানিং পোর্ট। এখানে জাহাজ এসে থামত। এখন জাহাজ আসে না বটে, কিন্তু প্রচুর যাত্রী-লঞ্চ ছাড়ে এখান থেকে। শহরটা খুব বড় নয়, তবে জায়গাটার খুব গুরুত্ব আছে। ক্যানিংকে বলা হয় সুন্দরবনের গেটওয়ে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জায়গাটার নাম ক্যানিং কেন ? এখানে কি টিনের

কৌটো তৈরি হয় ?”

কাকাবাবু বললেন, “না, সেই ক্যানিং নয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের এক বড়লাট ছিলেন লর্ড ক্যানিং। তার নাম থেকে হয়েছে। সন্দেশ-রসগোল্লা-লেডিকেনির মধ্যে লেডিকেনির নামও হয়েছে এই লর্ড ক্যানিং-এর বউয়ের নাম থেকে।”

বিমান বলল, “আচ্ছা কাকাবাবু, একটা কথা আমি তখন থেকে ভাবছি। এই যে খালি লঞ্চটা ভেসে এসেছে, এটা স্পাই কিংবা স্মাগলারদের ব্যাপার যাই হোক না কেন, তা নিয়ে পুলিশ খোঁজখবর করবে। আপনি তো কখনও এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। আপনি তা হলে এত দূরে ছুটে এলেন কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ, স্মাগলার কিংবা স্পাই ধরা আমার কাজ নয়। তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি এসেছি অন্য কারণে। লঞ্চটা সম্পর্কে আমার একটা অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে, সেটা মিলিয়ে দেখার জন্যই যাচ্ছি।”

“কী সন্দেহ ?”

“আগে লঞ্চটা দেখি একবার। তারপরে বলব।”

২

ইংরেজ বড়লাটের নামে শহর, তাই সন্তু আশা করেছিল, ক্যানিং বেশ সাজানো-গোছানো, সুন্দর, ছিমছাম জায়গা হবে। গাড়িটাকে একটা পেট্রোল পাম্পে রেখে ওরা খানিকটা হাঁটবার পরেই বোঝা গেল, সেরকম কিছুই না। বেশ নোংরা আর ঘিঞ্জি শহর, কাদা-প্যাচপেচে ভাঙা রাস্তা, তার দু' পাশে অসংখ্য ছোট-ছোট দোকান। সব জায়গায় কেমন যেন আঁশটে গন্ধ !

রাস্তার কাদায় কাকাবাবুর ক্রাচ বসে যাচ্ছে বলে তাঁর হাঁটুতে অসুবিধে হচ্ছে। তিনি বললেন, “বছর সাতেক আগে আমি শেষবার ক্যানিং এসেছিলুম, তার চেয়েও জায়গাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে। তবে, লঞ্চে ওঠার পর তোমাদের ভাল লাগবে। তার আগে থানাটা কোথায় চলো খোঁজ করা যাক।”

লোকজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা থানায় পৌঁছে গেল।

কাকাবাবু জিপগাড়ি আর গোরুর গাড়ির দুর্ঘটনার কথা জানালেন। থানার বড় দারোগা বললেন যে, তিনি একটু আগেই টেলিফোনে ঘটনাটা জানতে পেরেছেন। ছোট দারোগাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে।

একটা খাতা টেনে নিয়ে বড় দারোগা বললেন, “যাই হোক, আপনাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যান। পরে দরকার হতে পারে। উণ্ডেড লোকটাকে আপনারা ভর্তি করে দিয়েছেন তো ?”

সেই খাতায় নাম-টাম লিখে দেবার পর কাকাবাবু বললেন, "দারোগাবাবু, আপনাকে আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। বিদেশি যে-লঞ্চটা সমুদ্রে ভেসে এসেছে, সেটা এখন কোথায় আছে ?"

ভদ্রলোক চোখ তুলে কাকাবাবুকে একবার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপর কড়া গলায় বললেন, "কেন, সেটা আপনি জানতে চাইছেন কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "একবার সেই লঞ্চটা একটু দেখতে চাই।"

"কেন ? আপনারা কি কাগজের রিপোর্টার ?"

"আজ্ঞে না। এমনই একটা কৌতূহল।"

"সেই লঞ্চটা দেখবার জন্য আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"এই কৌতূহলের কারণ জানতে পারি কি ?"

"একটা বিদেশি লঞ্চ সমুদ্র দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে, সেটা দেখার জন্য তো কৌতূহল হতেই পারে, তাই না ? লঞ্চটা দেখার কি কোনও বারণ আছে ? অনেকেই তো দেখেছে, কাগজে কাগজে ছবি পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে !"

দারোগাবাবু কাকাবাবুর মুখের দিকে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, "আপনার কী নাম বললেন ? রাজা রায়চৌধুরী...মানে...সেই 'সবুজ দ্বীপের রাজা' নামে বইটায়..."

সন্তু পাশ থেকে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইনি সেই কাকাবাবু !"

দারোগা অমনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ও, তাই বলুন ! আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল...আপনার কত বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনা...আপনি ইচ্ছে করলেই...কী খাবেন, স্যার, বলুন ! চা ? ডাবের জল ?"

কাকাবাবু বললেন, "এখন কিচ্ছু খাব না। লঞ্চটা কোথায় আছে বলুন, আমাদের আজ রাতের মধ্যেই ফিরতে হবে !"

"বসুন, স্যার, বসুন আপনারা ! একটু চা অন্তত খান। আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুন্দরবন অঞ্চলটা ভাল করে চেনেন কি ? নইলে বুঝতে পারবেন না !"

বড় দারোগা একটা ম্যাপ বিছিয়ে ফেললেন টেবিলের ওপরে।

একটা পেন্সিলের উল্টোপিঠ দিয়ে বোঝাতে লাগলেন, "এই যে দেখুন, ক্যানিং, আপনারা এখানে আছেন। তারপর বাসন্তী, তারপর এই গোসাবা। এখান থেকেই আসল সুন্দরবনের শুরু। জঙ্গলের পাশ দিয়ে এই চলে গেছে দত্তর গাঙ, সেটা গিয়ে পড়েছে হরিণভাঙা নদীতে। এদিকে দু'পাশেই গভীর জঙ্গল কিন্তু। হরিণভাঙা নদী এখানে অনেক চওড়া হয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল। এ পাশটায় বাঘমারা ফরেস্ট। এইখানটায় এসে আটকে ছিল লঞ্চটা।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আটকে ছিল বলছেন কেন ? এখন নেই ?"

"লঞ্চটাকে ওখান থেকে গোসাবায় নিয়ে আসার কথা। এর মধ্যে পৌঁছে

গেছে কি না সে খবর আমরা পাইনি। আপনারা এক কাজ করুন। পুলিশের একটা লঞ্চ যাচ্ছে ওদিকে। কলকাতা থেকে দুজন বড় অফিসার এসেছেন। মিঃ ভট্টাচার্যি আর মিঃ খান, তাঁরা যাচ্ছেন এস. পি. সাহেবের লঞ্চে। আপনার নাম শুনলে নিশ্চয়ই নিয়ে যাবেন ওঁরা।"

কাকাবাবু বললেন, "ভট্‌চার্যি...মানে অ্যাডিশনাল আই. জি. ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ !"

"ওঁকে আমি ভাল করেই চিনি। তা হলে ওঁদের লঞ্চে গেলেই তো ভাল হয় !"

"এক্ষুনি জেটিঘাটে চলে যান স্যার। ওঁদের লঞ্চ তাড়াতাড়ি ছাড়বে। মানে, আমারও তো জেটিঘাটে যাবার কথা ছিল, বুঝলেন না, বড়সাহেবরা সব এসেছেন, কিন্তু আমার কলেরার মতন হয়েছে, প্রতি দশ মিনিট অন্তর বাথরুমে...সেইজন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি..."

থানা থেকে বেরিয়ে ওরা রওনা দিল জেটিঘাটের দিকে। কাকাবাবু বললেন, "আমি তো আর এ-রাস্তায় তেমন তাড়াতাড়ি যেতে পারব না। বিমান, তুমি আর সন্তু আগে আগে চলে যাও। পুলিশের লঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে পারে। তোমরা গিয়ে আমার নাম করে একটু অপেক্ষা করতে বলো !"

বিমান আর সন্তু ছুট লাগাল। ওরা তো চেনে না, তাই লোককে জিজ্ঞেস করতে লাগল জেটিঘাট কোন্ দিকে। এমন সরু আর পিছল রাস্তা, তাতেও বেশ ভিড়। রাস্তাটা বড় পুকুরের পাশ দিয়ে নদীর ধারে বাঁধের উপর উঠেছে। এই বাঁধের ওপর দিয়ে আবার অনেকটা যেতে হয়।

জেটিঘাটের কাছে অনেকগুলো লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কোন্‌টা যে পুলিশের লঞ্চ, তা বোঝবার উপায় নেই।

টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে বিমান জিজ্ঞেস করল, "পুলিশের লঞ্চ কখন ছাড়বে বলতে পারেন ?"

টিকিটবাবুটি গোমড়া মুখে প্রায় ধমক দিয়ে উত্তর দিল, "পুলিশের লঞ্চ কখন ছাড়বে, তার আমি কী জানি ! 'বন-বালা' ছাড়বে পাঁচ মিনিটের মধ্যে, যদি টিকিট কাটতে চান তো বলুন !"

বিমান বলল, "না, আমাদের পুলিশের লঞ্চটাই দরকার। সেটা কোন্‌খানে আছে, একটু দেখিয়ে দেবেন ?"

লোকটি বলল, "আচ্ছা মুশকিল তো ! আমি পুলিশের লঞ্চের খোঁজ রাখতে যাব কোন্ দুঃখে ? আমি কি চোর না ডাকাত ?"

সন্তু এগিয়ে গেছে জলের দিকে। তারই বয়েসি একটি ছেলে মাথায় করে কোনও যাত্রীর সুটকেস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার পাশে গিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ভাই, বলতে পারো, এর মধ্যে পুলিশের লঞ্চ কোন্‌টা ?"

ছেলেটি থেমে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর বলল, "হেথা নাই গো

বাবু !”

তারপর নদীর মাঝখানে একটা চলন্ত লঞ্চ দেখতে পেয়ে আবার বলল, “হুই যে পুলিশের লঞ্চ। হুই যে যায়, ‘মন-পবন’।”

বিমান ততক্ষণে সেখানে চলে এসেছে। ছেলেটির কথা শুনে সে বলল, “এই রে, ছেড়ে চলে গেছে ? কী হবে ! লঞ্চটাকে থামানো যায় না ?”

মালবাহক ছেলেটি বলল, “কেন যাবে না ? আপনি ‘বন-বালা’র সারেঙসাহেবকে গিয়ে বলেন না, হুইসিল বাজিয়ে থামিয়ে দেবে !”

“সারেঙকে এখন কোথায় পাব ?”

“ঐ যে ডেকের উপরে চেক্-লুঙ্গি পরে দাঁড়িয়ে আছে। উনিই তো সারেঙ সাহেব !”

লঞ্চের ওপর থেকে একটা লম্বা কাঠের পাটাতন ফেলে দেওয়া হয়েছে জেটির ওপর। একজন লোক পাশে একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বাঁশ ধরে, পাটাতনের সিঁড়ি দিয়ে লঞ্চে উঠতে হয়।

বিমান সেই পাটাতনের সিঁড়ির কাছে গিয়ে চেক-লুঙ্গি-পরা লোকটিকে ডেকে বলল, “সারেঙসাহেব, হুইস্‌ল বাজিয়ে ঐ পুলিশের লঞ্চটা থামাবেন ? আমাদের বিশেষ দরকার।”

গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা সারেঙসাহেব একমনে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, বিমানের কথাটা শুনে একটা অদ্ভুত হাসি দিয়ে বললেন, “অ্যাঁ ? কী বললেন, পুলিশের লঞ্চ থামাব ? কেন ? কোথাও ডাকাতি হয়েছে ?”

বিমান একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, “না, মানে সেসব কিছু নয়, এমনিই আমাদের খুব দরকার !”

সারেঙসাহেব বললেন, “আপনার দরকার হয়, আপনি নিজেই হাঁক পাড়ুন। আমায় এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন ?”

তারপর সারেঙসাহেব আর একখানা অবজ্ঞার হাসি দিয়ে ঢুকে গেলেন নিজের কেবিনে। পুলিশের লঞ্চ ‘মন-পবন’ ততক্ষণে আরো দূরে চলে গেছে।

নিরাশ হয়ে সন্তু আর বিমান এল টিকিটঘরের দিকে।

বিমান বলল, “আমি প্লেন চালাই আর এই সারেঙ সামান্য একটা লঞ্চ চালায়, কিন্তু সারেঙের কীরকম পার্সোনালিটি দেখলি ? আমাকে একেবারে আউট করে দিল !”

সন্তু বলল, “সারেঙসাহেবের গোঁফটা দেখেছ ? ঠিক কাকাবাবুর মতন !”

টিকিটঘরের ছোকরা বাবুটি বলল, “আপনারা কি ‘বন-বালা’য় যাবেন ? নইলে এখান থেকে একটু সরে দাঁড়ান !”

বিমান বলল, “কী ব্যাপার রে সন্তু ? এখানে সবাই যে ধম্‌কে কথা বলে !”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “এর পরের লঞ্চ আবার কখন ছাড়বে ?”

"আবার আড়াই ঘন্টা বাদে। আমি এক্ষুনি কাউন্টার বন্ধ করে দিচ্ছি।"

'বন-বালা' লঞ্চ ছাড়ার টং টং শব্দ হল। পাটাতনের সিঁড়িও তুলে নেওয়া হল ওপরে।

সন্তু বলল, "এই রে, কাকাবাবু তো এখনও এলেন না? তা হলে কি আমাদের এখানে আড়াই ঘন্টা বসে থাকতে হবে?"

দূরে বাঁধের ওপর দেখা গেল কাকাবাবু আস্তে আস্তে আসছেন। বাঁধের ওপরেও মাঝে মাঝে কাদা জমে আছে, ক্র্যাচ ফেলার খুবই অসুবিধে।

বিমান টিকিটবাবুকে বলল, "না, না, আমাদের এটাতেই যেতে হবে। আপনি 'বন-বালা'কে একটু থামান অন্তত!"

টিকিটবাবু বলল, "বন-বালাকে থামাব? কেন?"

বিমান বলল, "একজন লোক ঐ যে আসছেন। তাঁকে এটাতেই যেতে হবে!"

"একজন লোক আসছে বলে আমায় লঞ্চ লেট করাতে হবে? এ কি আবদার পেয়েছেন?"

সন্তু বলল, "একজন তো নয়, তিনজন। উনি এসে পৌঁছুলে আমরাও যাব!"

"ও, তিনজন। তাই বলুন! তিনজনের জন্য থামানো যেতে পারে!"

এই বলে টিকিটবাবু একটা হুইস্‌ল ফ-র-র-র করে বাজালেন বেশ জোরে। 'বন-বালা' ততক্ষণে জেটি ছেড়ে গেছে। আবার ঘ্যাস-ঘ্যাস, টং-টং শব্দ করে ধারে ভিড়ল।

কাকাবাবু এসে পৌঁছুতেই সব কথা জানাল বিমান। কাকাবাবু বিশেষ বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, "কী আর করা যাবে, এই লঞ্চেই গোসাবা পর্যন্ত যাওয়া যাক।"

পকেট থেকে টাকা বার করে তিনি সন্তুকে দিয়ে বললেন, "তিনখানা টিকিট কেটে নে!"

পাটাতনের সিঁড়ি দিয়ে সন্তু লঞ্চে উঠে গেল সহজেই। বিমানেরও কোনও অসুবিধে হল না। মুশকিল হল কাকাবাবুকে নিয়ে। অত সরু পাটাতনের ওপর ক্র্যাচ ফেলা মুশকিল, তার ওপর আবার এক হাতে বাঁশের রেলিং ধরে ব্যালান্স রাখতে হবে। একটু এদিক-ওদিক হলেই নীচের জলকাদার মধ্যে ধপাস।

কাকাবাবু কী করে ওঠেন, সেটা দেখার জন্য একদল যাত্রী ডেকের ওপর ভিড় করে এল। যেন এটা একটা মজার ব্যাপার।

কাকাবাবু পাটাতনের ওপর এক পা দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ক্র্যাচ দুটো লঞ্চের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "সন্তু, ধর!"

এবারে তিনি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে চলে এলেন।

একদল যাত্রী হাততালি দিয়ে উঠল। যেন এটা একটা সার্কাসের খেলা।

সন্তুর খুব রাগ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলাও যায় না।

লঞ্চটা একেবারে যাত্রীতে ঠাসা। একতলায় একটুও জায়গা নেই। ছাদের ওপরে খোলা জায়গায় রোদ্দুরের মধ্যে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল। বিমান একটু চলে গেল সারেঙসাহেবের কেবিনের দিকে, তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে, আর এই সুযোগে কাকাবাবুর চোখের আড়ালে গিয়ে একটা সিগারেট টানতে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এটা কী নদী ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই নদীর নাম মাতলা। এক সময় খুব বিরাট আর দুর্দান্ত নদী ছিল। এখন মাঝখানে চড়া পড়ে গেছে! সব নদীগুলোরই অবস্থা এখন কাহিল।"

পারের দিকে একটা পুরনো আমলের মস্ত বড় বাড়ির দিকে আঙুল তুলে কাকাবাবু বললেন, "ঐ যে বাড়িটা দেখছিস, ওটা ছিল হ্যামিলটন সাহেবের কাছারিবাড়ি। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন জমিদার, সুন্দরবনের এদিককার অনেক উন্নতি করেছেন। গোসাবায় গিয়ে আরও দেখতে পাবি।"

বিমান ফিরে এসে বলল, "সারেঙসাহেবের নাম হাসান মির্জা। আমায় কোনও পাত্তাই দিল না। আমি বললুম, 'আমি প্লেন চালাতে জানি, আমার একটু লঞ্চ চালাতে শিখিয়ে দেবেন ?' তা শুনে মির্জাসাহেব বললেন, ' আপনার পেট গরম হয়েছে আপনি চা খাওয়া একদম বন্ধ করে দিন। সকালবেলা কুলত্থ ভিজিয়ে খান !' কুলত্থ কলাই কী জিনিস, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু খুব হাসতে লাগলেন।

সন্তু বলল, "বিমানদা, তুমি প্লেন চালাও শুনে সারেঙ ভেবেছে তুমি গুল মারছ, কিংবা পাগল হয়ে গেছ !"

বিমান বলল, "কী ঝঞ্ঝাট! যারা চালায়, তারা বুঝি সুন্দরবনে বেড়াতে আসতে পারে না ? আর সুন্দরবনে বেড়াতে এলে তো এই সব লঞ্চেই চাপতে হবে !"

তারপরেই নদীর দু'ধারে তাকিয়ে বিমান বলল, "কই, জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না তো !"

কাকাবাবু বললেন, "আসল জঙ্গল এখনও অনেক দূর! তবে মাঝে-মাঝে এমনি জঙ্গল দেখতে পাবে।"

বিমান বলল, "বেশ লাগছে কিন্তু। ভাগ্যিস এসেছিলুম আপনাদের সঙ্গে ! সেই কলেজে পড়ার সময় একবার গঙ্গায় চেপেছিলুম, তারপর আর কখনও লঞ্চে করে বেড়াইনি !"

সন্তু বলল, "তুমি আজ সুন্দরবনের নদীতে বেড়াচ্ছ, আবার দু'দিন বাদেই নিউ ইয়র্কে চলে যাবে। তোমার বেশ মজা, না বিমানদা ?"

বিমান বলল, "রোজ রোজ প্লেন চালাতে আর অত ভাল লাগে না রে ! নিউ ইয়র্কে আমি অন্তত একশো বার গেছি। তার চেয়ে এই বাড়ির কাছেই নতুন

জায়গায় বেড়াতে বেশি ভাল লাগছে।”

কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, তুই এক কাজ কর তো। এখানে না দাঁড়িয়ে তুই বরং সারা লঞ্চটা একবার টহল দিয়ে আয়। যদি কোথাও শুনিস যে, লোকেরা সেই বিদেশি লঞ্চটা নিয়ে আলোচনা করছে, তাহলে মন দিয়ে শুনবি।”

সন্তু চলে যেতেই গেরুয়া কাপড় আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একজন লোক কাকাবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল। দু' হাত তুলে বলল, “নমস্কার, রায়চৌধুরী মশাই! এদিকে কোথায় চললেন?”

কাকাবাবু বেশ অবাক হলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, “আপনাকে চিনতে পারলুম না তো! আপনিই বা আমায় কী করে চিনলেন? আপনি কে?”

লোকটি বলল, “আমার নাম ছোট সাধু। আমার আর অন্য কোনও নাম নেই। আমার বাবাকে সবাই বলত বড় সাধু, সেই হিসেবে আমি ছোট সাধু।”

“আপনি আমায় চেনেন? আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না!”

“আপনি আমায় মনে রাখেননি। কিন্তু আমি মনে রেখেছি। আপনি খোঁড়া মানুষ, আপনাকে একবার দেখলেই চেহারাটা মনে থাকে।”

বিমান বিরক্ত হয়ে সাধুটির দিকে তাকাল। সত্যিকারের খোঁড়া লোককে কেউ মুখের ওপর খোঁড়া বলে? এ আবার কী রকমের সাধু?

কাকাবাবু কিন্তু না রেগে গিয়ে হাসলেন। লোকটির চোখের উপর চোখ রেখে বললেন, “হ্যাঁ, আমাকে একবার দেখলে মনে রাখা সহজ। কিন্তু আমারও তো স্মৃতিশক্তি খারাপ নয়। মানুষের মুখ আমি চট করে ভুলি না। আপনার সঙ্গে আমার কোথায় দেখা হয়েছিল, বলুন তো?”

কথাটার উত্তর না দিয়ে ছোট সাধু এদিক-ওদিক তাকালেন। আরও অনেক লোক কাকাবাবুর দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে আছে। লঞ্চের যাত্রীরা আর-সবাই স্থানীয় লোক, কাকাবাবু আর বিমানকে দেখলেই বোঝা যায়, ওঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন।

অন্যরা যাতে শুনতে না পায় এই জন্য ছোট সাধু কাকাবাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, “জেলখানায়! ব্যাস, ও সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আপনি কি রাঙাবেলের মাস্টারবাবুর কাছে যাচ্ছেন? তা হলে আমার আশ্রমে একবার আসবেন। আমিও রাঙাবেলেতেই থাকি।”

এই সময় একটা বাচ্চা ছেলে এসে বিমানের জামা ধরে টেনে বলল, “ও দাদা, সারেঙসাহেব আপনাকে ডাকছেন!”

বিমান ছেলেটির সঙ্গে চলে গেল।

ছোট সাধু বললেন, “রায়চৌধুরীসাহেব, আপনার মতন মানুষ এই রকম সাধারণ লঞ্চে যাচ্ছেন কেন? আপনি চাইলেই গবরমেন্টের এসপেশাল বোট পেতে পারতেন। এই ভিড়ের মধ্যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।”

কাকাবাবু বললেন, "কিসের কষ্ট ? তবে একটু বসতে পারলে ভালই লাগত। গোসাবা যেতে কতক্ষণ লাগবে ?"

"তা ধরেন, তিন সাড়ে-তিন ঘন্টা তো বটেই। এদিকে থাকবেন বুঝি কিছুদিন ?"

"না, আজই রাতে ফিরব।"

"আজ আপনার ফেরা হবে না।"

"তার মানে ? কেন ফেরা হবে না ?"

"আপনারা তো সাধু-সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু দেখবেন, আমার কথাটা ফলে কি না। আজ আপনি ফিরতে পারবেন না।"

"আমি রাঙাবেলিয়া যাচ্ছি না। শুধু গোসাবা পর্যন্ত যাব।"

"দেখুন কী হয় !"

বিমান ফিরে এসে উত্তেজিতভাবে বলল, "আমাদের খুব গুড লাক, কাকাবাবু, পুলিশের লঞ্চটা মাঝ-নদীতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন এই লঞ্চটা ওর পাশে ভিড়তে পারে। সারেঙসাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশের কর্তারা আমাদের চিনতে পারবেন তো ?"

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাডিশনাল আই. জি. রণবীর ভট্টাচার্য আছেন ঐ লঞ্চে, তিনি আমায় ভালই চেনেন।"

একটু বাদেই দুটো লঞ্চ পাশাপাশি হয়ে গেল। পুলিশের লঞ্চের ওপরের ডেকটা একদম খালি, শুধু সারেঙ-এর পাশে বসে আছে একজন পুলিশ অফিসার।

কাকাবাবু সেই পুলিশটিকে চেঁচিয়ে বললেন, "রণবীর ভট্টাচার্যকে বলুন, আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী। খুব জরুরি দরকারে এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

পুলিশটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি খবরের কাগজের লোক ? গোসাবায় গিয়ে দেখা করবেন। সাহেব এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন !"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "আপনার সাহেবকে গিয়ে আমার নামটা বলুন ! এখন বেলা এগারোটা বাজে, এখন বিশ্রাম নেবার সময় নয় !"

এই লঞ্চের কিছু লোক এই কথায় হেসে উঠল। ঐ লঞ্চের ভেতর থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন একজন খুব লম্বা মানুষ। নীল রঙের প্যান্ট সাদা হাওয়াই শার্ট পরা। মুখের ভাব দেখলেই বোঝা যায় তিনি একজন বড় অফিসার।

মুখে সরাসরি রোদ পড়েছে বলে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কী হয়েছে ? আরে, কে ? কাকাবাবু নাকি ? আপনি এখানে...চলে আসুন, চলে আসুন, এই লঞ্চে চলে আসুন !"

দুটো লঞ্চ একেবারে গায়ে-গায়ে ঘেঁষে দাঁড়াল। সন্তু ততক্ষণে উঠে এসেছে

ওপরে। একে একে ওরা যেতে লাগল অন্য লঞ্চটাতে। কাকাবাবু ছোট সাধুকে বললেন, "চলুন, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।"

ছোট সাধু হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে বললেন, "না, না, আমি কেন যাব !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি গোসাবা পর্যন্ত যাবেন তো ? ঐ লঞ্চটা আগে পৌঁছবে, সেখানে আপনাকে নামিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

"গোসাবায় না, আমি আগে বাসন্তীতে নামব, সেখানে আমার অন্য কাজ আছে।"

"বেশ তো সেখানেই আপনাকে নামিয়ে দেওয়া যাবে।"

"না, তার দরকার নেই। আমি এই লঞ্চেই নিয়মিত যাই, সবাই আমায় চেনে—"

কাকাবাবু ছোট সাধুর কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, "চলুন, চলুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে !"

খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই ছোট সাধু এলেন পুলিশের লঞ্চে। অন্য লঞ্চটা আবার দূরে চলে গেল।

রণবীর ভট্টাচার্য হাসতে হাসতে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাকাশ থেকে কোনও উল্কা সুন্দরবনে খসে পড়েছে নাকি ? কিংবা জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কণিষ্কর মুণ্ডু পাওয়া গেল ? নইলে আপনি এদিকে..."

কাকাবাবু বললেন, "এদের নিয়ে সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছি। সন্তুকে তো তুমি চেনো, আর এ হচ্ছে বিমান, আমাদের পাড়ার ছেলে। আর এই সাধুটির সঙ্গে নতুন পরিচয় হল।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "চলুন, চলুন, নীচে চলুন, ওপরে যা রোদ।"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের লঞ্চটা হঠাৎ থেমে গেল কেন ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "একটা মাছ ধরার নৌকো যাচ্ছিল, তাতে বেশ বড় বড় পার্শে মাছ রয়েছে। তাই আমি খালাসিদের বললুম, নৌকোটাকে ডেকে দু'তিন কিলো মাছ কিনে নাও। এরকম টাটকা মাছ তো কলকাতায় পাওয়া যায় না।"

বিমান বলল, "ভাগ্যিস লঞ্চটা থেমেছিল, নইলে তো আপনাদের ধরতেই পারতুম না !"

নীচে একটা টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার। সেখানে আরও দু'জন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। টেবিলের ওপর তাস বেছানো। তিনজন খেলোয়াড়, অথচ চার জায়গায় তাস দেওয়া হয়েছে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমরা কাটথ্রোট ব্রিজ খেলছিলুম। আপনার গলা শুনে আমি ওপরে উঠে গেলুম। ইনি হলেন চব্বিশ পরগনার এস. পি আকবর খান, ইনি এখানকার এস. ডি. পি. ও. প্রশান্ত দত্ত। আর ইনি কাকাবাবু,

তোমরা চেনো তো ? কাকাবাবুর নাম রাজা রায়চোধুরী, কিন্তু এখন তো সবাই কাকাবাবু বলেই ডাকে। আমি দিল্লি গিয়েছিলুম, হোম সেক্রেটারি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন, কাকাবাবু কেমন আছেন ? কনভে মাই রিগার্ডস টু হিম !"

অন্য দু'জনের মধ্যে আকবর খানকেই শুধু জাঁদরেল পুলিশ সাহেবের মতন দেখতে। ফর্সা রং, মুখে পাকানো গোঁফ আর খুব শক্তিশালী চেহারা। রণবীর ভট্টাচার্যকে দেখলে কিন্তু পুলিশের কর্তা বলে মনেই হয় না, মনে হয় যেন কোনও কলেজের প্রফেসার। আর প্রশান্ত দত্তের বয়েস অন্য দু'জনের তুলনায় বেশ কম, মনে হয় ক্রিকেট-খেলোয়াড়।

ছোট সাধুর দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত দত্ত কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "একে আপনি কোথায় পেলেন ? আগে থেকে চিনতেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি চিনি না, কিন্তু ইনি আমাকে চেনেন বললেন। এবার বলুন তো, সাধুমহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার জেলখানায় কেন দেখা হয়েছিল ? আপনি জেলখানায় কী করছিলেন ? আমিই বা সেখানে গিয়েছিলুম কেন ?"

ছোট সাধু বললেন, "সে প্রায় সাত-আট বছর আগেকার কথা। আমি তখনও সাধু হইনি, একটু অন্য লাইনে গিয়েছিলুম। এখন আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই, চুরি-জোচ্চুরিতে হাত পাকিয়েছিলুম। অসৎ সঙ্গে পড়লে যা হয় ! ছ' মাস জেল খেটে শায়েস্তা হয়ে গেছি। তারপর থেকেই ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছি। দেখুন স্যার, ঋষি বাল্মীকিও তো আগে ডাকাত ছিলেন, পরে সাধু হন।"

রণবীর ভট্টাচার্য হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "বাঃ ! বাঃ ! তা আপনিও কি এখন রামায়ণের মতন কোনও কাব্য-টাব্য লিখছেন নাকি ?"

ছোট সাধু বললেন, "না, স্যার ! অত বিদ্যে আমার নেই। তবে ভগবান আমাকে দয়া করেছেন। স্বপ্নে আমি একটা ওষুধ পেয়েছি, সেই ওষুধে যাবতীয় পেটের রোগ নির্ঘাত সেরে যায়। এই এলাকার অনেক লোক আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোন্ জেলে ছিলেন ? সেখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হল কী করে ?"

ছোট সাধু বললেন, "আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে শোভনলাল বলে একজন ফাঁসির আসামী ছিল। ফাঁসির আগের দিন সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। আপনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। শোভনলাল আপনার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদল খুব। অতবড় একজন দুর্দান্ত খুনে যার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে, সেই মানুষকে কি ভোলা যায় ? সেইজন্যই আপনার কথা আমার মনে আছে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "ও, সেই শোভনলালের কেস ? সে আপনাকেও

খুন করতে গিয়েছিল না, কাকাবাবু ?”

কাকাবাবু ছোট সাধুকে বললেন, “তা আপনি জেল থেকে ছাড়া পাবার পরেই সাধু হয়ে গেলেন ?”

ছোট সাধু বললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। বিশ্বাস করুন, তারপর আর আমি কোনওদিন খারাপ লাইনে যাইনি। তাছাড়া আমার বাবাও স্বর্গে গেলেন, আমাকে আশ্রমের ভার নিতে হল।”

প্রশান্ত দত্ত বলল, “এই সাধু সম্পর্কে আমার কাছে কিন্তু অন্যরকম রিপোর্ট আছে। সুন্দরবনের দিককার বড় বড় স্মাগলাররা গভীর রাত্রে এই সাধুর আশ্রমে যাতায়াত করে। তারা কেন আসে বলুন তো !”

আকবর খান বললেন, “হ্যাঁ, আমিও শুনেছি এর কথা।”

ছোট সাধু বললেন, “তারা পেটের রোগের ওষুধ নিতে আসে, স্যার। যে আসে, তাকেই দিই। তাদের মধ্যে কে স্মাগলার আর কে ভাল লোক তা আমি কী করে চিনব বলুন তো ?”

প্রশান্ত দত্ত বলল, “আপনি প্রত্যেক সপ্তাহে দু' তিনবার কলকাতায় যান, সে খবরও পেয়েছি। আশ্রম ছেড়ে এত ঘনঘন কলকাতায় যান কেন আপনি ?”

“আমার ওষুধ বানাবার জন্য মালপত্র কিনতে যেতে হয়। অনেক রকম গাছের শেকড় লাগে, সেগুলো কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।”

“সেজন্য সপ্তাহে দু' তিনবার যেতে হয় ? আজও কলকাতা থেকে ফিরছেন ?”

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “আরে, আমারও তো নানান রকম পেটের রোগ, কোনও ওষুধেই সারে না। এবারে তাহলে আপনার ওষুধ খাব। দিন দেখি, সাধুবাবা, আমায় কিছু ওষুধ দিন।”

“ওষুধ তো সঙ্গে নেই, স্যার !”

“নেই ? তাহলে কলকাতা থেকে কী সব গাছের শেকড়-বাকড় কিনে আনলেন, সেগুলো একটু দেখান তো ! কবিরাজি ওষুধের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। কই, দেখান !”

ছোট সাধু আমতা আমতা করে বললেন, “না, স্যার, এবারে কোনও শেকড়-বাকড় আনিনি। হাতিবাগান বাজারে একটা দোকানে অর্ডার দিয়ে এসেছি, পরের বার গিয়ে নেব।”

“আপনার জামাটা একবার খুলুন তো !”

রণবীর ভট্টাচার্যের হঠাৎ এই কথায় ছোট সাধু একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। ভুরু দুটো কপালে তুলে বললেন, “কী বলছেন স্যার, জামা খুলব ? কেন ?”

রণবীর ভট্টাচার্য হাসিমুখে বললেন, “আরে, খুলুন না মশাই, দেখি, আপনার স্বাস্থ্যখানা কেমন ! জানো প্রশান্ত, সাধুদের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়। ভাল ঘি-দুধ

খায় তো ! কই, খুলুন, খুলুন ।”

ছোট সাধু বললেন, “দেখুন, স্যার, আমি এই লঞ্চে আসতে চাইনি। রায়চৌধুরীসাহেব আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলেন। তা বলে আপনারা আমাকে হুকুম দিয়ে জামা খোলাবেন ? এ ভারী অন্যায় !”

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “হুকুম দিলাম কোথায় ? জামাটা খুলবেন, আপনার বুকের ছাতির মাপটা একটু দেখব। এতেই আপনার আপত্তি ?”

ছোট সাধু বললেন, “হ্যাঁ স্যার, আমার আপত্তি আছে। বাসন্তী বোধহয় এসে গেল, আমায় সেখানে নামিয়ে দিন।”

আকবর খানের চেয়ারের পায়ের কাছে একটা কাল রঙের ছোট সুটকেস রয়েছে। সেটা তিনি তুলে টেবিলের ওপর রাখলেন। সুটকেসটি খুলে তার মধ্য থেকে একটা রিভলভার বার করে প্রথমে নলটায় দু'বার ফুঁ দিলেন, তারপর সেটা সোজা ছোট সাধুর কপালের দিকে তাক করে খুব ঠাণ্ডাভাবে বললেন, “শুনুন, সাধুবাবা, একখানা গুলি ছুঁড়লেই আপনি অক্কা পাবেন। তারপর আপনার ডেডবডিটা জলে ফেলে দেব। এখন ভাটার সময়। জলের টানে আপনার বডিটা সোজা চলে যাবে। কেউ কোনওদিন কিছু জানতেও পারবে না। সেটা আপনি চান, না জামাটা খুলবেন ?”

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “আরে আকবর, তুমি শুধু শুধু সাধুবাবাকে ভয় দেখাচ্ছ। উনি এমনিতেই খুলবেন জামাটা। কী, তাই না ?”

কাকাবাবু বললেন, “কী কুক্ষণেই আপনি যেচে আজ আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন ! নইলে আপনাকে এরকম বিপদে পড়তে হত না। আর উপায় নেই, এবারে জামাটা খুলে ফেলুন !”

কাকাবাবুর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছোট সাধু আস্তে আস্তে জামাটা খুলে ফেললেন। তখন দেখা গেল, তাঁর সারা বুকে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো।

এবারে প্রশান্ত দত্ত উঠে গিয়ে সেই ব্যাণ্ডেজ ধরে এক টান দিতেই তার ভেতর থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল একশো টাকার নোট।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “প্রশান্ত, টাকাগুলো গুনে রাখো কত আছে। ব্যাণ্ডেজের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে, হাজার পঁচিশ-তিরিশ হবে !”

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে তিনি বললেন, “বুঝলে তো সন্তু, এই সাধুবাবা স্মাগলারদের চোরাই মালপত্তর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। সাধুর পোশাকে থাকে তো, তাই ওকে কেউ সন্দেহ করে না। তবে, এ অতি ছোটখাটো ব্যাপার !”

বিমান বলল, “মাই গড ! লোকটিকে দেখে আমি একবারও সন্দেহ করিনি !”

এই সময়ে ওপরে যে পুলিশটি ছিল, সে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলল, “স্যার, স্যার, নদী দিয়ে একটা লাশ ভেসে যাচ্ছে। কী করব, লঞ্চ

থামাব ?”

৩

এর পর এক ঘন্টা সময় চলে গেল, সেই মৃতদেহটির জন্য। পুলিশ-লঞ্চের খালাসিরা একটা লম্বা বাঁশের আঁকশি দিয়ে মৃতদেহটাকে টেনে আনল কাছে। কিন্তু সেটাকে এ-লঞ্চে তোলা হল না। ঠিক সেই সময় ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের একটা খালি লঞ্চ যাচ্ছিল, সেটাকে থামানো হল।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, “সন্তু, তুই ভেতরে বসে থাক, এইসব দৃশ্য তোর না দেখাই ভাল।”

সন্তু ওপরে না গেলেও একতলার জানলা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা।

কাকাবাবু আর রণবীর ভট্টাচার্যও বসে রইলেন সেখানে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “এই প্রশান্ত সঙ্গে থাকাতেই তো যত গণ্ডগোল। আমি যাচ্ছি অন্য কাজে, নদী দিয়ে লাশ কেন ভেসে যাচ্ছে, তা আমার দেখার কথা নয়। এখানে সাপের কামড়ে অনেক লোক মরে। সাপের কামড় খেয়ে মরলে সেই মৃতদেহ পোড়ানো হয় না, জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং তাতে পুলিশের কিছু করার নেই। কিন্তু প্রশান্ত রয়েছে সঙ্গে, সে এখানকার এস ডি. পি. ও.; যে-লাশ ভেসে যাচ্ছে, সেটা সাপের কামড়ে মৃত্যু না খুনের ব্যাপার, সেটা তার জানা দরকার।”

একটু বাদেই প্রশান্ত দত্ত এসে খবর দিল, মৃতদেহটির বুকে একটা ছুরি বিঁধে আছে। ভাগ্যিস ইরিগেশানের লঞ্চটা পাওয়া গেছে! সেই লঞ্চে, একজন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মৃতদেহটি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্যানিংয়ে। সেখানে পোস্ট মর্টেমের ব্যবস্থা হবে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “ওহে প্রশান্ত, ডেডবডিটা কার, এই লঞ্চের খালাসিরা কেউ চেনে ?”

প্রশান্ত দত্ত বলল, “না, স্যার। কেউ চেনে না।”

“এক কাজ করো না, এই সাধুবাবাকে একবার নিয়ে গিয়ে দেখাও না। সাধু এই অঞ্চলের লোক, চিনতে পারবে হয়তো !”

সাধুর হাত-টাত বাঁধা হয়নি। এমনি মেঝেতে এক কোণে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এই কথা শুনে সে বলল, “না, না, আমি যাব না। আমি দেখতে চাই না !”

প্রশান্ত দত্ত তার কাছে গিয়ে দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল, “ওঠো !”

সেই এক ধমকেই কাজ হল। সাধুবাবা সুড়সুড় করে উঠে গেল। এবারে

সন্তু আর বিমানও গেল ওদের সঙ্গে।

মৃতদেহটিকে পাশের লঞ্চের ডেকের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ টাটকা মড়া, শরীরে কোনও বিকৃতি নেই। বছর তিরিশেক বয়েস লোকটির শুধু একটা পাজামা পরা, বুকের বাঁ দিকে একটা ছুরি বিঁধে আছে, সেই ছুরির হাতলের আধখানা ভাঙা।

সেই দিকে তাকানো মাত্রই ছোট সাধুর মুখখানা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ফিসফিসিয়ে বলল, "কী সর্বনাশ! হায় হায় হায়! কে এমন করল!"

প্রশান্ত দত্ত জিজ্ঞেস করল, "তাহলে তুমি চেনো একে? কী নাম লোকটির?"

"ওর নাম হারু দফাদার। আমার আপন খুড়তুতো ভাই! হারুকে যে দু'দিন আগেও জীবন্ত দেখেছি।"

এর পর কান্নায় ভেঙে পড়ল সাধু। প্রশান্ত দত্ত ইঙ্গিত করল ইরিগেশানের লঞ্চটাকে ছেড়ে দিতে।

একটু বাদে ছোট সাধুকে যখন নীচে ফিরিয়ে আনা হল, তখনও সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সব শুনে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "বাঃ সাধুবাবা, আপনাদের পরিবারটি তো চমৎকার! আপনার বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকে, সেখান থেকে খসে পড়ে টাকা। আর আপনার খুড়তুতো ভাই বুকে ছুরি বিঁধিয়ে জলে ভাসে। তা কী কাজ করত আপনার ভাই?"

আকবর খান বললেন, "যারা সাধারণ চাষবাস করে, তারা অন্যকে ছুরি মারে না, নিজেরাও ছুরি খেয়ে মরে না।"

ছোট সাধু বলল, "হারু জঙ্গলে মধু আনতে যেত।"

আকবর খান বললেন, "যারা জঙ্গলে মধু আনতে যায়, তারা অনেক সময় বাঘের মুখে পড়ে। কিন্তু সেরকম লোককে কেউ ছুরি মারবে কেন?"

প্রশান্ত দত্ত বলল, "হারু দফাদার নামটা বেশ চেনা-চেনা, কিছুদিন আগেই একটা ডাকাতির কেসে একে খোঁজা হচ্ছিল, যতদূর মনে পড়ছে। জানেন স্যার, কয়েকদিন ধরে এই তল্লাটে স্মাগলার আর ডাকাতদের মধ্যে নানারকম মারামারির খবর পাওয়া যাচ্ছে। নতুন একটা কিছু ঘটেছে বোধহয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সেই বিদেশি লঞ্চের সঙ্গে এই সব ঘটনার কোনও যোগ নেই তো?"

রণবীর ভট্টাচার্য মুখ ফিরিয়ে বললেন, "সেই বিদেশি লঞ্চ? হ্যাঁ...সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। লঞ্চটাতে মানুষজন যেমন ছিল না, তেমনি অন্য কোনও দামি জিনিসপত্রও কিছুই নেই। সেসব গেল কোথায়? এখানকার লোকেরাই লুটেপুটে নিয়েছে! তারপর বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি

করছে তারা।"

কাকাবাবু ছোট সাধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই লঞ্চের কোনও মালপত্র তোমার কাছে এসেছিল ?"

ছোট সাধু বলল, "লঞ্চের মালপত্র ? না, না, স্যার ! কোন্ লঞ্চের কথা বলছেন ?"

"একটা জনশূন্য বিদেশি লঞ্চ সুন্দরবনে এসে ভিড়েছে, সে-কথা তুমি শোনোনি ?"

"কই না তো ! কলকাতার এক ব্যবসাদার তার টাকাগুলো এখানকার এক ভেড়িতে আমায় পৌঁছে দিতে বলেছিল, তাই টাকাগুলো আমি সাবধানে লুকিয়ে নিয়ে আসছিলুম। আর আপনারা ভাবলেন আমি চোরাই জিনিসের কারবার করি !"

রণবীর ভট্টাচার্য অট্টহাসি করে উঠলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে বলুন তো, কাকাবাবু, আপনি এদিকে কেন এলেন হঠাৎ ? এইসব চোর-ডাকাত আর স্মাগলাররা তো নিছক চুনোপুঁটি, এদের ধরবার জন্য নিশ্চয়ই আপনি আসেননি !"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি এসেছি ঐ লঞ্চটা একবার নিজের চোখে দেখতে। আচ্ছা, সুন্দরবনে ঐ লঞ্চটাকে প্রথম কে দেখতে পায় বলো তো ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সেটা আকবর সাহেবই ভাল বলতে পারবেন।"

আকবর খান বললেন, "আমরা প্রথমে খবর পাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে। দত্ত ফরেস্টের এক রেঞ্জার হরিণভাঙা নদীতে গিয়েছিল টহল দিতে, তখন এক জেলেনৌকো তাকে খবর দেয় যে, খাঁড়ির মুখে একটা লঞ্চ ভাসছে, ভেতরে কোনও মানুষজন নেই। সেই রেঞ্জারের নাম সুখেন্দু বিশ্বাস, সে-ই প্রথম লঞ্চটার কাছে যায়। রেঞ্জার প্রথমে লঞ্চের মধ্যে মানুষজনের গলার আওয়াজ শুনতে পায়। কেউ যেন বিদেশি ভাষায় কথা বলছে। একটু পরে সে বুঝতে পারে, ওটা আসলে রেডিও।"

"কী ভাষায় রেডিও'র প্রোগ্রাম চলছিল, তা রেঞ্জারবাবু বলেছে ?"

"না। সে বুঝতে পারেনি কোন্ ভাষা।"

"লঞ্চের ভেতরের আর-সব জিনিসপত্র লুটপাট হয়ে গেল, কিন্তু রেডিওটা কেউ নিল না কেন ?"

"সেটা একটা কথা বটে ! একটা বিদেশি রেডিও-র দাম তো নেহাত কম হবে না !"

"রেঞ্জার লঞ্চটা দেখার পর কী করল ?"

"রেঞ্জার বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছে। লঞ্চটা যেখানে ভাসছিল, সেখানে জল বেশি গভীর নয়। রেঞ্জার লঞ্চটাকে সেখান থেকে না সরিয়ে সেখানেই নোঙর ফেলে দেয়। তারপর খবর দেয় থানায়। এর মধ্যে আমি

আর প্রশান্ত গিয়ে দেখে এসেছি লঞ্চটা। আজ সেটাকে গোসাবায় নিয়ে আসার কথা আছে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এই সাধুজিকে একটা কেবিনে ভরে রাখো। এসো, গোসাবা পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা একটু তাস খেলি। কাকাবাবু, খেলবেন নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তোমরা খেলো। আমি বরং ওপরে গিয়ে নদীর দৃশ্য দেখি। অনেকদিন এদিকে আসিনি।"

বিমান আর সন্তুও কাকাবাবুর সঙ্গে উঠে গেল ওপরের ডেকে।

গোসাবা থানার দারোগা বললেন যে, প্রথমে দু'জন লোককে পাঠানো হয়েছিল লঞ্চটা চালিয়ে নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সেই লঞ্চটার ইঞ্জিনের কিছু-কিছু অংশও নিশ্চয়ই চুরি গেছে। তারপর আর একটা লঞ্চ পাঠানো হল সেটাকে টেনে আনবার জন্য। কিন্তু সেই দ্বিতীয় লঞ্চটাও চড়ায় আটকে গেছে, তারা ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছে। এখন জোয়ার এলে লঞ্চটা যদি জলে ভাসে তো ভালই, নইলে সেটাকে টানবার জন্য আবার একটা লঞ্চ পাঠাতে হবে!

প্রশান্ত দত্ত রেগেমেগে বলল, "যাঃ! এখানকার লোকদের দিয়ে কোনও কাজই ঠিকমতন হয় না! এখন উপায়? স্যার, আপনারা এতদূর এলেন—"

রণবীর ভট্টাচার্য কিন্তু একটুও উত্তেজিত হলেন না। তিনি বললেন, "দাঁড়াও, খিদে পেয়েছে, আগে খেয়ে নিই। দ্যাখো তো, যে-পার্শে মাছগুলো কেনা হল, তার ঝোল রান্না হয়েছে কি না!"

লঞ্চে বসেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হল। ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ, বেগুনভাজা আর মাছের ঝোল। খালাসিরা দারুণ রান্না করে।

বিমান বলল, "এমন টাটকা মাছের স্বাদই আলাদা। আমি আগে কোনওদিন এত ভাল মাছের ঝোল খাইনি।"

খাওয়ার পর একটা পান মুখে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে চিবোতে চিবোতে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এখন তা হলে কী করা যায়? ওহে প্রশান্ত গোসাবার টাইগার প্রজেক্টের একটা স্পিডবোট থাকে না? সেটা পাওয়া যাবে? দ্যাখো না, খোঁজ নিয়ে!"

গোসাবা থানার দারোগা বললেন, "হ্যাঁ স্যার, পাওয়া যাবে। স্পিডবোটটা আজ সকালেই এসেছে!"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তবে এক কাজ করা যাক। আমি কাকাবাবু আর এদের নিয়ে স্পিডবোটটায় করে বিদেশি লঞ্চটা দেখে আসি। সেটা এখানে কতদিনে পৌঁছবে কে জানে! আমি সেটা ইন্‌সপেকশান করতেই এসেছি। আকবর আর প্রশান্ত, তোমরা এখানে থেকে যাও!"

একটু গলা নামিয়ে তিনি আবার আকবর আর প্রশান্তকে বললেন, "তোমরা

এখানে থেকে যতগুলো পারো চোর-ডাকাত আর স্মাগলারদের রাউণ্ড আপ করো। ঐ বিদেশি লঞ্চ থেকে যে-সব জিনিসপত্র খোয়া গেছে, তার দু'একটা অন্তত উদ্ধার করা চাই। নইলে লঞ্চের মালিক কে ছিল কিংবা কোন্ দেশের, তা বার করা শক্ত হবে। এই সাধুবাবাকে একটু চাপ দাও, ও নিশ্চয়ই চোরাই মালের সন্ধান দিতে পারবে।"

স্পিডবোটটায় চালক ছাড়া আর তিনজনের জায়গা আছে। রণবীর, কাকাবাবু, বিমান আর সন্তু তার মধ্যে এঁটে গেল কোনওক্রমে। কিন্তু রণবীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে সব সময় দু'জন সাদা পোশাকের বডিগার্ড থাকে। তাদের কিছুতেই জায়গা হবে না।

রণবীর ভটাচার্য বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে বডিগার্ড দরকার নেই। ওরা এখানেই থাক। আমাদের আর কতক্ষণই বা লাগবে, স্পিডবোটে বড় জোর যাতায়াতে ঘন্টাতিনেক। নাও, এবার চালাও!"

স্পিডবোটটা স্টার্ট নিতে না নিতেই রকেটের মতন একেবারে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সন্তু, শক্ত করে ধরে থেকো। একবার উল্টে জলে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই!"

বলতে বলতে ঝাঁকুনির চোটে তিনি নিজেই উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন, কাকাবাবু তাঁর কাঁধটা চট করে ধরে ফেললেন।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমি অবশ্য পড়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না, আমি ভাল সাঁতার জানি। কিন্তু সন্তু সাঁতার জানো তো?"

সন্তু বেশ জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ!"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুও সাঁতার জানে, বিমানও সাঁতার জানে। কিন্তু মুশকিল তো আমাকে নিয়েই। খোঁড়া পায়ে আমি তো আজকাল আর ভাল সাঁতার দিতে পারি না! আমি পাহাড়ে উঠতে পারি, কিন্তু জলে পড়ে গেলেই কাবু হয়ে যাই।"

স্পিডবোটের চালক ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "স্যার, এই নদীতে পড়লে সাঁতার জেনেও খুব লাভ হয় না। এই নোনা জলে কামঠ্ থাকে, কুচ্ করে পা কেটে নিয়ে যায়।"

বিমান বলল, "কামঠ্ কী?"

কাকাবাবু বললেন, "একরকম ছোট হাঙর। খুব হিংস্র!"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "কারুরই জলে পড়ার দরকার নেই। ওহে বাপু, তুমি সাবধানে ঠিকঠাক চালাও!"

নদীর দু'ধারে অনেক লোক জলে নেমে কী যেন খোঁজাখুঁজি করছে। কারুর কারুর হাতে গাঢ় নীল রঙের ছোট ছোট জাল।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "ওরা কী করছে জলে নেমে!"

চালক বলল, "ওরা বাগদা চিংড়ির পোনা ধরছে। এটাই সিজন কিনা ?"

"ওখানে কামঠ্ যেতে পারে না ? ওদের ভয় নেই ?"

"কী করবে বলুন, মাছ না ধরলে যে ওরা খেতে পাবে না। ভয় আছে বই কী, মাঝে-মাঝে দু'একজনের পা কাটা যায়। তবে এক জায়গায় বেশি লোক থাকলে কামঠ্ কাছে আসে না।"

আর কিছুক্ষণ যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "ছোট সাধু আমায় দেখে হঠাৎ বলেছিল, আজ রাত্রে আমার বাড়ি ফেরা হবে না। এটাই ভাগ্য, ও নিজেই আজ রাত্রে বাড়িতে ফিরতে পারবে না।"

বিমান বলল, "ব্যাটা ভণ্ড ! আচ্ছা রণবীরবাবু, আপনি হঠাৎ ওর জামা খুলতে বললেন কেন ? আপনি কী করে বুঝলেন..."

"কী জানি, লোকটির মুখ দেখেই আমার কেমন যেন মনে হল, ও একটু টাকার গরমে কথা বলছে ! বুকে বাঁধা অতগুলো টাকা, হা-হা-হা !"

কাকাবাবু বললেন, "ও বেশি সাহস দেখিয়ে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলতে এসেছিল। যদি দূরে দূরে থাকত, তাহলে বোধহয় আজ ধরাই পড়ত না।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তবে, কাকাবাবু, ও বোধহয় এই কথাটা ঠিকই বলেছে। আজ রাত্তিরে আপনার না-ও ফেরা হতে পারে।"

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই বিমান বলল, "সে কী ! কেন ?"

"জলের ব্যাপার তো ! এই সব স্পিডবোট যখন-তখন খারাপ হয়। ধরুন যদি এটা খারাপ হয়ে গেল, তখন কী হবে ? দেখছেন তো ! দু'পাশে জঙ্গল, পাড়ে নামাও যাবে না ! তখন কোনও নৌকো ধরতে হবে কিংবা দৈবাৎ কোনও লঞ্চ যদি এদিক দিয়ে যায়—"

"দৈবাৎ কেন ? এদিকে লঞ্চ পাওয়া যায় না ?"

"খুব কম। ওহে মাস্টার, তুমি আবার স্পিডবোটটাকে খাঁড়ির মধ্যে ঢোকালে কেন ?"

চালক বলল, "এদিক দিয়ে শর্টকাট হবে, স্যার !"

"এই যে দু' দিকের জঙ্গল, এখানে বাঘ আছে ? তোমরা তো টাইগার প্রজেক্টের লোক !"

"হ্যাঁ, স্যার, তা আছে। এই তো বাঁ দিকে সজনেখালির জঙ্গল, ওখানে কয়েকটা বাঘ আছে।"

"বুঝুন তা হলে ! পাশের জঙ্গলে বাঘ, এর মধ্যে যদি স্পিডবোট খারাপ হয়..."

বিমান বলল, "যদি খারাপ নাও হয়, নদী এত সরু, এখানে এমনিতেই তো বাঘ আমাদের ওপরে লাফিয়ে পড়তে পারে।"

যেন এটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয় এইভাবে হাসতে হাসতে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তা তো পারেই ! বাঘ এর চেয়ে বেশি দূরেও লাফিয়ে যায় !

তবে কথা হচ্ছে, কোনও বাঘ এখন এদিকে আসবে না। বাঘেরাও জেনে গেছে যে, অ্যাডিশনাল আই. জি. রণবীর ভট্টাচার্য এই পথ দিয়ে যাচ্ছে। বাঘেরাও আমাকে ভয় পায়। হা-হা-হা-হা!"

কাকাবাবু বললেন, "স্পিডবোটে এত শব্দ হচ্ছে, এই জন্যই বাঘ এর কাছে ঘেঁষবে না। বাঘেরা শব্দ পছন্দ করে না। মুনি-ঋষিদের মতনই বাঘ খুব নির্জনতাপ্রিয়।"

রণবীর ভট্টাচার্য আগের মতনই হাসতে হাসতে বললেন, "কাকাবাবু, আমি পাইলটসাহেবকে একটু ভয় দেখাচ্ছিলুম।"

বিমান বলল, "ভয় আমি পাইনি। তবে পরশু আমার ডিউটি আছে..."

কাকাবাবু বললেন, "আমি গোসাবা পর্যন্ত এসে ফিরে যাব ভেবেছিলুম। এত দূর আসতে হল—"

বিমান বলল, "আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে কাকাবাবু। কাছাকাছি বাঘ আছে জেনে খুব উত্তেজনা হচ্ছে। এরকম অ্যাডভেঞ্চারে তো কখনও যাইনি! শুধু পরশু যদি ডিউটি না থাকত—"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আজ না হোক, কালকের মধ্যে ঠিক আপনাকে ক্যানিং পৌঁছে দেব। সেজন্য চিন্তা করবেন না। আমাকেও তো কাল বিকেলের মধ্যে চিফ মিনিস্টারকে রিপোর্ট দিতে হবে!"

সন্তু অনেকক্ষণ থেকেই চুপ করে আছে আর গভীর মনোযোগ দিয়ে দু' পাশের জঙ্গল দেখছে, কী গভীর বন! একটুও ফাঁক নেই, মানুষের পায়ে চলার মতনও কোনও পথ নেই। নদীর দু'ধারে শুধু থকথকে কাদা, তার মধ্যে উঁচু উঁচু হয়ে আছে শূল।

প্রতি মুহূর্তে সন্তুর মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন জঙ্গলের মধ্য থেকে গাঁক করে ডেকে একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার বেরিয়ে আসবে।

আর একটা কথা ভেবেও সন্তুর অদ্ভুত লাগছে। এখন দুপুর তিনটে বাজে। সকাল আটটার সময়েও সন্তু জানত না যে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে এইরকম একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে আসবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এত কম সময়ের মধ্যে এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চারের অভিজ্ঞতা সন্তুর আগে কখনও হয়নি।

সরু নদীটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। প্রত্যেকবার স্পিডবোটটা বাঁক নেবার সময়েই সন্তুর মনে হচ্ছে, এইবারে একটা কিছু ঘটবে।

হঠাৎ স্পিডবোটটার স্পিড কমে এল, ইঞ্জিনের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল।

রণবীর ভট্টাচার্যের একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল, ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল, খারাপ হয়ে গেল?"

কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল চালক।

"কী হে, কথা বলছ না কেন? খারাপ হয়ে গেছে?"

"কই, না তো ! কিসের আওয়াজ ?"

"শুনুন ভাল করে।"

সন্তু, বিমান, কাকাবাবু কেউ-ই এতক্ষণ স্পিডবোটটার মোটরের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শুনতে পায়নি। এমনকী একটা পাখির ডাকও না।

এখন মোটরের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতে নিস্তব্ধ জঙ্গলটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। শোনা যেতে লাগল নানারকম পাখির ডাক। একটা পাখি ট-র্‌-র্‌-র্‌, ট-র-র-র করে ডাকছে। মাথার ওপর দিয়ে দু' তিনটে বেশ বড় পাখি কাঁক-কাঁক করে ডেকে উড়ে গেল।

একটুক্ষণ সবাই উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকার পর শোনা গেল, দূরে, অনেক দূরে, কেউ যেন কাঁদছে। দু' তিনজন মানুষের গলা।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "হুঁ, কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি বটে। তোমার কান তো খুব সাফ্। স্পিডবোট চালাতে চালাতে তুমিই আগে শুনেছ !"

চালক বলল, "স্যার, গতিক বড় সুবিধে বোধ হচ্ছে না। সঙ্গে জনা দু'এক আর্মড গার্ড আনা উচিত ছিল।"

"কেন ?"

"এই জঙ্গলের মধ্যে তো চোর-ডাকাতের অভাব নেই। আমরা সঙ্গে বন্দুক আনিনি, এই সুযোগে যদি ওরা লুটপাট করতে চায়,...স্যার, এই জঙ্গলের রাজত্বে লুট করতে এসে ডাকাতরা একেবারে প্রাণেও মেরে যায়।"

"বটে ? কান্নার আওয়াজ কোন্ দিক থেকে আসছে ? ডান দিক থেকে না ?"

নদীটা সেখানে তিন দিকে ভাগ হয়ে গেছে। মাঝখানের জায়গাটা বেশ চওড়া। স্পিডবোটটা থেমে আছে সেখানে। কাকাবাবু তাঁর কালো বাক্সটা খুললেন। সন্তু জানে, ওর মধ্যে রিভলভার আছে !

রণবীর ভট্টাচার্য এতক্ষণ ইয়ার্কি-ঠাট্টার সুরে কথা বলছিলেন। এবারে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে সেই ভাবটা ঘুচিয়ে ফেলে কঠোর গলায় বললেন, "ডানদিকের ঐ খাঁড়িটা দিয়ে চলো, দেখি, কে কাঁদছে।"

স্পিডবোটের চালক বলল, "স্যার, ওটা দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, ওটা বড্ড সরু।"

"বলছি চলো ! ফুল স্পিডে !"

তারপর কাকাবাবুর অনুমতি নেবার জন্য রণবীর ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী বলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখে আসা যাক !"

স্পিডবোটের মোটর আবার গর্জন করে উঠল। তারপর ঘুরে গেল ডান দিকে।

খানিক দূর যাবার পরেই দেখা গেল কিছু দূরে একটা নৌকো। কান্নার

আওয়াজটা আসছে সেখান থেকেই। স্পিডবোটের আওয়াজ পেয়েই বোধহয় নৌকোটা তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল একটা ঝোপের মধ্যে।

রণবীর ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, "এটা টাইগার প্রজেক্টের এরিয়া। এখানে কাঠ কাটা নিষেধ। ওরা বেআইনি কাঠ কাটতে এসেছে। টাইগার প্রজেক্টের স্পিডবোট দেখে ভয়ে লুকোচ্ছে এখন। কিন্তু ওরা কাঁদছিল কেন?"

স্পিডবোটের চালক বলল, "স্যার, এটা ফাঁদও হতে পারে। আর্মস ছাড়া ওদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।"

রণবীর ভটাচার্য বললেন, "তুমি ঐ নৌকোটার গায়ে গিয়ে লাগাও!"

নৌকোটা মাঝারি ধরনের। মাঝখানে ছইয়ে ঢাকা। কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। কান্নার আওয়াজও থেমে গেছে।

স্পিডবোটটা গায়ে লাগাবার পর রণবীর ভট্টাচার্য চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে কে আছে? নৌকোর মালিক কে?"

ডাক শুনে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। হাত জোড় করে বলল, "স্যার, আমার চাচারে সাপে কেটেছে। এখনও প্রাণটা ধুকপুক করতেছে। আপনার বোটে করে নিয়ে গিয়ে চিকিচ্ছে করালে চাচা প্রাণে বেঁচে যেতি পারে, স্যার। দয়া করুন স্যার!"

"এই জঙ্গলে কী করতে এসেছিল?"

"আমরা মধুর চাক ভাঙতে আসি, স্যার। পেটের দায়ে আসতি হয়, স্যার। কখনও এমন বিপদে পড়ি নাই। একটু দয়া করেন, আমার চাচারে বাঁচান।"

"তোমার চাচাকে সাপে কামড়েছে কতক্ষণ আগে?"

"আজ সকালে, ঠিক সূর্য ওঠার সময়ে।"

"এখনও জ্ঞান আছে তার?"

কথা বলতে-বলতে রণবীর ভট্টাচার্য একবার কাকাবাবুর দিকে তাকালেন। কাকাবাবু কোলের ওপর কালো বাক্সটা নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। রণবীর ভট্টাচার্য প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে খুব স্মার্টভাবে উঠে গেলেন নৌকোটার ওপরে। তারপর বললেন, "কই দেখি, তোমার চাচা কোথায়?"

নিচু হয়ে তিনি ছইয়ের মধ্যে মাথা গলাতেই ভেতর থেকে একজন একটা লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে গেল।

রণবীর ভট্টাচার্য সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা সরিয়ে এনে সেই লাঠিটা ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে, লাঠিধারি হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল সামনে। রণবীর ভট্টাচার্য প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বার করে বললেন, "আরে, এ যে দেখছি চ্যাংড়া ডাকাত, দেব নাকি—"

রণবীর ভট্টাচার্য কথা শেষ করতে পারলেন না। নৌকোর খোলের মধ্যে

গুড়ি মেরে আর একটা লোক লুকিয়ে ছিল, সে তক্ষুনি উঠে পেছন থেকে লাঠি দিয়ে মারল রণবীর ভট্টাচার্যের মাথায়, তাঁর রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেল, তিনিও জ্ঞান হারিয়ে ঘুরে পড়লেন সেখানে।

দ্বিতীয় লাঠিধারী এবারে মুখ ফেরাতেই কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কাকাবাবুর হাতে রিভলভার, তিনি শান্ত গলায় বললেন, "লাঠিটা হাত থেকে ফেলে দেবে, না মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেব?"

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল নৌকোর খোলের মধ্যে।

এবারে প্রথম যে-ছেলেটি কথা বলেছিল, সে নৌকোর ছইয়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, তার হাতে একটা লম্বা নলওয়ালা বন্দুক।

সে বলল, "দেখি কে কার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়। এই বুড়ো, তোর হাতের অস্তরটা ফেলে দে নৌকোর ওপর।"

কাকাবাবুর মুখে এখনও মৃদু হাসি। তিনি বললেন, "তুমি আঙুল তোলার আগেই ছ'টা গুলি তোমায় ঝাঁঝরা করে দেবে। সাবধান!"

সন্তু একেবারে কাঠ হয়ে বসে আছে। কাকাবাবুর একটা দুর্বলতা সে জেনে গেছে। কাকাবাবু ভয় দেখান বটে, কিন্তু কিছুতেই কারুকে মারবার জন্য গুলি ছুঁড়তে পারেন না। সেবারে ত্রিপুরায় সেই 'রাজকুমার' ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিল বলে 'মারুন দেখি আমাকে' এই বলে এগিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিল। এই ডাকাতটাও যদি সে-কথা বুঝে যায়? অরণ্যদেব এক গুলিতে অন্যের হাতের বন্দুক ফেলে দিতে পারেন, কিন্তু কাকাবাবু সে চান্সও নিতে পারেন না—যদি লোকটার গায়ে গুলি লাগে!

সন্তু মুখ ফিরিয়ে বিমানের দিকে তাকাতেই দেখল বিমান তার পাশে নেই। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে বিমান সেই মুহূর্তে লাফিয়ে নৌকোটার ওপরে উঠে পড়েছে। বন্দুকধারীর বন্দুকের নলটা কাকাবাবুর দিকে তাক করা ছিল, সেটা সে ঘোরাবার আগেই বিমান সেটা খপ করে চেপে ধরল। তারপর দু' জনে ঝটাপটি করতে করতে একসঙ্গে ঝপাং করে পড়ে গেল জলে।

ঠিক সেই সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুর রিভলভার দু'বার গর্জন করে উঠল।

এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা যে, প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না সন্তু। তারপর দেখল যে, অন্য দু'জন লাঠিধারী এর মধ্যে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল বলে কাকাবাবু তাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে গুলি করেছেন। লোকদুটো লাঠি ফেলে দিয়ে নৌকোর পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়ে ভয়ে কাঁপছে।

কাকাবাবু বললেন, "বিমানের কী হল দ্যাখ, সন্তু!"

নদীর সেখানটায় জল খুব কম। বিমান এর মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, "আমি ঠিক আছি।"

বন্দুকধারীর চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বিমান

বলল, "হতভাগা ! জলের মধ্যে আমার হাত কামড়ে ধরেছিল ! আর একটু হলে গলা টিপে মেরেই ফেলতুম !"

স্পিডবোটের চালক এবার নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে নৌকোটার ওপর গিয়ে ব্যাকুলভাবে ডাকল, "স্যার ! স্যার !"

নৌকোর খোলের মধ্য থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন রণবীর ভট্টাচার্য। এত কাণ্ডের পরেও কিন্তু তাঁর মুখে কোনও ভয় বা ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই। হালকা গলায় তিনি বললেন, "বাপ রে বাপ, এমন জোরে মেরেছে যে, চোখে একেবারে সর্ষেফুল দেখলুম। মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছে নাকি ?"

মাথার পেছনে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, "ভিজে ভিজে কী লাগছে ? রক্ত ?"

নৌকোর খোলের মধ্যে খানিকটা জল থাকে, তার মধ্যে পড়ে গিয়ে রণবীর ভট্টাচার্যের জামা প্যান্ট খানিকটা ভিজে গেছে, মাথাও ভিজেছে। তাঁর মাথায় রক্তের চিহ্ন নেই।

রণবীর ভট্টাচার্য দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বললেন, "হাত ভেঙেছে ? না বোধহয়। পা দুটোতেও ব্যথা নেই। তা হলে ঠিকই আছে। বুড়ো বয়েসে কি আর মারামারি করা পোষায় ?"

তারপর ডাকাতদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, হঠাৎ আমাদের ওপর হামলা করতে গেলি কেন ? কী চাস তোরা ?"

স্পিডবোটের চালক বলল, "স্যার, গত শীতকালে আমাদের একটা বোট থেকে এরা একটা বন্দুক কেড়ে নিয়েছিল।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এরাই কেড়ে নিয়েছিল ?"

"ঠিক এই লোকগুলোই কি না তা জানি না ! এই রকমই একটা খাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে ছিল সেই ডাকাতরা। সেই বন্দুকটার হদিস আজও পাওয়া যায়নি ! যদি এরা আর কিছু না পায়, লোকের জামাকাপড় খুলে নিয়ে তাদের এই জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমার সার্ভিস রিভলভারটা কোথায় গেল ? সেটা আবার জলে পড়ে গেল নাকি ? দ্যাখো তো !"

নৌকোর খোলের মধ্যেই রিভলভারটা খুঁজে পাওয়া গেল। রণবীর ভট্টাচার্য স্পিডবোটে ফিরে এসে বললেন, "এবার এ ব্যাটাদের নিয়ে কী করা যায় ? শুধু-শুধু সময় নষ্ট হয়ে গেল অনেকটা।"

বিমান নদীর জল থেকে ডাকাতদের বন্দুকটা তুলে নিয়ে এল। তারপর সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, "কান্ট্রি মেড গাদাবন্দুক !"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আপনার তো মশাই দারুণ সাহস ! তখন আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে, আমি দেখলুম আপনি খালি হাতে বন্দুকের নলটা চেপে ধরলেন !"

বিমান বলল, "কী করব, আমি দেখলুম, কাকাবাবু গুলি চালাতে দেরি করছেন...এ লোকটা যদি হঠাৎ আগেই গুলি করে বসে...এদের তো কোনও দয়ামায়া নেই..."

কাকাবাবু বললেন, "ওর ওই গাদাবন্দুকের ঘোড়া টেপার আগেই আমি ওর ডানহাতটা উড়িয়ে দিতে পারতুম। তা হলে এই জোয়ান ছেলেটা চিরকালের মতন নুলো হয়ে যেত...। কিন্তু এই জঙ্গলের ধারে বেশিক্ষণ থাকা তো নিরাপদ নয়। হঠাৎ যদি বাঘ এসে পড়ে, তাহলে রিভলভার দিয়ে ঠেকানো যাবে না!"

স্পিডবোটের চালক বোটের মোটর চালু করে দিল।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এই বোকা ডাকাতগুলোকে তো এখন আমার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না। আবার একেবারে ছেড়েও দেওয়া যায় না। তাহলে এক কাজ করা যাক। এদের নৌকোটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে এই লোকগুলোকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া যাক। ওদের জামাকাপড় অবশ্য কেড়ে নিয়ে লাভ নেই, ও দিয়ে আমরা কী করব!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জঙ্গলে ছেড়ে দিলে ওরা কি প্রাণে বাঁচবে?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সে আশা খুব কম। ওদের বাঁচার দরকার কী? ওরা তো আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল!"

সরু চোখে লোকগুলির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তিনি আবার বললেন, "দেখেছেন ব্যাটারা কত পাজি! একটা কথা বলছে না পর্যন্ত। কেঁদেকেটে দয়া চাইলেও না হয় দয়া করা যেত!"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের নৌকোটা আমাদের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলো। ওরাও চলুক!"

শেষ পর্যন্ত তাই হল, একটা মোটা দড়ি দিয়ে নৌকোটা বাঁধা হল স্পিডবোটের সঙ্গে। লোকগুলোকে বসিয়ে দেওয়া হল তাদের নৌকোয়। তাদের লাঠিগুলো কেড়ে নেওয়া হল।

রণবীর ভট্টাচার্য স্পিডবোটের চালককে বললেন, "এবারে আস্তে আস্তে চালাতে হবে, নইলে ওদের নৌকোটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে।"

তারপর ঘড়ি দেখে তিনি বললেন, "ইস, প্রায় এক ঘন্টা সময় বাজে খরচ হয়ে গেল। মেঘ করে আসছে, এর পর বৃষ্টি নামলে তো পুরোপুরি ভিজতে হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "ভেবেছিলুম বিদেশি লঞ্চটা একবার দেখেই ফিরে যাব আজ। কিন্তু দিনটা দেখছি ক্রমেই ঘটনাবহুল হয়ে উঠছে। আমি শুনেছিলুম বটে যে, সুন্দরবনে ইদানীং বাঘের উপদ্রবের চেয়েও ডাকাতদের উপদ্রব বেশি। কিন্তু এতটা যে বেড়ে উঠেছে, তা ধারণা করতে পারিনি।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সরকারি স্পিডবোট দেখেও ওরা ভয় পায়নি। একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে। আমার মাথায় চোট মেরেছে, এ-কথা যদি

পুলিশ মহল একবার জানতে পারে, তা হলে এ ব্যাটাদের এমন ধোলাই দেবে !"

বিমান বলল, "আপনার মাথায় কি খুব জোরে মেরেছিল না আপনি ইচ্ছে করে নীচে পড়ে গেলেন ?"

"না, প্রথম মারটা বেশ জব্বর কষিয়েছিল। তবে ঘাড়ে লেগেছে। লাঠিটা মাথায় পড়লে মাথা ফেটে যেত।" তারপর হেসে ফেলে তিনি বললেন, "প্রায় দশ বারো বছর বাদে আমি এরকম মার খেলাম !"

সন্তু বারবার পেছন ফিরে দেখছে নৌকোটাকে। ডাকাত তিনটে পাশাপাশি চুপ করে বসে আছে। ওদের হাত-পা বাঁধা হয়নি। দেখলে লোকগুলোকে হিংস্র মনে হয় না, ডাকাত বলেও মনে হয় না। এমনি যে-রকম গ্রামের লোক হয়। কিন্তু আর একটু হলেই ওরা রণবীর ভট্টাচার্যের মাথা ফাটিয়ে দিত, কাকাবাবুকেও গুলি করত বোধহয়।

নদীটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, সামনে দেখা যাচ্ছে আর-একটা বড় নদী। জঙ্গলটা নদীর এক দিকে বেশ পাতলা। একঝাঁক হাঁস বসে ছিল সেই দিকে, স্পিডবোটের আওয়াজ পেয়ে সেগুলো একসঙ্গে উড়ে গেল। তারপরই সন্তু দেখল দুটো মুর্গি কক্-কক্ করে ডেকে পালাচ্ছে।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "এ কী, মুর্গি ? জঙ্গলের মধ্যে মুর্গি ?"

বিমান বলল, "বনমুর্গি বনমুর্গা ! ওরা জঙ্গলে থাকে। খুব টেস্টফুল।"

কাকাবাবু বললেন, "না, বনমুর্গা নয়, ওগুলো এমনিই সাধারণ মুর্গি। এখানকার লোকেরা জঙ্গলে ঢোকার সময় বনবিবির পুজো করে, তখন একটা মুর্গি ছেড়ে দেয়।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তারপর বনে থাকতে থাকতে এক সময় ওরাও বুনো হয়ে যায়। তাদের বাচ্চা হলে সেগুলিই হয়ে যাবে বনমুর্গা !"

স্পিডবোটটা ছোট নদী ছেড়ে বড় নদীতে পড়বার ঠিক আগেই ঝপাং ঝপাং শব্দ হল।

পেছনের নৌকো থেকে ডাকাত তিনজন জলে লাফিয়ে পড়েছে।

সন্তু আর বিমান উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। স্পিডবোটের চালক মুখ ফিরিয়ে ব্যাপারটা দেখেই বোটটা ঘোরাতে গেল ওদের দিকে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "যাক, যাক, আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

বিমান বলল, "ওদের ধরা হবে না ? ইচ্ছে করলেই ধরা যায় !"

ডাকাত তিনটে ডুবসাঁতার কেটে পারের দিকে এগোচ্ছে, এক একবার তাদের মাথা ওপরে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

রণবীর ভট্টাচার্য হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আমি ভাবছিলুম ব্যাটারা পালাতে এত দেরি করছে কেন ? ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলে ঝামেলা হত আমাদের। এদিকে থানা নেই, লোকবসতি নেই, ওদের রাখতুম কোথায় ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ওরা জঙ্গলে থাকবে ? যদি ওদের বাঘে ধরে ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "ওরা সব জানে, কোন্ জঙ্গলে বাঘ আছে, কোথায় নেই। ঠিক জায়গা বুঝে লাফিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিংবা বোধহয় মুর্গি দুটো দেখে ওদের লোভ হয়েছে।"

হঠাৎ মত বদলে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এদের একটা প্রায় পাড়ে গিয়ে উঠেছে, বোটটা ওর কাছে নিয়ে চলো তো!"

পাড়ের কাছে খুব কাদা, একজন ডাকাত জল ছেড়ে উঠে কাদার মধ্যে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে দৌড়োবার চেষ্টা করছিল, স্পিডবোটটা তার কাছাকাছি পৌঁছতেই রণবীর ভট্টাচার্য রিভলভার উঁচিয়ে চোখ কটমট করে বললেন, "দেব ? মাথাটা ফুটো করে দেব ?"

লোকটি এবারে হাত জোড় করে হাউমাউ করে কেঁদে বলল, "দয়া করুন বাবু! এবারকার মতন বাঁচিয়ে দিন। আর কোনওদিন অন্যায় কাজ করব না। নাকে খত দিচ্ছি বাবু, এবারে মাপ করে দিন!"

"ঠিক তো ? মনে থাকবে ?"

"নাকে খত দিচ্ছি বাবু! কিরে কেটে বলছি, এরকম আর করব না।"

অন্য দুটি লোক জল থেকে মাথা তুলেই আবার ডুব দিল।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "ঐ দুই স্যাঙাতকেও বলে দিস! মনে থাকে যেন! তবে, তোমাদের নৌকো আর বন্দুক ফেরত পাবে না। ফেরত নিতে চাও তো গোসাবা থানায় যেও!"

স্পিডবোটটা আবার স্পিড নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বড় নদীতে পড়ল। আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। জলে তার ছায়া পড়েছে, অন্ধকার অন্ধকার একটা ভাব। নদীতে বেশ বড় বড় ঢেউ।

কাকাবাবু বললেন, "জোয়ার আসছে মনে হচ্ছে।"

রণবীর ভট্টাচার্য স্পিডবোট-চালককে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই লঞ্চটার কাছে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে ? তুমি একবার গিয়েছিলে তো সেখানে ?"

"হ্যাঁ, সার। আর বেশি দূর নয়। নৌকোটা বাঁধা রয়েছে যে, নইলে আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যেতুম।"

"দ্যাখো, যদি বৃষ্টি নামার আগে পৌঁছে দিতে পারো!"

বলতে বলতেই নেমে গেল বৃষ্টি। দারুণ বড় বড় ফোঁটা। বসে বসে ভেজা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেলে মাথা বাঁচানো যায়। কাকাবাবু, যাবেন নাকি নৌকোতে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, থাক। আবার ওঠাউঠি করা এক ঝামেলা। তোমরা যেতে পারো।"

কেউই গেল না, বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজতে লাগল বসে বসে। খুব জোরে বাতাসও বইছে, পেছনের নৌকোটা ভীষণ দুলছে, সেজন্য স্পিডবোটেরও গতি

কমে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এতবড় নদী, অথচ এদিকে একটা নৌকো বা লঞ্চ দেখছি না।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সমুদ্র তো বেশি দূরে নয়। এদিকে সার্ভিস লঞ্চ চলে না। মাছ-ধরা নৌকো-টৌকো যায় নিশ্চয়ই, আসলে মেঘ দেখে তারা ঘরে ফিরে গেছে।"

স্পিডবোটের চালক বলল, "ক'দিন ধরেই এখানে খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে।"

সন্তু বলল, "কলকাতায় তো একদম বৃষ্টি পড়েনি!"

"এদিকে একটু বেশি বৃষ্টি হয়। সমুদ্র কাছেই কিনা!"

বিমান হঠাৎ বলে উঠল, "ওই যে সামনে ঝাপসামতন কী দেখা যাচ্ছে? ওইটাই সেই লঞ্চটা না?"

৪

লঞ্চ একটা নয়, দুটো। প্রথম লঞ্চটা চড়ায় আটকে একটুখানি কাত হয়ে আছে। দ্বিতীয় লঞ্চটা একটুখানি দূরে, সেটা ধপধপে সাদা রঙের, জলের উপর রাজহংসের মতন ভাসছে।

বৃষ্টির দাপট খানিকটা কমেছে। স্পিডবোটের আওয়াজ শুনেই প্রথম লঞ্চের ডেকের ওপর একজন লোক এসে উঁকি মারল। এই লঞ্চটার নাম মধুকর। স্পিডবোট মধুকরের পাশেই এসে থামল আগে।

রণবীর ভট্টাচার্য উঠে দাঁড়িয়ে মধুকরের সেই লোকটিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেতেই লোকটি যেন ভূত দেখার মতন চমকে উঠল। তারপর এক ছুটে চলে গেল ভেতরে।

রণবীর ভট্টাচার্য হেসে উঠলেন।

বিমান জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, লোকটা পালাল কেন?"

স্পিডবোট-চালক বলল, "মধুকরের সারেঙ তো মইধরদা! সে গেল কোথায়? ও মইধরদা! মইধরদা!"

কেউ কোনও সাড়াশব্দ করে না।

বিমান সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "মইধর? এ আবার কী রকম অদ্ভুত নাম?"

সন্তু বিমানের চেয়ে ভাল বাংলা জানে। সে বলল, "মইধর না। মহীধর!"

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর একজন মোটামতন লোক কোমরের লুঙ্গিতে গিঁট বাঁধতে বাঁধতে এল রেলিং-এর কাছে। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ঘুমোচ্ছিল।

লোকটি এসে খুব বিরক্তভাবে বলল, "গোসাবা থানায় সেই সক্কালবেলা খবর দিয়েছি। তারপরেও কোনও লোক পাঠাল না। আমার লঞ্চে খাওয়া-দাওয়ার

কিছু নেই। সারারাত কি এখানে না খেয়ে পড়ে থাকব ? কাশেম, এনারা কারা ?"

স্পিডবোটের চালক রণবীর ভট্টাচার্যকে দেখিয়ে বলল, "ইনি পুলিশের বড় কর্তা। আর এনারা কলকাতা থেকে এসেছেন। সাহেবদের লঞ্চটা দেখবেন।"

মহীধর নামের লোকটি বলল, "ওই লঞ্চ দেখতে চান, দেখুন গিয়ে ! আমি তার কী করব ? আমাদের এখন সারা রাত এখানে পড়ে থাকতে হবে ? থানা থেকে কিছু খবর পাঠিয়েছে ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এ লোকটা তো আচ্ছা দেখছি ! একটা কাজের জন্য পাঠানো হল, সে কাজ না পেরে নিজের লঞ্চটাই আটকে ফেলল চড়ায়। এখন আবার গজগজ করছে !"

মহীধর বলল, "আমি স্যার পুলিশে কাজ করি না। পুলিশ থেকে এই লঞ্চ ভাড়া করেছে। লঞ্চ চড়ায় আটকে গেলে আমি কী করব ?"

সন্তু তখনও ভাবছে, প্রথম লোকটা ওরকম দৌড়ে পালিয়ে গেল কেন ?

কারণটা বুঝতে পারা গেল তক্ষুনি। সেই লোকটা পুলিশের কনস্টেবল, কিন্তু সে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে রণবীর ভট্টাচার্যকে দেখেই চিনতে পেরেছে। ডিউটির সময় বড় অফিসারদের সামনে সাধারণ পুলিশদের সব সময় পুরো পোশাক পরে থাকতে হয়। তাই সে দৌড়ে ভেতরে গিয়ে হাফ-প্যান্ট আর জামা, বেল্ট, জুতো-মোজা সব পরে এসেছে তাড়াতাড়ি।

এবারে সে এসেই ঠকাস করে দু'পায়ের জুতো ঠুকে একখানা স্যালুট দিল রণবীর ভট্টাচার্যকে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তক্তা ফেলো ! আমরা এই লঞ্চে আগে একটু জিরিয়ে নিই। ভিজে একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছি। এক কাপ করে চা খাওয়াতে পারো সবাইকে ?"

"স্যার, চা আর চিনি আছে, দুধ নেই।"

"ওতেই হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "রণবীর, তোমরা বরং একটু জিরিয়ে নাও আর চা খাও ! আমি কষ্ট করে এই লঞ্চে একবার উঠব, আবার নামব, সে অনেক ঝামেলা। আমি আগে ওই লঞ্চটাতেই চলে যেতে চাই।"

রণবীর ভট্টাচার্য তক্ষুনি মত বদলে বললেন, "সেই ভাল, চলুন, আমরা সবাই আগে ওই লঞ্চটায় যাই। এরা ততক্ষণে চা বানাক, তারপর ওই লঞ্চেই চা পৌঁছে দেবে।"

কাকাবাবু স্পিডবোটের চালককে বললেন, "তুমি প্রথমে ওই লঞ্চটার চারপাশে একটা চক্কর দাও ! আমি বাইরে থেকে পুরো লঞ্চটা একবার দেখতে চাই।"

খুব আস্তে আস্তে লঞ্চটার চারপাশ ঘুরে আসা হল। লঞ্চটা দেখতে খুব সুন্দর। অন্য লঞ্চের মতন লম্বাটে নয়, একটু যেন গোল ধরনের। কিন্তু লঞ্চের গায়ে কোনও নাম লেখা নেই।

এবারে লঞ্চের সামনেটা দিয়ে এক এক করে সবাই ওপরে উঠে এল। কাকাবাবুকে ধরাধরি করে তুলতে হল ওপরে।

রণবীর ভট্টাচার্য বোট-চালককে বললেন, "তোমার নাম কাশেম ? তুমি ওই লঞ্চে চলে যাও, চা-টা নিয়ে এসো। আর দেখো তো, ওদের ওখানে তোয়ালে বা গামছা-টামছা কিছু পাও কি না ! মাথা মুছতে হবে তো !"

এই লঞ্চের ডেকে পা দিয়েই সন্তু হ্যাঁচ্চো করে হেঁচে ফেলল।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এই রে, ঠাণ্ডা লেগে গেছে। জামা খুলে ফেলো, জামা খুলে ফেলো। নইলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে !"

তিনি নিজেই আগে খুলে ফেললেন গায়ের জামা।

বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। কিন্তু সন্ধে হতে আর বিশেষ দেরি নেই।

সিঁড়ি দিয়ে সবাই নেমে এল নীচে। প্রথমেই চোখে পড়ল খাবার ঘরটা। টেবিলের ওপর এখনও কাপ-প্লেটগুলো রয়েছে। প্লেটের ওপর পড়ে আছে আধ-খাওয়া খাবার। কাপে অর্ধেকটা কফি। কিন্তু রান্নার অন্য জিনিসপত্র এমনকী কফির কেটলি, জল খাওয়ার গেলাসেরও কোনও চিহ্ন নেই। সব উধাও !

লঞ্চটার নানান জায়গায় ভাঙচুরের চিহ্ন। এখানে সেখানে হাতুড়ির দাগ। কেউ যেন ভেতরের দেয়ালও পিটিয়ে পিটিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করেছে। শোবার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা ছিন্নভিন্ন বালিশ, কেউ যেন ছুরি দিয়ে সেটাকে ফালা-ফালা করেছে। এক কোণে পড়ে আছে এক পাটি চটি। মনে হয় যেন লঞ্চটার মধ্যে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, লঞ্চটার কোনও নাম তো নেই-ই কোন্ দেশে তৈরি, তারও কোনও প্রমাণ নেই, মালিকের নামে কোনও কাগজপত্র নেই, কিছুতেই বোঝা যায় না এটা কোন দেশ থেকে এসেছে। তাইতেই সন্দেহ হয়, এর সঙ্গে স্পাইং-এর কোনও সম্পর্ক আছে।"

বিমান বলল, "এত বড় লঞ্চ নিয়ে একা একা কেউ সুন্দরবনে স্পাইং করতে আসবে ? কেন, আমাদের সুন্দরবনে গোপন কী আছে ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমাদের এখানে স্পাই আসবে কেন ? যতদূর মনে হয়, কোনও বিদেশি স্পাই জাপান বা চিনে গিয়েছিল, তারপর হঠাৎ সে কোথাও নেমে যায় কিংবা কেউ তাকে খুন করে জলে ফেলে দেয়। তারপর খালি লঞ্চটা ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছে !"

কাকাবাবুর কপালটা কুঁচকে গেছে। তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন। এবার মুখ তুলে বললেন, "আমি যা সন্দেহ করছিলুম তা-ই ঠিক! মনে হচ্ছে এই লঞ্চটা কার আমি তা জানি।"

রণবীর ভট্টাচার্য চমকে উঠে বললেন, "আপনি জানেন!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের পুলিশদের থিয়োরি তো এই যে, লঞ্চের মালিক খুন বা উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখানে খালি লঞ্চটা ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়?"

"অর্থাৎ?"

"এমনও তো হতে পারে যে এই লঞ্চের মালিক কোনও কারণে নিজেই এসে পড়েছিল এখানে। হয়তো তার ইঞ্জিনের গণ্ডগোল হয়েছিল কিংবা তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল—"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু, সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একটা লোক একা একা এত বড় একটা লঞ্চ নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে কেন? এই লঞ্চে বেডরুম মোটে একটা, বিছানাও একটা, সুতরাং একজনের বেশি লোক ছিল না। অবশ্য, একা একা কেউ কেউ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রেকর্ড করার চেষ্টা করে। ফ্রান্সিস চিচেস্টার যেমন।"

"চিচেস্টার লঞ্চে যাননি, পাল-তোলা নৌকোয় গিয়েছিলেন।"

"সে যাই হোক। কিন্তু সে রকম কোনও অভিযাত্রীর কথা তো শিগগির শোনা যায়নি।"

সন্তু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "রেডিওটা কোথায়?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে প্রশংসার চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, "গুড কোয়েশ্চেন! ছেলেটার বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি হচ্ছে দেখছি। সত্যিই তো, রেডিওটা কোথায়? ফরেস্ট অফিসার যখন প্রথম এই লঞ্চটা দেখে, তখন লঞ্চে কোনও মানুষ ছিল না, কিন্তু রেডিও চলছিল। ফরেস্ট অফিসার কি এই লঞ্চ থেকে কিছু নিয়ে গেছে?"

"না। হি শুড নট্। তার রিপোর্টেই দেখা গেছে, তখন লঞ্চে আর কিছু ছিল না। সব লুট হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরাই লুটেপুটে নিয়েছে নিশ্চয়ই।"

বিমান বলল, "অন্য সব কিছু নিল, কিন্তু রেডিওটা নিল না কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "রেডিওটা নিশ্চয়ই ইন-বিল্ট। বাইরে থেকে দেখা যায় না। দেয়ালের গায়ে কোথাও সুইচ আছে, সেটা খুঁজতে হবে।"

সবাই মিলে খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর সন্তুই প্রথম খুঁজে পেল। রান্নাঘরের দেওয়ালেই রয়েছে পর পর তিনটি নব। তার মধ্যে প্রথম নবটা ঘোরাতেই শুরু হল খুব জোরে বাজনা।

কাকাবাবু খুব মন দিয়ে সেই বাজনা শুনতে লাগলেন।

বিমান বলল, "দেখা যাচ্ছে, এখানে কারা যেন হাতুড়ি দিয়ে দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রেডিও'র আওয়াজ শুনেও তারা রেডিও খোঁজার চেষ্টা করল না ? ওই যে ওপরে জালমতন দেখা যাচ্ছে, ওর মধ্যেই বসানো আছে রেডিওটা।"

কাকাবাবু বললেন, "এই লঞ্চে ডাকাতি হয়েছে অন্তত দু'তিনবার। প্রথমবার এসেছিল বড় ডাকাতরা, যারা লঞ্চের মালিককে মেরেছে আর দামি দামি জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার এসেছে ছিঁচকে ডাকাতরা, তারা যেখানে যা পেয়েছে তাই-ই নিয়েছে।"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করে বুঝলেন, দু'তিন বার চুরি-ডাকাতি হয়েছে ? একবারেই তো সব নিয়ে যেতে পারে ?"

"যে-ডাকাতরা মানুষ মারে, তারা রান্নার বাসনপত্র কিংবা চেয়ার-বেঞ্চি পর্যন্ত নেয় না। একটা জিনিস লক্ষ করেছ, এই লঞ্চে একটা চেয়ার পর্যন্ত নেই। খাবারের টেবিল আছে, তারও চেয়ার নেই। এগুলো সব কোথায় গেল ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমিও কাকাবাবুর সঙ্গে একমত। খালি লঞ্চ দেখে যে পেরেছে সে-ই একবার উঠে এসে দেখে গেছে, আর হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে চলে গেছে।"

বিমান বলল, "তাহলে তারা রেডিওটা নিল না কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। এই লঞ্চের মালিককে যখন মেরে ফেলা হয়, তখন রেডিওটা চলছিল। তারপর প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়, রেডিও আপনি চুপ করে যায়। দ্বিতীয় দল যখন আসে, তখন রেডিও চুপ করে ছিল। তাই তারা রেডিও যে আছে তা বুঝতে পারেনি। আমরা অনেক সময় রাত্তিরবেলা রেডিও বন্ধ করতে ভুলে যাই, পরদিন সকালে আপনাআপনি রেডিও বেজে ওঠে !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখন রেডিওটা বন্ধ করে দেব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাজনা থেমে গিয়ে ঘোষণা শুরু হল। কিন্তু দুর্বোধ্য কোনও বিদেশি ভাষা, ইংরেজি নয়। সন্তু তার একবর্ণও বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু বিমানকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কোন ভাষা বলতে পারো ? তুমি তো অনেক দেশে যাও।"

বিমান বলল, "ঠিক ধরতে পারছি না। জার্মান নাকি ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "না, না, জার্মান নয়, যতদূর মনে হচ্ছে এটা সুইডিশ ভাষা !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার অনুমানই ঠিক। এটা সুইডিশ ভাষা, স্টকহল্‌ম, গোথেনবুর্গ এইসব জায়গার নাম শোনা যাচ্ছে। তা হলে আর কোনও সন্দেহ রইল না। এই বোটের মালিক ইংগমার স্মেল্ট !"

"তিনি কে ?"

বাইরে স্পিডবোটের আওয়াজ পাওয়া গেল। কাকাবাবু বললেন, "চা এসে গেছে। আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "চা ওরা এখানে নিয়ে আসবে। আপনি বলুন ইংগমার স্মেল্ট কে ? আপনি তাকে চিনতেন ?"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কখনও। ইশ, এরকম একজন মানুষের এই বীভৎস পরিণতি হল ? সুন্দরবনের কয়েকটা ডাকাতের হাতে ওইরকম একজন মহান মানুষের জীবনটা গেল ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "ইংগমার স্মেল্ট ? মহান মানুষ ? অথচ আমি তার নাম শুনিনি ? ভদ্রলোক জাতে সুইডিশ ?"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীর লোক এই সব ভাল-ভাল মানুষের কথা বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। ইংগমার স্মেল্ট সুইডেনের লোক হলেও কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন। বিরাট বৈজ্ঞানিক। যে বছর ভিয়েৎনামে যুদ্ধ শুরু হয়, সেই বছর নোবেল প্রাইজের জন্য ওঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। উনি সেই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। উনি বলেছিলেন, কোনও বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করার কাজে লাগানো যাবে না। তিনি পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেন কেউ-ই আর কোনও দেশের সরকারকে অস্ত্র বানাতে সাহায্য না করে !"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "হ্যাঁ, এই ঘটনা কাগজে পড়েছিলুম সেই সময়। কিন্তু ভদ্রলোকের নাম মনে ছিল না।"

কাকাবাবু বললেন, "ইংগমার স্মেল্ট-এর কথা নিয়ে কয়েকটা দিন পৃথিবীর সব কাগজে হৈ-চৈ হয়েছিল, তারপর এক সময় চাপা পড়ে গেল। কিছুদিন পরে লোকে তাঁর কথা ভুলেই গেল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে স্মেল্ট নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন !"

স্পিডবোটের চালক আর পুলিশ কনস্টেবলটি একটি কেট্‌লি আর কয়েকটা গেলাস নিয়ে এল। তারপর সেই গেলাসে কালো কুচকুচে চা ঢালল।

স্পিডবোটের চালক জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনারা কখন ফিরবেন ? রাত হয়ে গেলে তো মুশকিল হবে ! আকাশের অবস্থা খারাপ, আবার ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। ডাকাতেরও ভয় আছে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তোমরা বাইরে একটু অপেক্ষা করো ! আমি একটু বাদে বলছি। মধুকর লঞ্চটাকে সারা রাত থাকতে হবে কেন ? জোয়ার আসছে কখন ?"

জোয়ার তো আসতে শুরু করেছে, কিন্তু লঞ্চ তবু নড়ছে না। অন্য লঞ্চ এনে ওটাকে টানা দিতে হবে !"

"একখানা ছোট লঞ্চ উদ্ধার করার জন্য আরও দুটো লঞ্চ লাগবে ? ভাল ব্যাপার ! যাও, এখন বাইরে গিয়ে বসো। আমাদের দরকারী কথা আছে।"

ওরা চলে যেতেই রণবীর ভট্টাচার্য কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, তারপর ? আপনি বুঝলেন কী করে যে, এটা সেই স্মেল্ট সাহেবের লঞ্চ ? সুইডেনের অন্য কোনও লোকেরও তো হতে পারে ? তা ছাড়া রেডিওতে সুইডিশ প্রোগ্রাম হচ্ছে বলেই যে সেখানকার লঞ্চ, তাও জোর দিয়ে বলা যায় না। গান-বাজনা শোনার জন্য লোকে কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অন্য অনেক দেশের প্রোগ্রাম শোনে।"

কাকাবাবু বললেন, "বছর কয়েক আগে আমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় একটা লেখা আর ছবি দেখেছিলুম। ঠিক এই রকম একটা লঞ্চের ছবি। ওরা লিখেছিল, ইংগমার স্মেল্ট সেই লঞ্চে করে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পৃথিবীর কোনও দেশের বৈজ্ঞানিকই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি বলে তিনি ঠিক করেছিলেন, তিনি আর কোনও দেশেরই নাগরিক থাকবেন না। পৃথিবীর বড় বড় সমুদ্রগুলি এখনও ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার, তা কোনও দেশের এলাকার মধ্যে পড়ে না। তিনি ঠিক করেছিলেন, জীবনের বাকি কয়েকটা দিন তিনি সেই জলে জলেই কাটিয়ে দেবেন !"

বিমান বলল, "অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা তো !"

"পৃথিবীতে দু'চারজন মানুষ এখনও এরকম অদ্ভুত হয় বলেই মানুষের জীবনে এখনও বৈচিত্র্য আছে। নইলে সব মানুষই তো একরকম হয়ে যেত !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু অতদিন জলের ওপর ভেসে থাকলে ওঁর খাবার ফুরিয়ে যাবে না ?"

"খাবার তো ফুরিয়ে যাবেই, তার চেয়েও বড় সমস্যা হল পানীয় জলের। সমুদ্রের জল তো খাওয়া যায় না ! সেইজন্য মাঝে-মাঝে উনি কোনও বন্দরে এসে কিছু খাবার-দাবার আর মিষ্টি জল সংগ্রহ করে নিতেন। একলা বুড়ো মানুষ, ওঁর বেশি কিছু লাগত না !"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আপনি ছ'বছর আগে খবরটা দেখেছিলেন ? এতদিন ধরে উনি সমুদ্রের বুকে ভাসছেন ? এতদিন যে কেউ ওঁকে মেরে ফেলেনি, সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকের মৃত্যু হল কিনা আমাদের দেশে এসে ! যাই হোক, আপনার কথায় তবু একটা সূত্র পাওয়া গেল। এখন সুইডেনে খবর পাঠালে সেখানকার সরকার নিশ্চয়ই কিছু খোঁজ দিতে পারবে। লঞ্চটাও আমরা সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেব ! তা হলে এখন ফেরা যাক ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেই ভাল। তোমরা ফেরার ব্যবস্থা করো। আমি আজ রাতটা এখানে থাকব।"

"আপনি এখানে থাকবেন ? কেন ?"

“এতদূর যখন এসে পড়েছি, তখন দু'একটা জিনিস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই। ইংগমার স্মেল্ট-এর মৃতদেহটা পাওয়া যায়নি কেন ?”

“মৃতদেহ পাওয়া যাবে কী করে ? এ জায়গাটা সমুদ্রের এত কাছে, এখানকার সব কিছুই সমুদ্রে ভেসে চলে যায়। কিংবা ডেডবডির সঙ্গে যদি ইঁট-পাথর বেঁধে ফেলে দিয়ে থাকে, তাহলে কোনওদিনই তা ভেসে উঠবে না।”

“ইংগমার স্মেল্ট পণ্ডিত লোক ছিলেন। এই সব পণ্ডিতরা লেখাপড়া বাদ দিয়ে কিছুতেই থাকতে পারেন না। নিশ্চয়ই তাঁর এই বোটে অনেক দামি দামি বই ছিল, এই ছ'বছর তিনি হয়তো লিখেছিলেন অনেক কিছু, সে সবই হারিয়ে গেল ?”

“খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু কিছুই তো নেই দেখছি। সাধারণ চোর-ডাকাতরা কি ওই সব জিনিসের দাম ঝোঝে ? বোধহয় এমনিই সব জলে ফেলে দিয়েছে।”

“একজন নিরীহ, নিষ্পাপ, জ্ঞানতপস্বী বৃদ্ধ, তাঁকে যারা মারে, তারা কি মানুষ না পশু ? কী-ই বা এমন মূল্যবান জিনিস ছিল এখানে ?”

কাকাবাবুর গলার আওয়াজটা এমন হয়ে গেল, যেন তাঁর খুব আপনজন কেউ মারা গেছে। সন্তুর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। একজন মানুষ পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু জলে জলে ভাসছিলেন, তাঁকে লোভী মানুষেরা বাঁচতে দিল না।

একটুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল, তারপর রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “একটা যখন ক্লু পাওয়া গেছে, তখন অপরাধীরা ধরা পড়বেই। কালকেই বড় পুলিশ পার্টি আনিয়ে এ তল্লাটটাপুরো সার্চ করাব। চলুন, কাকাবাবু, আজ আমরা ফিরে যাই। এখন সওয়া ছ'টা বাজে। এখনও স্টার্ট করলে আমরা রাত দশটার মধ্যে ক্যানিং পৌঁছে যেতে পারব।”

“তোমরা এগিয়ে পড়ো তা হলে। আর দেরি করে লাভ নেই। বিমানের পরশু ডিউটি, সন্তুর পড়াশুনো আছে—”

“আপনি এখানে একা থেকে কী করবেন ?”

“কিছুই না। এমনিই থেকে যাই। স্পিডবোটটা পাঠিয়ে দিও কাল সকালে, এদিকে একটু ঘোরাফেরা করব।”

“না, না, আপনার এখানে একা থাকা চলবে না। খাওয়া-দাওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া এখানে থাকলে বিপদ হতে পারে। চোর-ডাকাতরা যে আবার আসবে না তাই-ই বা কে বলতে পারে ?”

“আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমার কীরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে, আমার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। কতবার কত রকম বিপদে পড়েছি। কিন্তু প্রাণটা তো যায়নি ! এখানে আর কী হবে ? আর খাওয়া-দাওয়ার কথা বলছ ? এক রাত্তির আমি না খেয়ে চমৎকার কাটিয়ে দিতে পারি।”

"না, না কাকাবাবু, আপনাকে এখানে একা রেখে যাওয়া অসম্ভব ! চলুন, চলুন এবার !"

"শোনো, রণবীর, আজ যদি চলে যাই, কাল আর ফিরে আসা হবে না। ইংগমার স্মেল্ট-এর সত্যি কী পরিণতি হল, তা না জেনেই চলে যাব ? এইসব মহান মানুষের কাছে কি আমাদের কোনও ঋণ নেই ? কিছু একটা না করলে আমি শান্তি পাব না।"

"তা হলে এক কাজ করা যাক। আমিও থেকে যাই আপনার সঙ্গে। সন্তু আর বিমানবাবু ফিরে যাক স্পিডবোটটা নিয়ে।"

সন্তু আর বিমান একসঙ্গে বলে উঠল, "না, না, তা হতেই পারে না ! আমরাও তা হলে থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু বিমানের তো পরশু ডিউটি।"

বিমান বলল, "আমার কাল যে-কোনও সময় ফিরলেই হবে। এমনকী, পরশু আমার দুপুর দুটোয় রিপোর্টিং, যদি দেড়টার মধ্যে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পারি, তাহলেই চলবে। এখন আপনাদের ফেলে আমি যেতে পারব না !"

রণবীর ভট্টাচার্য বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে থুতনিতে টোকা দিতে দিতে চিন্তিতভাবে বললেন, রাত্তিরে আমরা সবাই মিলে এখানে থাকব ? খাবার-দাবার কিছু নেই, তা ছাড়া আমার জরুরি কাজ আছে ! কাকাবাবু, আপনি মুশকিলে ফেললেন দেখছি !"

"আমি তো বলছি, তোমরা সবাই ফিরে যাও ! আমি একলা থাকলে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"সে তো আউট অফ কোশ্চেন ! তা হলে থাকাই যাক ! অনেকদিন এমন কষ্ট করে রাত কাটাইনি। একটা নতুনত্বও হবে !"

সিঁড়ির কাছে গিয়ে তিনি হাঁক দিলেন, "ওহে, শোনো এদিকে !"

স্পিডবোটের চালক ওপর থেকে উঁকি দিয়ে বলল, "কী বলছেন, স্যার ?"

"রাত হয়ে গেছে, এখন ফেরা কি ঠিক হবে ? আবার যদি ডাকাতরা হামলা করে ? তুমি বলো, সে রকম সম্ভাবনা আছে ?"

"বড় নদীর ওপর দিয়ে খুব স্পিডে চলে গেলে কেউ ধরতে পারবে না আমাদের। অবশ্য দূর থেকে গুলি করতে পারে।"

"পারে ? গুলি করতে পারে ? অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতর থেকে যদি বন্দুকের গুলি চালায়, তা হলে তো গেছি ! না, না, এত ঝুঁকি নিয়ে রাত্তিরবেলা যাওয়া ঠিক নয়। থেকেই যাওয়া যাক, কী বলো !"

"আপনি যা বলবেন, স্যার !"

"খাওয়া-দাওয়ার কী হবে ? ওই লঞ্চে চা-চিনি যথেষ্ট আছে তো ? সারা রাত শুধু চা খেয়ে থাকব !"

পুলিশ কনস্টেবলটি বলল, "চা-চিনি আছে, আর কিছু চাল আছে, স্যার।"

রণবীর ভট্টাচার্য উৎসাহিত হয়ে বললেন, "চাল আছে? তবে আর কী! নুন নেই? আলু নেই?"

"নুন আছে, স্যার। আলু নেই।"

"ইশ্! আলু থাকলে ফেনাভাত আর আলুসেদ্ধ চমৎকার খাওয়া যেত। ঠিক আছে। শুধু ফেনাভাতই সই! রাত্তিরে একেবারে খালি পেটে আমি থাকতে পারি না। ওই লঞ্চের সারেংকে বলো। আজ আমাদের ফেনাভাত খাইয়ে দিক, কাল আমি ওদের মুর্গির মাংস খাওয়াব!"

"ঠিক আছে, স্যার!"

"আর দ্যাখো তো, ওই লঞ্চে একটা শতরঞ্চি আছে কি না। এই লঞ্চে একটু বসবারও উপায় নেই।"

তারপর আপন মনেই হেসে উঠে তিনি বললেন, "কে জানে, আমি রাত্রে না ফিরলে আমার খোঁজে আবার একটা লঞ্চ এসে হাজির হয় কিনা! আসে তো আসুক!"

৫

রাত্রে থেকে যাওয়াটা সার্থক হয়েছে, তা খানিকটা বাদেই কাকাবাবু প্রমাণ করে দিলে।

ভাড়া-করা লঞ্চটায় শতরঞ্চি পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল দুটো ছেঁড়া মাদুর। তাই পেতে ওরা বসেছিল ডেকের ওপরে। আকাশ মেঘলা, চাঁদ ওঠেনি। চারপাশটা কী রকম গা-ছমছমে অন্ধকার। নদীর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। নদীটা খুব চওড়া হলেও ওদের লঞ্চ রয়েছে এক দিকের পাড় ঘেঁষে। নদীর দু'দিকেই জঙ্গল। স্পিডবোটের চালক কাশেম অবশ্য ভরসা দিয়েছে যে, এদিককার জঙ্গলে বাঘ নেই, কারণ এখানে জঙ্গলটা বেশ সরু, তার ওপারেই আর একটা নদীর মুখ। কিন্তু নদীর ওপরের জঙ্গলটায় নির্ঘাত বাঘ আছে। ওই জঙ্গলটার নামই হল বাঘমারা।

বিমান জিজ্ঞেস করেছিল, "বাঘ তো সাঁতরে আসতে পারে শুনেছি?"

কাশেম আমতা আমতা করে বলেছিল, "তা পারে। তবে এত চওড়া নদী, স্রোতের টানও খুব, এতখানি সাঁতরে বাঘ আসবে না!"

রণবীর ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "সুন্দরবনের বাঘকে বিশ্বাস নেই, ওরা সব পারে। এরকম ফেরোশাস্ বাঘ আর সারা পৃথিবীতে নেই। এখানকার প্রত্যেকটা বাঘই নরখাদক।"

বিমান জিজ্ঞেস করেছিল, "রণবীরবাবু, আপনি কখনও বাঘ দেখেছেন? আপনি তো অনেকবার এসেছেন এদিকে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমি যখন চব্বিশ পরগনার এস. পি. ছিলাম, তখন বেশ কয়েকবার এদিকে আসতে হয়েছে। তবে বাঘ-টাঘ কখনও দেখিনি। আমি এই সব বিশ্রী জন্তুজানোয়ারের থেকে সব সময় দূরে থাকতে চাই।"

কাশেম বলল, "আমি একবার স্যার প্রায় বাঘের মুখে পড়েছিলুম।"

"কোথায় ?"

"আপনার ওইদিকটায় হচ্ছে রায়মঙ্গল নদী। সেখানে ছোট মোল্লাখালি বলে একটা গ্রাম আছে। আমার বাড়ি সেখানে। সেই গ্রামে একবার বাঘ এসেছিল। এই তো মোটে দু'বছর আগে—"

তারপর শুরু হয়ে গেল বাঘের গল্প।

কাকাবাবু কিন্তু এই গল্পে যোগ দেননি। তিনি ওপরেও আসেননি। তিনি লঞ্চের নীচতলাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন একটা লম্বা টর্চ জ্বেলে। কী যে তিনি খুঁজছেন, তা তিনিই জানেন। তাঁর ক্রাচের ঠক ঠক শব্দ শোনা যাচ্ছে ওপর থেকে।

রণবীর ভট্টাচার্য কয়েকবার কাকাবাবুকে ডেকেছিলেন ওপরে আসবার জন্য। কাকাবাবু বলেছিলেন, "তোমরা গল্প করো না, আমি পরে আসছি।"

রণবীর ভট্টাচার্য এমন একটা মুখের ভাব করেছিলেন, যার অর্থ হল, এমন পাগল মানুষকে নিয়ে আর পারা যায় না !

কাশেম তিন-চারটে বাঘের গল্প বলবার পর রণবীর ভট্টাচার্য তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "মাত্র পৌনে আটটা বাজে, অথচ মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। ওহে কাশেম, দ্যাখো না, আর এক রাউণ্ড চা পাওয়া যায় কি না !"

কাশেম চলে গেল চা আনতে।

রণবীর ভট্টাচার্য চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন, "মাঝে-মাঝে এরকমভাবে রাত কাটানো মন্দ না। তবে বাঘ-ফাগ না এলেই বাঁচি। আর ডাকাত-ফাকাত যদি এসে পড়ে, আমি একদিনে দু'বার ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে পারব না !"

বিমান বলল, "এখানে দুটো লঞ্চ মিলে আমরা অনেক লোক, এখানে ডাকাত আসবে কোন্ সাহসে ?"

"আরে ভাই আপনি জানেন না। যদি একটা ছোট মেশিনগান নিয়ে আসে, তা হলে আমরা সবাই ছাতু হয়ে যাব। বাংলাদেশ ওয়ারের পর এইসব বর্ডার এরিয়ায় অনেকের কাছেই লাইট মেশিনগান ছিল।"

সন্তু বলল, "নীচে গিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দিলে হয় না ? এই রেডিওতে নিশ্চয়ই লোকাল স্টেশন পাওয়া যাবে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "তা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, কাঁটা ঘুরিয়ে দ্যাখো।

শুনে এসো তো। স্থানীয় সংবাদে আমাদের নিরুদ্দেশ সংবাদ শোনায় কি না!"

সন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখল, সিঁড়ির ঠিক নীচেই কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে টর্চ জ্বেলে অন্য হাতে সিঁড়ির একটা ধাপ ধরে টানাটানি করছেন তিনি।

সন্তু নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী খুঁজছেন কাকাবাবু?"

কাকাবাবু বললেন, "যা খুঁজছিলাম, তা বোধহয় এবারে পেয়ে যাব, রণবীরকে ডাকো তো!"

সন্তুর ডাক শুনে রণবীর ভট্টাচার্য আর বিমান দু'জনেই নেমে এল।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে তোমাদের সাহায্য চাই।"

বিমান বলল, "কী হয়েছে, কাকাবাবু?"

"তোমরা একটা জিনিস চিন্তা করোনি। লঞ্চের বিভিন্ন দেয়ালে হাতুড়ি কিংবা শাবলের দাগ দেখেছিলে নিশ্চয়ই। ডাকাতরা লঞ্চের দেয়াল ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেন? শুধু শুধু ইস্পাতের দেয়াল ভেঙে তাদের কী লাভ? আমি অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে দেখলুম, এই নীচতলায় সব ক'টা ঘর আর মেশিনপত্রের জায়গা ছাড়াও চৌকো খানিকটা জায়গা রয়েছে। সেরকম রাখার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। ওই জায়গাটা কিসের হবে? সেই জায়গাতে ঢোকার পথই বা কোথায়? ডাকাতরাও নিশ্চয়ই এটা লক্ষ করেছে, তাই তারা সেই চৌকো জায়গাটার দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা পারেনি। আমাদের পারতে হবে!"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আমরা কী করে এই ইস্পাতের দেয়াল ভাঙব?"

"আমরা ভাঙব না, আমরা সেখানে ঢোকার রাস্তা খুঁজে বার করব। আমি দেয়ালের সব দিক তন্ন তন্ন করে দেখেছি, কোথাও কোনও ফাটল নেই। বাকি আছে এই সিঁড়িটা। এখন তোমরা দ্যাখো তো, এই সিঁড়িটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা যায় কি না!"

সবাই মিলে টানাটানি করেও সে সিঁড়ি আধ ইঞ্চিও কাঁপানো গেল না। সেটা একেবারে পাকাপাকিভাবে নাটবল্টু দিয়ে আঁটা।

রণবীর ভটাচার্য বললেন, "নাঃ কাকাবাবু, আপনার ডিডাকশান ঠিক হল না। এই সিঁড়ির তলায় কিছু নেই।"

কাকাবাবু তাতেও দমে না গিয়ে বললেন, "এইবার দ্যাখো তো, এই সিঁড়ির ধাপগুলো ডিটাচেবল্ কি না!"

এবারে ওরা সিঁড়িটার প্রত্যেক ধাপ ধরে টানাটানি শুরু করল। তার ফল পাওয়া গেল হাতেহাতেই। একদম ওপরের সিঁড়ির দুটো ধাপ খুলে এল সামান্য টানতেই। কাকাবাবু সেখানে টর্চের আলো ফেললেন।

সেখানে সিঁড়ির নীচে দেয়ালে একটা চৌকো বর্ডার দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। এক দিকে একটা বোতাম। বিমান সেই বোতাম টিপতেই খুলে গেল একটা চৌকো

দরজা।

বিমান চেঁচিয়ে বলল, "কাকাবাবু, এর ভেতরে আর একটা সিঁড়ি আছে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "কাকাবাবু, পায়ের ধুলো দিন। সত্যিই আপনি অসাধারণ! এ-ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসেনি।"

কাকাবাবু নীচে থেকে টর্চটা বিমানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "দ্যাখো তো, ভেতরে কী দেখা যাচ্ছে?"

বিমান টর্চটা ঘুরিয়ে সেই চৌকো গর্তটার মধ্যে ফেলে উত্তেজিতভাবে বলল, "এর ভেতরে অনেক কিছু আছে! একটা বিছানা, প্রচুর বই আর কাগজপত্তর!"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "আমি জানতুম, আমি জানতুম! সমস্ত বই আর কাগজপত্র ডাকাতরা নিয়ে যাবে, এ হতেই পারে না!"

রণবীর ভট্টাচার্য আফসোসের সুরে বললেন, "পুলিশ ডিপার্টমেন্টটা একেবারে হোপলেস হয়ে গেছে। আগে যারা এনকোয়ারি করতে এসেছে, তাদের এ ব্যাপারটা একবারও মাথায় খেলেনি!"

বিমান বলল, "আমি ভেতরে নেমে দেখছি!"

কাকাবাবু সিঁড়ির ওপরে উঠে এলেন চৌকো গর্তটার কাছে!

বিমান নীচে থেকে বলল, "এখানে প্রচুর বইপত্তর, রীতিমতন একটা লাইব্রেরি। অনেক বই মেঝেতে ছড়ানো...একটা দেয়াল-আলমারিও রয়েছে, তার পাল্লা খোলা...ওমা, একী! মাই গড্!"

"কী হল, বিমান? কী দেখলে?"

"একজন মানুষ! হাত-পা বাঁধা!"

কাকাবাবু এবারে আর শান্তভাব বজায় রাখতে পারলেন না। চিৎকার করে বললেন, "মানুষ? ইংগমার স্মেল্ট? তাঁকে আমরা খুঁজে পেয়েছি! বিমান, বেঁচে আছেন তো উনি? বিমান!"

বিমান বলল, "কিন্তু...কিন্তু...কাকাবাবু, ইনি তো সাহেব নন, এ তো একজন বাঙালি! বেঁচে আছে এখনও!"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "দাঁড়ান, আমি আসছি!"

বেশি তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে স্লিপ খেয়ে পড়ে গেলেন নীচে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "আমার লাগেনি। কই, কই, লোকটা কই!"

ভেতরের লোকটি ইংগমার স্মেল্ট নয় শুনে কাকাবাবু যেন দারুণ হতাশ হয়ে পড়লেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, "আমি আর ওই সরু সিঁড়ি দিয়ে নামব না। লোকটিকে ওপরে তুলে নিয়ে এসো।"

এবারে কাকাবাবু ডেকের ওপর উঠে মাদুরে বসলেন। তারপর নিশ্বাস নিতে লাগলেন জোরে জোরে।

রণবীর ভট্টাচার্য আর বিমান লোকটিকে ধরাধরি করে নিয়ে এল ডেকের ওপরে। হাত-পা-মুখ বাঁধা একটি বছর তিরিশের বয়েসের লোক। গায়ে একটা

নীল জামা আর খাঁকি প্যান্ট। লোকটির চুলে আর ঘাড়ে চাপ-চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে। ওর জ্ঞান নেই, কিন্তু ক্ষীণ নিশ্বাস পড়ছে।

ঠিক সেই সময় চা নিয়ে উপস্থিত হল স্পিডবোটের চালক কাশেম। স্পিডবোট থেকে ওপরে উঠে এসে সে দারুণ চমকে গেল। এর মধ্যে একজন লোক বেড়ে গেছে!

কাশেম জিজ্ঞেস করল, "স্যার, এ কে? কোথায় ছিল এ লোকটা?"

রণবীর ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি চেনো নাকি লোকটাকে?"

কাশেম বলল, "না স্যার! কিন্তু... এ লোকটাকে কোথায় পেলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ছোট সাধুবাবা বোধহয় এসে চিনলেও চিনতে পারত! লোকটার হাত-পা খুলে দাও; দ্যাখো, যদি ওকে বাঁচাতে পারো!"

বিমান বলল, "আমি ফার্স্ট এইড জানি। আমি দেখছি।"

লোকটির হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল। বিমান নিজের রুমাল দিয়ে ওর মাথা মুছে দিতে গিয়ে দেখল, খুলিতে অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেছে। কেউ কোনও ধারাল অস্ত্র দিয়ে ওর মাথায় মেরেছে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "মাথায় এরকম ক্ষত, নিশ্চয়ই ওর অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। ক'দিন ধরে ওখানে পড়ে আছে কে জানে। কিন্তু কী কড়া জান্ দেখেছেন, এখনও মরেনি। লোকটা যদি বাঁচে, তা হলে কাকাবাবু, ও আপনার জন্যই বাঁচল! আজ রাত্তিরে আমরা এখানে থেকে না গেলে ও ওই চোরাকুঠুরির মধ্যেই পচে গলে শেষ হয়ে যেত।"

কাকাবাবু বললেন, "লোকটার জ্ঞান ফিরলে অনেক কথা জানা যাবে। আমাদের এখানকার চোর-ডাকাতদের বুদ্ধি মোটেই কম নয়। আমার আগেই তারা গোপন কুঠুরিটায় ঢোকার পথ ঠিক বার করে ফেলেছে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "ওর ভেতরে একটা ছোট্ট সিন্দুক মতন রয়েছে, তার পাল্লা খোলা। সেখানে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা যাই হোক দামি কিছু জিনিস ছিল নিশ্চয়ই। তা নিয়ে ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে।"

বিমান কাশেমকে বলল, "তুমি এক কাপ চায়ে অনেকখানি চিনি মিশিয়ে দাও তো! গ্লুকোজের বদলে চিনি খাওয়ালেই কিছুটা কাজ হতে পারে।"

অজ্ঞান লোকটির মুখ ফাঁক করে সেরকম চা জোর করে ঢেলে দেওয়া হল তার গলায়। একটু বাদে লোকটি উঃ উঃ শব্দ করে একটু মাথা নাড়াচাড়া করল কিন্তু তার জ্ঞান ফিরল না।

কাকাবাবু বললেন, "থাক, থাক, এখনই ওকে বেশি চাপ দেওয়া ঠিক নয়। তাতে ফল খারাপ হতে পারে। যেটুকু চিনি পেটে গেছে তা যদি বমি না হয়, তবে ওতেই কাজ হবে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "বিমানবাবু, ইউ আর অ্যান অ্যাসেট। আপনি

আজ যা সাহায্য করলেন, তার তুলনা নেই। তবে, এই লোকটার হাত আর পা দুটো আবার ওই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখুন।"

সন্তু অবাক হয়ে তাকাতেই তিনি আবার বললেন, "বলা তো যায় না! হয়তো মট্‌কা মেরে পড়ে আছে। কিংবা, একটু বাদে ভাল করে জ্ঞান ফিরলেই হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়তে পারে। এদের যা জীবনীশক্তি, কিছু বিশ্বাস নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। হাত-পা বেঁধে রাখাই ভাল।"

ঠিক এই সময় একটা রাতপাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে খ-র-র খ-র-র শব্দে ডেকে উড়ে গেল। তারপরেই শোনা গেল একটা জাহাজের ভোঁ।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এইবার বোধহয় আমাদের খোঁজে কোনও লঞ্চ আসছে।"

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু কোনও লঞ্চ দেখা গেল না। চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করেও কোনও আলো দেখা গেল না।

কাশেম বলল, "ওটা স্যার বোধহয় সমুদ্রের কোনও জাহাজের ভোঁ। রাত্তিরবেলা অনেক দূর থেকে আওয়াজ পাওয়া যায়।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "দূর ছাই! লঞ্চ এলে নিশ্চয়ই ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত! যাও হে, তোমার ফেনাভাত আর নুনই নিয়ে এসো। সারা দিন যা ধকল গেল, বেশ খিদে পেয়ে গেছে!"

আধ ঘন্টার মধ্যেই ভাত এসে গেল। লঞ্চের ছাদে বসে সেই শুধু ভাত আর নুনই যেন অমৃতের মতন লাগল সবার। অভাবের সময় যা পাওয়া যায় তাই-ই ভাল লাগে। কিছু না খেতে পাওয়ার চেয়ে শুধু গরম ভাতও কত উপাদেয়!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর কাকাবাবু বললেন, "এবারে আমি গোপন কুঠুরির কাগজপত্র পরীক্ষা করব। তোমরা আমাকে ওখানে নামতে একটু সাহায্য করো।"

এই লঞ্চে নিশ্চয়ই আলো জ্বালার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চোর-ডাকাতেরা ডায়নামো বা ব্যাটারি সবই চুরি করে নিয়ে গেছে। কাকাবাবু টর্চটা বগলে চেপে ধরে অতি কষ্টে ছোট্ট সিঁড়ি দিয়ে গোপন কুঠুরিটার ভেতরে নামলেন।

একটু বাদেই তিনিই চেঁচিয়ে বললেন, "রণবীর, এখানে ইংগমার স্মেল্ট-এর ডায়েরি রয়েছে। অনেক বইতেই তাঁর নাম লেখা। সুতরাং এই লঞ্চটাতে যে তিনি ছিলেন, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই। তোমরা ওপরে থাকো। আমি রাতটা এই ঘরেই কাটিয়ে দেব!"

রাত্তিরে কেউ ঘুমোবে না ভেবেছিল, কিন্তু এক সময়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কে যে আগে ঘুমিয়েছে, কে পরে ঘুমিয়েছে, তার ঠিক নেই। বিমানদা আর রণবীর ভট্টাচার্যের মধ্যে কী নিয়ে যেন তর্ক বেধেছিল, এই পর্যন্ত সন্তুর মনে আছে। তারপর এক সময় ঘুমে চোখ টেনে এসেছিল তার।

সূর্যের প্রথম আলো চোখে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তুই প্রথম জেগে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখল, বিমানদা আর রণবীর ভট্টাচার্য ঘুমিয়ে আছেন এক মাদুরে। একটু দূরে সেই হাত-পা-বাঁধা লোকটি। লঞ্চের রেলিং ঘেঁষে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে পুলিশ কনস্টেবলটি।

ঘুম ভাঙার পর চোখ কচলে সন্তু বুঝতে পারল, রাত্তিরে অন্তত তিনটে ব্যাপার ঘটেনি। বৃষ্টি আসেনি, বাঘ আসেনি, চোর-ডাকাতও আসেনি।

তারপরেই সন্তুর মনে পড়ল কাকাবাবুর কথা। কাকাবাবু কোথায়?

সিঁড়ির কাছে ডেকের ওপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে সে উঁকি মারল গোপন কুঠুরিটার মধ্যে। প্রথমে সে কাকাবাবুকে দেখতে পেল না। অমনি তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। কাকাবাবু কোথায় গেলেন! হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে সে দ্বিতীয় সরু সিঁড়িটা দিয়ে নেমে এল গোপন কুঠুরিতে।

একটা খাতা কোলের ওপর নিয়ে কাকাবাবু বসে আছেন এক কোণে। তাঁর মাথাটা বুকের ওপর ঢলে পড়েছে। তিনিও ঘুমোচ্ছেন। পাশে তাঁর টর্চটা গড়াচ্ছে। কাকাবাবুর সারা মুখে ফোঁটা ঘাম।

সন্তু কাকাবাবুকে জাগাল না। সে পা টিপে টিপে উঠে এল ওপরে।

ডেকে দাঁড়িয়ে সন্তু আকাশ দেখতে লাগল।

একটু দূরে হেলে-পড়া অন্য লঞ্চটাতেও কোনও জাগরণের চিহ্ন নেই। কিন্তু নদীর বুকে কয়েকটা নৌকো চলেছে পাল তুলে। মনে হয়, সেগুলো সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। আকাশের পূর্ব দিকে লাল আভা। মেঘ কাটিয়ে এক্ষুনি সূর্যকে দেখা যাবে। কাল রাত্তিরে গা ছমছম করছিল, এখন চারদিকে কেমন পবিত্র পবিত্র ভাব!

একটু বাদেই নীচে থেকে কাকাবাবুর ডাক শোনা গেল, "সন্তু! সন্তু!"

সন্তু তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে।

কাকাবাবু বললেন, "এত সরু সিঁড়ি দিয়ে আমার উঠতে অসুবিধে হচ্ছে, তুই ওপর থেকে আমার একটা হাত ধর তো। ক্রাচ দুটোও ওপরে রেখে দে।"

এই সিঁড়িটায় কোনও রেলিং নেই। তাই কাকাবাবু ক্রাচ ছাড়াই সন্তুর একটা হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "সেই লোকটার জ্ঞান ফিরেছে?"

“ঘুমুচ্ছে এখনও। আমি দেখলুম নিশ্বাসের সঙ্গে ওর বুক ওঠা-নামা করছে।”

“আর কেউ জাগেনি ?”

“না।”

ডেকের ওপর উঠে এসে কাকাবাবু হাত-পা বাঁধা লোকটার পাশে বসে প্রথমে তার নাকের নীচে হাত দিলেন। তারপর তার বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে একটুক্ষণ নাড়ি দেখে বললেন, “সবই তো প্রায় স্বাভাবিক দেখছি। ওর আর প্রাণের ভয় নেই। থাক, আর একটু ঘুমোক।”

এই সময় রণবীর ভট্টাচার্য একটু চোখ খুলে বললেন, “ভোর হয়ে গেছে ? এটা রোদ্দুর না জ্যোৎস্না ?”

সন্তু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “আমি কিন্তু ঘুমোইনি, সবে মাত্র একটু চোখ বুজেছি। এর মধ্যেই রোদ উঠে গেল ? চা কোথায় চা ? সেপাই !”

রেলিং-এ ভর দিয়ে যে কনস্টেবলটি ঘুমোচ্ছিল, সে এই হাঁক শুনে হাত-পা ছড়িয়ে জেগে উঠল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল একটা।

“চা বানাতে বলো শিগগির ! সকালে চা না খেয়ে আমি কথাই বলতে পারি না।”

কনস্টেবলটি অন্য লঞ্চটির দিকে ফিরে মুখের পাশে দু' হাত দিয়ে চ্যাঁচাল, “এ মইধর ! এ কাশেম ! সাহেব চা চাইছেন ! চা বানাও।”

ওপাশ থেকে মহীধরের উত্তর ভেসে এল, “জল নেই !”

কনস্টেবলটি কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, “স্যার, চা কী করে হবে, জল ফুরিয়ে গেছে !”

রণবীর ভট্টাচার্য উঠে বসে বললেন, “অ্যাঁ ? বলে কী ? এত বড় নদীর ওপরে ভেসে আছি, তাও বলে কিনা জল নেই ?”

“স্যার, এই নদীর পানি ভীষণ নোনা। মুখে দেওয়া যায় না !”

“তা হলে কী হবে ? চায়ের পাতা আছে, চিনি আছে, তবু চা তৈরি করা যাবে না জলের অভাবে, এ কথা কেউ শুনেছে কখনও ? অথচ এত জল চারদিকে !”

সন্তু বলল, “ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার, নট এ ড্রপ টু ড্রিংক !”

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “হুঁ, তুমি এটা জানো ? ‘জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল’ ? কুছ্ পরোয়া নেই, এই নোনতা নদীর জলেই চা বানাতে বলো ! লেবু আছে, লেবু ?”

লেবুও পাওয়া গেল না। নোনতা জলে এমন এক বিতিকিচ্ছিরি চা তৈরি হয়ে এল, যা কাকাবাবু এক চুমুক দিয়ে সরিয়ে রেখে দিলেন। সন্তুর তো বমি এসে যাচ্ছিল। বিমানও সেই চা খেতে পারল না। শুধু রণবীর ভট্টাচার্য সবটা শেষ করে তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, “আঃ ! তবু তো চায়ের গন্ধটুকু আছে ! এবারে

বলুন, কাকাবাবু, আর নতুন কিছু জানতে পারলেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “চমকপ্রদ নতুন কথা জানতে পেরেছি। গোপন ঘরটায় ইংগমার স্মেল্ট-এর একটা ডায়েরি আছে, টর্চের আলোয় আমি তার খানিকটা পড়ে ফেলেছি। টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে বলে আমি শুধু তার শেষ অংশটাই পড়েছি আগে। স্মেল্ট সাহেব প্রথম ডাকাতদলের হাতে মারা যাননি।”

“তার মানে ?”

“সাহেব বুদ্ধিমান ছিলেন যথেষ্ট। যখন-তখন ডাকাতদের আক্রমণ হতে পারে ভেবে তিনি অত্যন্ত কৌশলে লঞ্চের মধ্যে ওই গোপন ঘরটি বানিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র ওই ঘরেই থাকত। বিপদ দেখলেই তিনি ওই ঘরে ঢুকে পড়তেন। যাই হোক, সংক্ষেপে বলি, দেড় মাস আগে স্মেল্ট জাপানের এক বন্দর থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন। তারপর ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর লঞ্চের ইঞ্জিনটা খারাপ হয়ে যায়। এই সব লঞ্চে সাধারণত ওয়ারলেস সেট থাকে, বিপদে পড়লে কাছাকাছি জাহাজদের উদ্দেশ্যে এস-ও-এস পাঠানো হয়। কিন্তু স্মেল্ট পৃথিবীর কোনও মানুষের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করবেন না বলে ওয়ারলেস সেট রাখেননি।”

“আশ্চর্য মানুষ ! তারপর ?”

“লঞ্চটা আপনমনে ভাসছিল। ভাসতে ভাসতে সেটা এদিকে এসে পড়ে। কম্পাস ও ম্যাপের সাহায্যে স্মেল্ট এই জায়গার অবস্থানও বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন যে, এটা ইণ্ডিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ক্যালকাটা পোর্ট কাছাকাছি হবে, সেখানে ইঞ্জিন সারিয়ে নেওয়া যাবে। ইন্ডিয়া হিন্দুদের দেশ, হিন্দুরা অতি শান্তিপ্রিয়, ভদ্র ও নিরীহ জাতি। হিন্দু মানে কিন্তু হিন্দু জাতি নয়। ওই সব দেশের লোকেরা সব ভারতীয়কেই হিন্দু মনে করে। এর দু' দিন পরেই অবশ্য স্মেল্ট-এর অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। তিনি লিখেছেন, সন্ধের অন্ধকারে একদল হিন্দু ডাকাত তাঁর লঞ্চ আক্রমণ করে। ডাকাতদের লঞ্চের ওপরে উঠতে দেখেই তিনি খাওয়ার টেবিল ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর গোপন কুঠুরিতে ঢুকে পড়েন। সেখানে বারো ঘন্টা ছিলেন। এই লেখার তারিখটা সাতদিন আগের।”

“তারপর ?”

“তারপর আর কিছু লেখা নেই। এর পরের অংশটা আমাদের অনুমান করে নিতে হবে। বারো ঘন্টা লুকিয়ে থাকার পর স্মেল্ট নিজেই বোধহয় বাইরে বেরিয়েছিলেন। দৈবাৎ সেখানে দ্বিতীয় ডাকাতদলটি তক্ষুনি এসে পড়ে আর স্মেল্টকে খুন করে। কিংবা দ্বিতীয় ডাকাতদল গোপন কুঠুরির দরজা নিজেরাই আবিষ্কার করে সেখান থেকে স্মেল্টকে টেনে বার করে আনে। স্মেল্ট নিজের কাছে কোনও অস্ত্র রাখতেন না।”

“গোপন কুঠুরির মধ্যে ধস্তাধস্তির চিহ্ন আছে।”

"সেটা স্মেন্টের সঙ্গেও হতে পারে। কিংবা ডাকাতরা নিজেদের মধ্যেও করতে পারে। সিন্দুকের জিনিসপত্র দেখেই সেই লোভে ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দেয়। তার প্রমাণ তো এই একজন।"

"এই লোকটাকে এখন জাগানো যাক। এর পেট থেকে সব কথা বার করতে হবে।"

সন্তু বলল, "আমি লোকটাকে একবার চোখ পিটপিট করতে দেখেছি।"

রণবীর ভট্টাচার্য লোকটির বুকের ওপর ডান হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এই, তোর খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। ফেনাভাত খাবি ?"

লোকটি কোনও সাড়া দিল না।

বিমান বলল, "ওর চোখে জলের ঝাপটা দিলেই ও চোখ খুলবে ! নদীর জল তুলে আনব ?"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সে সব কিছু লাগবে না। আমি ঠিক তিন গুনব, তার মধ্যে যদি ও কথা না বলে, তা হলে ওকে চ্যাংদোলা করে ফেলে দেব নদীতে। ওর তো মরে যাবারই কথা ছিল, আমরা শুধু-শুধু কষ্ট করে ওকে বাঁচাব কেন, যদি না ও আমাদের সাহায্য করে। এক-দুই-তিন !"

লোকটি চোখ মেলে কোনও রকমে চিঁ চিঁ করে বলল, "বাবু ! আমি কথা কইতে পারতেছি না ! মাথায় বড় ব্যথা ! একটু পানি দ্যান !"

"তোর নাম কী ?"

"কালু শেখ !"

"তোর এই অবস্থা করেছে কে ?"

"হা-রু দ- ফা-দার।"

এবারে আবার তার মাথাটা ঢলে পড়ল, চোখ বুজে গেল।

বিমান বলল, "লোকটার সত্যিই কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আর বেশি প্রেশার দিলে তার ফল খারাপ হবে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "থাক তা হলে। গোসাবায় নিয়ে গিয়ে খানিকটা চিকিৎসা করার পর আবার জেরা করা যাবে। একজনকে যখন পেয়েছি, তখন ধরা পড়বে সব কটাই।"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু হারু দফাদারকে আর ধরতে পারবে না !"

"কেন ? ওঃ হো ! এ নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে...সেই নদীতে যে লাশটা ভাসছিল...বুকে ছোরা বেঁধা !"

সেই দৃশ্যটা মনে পড়তেই সন্তু চোখ বুজে ফেলল। ইশ্‌, কীভাবে মানুষ মরে !

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সে-ব্যাটাকেও কেউ খতম করে ফেলেছে। এই সব চোর-ডাকাতদের এই তো হয়। অন্যদের মেরে ধরে যে-সব টাকা-পয়সা নিয়ে আসে, তা নিজেরাও ভোগ করতে পারে না। নিজেরাও আবার মারামারি

করে মরে !"

বিমান মুখ তুলে বলল, "ওই যে একটা লঞ্চ আসছে।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এবারে আমার খোঁজে সত্যিই এসেছে। চলুন এখন ফিরে যাওয়া যাক। ভদ্রগোছের এক কাপ চা না খেলে এরপর আমার মাথা ধরে যাবে ! কাকাবাবু, আর তো এখানে কিছু করার নেই, কী বলুন ?"

কাকাবাবু চুপ করে রইলেন।

তৃতীয় লঞ্চটিতে রয়েছেন আকবর খান আর প্রশান্ত দত্ত। দু'জনেই বসেছিলেন সারেঙ-এর ক্যাবিনে। সেই লঞ্চটি কাছে এসে লাগতেই দুই পুলিশের অফিসার বেরিয়ে এলেন।

আকবার খান দারুণ চিন্তিতভাবে বললেন, "কী ব্যাপার স্যার। কাল রাত্রে ফিরলেন না, কোনও খবরও দিলেন না ? আমরা এমন অ্যাংজাইটিতে ছিলাম...সারারাত ভাল করে ঘুমোতেই পারিনি !"

রণবীর ভট্টাচার্য চওড়াভাবে হেসে বললেন, "বাঃ বেশ, বেশ ! রাত্তিরবেলা আমরা ডাকাতের হাতে খুন হতে পারতাম কিংবা বাঘের পেটে চলে যেতে পারতাম, তোমরা খোঁজ নিতে এলে সকালে !"

আকবর খান একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "কী করব, আপনারা ফিরবেন বলে আমরা রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর—"

"তারপর ডাকাতের ভয়ে আর অত রাত্তিরে এলে না, তাই তো ? পুলিশ ফোর্সও যদি ডাকাতের ভয় পায়—"

"না, স্যার, সেজন্য নয়। বোটের সারেঙকে আর তখন খুঁজে পাওয়া গেল না। সে তার গ্রামের বাড়ি চলে গিয়েছিল। তারপর তাকে ডেকে আনতে আনতেই ভোর হয়ে গেল—"

"যাক গে, যা হয়েছে বেশ হয়েছে। তোমাদের লঞ্চে চা বানানোর জল আছে তো ?"

পুলিশের লঞ্চে অনেক কিছুই মজুত থাকে। সবাই মিলে এবার চলে আসা হল সেই লঞ্চে। হাত-মুখ ধুয়ে ভাল চায়ের সঙ্গে ওম্‌লেট আর টোস্টও খেয়ে নিল সবাই।

এরই মধ্যে পুলিশের লঞ্চের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল দ্বিতীয় লঞ্চটাকে। তারপর পুলিশের লঞ্চ চালু করে দু-তিনবার টান দিতেই মহীধর সারেঙ-এর লঞ্চ চড়া ছেড়ে ভেসে পড়ল জলে। এবারে সেই দড়ি দিয়েই বিদেশি লঞ্চটাকে বেঁধে দেওয়া হল পুলিশের লঞ্চের সঙ্গে। ডাকাতদের সেই খালি নৌকোটাকেও বেঁধে দেওয়া হল এর পেছনে।

সবই ঠিকঠাক। এবারে ফেরার পথে রওনা দিলেই হয়।

স্পিডবোটে যে-কজন এসেছিল, তারাই আবার বসেছে। স্টার্ট দেবার আগে রণবীর ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, আপনি এখনও গম্ভীর হয়ে

আছেন, কিছু বলছেন না যে ? ব্যবস্থাটা আপনার পছন্দ হয়নি ? এখানে আর কিছু করার আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, আর কী করার থাকতে পারে ! তবে, মনটা এখনও খচখচ করছে। ইংগমার স্মেল্ট-এর মৃতদেহটার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। ধরো যদি কোনও উপায়ে তিনি এখনও বেঁচে থাকেন ?"

"এর পরেও তিনি বেঁচে থাকতে পারেন ? লঞ্চটায় কি আরও কোনও গোপন কুঠুরি আছে আপনি বলতে চান ?"

"না, তা নেই। সেটা ভাল করেই দেখেছি। তবু স্মেল্ট-এর মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়নি বলে মন কিছুতেই মানছে না।"

"তা হলে আপনি এখন কী করতে চান ?"

"এখান থেকে সমুদ্র তো খুব বেশি দূরে নয়, একবার সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত ঘুরে এলে হয় না ? ওর ডেডবডিটা যদি সমুদ্রে ভেসেও যায়, আবার ফিরে আসতে পারে। সমুদ্র কোনও কিছু একেবারে নিয়ে নেয় না, ফিরিয়ে দেয়।"

"সে রকম ফিরে পাওয়ার আশা কিন্তু খুবই কম।"

"তা হলেও একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী ? ওরকম একটা মানুষের দেহ হাঙরে-কুমিরে ছিঁড়ে খাবে ? যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলে আমরা সসম্মানে কবর দিতে পারি।"

"কিন্তু কাকাবাবু, উনি তো সমুদ্রের বুকেই মরতে চেয়েছিলেন !"

"তার মানে তুমি আর সময় নষ্ট করতে চাও না। ঠিক আছে, ফিরেই চলো।"

"না, না, আমি সে-কথা বলিনি ! সমুদ্রের মুখটা ঘুরে আসতে আসতে কতক্ষণই বা লাগবে ! অন্য একটা লঞ্চও আমাদের সঙ্গে চলুক। আমরা নদীর দু'দিক দেখতে দেখতে যাব। বলা যায় না, নদীর ধারে কোনও ঝোপঝাড়ের মধ্যে ডেডবডিটা আটকে থাকতেও পারে !"

রণবীর ভট্টাচার্য সেইমতন আদেশ দিলেন। পুলিশের লঞ্চটা থেকে দড়ি খুলে ফেলা হল। সেটা চলল নদীর বাঁ দিক দিয়ে। আর নদীর ডান দিক দিয়ে চলল স্পিডবোটটা। ডান দিকেই জঙ্গল বেশি ঘন। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল নদীর পাড়, কোথাও ঝোপ নেমে এসেছে জলের মধ্যে, সেখানে খুব কাছে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল স্পিডবোটটাকে।

এক ধরনের হল্‌দে হল্‌দে ছোপ-লাগা সবুজ ঝোপের দিকে আঙুল উঁচিয়ে রণবীর ভট্টাচার্য সকৌতুকে বললেন, "এই সব ঝোপের মধ্যে সাধারণত বাঘ লুকিয়ে থাকে। খুব ভাল ক্যামুফ্ল্যাজ হয়। এগুলোকে বলে হেঁতাল। তাই না হে কাশেম, ঠিক বলিনি ?"

কাশেম বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার !"

"এখন একখানা বাঘ ঝপাৎ করে আমাদের উপর লাফিয়ে পড়লে তারপর

আমাদের লাশ খুঁজতে আসতে হবে অন্য লোককে। হা-হা-হা !”

কাকাবাবু কিন্তু এইসব কৌতুকে একটুও অংশগ্রহণ করছেন না। তাঁর মুখখানা থমথমে।

বিমান হঠাৎ বলল, “নদীর মাঝখানে অতগুলো গাছ কেন ? আমরা ওদিকটা দেখব না ?”

সবাই একসঙ্গে বাঁ দিকে ঘাড় ফেরাল।

নদীর মাঝখানে শুধু গাছ নয়, আট-দশখানা ঘরও রয়েছে। রীতিমতন একটা দ্বীপ। ওরা কেউ সেদিকে এতক্ষণ তাকায়নি, দ্বীপটা অনেকখানি পার হয়ে এসেছে।

কাশেম বলল, “এই দ্বীপটা ছ' বছর হল জেগেছে স্যার। লোকে এটাকে বলে মনসা দ্বীপ। বড্ড সাপ ছিল ওখানে। এখন জেলেরা থাকে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওই দ্বীপের কাছে চলো।”

দ্বীপটার আকার অনেকটা ওল্টানো মাটির প্রদীপের মতন। মাথার দিকটা একেবারে সরু, সেখানে শুধু বালি। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, সেই বালির ওপর দিয়ে একটা আট-ন' বছরের নেংটি পরা ছেলে কী একটা বড় জিনিস টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

আরও কাছে যেতে বোঝা গেল, সেটা একটা লোহার চেয়ার।

কাকাবাবু রণবীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে চোখাচোখি করলেন।

রণবীর ভট্টাচার্য শিস দিয়ে উঠে বললেন, “হোয়াট এ লাকি ব্রেক ! জেলেদের গ্রামে ডেক-চেয়ার। কাকাবাবু, আপনি কি ম্যাজিক জানেন ? কিংবা আপনার ইনটুইশান এত স্ট্রং !”

স্পিডবোটটা থামতেই ছেলেটা ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, তার আগেই বিমান লাফিয়ে নেমে গিয়ে ছেলেটাকে ধরল। অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল ছেলেটা।

রণবীর ভট্টাচার্য নেমে গিয়ে ছেলেটার কাছে গিয়ে বললেন, “এই, ভয় নেই তোর। আমরা ছেলেধরা নয় রে। তোর বাবা কোথায় ?”

ছেলেটার কান্না শুনে দু'জন বউ বেরিয়ে এল খড়ের চালাঘর থেকে। ভদ্রলোকদের দেখেই তারা ছুটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। তারপর একপাশ ফিরে ঘোমটায় মুখ ঢেকে তাদের মধ্যে একজন বলল, “পুরুষ মানুষরা কেউ ঘরে নেই, মাছ ধরতে গেছে, আপনারা কে ?”

রণবীর ভট্টাচার্য এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এই চেয়ারটা কার ?”

একজন বউ বলল, “কী জানি ! কেউ এখানে ফেলে দিয়ে গেছে ! এই নকু, এদিকে চলে আয় !”

নকু সেই বাচ্চা ছেলেটার নাম। সে বিমানের হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য মোচড়া-মুচড়ি করছে।

বিমান তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই চেয়ারটা কোথায় পেয়েছিস রে ?"

ছেলেটা উঁ-উঁ করতে লাগল শুধু।

রণবীর ভট্টাচার্য এগিয়ে গেলেন ঘরগুলোর দিকে। তিন-চারটে ঘরের মাঝখানে একটা বড় খড়ের গোলা।

একজন বউ ঘোমটায় পুরো মুখ ঢেকে রণবীর ভট্টাচার্যের একেবারে কাছে চলে এসে বলল, "পুরুষরা কেউ নেই, আপনারা বিকালে আসবেন !"

রণবীর ভট্টাচার্য মাটি থেকে একটা বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে সেই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। একটা শক্ত কিছুতে বাখারিটা লাগল। তিনি বাখারি দিয়ে সেখানকার খড় পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখবার জন্য খড়ের গাদা খুব ভাল জায়গা। আরও ক'টা চেয়ার রয়েছে দেখছি, আর একটা ডায়নামো ! এগুলো কে রেখে গেছে ?"

বউটি বলল, "আমরা জানি না গো বাবু, কারা যেন ফেলে রেখে গেছে। রাতের বেলা ফেলে দিয়েছে এখানে।"

"তারপর তোমরা এখানে লুকিয়ে রেখেছ ?"

"আমরা কিছু জানি না।"

রণবীর ভট্টাচার্য চেঁচিয়ে বললেন, "কাকাবাবু, এখানে অনেক মালপত্র পাওয়া গেছে।"

কাকাবাবু স্পিডবোট থেকে নামেননি। তিনি বললেন, "পুরো দ্বীপটাই সার্চ করা দরকার।"

রণবীর ভট্টাচার্য মুখ তুলে দেখলেন, বাঁ দিক দিয়ে পুলিশের লঞ্চটা অনেকটা এগিয়ে চলে গেছে।

"ঠিক আছে, ব্যস্ততার কিছু নেই। লঞ্চটা ফিরে আসুক, এখানে পুলিশ পোস্টিং করিয়ে দেব।"

আরও কয়েকজন মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি খুবই বাচ্চা ছেলেমেয়ে মায়েদের আঁচল জড়িয়ে জুলজুল করে দেখছে এইসব অচেনা লোকদের।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "দেখলে মনে হয় একটা শান্তশিষ্ট গ্রাম। অথচ এখানেও খুনে-ডাকাত রয়ে গেছে।"

বিমান বলল, "হয়তো সত্যিই ডাকাতরা চেয়ার-টেয়ারগুলো ফেলে গেছে এই দ্বীপে। এরা লোভ সামলাতে পারেনি, তাই লুকিয়ে রেখেছে। এই ছেলেটাই ধরিয়ে দিল। ও যদি একটা চেয়ার নিয়ে খেলা না করত, আমরা সন্দেহ করতুম না। ছেলেটাকে ছেড়ে দেব ?"

কাকাবাবু বোটের উপর থেকে বললেন, "না, ওকে ছেড়ো না, ওকে ধরে রাখো।"

তারপর কাকাবাবু হাতছানি দিয়ে রণবীর ভট্টাচার্যকে কাছে ডেকে কানে

কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন।

রণবীর ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে বললেন, "ঠিক বলেছেন, তা তো করতেই হবে!"

আবার তিনি ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ওগো মেয়েরা, আপনারা শুনুন! আপনাদের এখানে চোরাই মাল রয়েছে, পুলিশে আপনাদের ধরবে। এইসব মালপত্তর কে এখানে এনেছে, তার নামটা বলে দিন, তাহলে আপনারা ছাড়া পাবেন। নইলে সক্কলকে পুলিশ চালান করে দেবে!"

মেয়েরা কেউ কোনও কথা বলল না।

রণবীর ভট্টাচার্য আবার বললেন, "আপনারা যদি সত্যি কথা না বলেন, তাহলে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এই ছোট ছেলেটি চোরাইমাল সমেত হাতে-হাতে ধরা পড়েছে। সুতরাং একে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। একে নিয়ে চললুম।"

তিনি এসে ছেলেটির আর-একটা হাত ধরে বললেন, "চলুন, বিমানবাবু, ছেলেটাকে বোটে নিয়ে চলুন!"

দু'জনে মিলে ছেলেটাকে উঁচু করে তুলে ধরলেন। ছেলেটা দু'পা ছুঁড়ে চ্যাঁচাতে লাগল প্রাণপণে। মহিলারা ছুটে এল সবাই। তারা সবাই মিলে চিৎকার করে কী বলতে লাগল, তা বোঝাই গেল না।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "উঁহু, সরকারি কাজে বাধা দেবেন না। এ ছেলে চোরাইমাল সঙ্গে রেখেছে, একে থানায় নিয়ে যেতেই হবে!"

ছেলেটা কান্না থামিয়ে হঠাৎ বলল, "আমায় ছেড়ে দাও গো, বাবু! এই সব জিনিস হারু দফাদার ফেলে গেছে!"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "আবার সেই হারু দফাদার! এ ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে মনে হয়!"

মহিলারা এবার বলল, "হ্যাঁ গো, বাবু! ও ঠিক বলেছে, এসব হারু দফাদার ফেলে গেছে। সে আমাদের এ দ্বীপের কেউ নয়। সে অন্য জায়গায় থাকে।"

রণবীর ভট্টাচার্য ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, যা!"

স্পিডবোটের কাছে এসে কাকাবাবুকে বললেন, "ঘুরে-ফিরে সেই হারু দফাদারের নামই আসছে। সে-ই মনে হচ্ছে পালের গোদা। কিন্তু সে তো খতম হয়ে গেছে। সুতরাং তার ওপরেও একজন আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ছোট সাধুর কাছ থেকেই বাকি খবর জানতে হবে। আমার কাছে একটা লোকের ছবি আছে, সেও যদি এই ব্যাপারে জড়িত থাকে, তা হলে কিছু আশ্চর্য হব না।"

"ছবি! আপনার কাছে?"

"ক্যানিং আসবার পথে একটা লোকের ছবি তুলে রেখেছি আমার

ক্যামেরায়। লোকটির যে-রকম পালাবার গরজ ছিল, তাতে বেশ সন্দেহ হয়।”

আসবার পথে সেই গোরুর গাড়ির সঙ্গে জিপের দুর্ঘটনার কথাটা কাকাবাবু সংক্ষেপে জানালেন। তারপর বললেন, “লোকটির যে-রকম চোট লেগেছে, তাতে সহজে হেল্‌থ সেন্টার থেকে পালাতে পারবে না!”

“চলুন তাহলে পুলিশের লঞ্চটাকে ধরা যাক। এদের এই দ্বীপে নৌকো নেই একটাও, এরা এর মধ্যে পালাতে পারবে না কেউ।”

সবাই উঠে পড়ার পর স্পিডবোটটা সবে মাত্র ছেড়েছে, অমনি বিমান বলে উঠল, “এ কী, সন্তু কোথায়? সন্তু?”

কাকাবাবু বললেন, “থামাও! থামাও!”

“সন্তু কোথায় গেল?”

সঙ্গে-সঙ্গে দূর থেকে সন্তুর গলা শোনা গেল, “কাকাবাবু! কাকাবাবু!”

তারপরেই একটা গুলির শব্দ! সেই আওয়াজটার যেন প্রতিধ্বনি শোনা গেল নদীর দু'পাড় থেকে।

দু'এক মুহূর্ত সবাই থমকে থাকবার পরই বিমান লাফিয়ে নেমে পড়ে ছুটল আওয়াজ লক্ষ করে।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, “আপনি দাঁড়ান! আমি আগে যাচ্ছি, আওয়াজটা রিভলভারের!”

কাকাবাবু নেমে পড়লেন স্পিডবোট থেকে। চোখ দুটো জ্বলছে। সন্তু কখনও বিপদে পড়লে তাঁর মুখের চেহারা সাংঘাতিক হয়ে যায়। সন্তুকে কেউ মারলে তাকে তিনি পাগলা কুকুরের মতন গুলি করতেও দ্বিধা করবেন না।

নরম বালির ওপর কাকাবাবুর ক্রাচ বসে যাচ্ছে, তবু তিনি যতদূর সম্ভব এগোতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

গুলির শব্দ শুনে মহিলারা সবাই দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেছে। দু'তিনজন ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। যে-ছেলেটা প্রথমে ডেকচেয়ার নিয়ে খেলছিল,সে হঠাৎ দৌড়ে এসে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, “ওইদিকে!”

কাকাবাবু সেদিকে আর একটু এগিয়ে দেখলেন, সেই ঘরটার দু'পাশে বিমান আর রণবীর ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে খুব সাবধানে পেছন দিকে উঁকি দিচ্ছে।

কাকাবাবু ঘরটার কাছে এসে ডাক দিলেন, “সন্তু! সন্তু!”

কোনও সাড়া এল না।

কাকাবাবু রিভলভার হাতে নিয়ে বিমানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিমান ফিসফিস করে বলল, “সন্তু ঠিক আছে, কিছু হয়নি।”

কাকাবাবু উঁকি দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। মাটির মধ্যে একটা লম্বা গর্ত, সেই গর্তের মধ্যে একজন মানুষ। লোকটির একটা হাত রয়েছে গর্তের বাইরে, সেই হাতে একটি রিভলভার। গর্তটা থেকে খানিকটা দূরে রয়েছে

একটা কালো মাটির হাঁড়ি। কিন্তু সন্তুকে দেখা গেল না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু কোথায় ?"

বিমান বলল, "আমি দেখলুম, সন্তু ইচ্ছে করে গড়িয়ে গড়িয়ে জলের দিকে চলে গেল। গুলি লাগলেও মারাত্মক জখম হয়নি।"

গর্তের লোকটার মাথায় টাক। চোখ দুটো ভয় পাওয়া জন্তুর মতন গোল হয়ে গেছে। ঘন ঘন মাথা ঘুরিয়ে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর হাতের ভর দিয়ে গর্ত থেকে ওঠবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "রণবীর, তুমি ওদিক থেকে এগোও, আমি এদিক থেকে আসছি। এই লোকটা গুলি করার জন্য হাত তুললেই ওর মাথায় দু'জনে এক সঙ্গে গুলি করব !"

ওদিক থেকে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "অত কথার দরকার কী ! আগেই ওর মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিই না ?"

বলেই রণবীর আকাশের দিকে রিভলভারের মুখ করে ট্রিগার টিপলেন। পর পর দু'পার।

সেই শব্দ হওয়া মাত্র লোকটা হাত দিয়ে মাথা চাপা দিল। সে বোধহয় ভাবল, তার মাথা ফুটো হয়ে গেছে। তারপর যখন বুঝল, সেরকম কিছু হয়নি, তখন মুখ তুলতেই দেখল, তার সামনে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দু'জনের হাতে রিভলভার।

লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

লোকটার হাতের রিভলভার একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "বিমানবাবু, ধরুন তো, এ হারামজাদাকে টেনে তুলি গর্ত থেকে।"

কাকাবাবু দেখলেন, কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে সন্তু। এবারে সে ছুটে এল এদিকে।

হাসি-ঝলমলে মুখে সন্তু বলল, "আমার কিন্তু একটুও লাগেনি। আমি খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখি, এখানে একটা কালো হাঁড়ি, সেটা একটু একটু নড়ছে। আমি হাঁড়িটা টেনে সরিয়ে দিতেই লোকটা গুলি করল। কিন্তু আমি ওর পিছন দিকে ছিলুম তো, তাই ঠিক টিপ করতে পারেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই হাঁড়িটা না সরিয়ে আমাদের খবর দিলি না কেন ?"

সন্তু উত্তর না দিয়ে দুষ্টু-দুষ্টু হাসল।

রণবীর আর বিমান টানাটানি করে টাকমাথা লোকটাকে ওপরে তুলে ফেলল। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "ইশ্ ! এর কী অবস্থা !"

লোকটির পেটে একটা বিরাট ক্ষত। একটা ব্যাণ্ডেজ পর্যন্ত করেনি। কী খানিকটা মলম সেখানে মাখিয়ে রেখেছে, সেইজন্য ক্ষতটা বীভৎস দগদগে দেখাচ্ছে !

লোকটা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার এই অবস্থা কে করেছে?"

লোকটা বলল, "আমি আর বাঁচব না গো, বাবু, বাঁচব না। আমায় তোমরা মেরে ফেলো! আমি আর যন্তন্না সহ্য করতে পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন বাঁচবে না? আমরা তোমার চিকিৎসা করাব। স্পিডবোটে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাব। তুমি সেরে উঠবে।"

লোকটা কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল কাকাবাবুর দিকে। তারপর অদ্ভুত করুণ গলায় বলল, "আমায় বাঁচাবেন? ও বাবু, আমি যে মহাপাপী! আমি যে কালু শেখকে হাত মুখ বেঁধে ফেলে এসেছি! আমি যে...আমি যে..."

"তুমি সেই সাহেবকেও মেরেছ? লঞ্চে যে সাহেব ছিল!"

"না, না, বাবু, সেই সাহেবকেও আমি মারিনি। মা কালীর দিব্যি, সে সাহেবকে আমি মারিনি!"

"কে মেরেছে সাহেবকে?"

"বাবু, আমাকে একটা গুলি করে মেরে ফেলে দ্যান। আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।"

"না, তোমাকে আমরা বাঁচাব। ধরো, একে তোলো, স্পিডবোটে নিয়ে চলো!"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "এই, তুই হারু দফাদারের দলে ছিলি না? তাকে কে মেরেছে?"

লোকটি এবারে খানিকটা দম নিয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, "তারে মেরেছি আমি। সেই কুত্তার বাচ্চা নিমকহারাম, সে ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, এক সাথে কত কাজ করেছি, আর সেই হারু দফাদার কিনা আচমকা আমার পেটে গুলি চালালে! আমিও তারে ছাড়ি নাই, বাবু! বদলা নিয়েছি। ছুরির এক কোপে তার কল্‌জে ফাঁসিয়ে দিয়েছি!"

লোকটা এর পর দারুণভাবে হাঁপাতে লাগল।

কাকাবাবু আঙুল দিয়ে তার থুতনিটা উঁচু করে ধরে তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে সত্যি কথা বলো তো? সেই সাহেবকে কে মেরেছে? তুমি না হারু দফাদার?"

লোকটা আস্তে আস্তে বলল, "মা কালীর কিরে, বনবিবির কিরে, আমি তারে মারিনি! হারুও তারে মারেনি। কালু শেখ তারে জড়িয়ে ধরেছিল, কিন্তু ছুরি মারবার আগেই সাহেব জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে!"

৭

এর পরে যা ঘটল তাকে অসম্ভব বা অলৌকিক বলা যেতে পারে। ঠিক যেন একটা রূপকথা।

ইংগমার স্মেল্ট মারা যাননি, জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, একথা জানবার পর পুরো পাঁচ ঘন্টা ধরে পুরো এলাকাটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হল। নদীর দু'ধারে প্রতিটি ইঞ্চিও দেখা বাকি রইল না। কিন্তু জীবিত বা মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল না ইংগমার স্মেল্টকে।

এর মধ্যে স্পিডবোটের ডিজেল ফুরিয়ে গিয়েছিল, পুলিশের লঞ্চ থেকে নেওয়া হয়েছিল ডিজেল। ভাড়া করা লঞ্চটাকেও খোঁজার কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

বেলা দুটোর সময় রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "নাঃ! লেট্স কল ইট এ ডে! আর খুঁজে লাভ নেই!"

বিমান বলল, "জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেও, এত স্রোত, তাছাড়া এই নদীতে কামঠ আছে। সাহেবের প্রাণে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। সাহেবের বয়েসও তো হয়েছিল অনেক, তাই না কাকাবাবু?"

কাকাবাবু ক্লান্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ। প্রায় চুয়াত্তর! চলো, তাহলে ফেরা যাক! সাহেব জলে মরতে চেয়েছিলেন, জলেই প্রাণ গেছে।"

স্পিডবোটটা তখন প্রায় সমুদ্রের মোহনার কাছে। ফেরার জন্য স্পিডবোটের চালক কাশেম এমনই ব্যস্ত হয়ে গেল যে, প্রচণ্ড স্পিড তুলে দিল। আর মোটরের আওয়াজ হতে লাগল এত জোরে যে, কারুর কোনও কথা বলার উপায় নেই। সবাই নিস্তব্ধ।

কিন্তু রণবীর ভট্টাচার্য বেশিক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। তিনি ঝুঁকে পড়ে কাশেমের পিঠে হাত রেখে বললেন, "ওহে, একটু আস্তে চালাও! আমাদের মেরে ফেলতে চাও নাকি?"

কাশেম মুখ ফিরিয়ে বলল, "অ্যাঁ? কী বলছেন স্যার? অ্যাঁ?"

"একটু আস্তে চালাও!"

"অ্যাঁ? অ্যাঁ?"

তার পরেই কিসে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লেগে উল্টে গেল স্পিডবোটটা। সবাই ছিটকে পড়ে গেল জলে।

কামঠের ভয়ের চেয়েও সন্তুর বেশি ভয় হল কাকাবাবুর জন্য। কাকাবাবু বলেছিলেন, তিনি সাঁতার কাটতে পারবেন না। সে এদিক-ওদিক চেয়ে কাকাবাবুকে খুঁজতে লাগল।

ওদের মহা সৌভাগ্য এই যে, স্রোতের টান নেই একেবারে। সময়টা জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝখানে। এই সময়ে জল প্রায় স্থির থাকে, কোথাও অবশ্য ঘূর্ণি হয়।

একটা বড় গাছ ভেসে আসছিল, কাশেম অন্যমনস্ক হওয়ায় সেই গাছেই ধাক্কা লেগে উল্টে গেছে স্পিডবোটটা।

একটু দূরে কাকাবাবুর মাথাটা একবার দেখতে পেয়ে সন্তু ডুবসাঁতারে কাছে

চলে গিয়ে কাকাবাবুকে ধরতে গেল। কাকাবাবু মুখ উঁচু করে বললেন, "আমি ঠিক আছি। আমি পেরে যাচ্ছি।"

পুলিশের লঞ্চটা কাছেই ছিল। তারা স্পিডবোটটা উল্টে যাওয়া দেখতে পেয়েছে। তারা অমনি আসতে লাগল এদিকে। লঞ্চের ঢেউয়ে কাকাবাবু আরও সহজে ভেসে যেতে লাগলেন পাড়ের দিকে।

তীর থেকে বোটটা খুব বেশি দূরে ডোবেনি। একটুক্ষণের মধ্যেই সবাই পৌঁছে গিয়ে গাছের শিকড় ধরল।

রণবীর ভট্টাচার্য হেসে বললেন, "কেলেংকারি ব্যাপার! আমিই বোধহয় ডোবালাম বোটটাকে, তাই না? আমি যদি কাশেমকে না ডাকতুম—"

কাশেম এবারে আর পুলিশের বড়সাহেবকে খাতির করল না। বেশ রাগতভাবে বলল, "আপনিই তো স্যার আমায় অন্যমনস্ক করে দিলেন। আমি ঠিকই চালাচ্ছিলুম!"

রণবীর ভট্টাচার্য সেইরকম হাসিমুখে বললেন, "যাক, এ যাত্রায় অনেক কিছুই তো হল, জলে ডোবাটাই বা বাকি থাকে কেন? সবই হয়ে গেল! আমরা সবাই তো বেঁচে গেছি!"

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পুলিশের লঞ্চের উদ্দেশে খুব জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "আমরা সবাই ঠিক আছি। তোমরা স্পিডবোটটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করো!"

স্পিডবোটটা উল্টো হয়ে ভেসে চলেছে দুলতে দুলতে।

কাশেম কাকাবাবুকে দেখিয়ে বলল, "ভাগ্য ভাল, নদীর জলে এখন টান ছিল না। নইলে এই বাবুর খুব অসুবিধে হত।"

কাকাবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন, "হুঁ!"

তারপরই উৎকর্ণভাবে বললেন, "ওটা কিসের শব্দ? জঙ্গলের মধ্যে তোমরা একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ?"

সবাই একসঙ্গে মনোযোগ দিল। একটা ক্ষীণ আওয়াজ সত্যিই শোনা যাচ্ছে। গাছের পাতায় হাওয়ার শব্দ? তার চেয়ে যেন কিছুটা অন্যরকম। তীক্ষ্ণ শিসের মতন। কিন্তু একটানা আর সুরেলা।

কাশেম বলল, "ওটা স্যার সাপের ডাক। মাঝে-মাঝে জঙ্গলে শোনা যায়। গোখরো সাপে ওরকম ডাকে।"

কাকাবাবু খাড়া হয়ে বসে বললেন, "সাপের ডাক? যতসব গাঁজাখুরি কথা। সাপ কখনও ডাকে নাকি? আমার ক্রাচ দুটো ভেসে গেছে। এখন আমি কী করে যাব?"

বিমান বলল, "কোথায় যাবেন? এখন?"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা কিসের আওয়াজ দেখতে হবে না? আমার মনে হচ্ছে, রুমানিয়ান বাঁশির আওয়াজ। আমি রুমানিয়ায় গিয়ে এই বাঁশি শুনেছি। দেখতে ছোট হারমোনিকার মতন, কিন্তু ঠিক বাঁশির সুর বেরোয়।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "সুন্দরবনে রুমানিয়ান বাঁশি ?"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সন্তু আর বিমান, আমার দু'দিকে দাঁড়া তো। তোদের কাঁধে ভর দিয়ে চল যাই, একটু দেখে আসি।"

কাশেম কাকাবাবুর হাত চেপে ধরে ভয়ার্ত গলায় বলল, "যাবেন না, বাবু ! এ জঙ্গল বড় খারাপ ! বাঘ থাকতে পারে। সাপ তো আছেই !"

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, "আমায় যেতেই হবে, কাশেম। তুমি এখানে বসে থাকো।"

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "চলুন, আমিও যাই। এ-যাত্রায় বাঘ আর সাপটাই বা দেখা বাকি থাকে কেন ?"

ঘন জঙ্গল ঠেলে খানিকটা যেতেই এক অপরূপ দৃশ্য দেখা গেল। একটা বড় গরান গাছের নীচে শুয়ে আছে একজন মানুষ। লোকটিকে দেখলে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে হয়। মাথায় ধপধপে সাদা চুল মুখেও ধপধপে সাদা দাড়ি। তবে লোকটি পরে আছে একটি নীলরঙের প্যান্ট আর একটা ঢোলা জামা। আপন মনে একটা মাউথ অর্গানের মতন জিনিস বাজাচ্ছে।

এত লোকের পায়ের শব্দ শুনে বৃদ্ধ বাজনা থামিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলেন। খুব একটা অবাক হলেন না, কোনও কথা বললেন না।

কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কম্পিত গলায় বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ইংগমার স্মেল্ট ! আপনি আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আপনি আমাদের দেশে দস্যুদের হাতে পড়েছিলেন। তবু যে আপনি বেঁচে আছেন, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।"

ইংগমার স্মেল্ট খুব ধীরে ধীরে কোমল গলায় বললেন, "হে ভারতীয় বন্ধুগণ, আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। আপনারা এত কষ্ট করে কেন এই গভীর বনে এসেছেন ? আমি এখানে বেশ আছি। আমার মেরুদণ্ডে খুব জোর চোট লেগেছে, আমার আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা আপনাকে বহন করে নিয়ে যাব।"

বৃদ্ধ বললেন, "না, না, তার কোনও দরকার নেই। আপনারা মহানুভব, আমার জন্য আপনাদের কোনও কষ্ট করতে হবে না।"

এবারে রণবীর ভট্টাচার্য এগিয়ে গিয়ে বললেন, "না, আপনার কথা শুনব না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে চলুন। আমাদের একটু সেবা করার সুযোগ দিন।"

বৃদ্ধ বললেন, "তবে আপনারা শুধু আমাকে আমার লঞ্চে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।"

বিমান আর রণবীর ভট্টাচার্য দু'দিক থেকে ধরে বৃদ্ধকে তুলে দাঁড় করালেন। বৃদ্ধের মুখে একবার মাত্র কষ্টের রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

রণবীর ভট্টাচার্য বললেন, "কী আশ্চর্য কথা এই জঙ্গলে সাপ আছে, বাঘ আছে, অথচ আপনি এখানে দু'দিন ধরে শুয়ে আছেন ? মিরাক্‌ল্‌ আর কাকে বলে ?"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি একবার বাঘের ডাক শুনেছি। হয়তো আমি অশক্ত, বৃদ্ধ বলে তারা অনুগ্রহ করে আমায় ভক্ষণ করেনি। আপনারা বিশ্বাস করুন, অনেক মানুষ যত হিংস্র হয়, বনের পশুরা তত হিংস্র হয় না কখনও। তারা অনেক সভ্য আর ভদ্র। বৈজ্ঞানিকদের অস্ত্র যত মানুষ মেরেছে, তার চেয়ে কি পশুরা বেশি মানুষ মারতে পারে! আবার আপনাদের মতন মানুষও তো আছে!"

এই কথা বলে তিনি দুঃখ-মেশানো মধুর হাসি হেসে সকলের মুখের দিকে তাকালেন।

মিশর রহস্য

সাইকেল চালানো শেখার জন্য সন্তুকে এখন ভোরবেলা বালিগঞ্জ লেকে আসতে হয়। ওদের পাড়ার পার্কটা মেট্রো রেলের জন্য খুড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন খেলাধুলো করার উপায় নেই।

ভোরবেলাতেই বালিগঞ্জ লেকে বেশ ভিড় থাকে। বহু বয়স্ক লোক আসেন মর্নিং ওয়াক করতে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা দৌড়য়। অনেকে রোয়িং করে। কালীবাড়ির উল্টো দিকের গ্রাউন্ডটায় ফুটবলের কিক প্র্যাকটিস হয়। লেকের পেছন দিকটায় যেখানে লিলিপুল আছে, সেখানকার রাস্তাটা অনেকটা নির্জন। ঐ জায়গাতেই দু'তিনটে দল সাইকেল শেখে।

সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সঙ্গে থাকে রকুকু। সন্তুর নিজের সাইকেল নেই। কুনালদের বাড়িতে একটা পুরনো সাইকেল ছিল। কুনালের বাবা ডাক্তার, তাঁর চেম্বারের কম্পাউণ্ডারবাবু এই সাইকেলটা ব্যবহার করতেন। কম্পাউণ্ডারবাবু চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গেছেন তিন-চার মাস আগে, সাইকেলটা নিয়ে যাননি। কুনাল সেই সাইকেলটা নিয়ে কিছুদিন প্যাড্‌ল করতে করতে চালানো শিখে গেছে। সেই দেখাদেখি সন্তুরও সাইকেল শেখার শখ হয়েছে।

কুনালকে ডাকতে হয় না, সে তৈরি হয়েই থাকে। কিন্তু মুশকিল হয় বাপিকে নিয়ে। বাপিদের বাড়িতে সবাই খুব দেরি করে ওঠে। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। সন্তু আর কুনাল যখন রাস্তা থেকে বাপির নাম ধরে ডাকতে থাকে, তখন রকুকুও ঘেউঘেউ করতে শুরু করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত বাপি চোখ মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় এসে বলে, "এক মিনিট দাঁড়া বাথরুম থেকে আসছি।"

তারপরেও বাপি পনেরো মিনিট কাটিয়ে দেয়। লেকে পৌঁছতে-পৌঁছতে রোদ উঠে যায়।

খুব ছেলেবেলায় সন্তু ট্রাইসাইকেল চালিয়েছিল, কিন্তু দু' চাকার সাইকেল

চালানো খুব শক্ত ব্যাপার। একটু-একটু ভয়ে গা-শিরশির করে। সাইকেলটায় ওঠার পর কুনাল আর বাপি তাকে দু'দিকে ধরে থেকে ঠেলতে থাকে। তারপর দু'জনে নির্দেশ দেয়, জোরে প্যাড্‌ল কর, সামনে তাকিয়ে থাক্‌, শরীরটা হাল্‌কা কর, এত স্টিফ হয়ে আছিস কেন ?

কুনাল আর বাপি হঠাৎ একসময় তাকে ছেড়ে দিলেই সন্তুর চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন দুলতে থাকে, হাত দুটো লগ্‌বগ্‌ করে। সন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, "এই, এই পড়ে যাব, ধর, ধর !"

ওরা দু'জন হাসতে-হাসতে দৌড়ে এসে আবার ধরে ফেলে।

এই রকম দু'দিন ধরে চলছে। আজ তৃতীয় দিন। আজ সন্তুর অনেকটা ভয় কেটে গেছে। সাইকেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আর আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। বাপি আর কুনাল মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আজ এখানে আরও চারটে দল এসেছে, এক দলের সঙ্গে আর-এক দলের যে-কোনও সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে। উল্টোদিকে অন্য কোনও দলকে দেখলেই সন্তু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছোটাছুটি করার পর একসময় বাপি সন্তুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, "এইবার তুই নিজে চালা, সন্তু। এই কুনাল, ছেড়ে দে !"

সন্তুর আর হাত কাঁপল না, সে সোজা সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল। দারুণ আনন্দ হচ্ছে সন্তুর, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'শিখে গেছি ; শিখে গেছি !' চিৎকার করার বদলে সন্তু ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাতে লাগল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার সব বদলে গেল। আবার হাত কাঁপছে, হ্যাণ্ডেলটা এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছে, পায়ে যেন জোর কমে গেছে। সন্তুর ধারণা হল, সে একা-একা অনেকটা দূরে এসে গেছে, কুনাল আর বাপি দৌড়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। কী হবে ? এই রে, এই রে, সাইকেলটা হেলে যাচ্ছে...

পেছন থেকে বাপি চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হচ্ছে, চালিয়ে যা সন্তু, সামনের দিকে তাকিয়ে—"

ঠিক এই সময়ে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আর-একটা দল এসে পড়ল। এখন পাশ কাটাতে না-পারলেই মুখোমুখি কলিশান। সন্তু মোটে সোজা চালাতে শিখেছে, এদিক-ওদিক ঘুরতে জানে না। কুনাল বলেছিল, সাইকেলে সব সময় বাঁদিকে টার্ন নেবার চেষ্টা করবি, ডান দিকে হঠাৎ টার্ন নেওয়া ডিফিকাল্ট। কিন্তু এখানে বাঁ দিকে টার্ন নিতে গেলে যে সোজা লেকের জলে নেমে যেতে হবে।

উল্টোদিকের দলটা সন্তুর একেবারে কাছে এসে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল, "বাঁ দিক চেপে... বাঁ দিক চেপে !"

সন্তু আর কিছু চিন্তা না করে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডেল। পরের

মুহূর্তটা সে চোখে কিছু দেখতে পেল না। কী যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল পৃথিবীতে। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সন্তু ছিটকে পড়ে গেল, তারপর সাইকেলটাও পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

কোনওরকম ব্যথা বোধ করার আগেই সন্তু ভাবল, চোখ দুটো ঠিক আছে তো ? পায়ের হাড় ভেঙে গেছে ?

রকুকু ছুটে আসছিল সন্তুর পেছন পেছন। সাইকেলটা পড়ে যেতে দেখে সে ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

সাইকেলটা সরিয়ে সন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। একজন মর্নিং ওয়াকার সাইকেলটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "খুব লেগেছে নাকি, খোকা ? আমার হাত ধরে ওঠবার চেষ্টা করো।"

ততক্ষণে কুনাল আর বাপি এসে পৌঁছে গেল সেখানে।

কুনাল বলল, "এই ওঠ্, তোর কিচ্ছু হয়নি !"

বাপি বলল, "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার/সাইকেল শেখে না কেহ না খেলে আছাড় !"

মর্নিং ওয়াকার ভদ্রলোক বললেন, "না হে, ওর বেশ ভালই লেগেছে মনে হচ্ছে, হাঁটুর কাছে রক্ত বেরোচ্ছে !"

কুনাল বলল, "আমার ওর থেকে ঢের বেশি রক্ত বেরিয়েছিল। সাইকেল শিখবে, আর একবারও রক্ত বেরুবে না ?"

ভদ্রলোকটি আবার হাঁটা শুরু করে দিলেন।

কুনাল আর বাপি দু'হাত ধরে সন্তুকে টেনে তুলল। কুনাল বলল, "সাইকেলটা টাল খেয়ে গেছে শুধু, আর কিছু হয়নি ভাগ্যিস !"

সন্তু মাঝে-মাঝে ফুলপ্যান্ট পরলেও সাইকেল চালাবার জন্য পরে এসেছে শর্টস আর গেঞ্জি। তার একটা হাঁটুর নুন-ছাল উঠে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ফোঁটা ফোঁটা। সেখানে খানিকটা জ্বালা করলেও আসল ব্যথা হচ্ছে সন্তুর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে।

এক পা চলার চেষ্টা করেই সন্তু উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় প্রায় চোখে জল এসে গেল তার।

বাপি বলল, "কী রে, তুই এত সব বিপদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাস, আর সামান্য একটু পায়ের ব্যথায় কেঁদে ফেললি ?"

সন্তু বলল, "ভীষণ লাগছে, মাটিতে পা ফেলতে পারছি না।"

কুনাল বলল, "জোর করে হাঁটার চেষ্টা কর, একটু বাদে ঠিক হয়ে যাবে !"

সন্তু বলল, "যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে ?"

কুনাল বলল, "ধ্যাত, অত সহজে ফ্র্যাকচার হয় না।"

রকুকু আবার এর মধ্যে সন্তুর পা চেটে দিতে চায়। সন্তু কুনালকে বলল, "ওর গলার চেনটা বেঁধে নে।"

এর পরে আর সাইকেল চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। কুনাল সাইকেলটা ঠিক করে নিল। বাপির কাঁধে ভর দিয়ে সন্তু হাঁটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে, কোনও কথা বলছে না।

খানিকক্ষণ চলার পর বাপি বলল, "কী রে, তুই যে এখনও ল্যাংচাচ্ছিস ? জোর করে বাঁ পাটা ফেলার চেষ্টা কর।"

সন্তু ধরা গলায় বলল, "কিছুতেই পারছি না। হাড় ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই।"

বাপি হাসতে হাসতে বলল, "যাঃ, তা হলে কী হবে ? তুই তো আর কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারবি না। তোর কাকাবাবুর একটা পা তো, ইয়ে, মানে ডিফেকটিভ। তুইও যদি খোঁড়া হয়ে যাস, তা হলে তো তোকে আর উনি সঙ্গে নেবেন না!"

কুনাল বলল, "এই বাপি, ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস না। ওর পা আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্তুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাপি তো ঠিকই বলেছে। সে খোঁড়া হয়ে গেলে তো কাকাবাবুকে আর কোনও সাহায্য করতে পারবে না! তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল ?

খানিকটা পথ পার হবার পর কুনাল জিজ্ঞেস করল, "একটা রিকশায় উঠবি, সন্তু ?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল। বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলে মা ভয় পেয়ে যাবেন। আগেই মাকে কিছু বলার দরকার নেই। বিমানদার দাদা ডাক্তার, তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে একবার।

সন্তুদের বাড়ির কাছেই বিমানদাদের বাড়ি। বিমানদা পাইলট, তিনি বাড়ি নেই, নিউ ইয়র্কে গেছেন। বিমানদার দাদাও নার্সিং হোমে চলে গেছেন জরুরি কল পেয়ে। দুপুরবেলা তিনি বাড়িতে খেতে আসেন, সেইসময়ে সন্তুকে আবার আসতে হবে।

কাছেই একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, কী যেন কিনছেন। ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না, তবু প্রত্যেকদিন সকালে তাঁর মর্নিং ওয়াকে বেরুনো চাই।

সন্তু প্রথমে কাকাবাবুকে দেখতে পায়নি। বাপি তার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, "এই সন্তু দ্যাখ..."

সন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখল কাকাবাবু তার দিকেই চেয়ে আছেন। সন্তুকে খোঁড়াতে দেখে তিনি মিটিমিটি হাসছেন, মুখে কিছু বললেন না!

অন্য যে-কোনও বাড়ির বাবা-কাকারা তাঁদের বাড়ির ছেলেকে এইরকম অবস্থায় দেখলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বলতেন, "অ্যাঁ, কী হয়েছে ? কী করে পড়লি ? হাড় ভেঙে গেছে ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কাকাবাবু সন্তুকে ঐ অবস্থায় দেখে পাত্তাই দিলেন না।

এমন কী, একটু বাদে বাড়ি ফিরেও কাকাবাবু মাকে কিছুই বললেন না।

সন্তু নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। এখন দু'তিন ঘণ্টা তার পড়ার সময়, ঘর থেকে না বেরুলেও চলবে। ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে, বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা বেশ ফুলে গেছে। একটু আয়োডেক্স মালিশ করলে হত। আয়োডেক্সের একটা টিউব ছিল যেন বাড়িতে কোথায়, কিন্তু দরকারের সময় তো সেসব কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। মায়ের কাছেও চাইতে সাহস পাচ্ছে না। সন্তু জানে, মা জানতে পারলে এক্ষুনি কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, তারপর এক্স-রে, তারপর আরও কত কী ! পায়ে প্লাস্টার করিয়ে শুইয়ে রাখবেন এক মাস। ঐ প্লাস্টার জিনিসটা সন্তু একদম পছন্দ করে না। এক মাস বিছানায় শুধু-শুধু শুয়ে থাকা...অসহ্য !

বিমানদার দাদা অবনীদা নিজে খেলাধুলো করেন। তিনি নিশ্চয়ই একটা সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। মা সকালের দিকে অনেকটা সময় স্নান আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সহজে টের পাবেন না।

বেলা এগারোটা আন্দাজ সন্তু বারান্দায় খটখট শব্দ পেয়ে বুঝল কাকাবাবু আসছেন তার ঘরে। পড়ার টেবিল থেকে সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, বাড়িতে কারুকে কিছু বলিসনি তো ? পা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কি এমনি-এমনি সারবে ?"

সন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কাকাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "এদিকে আয়, হাঁটবার চেষ্টা কর, দেখি কতদূর কী হয়েছে !"

কাকাবাবু গুরুজন হয়ে তার পায়ে হাত দেবেন, এটা ভেবে সন্তু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু আপত্তি জানিয়েও কোনও লাভ নেই।

সন্তু এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু বসে পড়ে সন্তুর বাঁ পা'টা দু' হাতে ধরলেন। সন্তুর গা শিরশির করছে। ঐখানটায় হাত দিলেই ব্যথা।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, বেশ ফুলেছে দেখছি !"

তারপর পা'টা বেশ জোরে চেপে ধরে সন্তুর চোখে চোখ রেখে বললেন, "শোন্, যতই ব্যথা লাগুক, চ্যাঁচানো চলবে না কিন্তু। দেখি কী রকম তোর মনের জোর। মন শক্ত করেছিস তো ?' এক...দুই...তিন !"

কাকাবাবু স্যাট করে সন্তুর গোড়ালিটা ঘুরিয়ে দিলেন। সন্তুর মুখখানা মস্ত বড় হাঁ হয়ে গেল, তবু সে কোনও শব্দ করল না। মনে হল যেন কাকাবাবু তার পায়ের হাড় ভেঙে দিলেন মট্ করে।

কাকাবাবু বললেন, "যা, ঠিক হয়ে গেছে, আর কিছু হবে না।"

সন্তু প্রকাণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক হয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মট্ করে একটা শব্দ পেলি না ? তাতেই তো হাড় আবার সেট হয়ে গেল। তোর গোড়ালিটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।"

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমি অনেককাল পাহাড়ি লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছি তো। সেখানে তো ডাক্তার পাওয়া যায় না, ওরা এইরকমভাবে চিকিৎসা করে। আমি ওদের কাছ থেকে শিখেছি।"

সন্তুর দৃষ্টি অমনি কাকাবাবুর পায়ের দিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তুই ভাবছিস তো আমার পা'টা কেন এইভাবে সারাতে পারিনি ? আমার পায়ের ওপর এই অ্যাত্তো বড় একটা পাথরের চাঁই এসে পড়েছিল, এখানকার হাড়গোড় একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পা'টা যে কেটে বাদ দিতে হয়নি তাই যথেষ্ট। তুই এবারে একটু হাঁটার চেষ্টা করে দ্যাখ্ তো!"

আশ্চর্য ব্যাপার, পায়ে এখনও ব্যথা আছে যদিও, তবু সন্তু দু'পা ফেলে হাঁটতে পারছে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। তবু একবার বিমানের দাদার কাছে গিয়ে দেখিয়ে নিস।"

গরমের ছুটি, তাই স্কুল-কলেজ বন্ধ। সারাদিন সন্তু বাড়িতেই বসে রইল। পায়ের ব্যথা ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর সন্তুরও মন ভাল হয়ে উঠছে। বিকেলে অবনীদার চেম্বার যাবার পর তিনি ওর পা দেখে বললেন, "কই, কিছু হয়নি তো। একটু-আধটু মচ্‌কে গেলে চিন্তার কী আছে ? বাড়িতে গিয়ে মাকে বলো একটু চুন-হলুদ গরম করে ওখানটায় লাগিয়ে দিতে।"

পরদিন ভোরবেলা সন্তুর ঘরের দরজায় খটখট শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তু দেখল কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, আজ আর সাইকেল শিখতে যাবি না ?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সাইকেল ? সাইকেল শেখার চিন্তা তো সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছে। ঐ অপয়া সাইকেলটার জন্যই তো কাল থেকে অত কষ্ট পেতে হল। কী হয় সাইকেল শিখে ? এটা গাড়ির যুগ। আর একটু বড় হয়ে সন্তু গাড়ি চালানো শিখবে।

সন্তু বলল, "আমি আর সাইকেল শিখব না, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ? সাইকেল কী দোষ করল ? তুই পড়ে গেছিস, সেটা তো সাইকেলের দোষ নয়। কিছু একটা শিখতে শিখতে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।"

সন্তু তবু গাঁইগুঁই করে বলল, "পায়ে এখনও একটু-একটু ব্যথা, যদি আবার লেগেটেগে যায় ?"

কাকাবাবু বললেন, "আবার লেগে গেলে আবার সারবে। সাইকেল শেখাটা

ভয় পেয়ে একবার ছেড়ে দিলে আর শেখা হবে না। যা, যা, বেরিয়ে পড়! সাইকেলটা একবার শিখে নিলে দেখবি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগবে!"

সন্তু ভেবেছিল, আজ বেশ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে। কাকাবাবুর তাড়নাতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হল। কুনালের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে সে ভাবল, কাকাবাবু সাইকেল শেখার ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? এবারে যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে কি সাইকেল চালানো দরকার হবে?

সন্তুর মন বলছে, শিগগিরই কোথাও যাওয়া হবে। লম্বা, ফর্সা মতন একজন বুড়োলোক প্রায়ই আসছেন কাকাবাবুর কাছে। লোকটি ঠিক সাহেব নয়, আবার ভারতীয় বলেও মনে হয় না। লোকটি কাকাবাবুকে কোথাও নিয়ে যেতে চান। সন্তু একদিন শুনতে পেয়েছিল, বুড়ো লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলছেন, "ইউ কাম্... আই উইল মেক অল অ্যারেঞ্জমেন্টস্।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "দাঁড়ান, যাওয়াটা ওয়ার্থহোয়াইল হবে কি না আগে চিন্তা করে দেখি!"

লোকটি যে কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন, সেটা সন্তু বুঝতে পারেনি। লোকটি কি কাশ্মীরি? কিংবা কাবুলের লোক?

॥ ২ ॥

দিদির বন্ধু স্নিগ্ধাদির বর সিদ্ধার্থদা কলেজে পড়ানোর কাজ ছেড়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। এখন বাইরে-বাইরে থাকেন। সেই যে সেবার কাশ্মীরে কণিষ্কর মুণ্ডু উদ্ধার করার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলেন, তারপর থেকে আর অনেকদিন সিদ্ধার্থদার সঙ্গে সন্তুর দেখাই হয়নি। সিদ্ধার্থদারা কয়েক বছর কাটালেন বেলজিয়ামে, তারপর সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কানাডায়। আবার যেন কোথাও বদলি হয়েছেন, সেই ফাঁকে বেড়াতে এসেছেন কলকাতাতে।

স্নিগ্ধাদি একদিন এসেছিলেন সন্তুদের বাড়িতে। দিদি তো এখানে নেই, দিদি এখন ভূপালে। মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করার পর স্নিগ্ধাদি সন্তুকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁদের বাড়িতে।

সিদ্ধার্থদা আবার শখের ম্যাজিশিয়ান। খাওয়া-দাওয়ার পর সিদ্ধার্থদা ম্যাজিক দেখাতে লাগলেন কয়েকটা। সন্তু অনেক ম্যাজিকের বই পড়েছে, সিদ্ধার্থদার সব কটা ম্যাজিকই সে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু ম্যাজিকের আসরে ওরকম করা উচিত নয় বলে সে চুপ করে রইল। শেষকালে একটা তাসের ম্যাজিকে সিদ্ধার্থদা একটুখানি ভুল করে ফেলায় সন্তু আর হাসি চাপতে পারল না!

সিদ্ধার্থদা বললেন, "এই, তুমি হাসলে কেন? দেখবে, তোমার জামার পকেট থেকে আমি একটা মুর্গির ডিম বার করে দেব?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "আহা, তোমার যা পচা-পচা ম্যাজিক, সন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে!"

সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সন্তু মানে? দা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার? আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি, অনেক বড় হয়ে গেছে!"

ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করে সিদ্ধার্থদা সন্তুকে কাছে ডেকে নানান গল্প শুরু করে দিলেন। এক সময় তিনি বললেন, "জানো সন্তু, কানাডায় আমাদের এমব্যাসির ছেলেমেয়েদের জন্য একদিন 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমাটা দেখানো হল। তুমি আর কাকাবাবু যে একেবারে আন্দামানে জারোয়াদের মধ্যে চলে গিয়েছিলে, আমি তো জানতুমই না! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিলে। আমি একেবারে থ্রিল্‌ড!"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে রইল।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর আর কোথাও গিয়েছিলে?"

সন্তু তাদের অভিযানের কাহিনী শোনাতে লজ্জা পায়। সে বলল, "এই, আরও দু'এক জায়গায়..."

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমার এবার পোস্টিং কোথায় জানো তো? ইজিপ্টে। কাকাবাবুকে বলো না, সেখানে একবার চলে আসতে? সেখানেও তো কত রহস্যময় ব্যাপার আছে, পিরামিড, স্ফিংকস, মরুভূমি..."

স্নিগ্ধাদি বললেন, "হ্যাঁ, চলে এসো, বেশ মজা হবে, আমরাও থাকব।"

সন্তু বলল, "শুধু আমি যেতে চাইলেই তো হবে না। কাকাবাবু অন্য একটা কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন।"

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু চলে গেছেন দিল্লিতে। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। যাওয়ার দিন সন্তুই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কাকাবাবু, আমাকে নিয়ে যাবেন না?"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "না রে, তুই গিয়ে কী করবি? আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে। প্লেনে যাব, প্লেনে আসব, কোনও অসুবিধে তো নেই!"

কিন্তু সন্তুর সন্দেহ হয়েছিল, দিল্লি থেকে কাকাবাবু আরও কোথাও যাবেন। সেই ফর্সা, লম্বা বৃদ্ধ লোকটি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তুলে নিতে এসেছিলেন কাকাবাবুকে। সন্তুর বেশ মন খারাপ হয়েছিল।

সন্তুর আবার মন খারাপ হয়ে গেল, যখন শুনল যে, স্নিগ্ধাদির বোন রিনিও এবারে ওঁদের সঙ্গে যাবে ইজিপ্টে। রিনি সন্তুর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। রিনি সন্তুর আগেই ফরেন কান্ট্রিতে যাচ্ছে? সন্তু এ-পর্যন্ত বিদেশ বলতে শুধু নেপাল ঘুরে এসেছে। অবশ্য নেপালও খুব সুন্দর জায়গা। সন্তুর আবার যেতে ইচ্ছে করে।

রিনি বলল, "সিদ্ধার্থদা, ইজিপ্ট থেকে গ্রিস তো খুব দূরে নয়! আমাকে একবার গ্রিস ঘুরিয়ে আনবেন তো?"

সিদ্ধার্থদা বললেন, "হ্যাঁ, গ্রিস তো ঘুরে আসাই যায়। ইচ্ছে করলে আমরা রোমেও যেতে পারি। আমার রোম দেখা হয়নি।"

গ্রিস, রোম, এইসব নাম শুনলে সন্তুর রোমাঞ্চ হয়। আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার এইসব নাম মনে পড়ে।

সন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল।

সামনে অনেকদিন ছুটি, সন্তুর আর সময়ই কাটতে চায় না। কুনাল চলে গেছে ওর মামাবাড়ি ভাগলপুরে। বাপিও দার্জিলিং যাবে-যাবে করছে। খেলাধুলো জমছে না। বাড়িতে যত বই ছিল, সবই সন্তুর পড়া, নতুন বই আর জোগাড় করা যাচ্ছে না।

কিছু একটা করতে হবে তো। একদিন দুপুরবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সন্তু ঠিক করল, সে একা-একাই এবার থেকে এক-একটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে। কাকাবাবুর যদিও অনেকের সঙ্গেই চেনাশুনো, তবু কাকাবাবুও তো বিশেষ কারুর সাহায্য নিতে চান না।

ক'দিন ধরেই কাগজে একটা খবর বেরুচ্ছে। তিলজলায় একটা পুকুরে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ছেলে ডুবে গেছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ জলে ডুবে গেলে কিছুক্ষণ বাদে তার মৃতদেহটা ভেসে উঠবেই। পুকুরটা বেশি বড় নয়। অথচ পোর্ট কমিশনার্সের পেশাদার ডুবুরিরাও কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে ছেলে দুটির কোনও চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ছেলেদুটিকে ডুবে যেতে অনেকেই দেখেছে। ঘটনা দুটিই ঘটেছে বিকেলবেলা। গরমের দিনে এই সময় অনেকেই ওই পুকুরে স্নান করতে আসে। ওই ছেলেদুটি জলে নামল, আর উঠল না, তা হলে ওরা গেল কোথায়? অনেকে বলছে, ওই পুকুরের তলায় নিশ্চয়ই গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। অনেক কালের পুরনো পুকুর, সেই নবাবি আমলের। পেশাদার ডুবুরিরা অবশ্য কোনও সুড়ঙ্গের কথা বলেনি। এতদিন ঐ পুকুরে অনেকেই স্নান করছে, কারুর কিছু হয়নি, হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই দুটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে?

সন্তু মনে-মনে এই কেসটা টেক আপ করে নিল।

তিলজলা জায়গাটা কোথায়? সন্তু কোনওদিন ঐ নামের জায়গায় যায়নি, তার চেনা কেউ ওখানে থাকেও না। তিলজলা কী করে খুঁজে পাওয়া যায়? কুনাল ওর সাইকেলটা সন্তুর কাছে রেখে গেছে। ইচ্ছে করলে সন্তু এখন সাইকেলে কলকাতার যে-কোনও অঞ্চলে চলে যেতে পারে।

রাস্তার মোড়ে একটা বই-পত্রপত্রিকার স্টল আছে। সেই স্টলের মালিক গুপিদা বেশ ভালমানুষ ধরনের। সন্তু ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকেই এই স্টল থেকে ম্যাগাজিন, কমিক্স, গল্পের বই কেনে। গুপিদা তাকে চেনেন।

সন্তু সেই স্টল থেকে কলকাতার একটা ম্যাপ কিনে পাশের দেয়ালে মেলে ধরল। কিন্তু তাতেও সে তিলজলা খুঁজে পায় না। কী ব্যাপার, তা হলে কি তিলজলা কলকাতার মধ্যে নয়, বাইরে কোথাও?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "গুপিদা, তিলজলা জায়গাটার নাম খুঁজে পাচ্ছি না কেন?"

গুপিদা বললেন, "পাচ্ছ না? পিকনিক গার্ডেনস দ্যাখো, তার পাশেই পাবে।"

সন্তু অবাক। পিকনিকের জন্য বাগান, সেখানে সবাই পিকনিকের জন্য যায়? সন্তু তো এরকম কোনও জায়গার নামই শোনেনি।

গুপিদা ওর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এই দ্যাখো, ভবানীপুর, এই হাজরা মোড়, এই হল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, তারপর এই বণ্ডেল রোড ধরে সোজা গেলে রেল-লাইনের লেভেল ক্রসিং পাবে, তার ওপারে...।

বেলা এখন চারটে। সঙ্গে আর কারুকে নিলে হত। বাপিকে ডাকবে? কিন্তু বাপির এইসব ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই। থাক, সন্তু একাই যাবে। সাইকেলটা না নিয়ে যাওয়াই ভাল। লোকের চোখে পড়ে যাবে। সন্তু হাঁটতে শুরু করে দিল।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল সহজেই। লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল বণ্ডেল রোড কোন্‌টা। কতদিনই সন্তু একলা-একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটে। কিন্তু আজকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। আজ সন্তু এমন একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যার কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সন্তুর কি মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে? রাস্তার প্রায় সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে কেন?

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্য দিকে চলে এল সন্তু। যেন কলকাতা নয়, যেন অন্য একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছে সে। যদিও জায়গাটাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ভাঙা, ঘিঞ্জি রাস্তা, বাস আর সাইকেল-রিকশা চলছে।

খানিকদূর এগোবার পর আর-একটা সমস্যা মাথায় এল সন্তুর। কোন্‌ পুকুরে ছেলেদুটো ডুবে গিয়েছিল, তা কী করে বোঝা যাবে? তিলজলাতে কি একটাই পুকুর আছে? পিকনিক গার্ডেনস তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে? কত বড় বাগান? সেখানেও নিশ্চয়ই পুকুর থাকবে! ঘটনাটা কি সেখানেই ঘটেছিল?

সন্তু একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

চালক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন?"

সন্তু বলল, "পিকনিক গার্ডেনে।"

সাইকেল-রিকশার চালক একটু বিরক্তভাবে বলল, "অ্যাঁ? এটাই তো পিকনিক গার্ডেন।"

সন্তু রাস্তার চারপাশে বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। কোনও বাগান তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুকুর কোথায় ?

সন্তুর মনে হল, ইনভেস্টিগেটর হতে গেলে আগে সব রাস্তা-টাস্তাগুলো ভাল করে চেনা দরকার। এবার থেকে সে নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে একটা পুকুর আছে ?"

চালক বলল, "একটা কেন, অনেক গণ্ডা পুকুর আছে। কোথায় যাবেন সেটা বলুন না। ঠিকানা কী ?"

সন্তু বলল, "ঠিকানাটা মনে নেই, আমার পিসিমার বাড়ি, কাছেই একটা পুকুর আছে... ঐ যে যে-পুকুরে দুটো ছেলে ডুবে গেছে..."

চালক আর বাক্যব্যয় না করে প্যাড্‌ল ঘোরাল।

একটু বাদেই বড় রাস্তা ছেড়ে সাইকেল-রিকশাটা ঢুকল একটা মাঝারি রাস্তায়। কয়েকবার ডান-দিক বাঁ-দিক ঘুরে সেটা এসে থামল একটা পুকুরের সামনে।

চালক জিজ্ঞেস করল, "এবারে চেনা লাগছে ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ঐ তো ঐ কোণের বাড়িটা !"

ভাড়া পেয়ে সাইকেল-রিকশার চালক চলে গেল উল্টো দিকে। কোনও কারণ নেই, তবু সন্তুর বুকটা এত টিপটিপ করছে। এই সেই পুকুর, যার মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে, যে দুটো ছেলেকে টেনে নিয়েছে, আর ফিরিয়ে দেয়নি।

পুকুরটা বেশ বড়ই। কালো রঙের জল। মাঝখানটায় কিছু কচুরিপানা রয়েছে, তাতে সুন্দর হালকা-নীল রঙের ফুলও ফুটেছে। পুকুরটার তিনদিকেই বাড়ি, একটা দিক ফাঁকা। সেখানে খানিকটা ঝোপঝাড়ের মতন হয়ে আছে, তারপর খানিকটা দূরে একটা কারখানা।

সন্তু ভেবেছিল যে, এখানে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। পুলিশ, দমকল, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার...। কিন্তু কেউই নেই। খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, এই জায়গাটা বুঝি ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে গমগম করছে ! একটা লোকও স্নান করছে না পুকুরে। রাস্তা দিয়ে দু'চারজন লোক যাচ্ছে, কিন্তু কারুর কোনও কৌতূহল আছে বলেও মনে হয় না।

পুকুরটার জলের দিকে তাকিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। কাকাবাবু হলে কী করে এই রহস্যটার সমাধান করতেন ? খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, ডুবুরিরা কিছু খুঁজে পায়নি বলে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছেলেদুটো তো জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না !

যে-জায়গায় কোনও ঘটনা ঘটে, সে-জায়গাটা কাকাবাবু নিজের চোখে দেখতে যান সব সময়। খবরের কাগজ পড়েই তো তিনি সুন্দরবনের নদীতে খালি জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলেন। এখানে এসে কি কাকাবাবু জলে নেমে

পড়তেন ? পায়ের জখমের জন্য কাকাবাবুর সাঁতার দিতে অসুবিধে হয়। তাহলে ? কাকাবাবু নিশ্চয়ই সন্তুকে বলতেন জলে নামতে।

সন্তু ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এই রকম একটা পুকুর, কালো মিশমিশে জল, এখানে নামার কথা ভাবতেই সন্তুর ভয়-ভয় করছে। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে কক্ষনো ভয় করে না। খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু নিজে কত সাংঘাতিক বিপদের দিকে এগিয়ে যান, শুধু মনের জোরে।

একটা লোকও এই পুকুরের জলের ধারেকাছে নেই। সবাই ভয় পেয়েছে ? একটা পুকুরের জলে ভয়ংকর কী থাকতে পারে ? খবরের কাগজে লিখেছে, ডুবুরিরা জল তোলপাড় করে কিছুই দেখতে পায়নি। কোনও গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা কোনও অদ্ভুত জন্তু লুকিয়ে আছে ?

শুধু-শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। ফিরে যাবে ? কিছুই করা গেল না ? প্রথম কেস হাতে নিয়েই সন্তু হেরে যাবে ? যদিও কেউ জানে না, তবু সন্তুর লজ্জা লাগছে।

পুকুরটার চারপাশটা অন্তত একবার ঘুরে দেখা দরকার। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকটায় যেখানে ঝোপঝাড় রয়েছে, সেখানে কি কোনও ঘাট আছে ? ছেলে দুটো ডুব-সাঁতারে ওপারে গিয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে অনেকেই ভাবতে পারে ওরা ডুবে গিয়ে আর ওঠেনি। মজা করার জন্য ছেলেদুটো এরকম করতেও পারে।

সন্তু পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তিনদিকে তিনটে ঘাট আছে, তার মধ্যে একটা ঘাট বেশ বড়, থাক-থাক্ ইঁটের সিঁড়ি, দু'পাশে বসবার জায়গা।

যে-দিকটায় ঝোপঝাড়, সেই দিকটা বেশ নোংরা। বোধহয় কারখানার লোকেরা তাদের আবর্জনা এই দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে। ভাঙা কাচ, চায়ের খুরি, ময়লা ন্যাকড়া ছড়িয়ে আছে অনেক। অনেক বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে এখানে। একটা বা দুটো ছেলে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই এই ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।

এই জায়গাটার মাটি থসথসে, কাদা-কাদা। চার-পাঁচদিন আগেও যদি কেউ এ-দিকটায় এসে থাকে তাহলে তার পায়ের চিহ্ন এখনও পাওয়া যাবে। একটা বেশ বড় গর্তও রয়েছে, কেউ মাটি কেটে নিয়ে গেছে। সন্তু এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক জায়গায় একটা হলদে রঙের জামা পড়ে আছে। জামাটা দেখে খুব পুরনো বলে মনে হয় না। সন্তুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখানে একটা জামা এল কী করে ?

জামাটার খানিকটা রয়েছে ঝোপের মধ্যে, খানিকটা জলে ডুবে আছে। সন্তু পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জামাটা তুলতে যেতেই এক কাণ্ড হল।

পায়ের তলার নরম মাটি ধসে গিয়ে সন্তু হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল জলে। ভাল

সাঁতারু হয়েও সে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তার মনে হল, কুমিরের চেয়েও সাংঘাতিক কোনও জন্তু এক্ষুনি তাকে কামড়ে দেবে!

সে-রকম কিছুই হল না। প্রথম পড়ার ঝোঁকে সন্তু চলে গেল অনেকখানি জলের মধ্যে। পুকুরটা খুব খাড়া আর পিছল, পা রাখা যায় না। ডুবজল থেকে উঠে আসবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করেও তার পা হড়কে যেতে লাগল বারবার। তারপর সে সাঁতরে পারের কাছে এসে এক গোছা ঘাস মুঠো করে ধরল, অমনি সেখানকার মাটিও খসে পড়ল।

কয়েকবার এরকম চেষ্টা করার পর সন্তু উঠে এল ওপরে। জামা প্যান্ট একেবারে জবজবে ভিজে, জুতো কাদায় মাখামাখি। মাথায় শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। জামার পকেটে দু'খানা দু'টাকার নোট ছিল, সে দুটি বুঝি গেছে একেবারে।

একটা গোলমাল শুনে সন্তু মুখ তুলে তাকাল। পুকুরের ওপারে রাস্তার ধারে একদল লোক জমেছে, সবাই সন্তুকেই দেখছে আর কী যেন বলাবলি করছে। তারপর তারা দৌড়ে আসতে লাগল এদিকে।

তারা কাছাকাছি আসতেই সন্তু শুনতে পেল, কয়েকজন চেঁচিয়ে বলছে, 'মরা ছেলে ফিরে এসেছে! মরা ছেলে ফিরে এসেছে! সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালপুরীতে চলে গিয়েছিল!'

এ-কথা শুনে সন্তুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এই রে, এরা কি ভেবেছে, জলে-ডোবা দু'জন ছেলের মধ্যে সে একজন? তিন-চার দিন পর কেউ জলের তলা থেকে ফিরে আসতে পারে? এ কি রূপকথা নাকি?

লোকগুলো সন্তুকে ঘিরে ধরে এমন চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, সন্তু কোনও কথাই বলতে পারল না। অনেকেরই ধারণা, সন্তু ডুবে যাওয়া ছেলেদের একজন। কয়েকজন অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করল যে, এর পায়ে জুতো রয়েছে কেন? জুতো পরে তো কেউ সাঁতার কাটতে নামে না। তাদের বিশেষ কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। একজন বেশ গলা চড়িয়ে বলল, "আমিই তো প্রথম দেখেছি, মাঝপুকুরে ভুশ করে জল ঠেলে উঠল, তারপর সাঁতরে-সাঁতরে এই দিকে চলে এল।"

ক্রমশই বেশি ভিড় জমছে। মজা দেখবার জন্য পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির বউরাও ছুটে আসছে। কেউ বলল, 'ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, ওকে দুধ খাওয়াও!' কেউ বলল, 'পুলিশে খবর দাও!' কেউ বলল, 'খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারকে ডাকো।'

একজন বয়স্কমতন ভারিক্কি চেহারার লোক সন্তুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, তুমি সন্ধেবেলা এখানে কী করছিলে? কোথা থেকে এলে?"

সন্তু উত্তর দিতে পারল না।

লোকটি বলল, "মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। তিন দিন ধরে এই পুকুরের জল কেউ ছোঁয় না, অথচ একটা ছেলে জল থেকে উঠে এল ?"

সন্তু এবারে কোনওক্রমে বলে উঠল, "আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম !"

বয়স্ক লোকটি বিকট গলায় হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। সন্তুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। পাতালপুরীতে সন্তু কী দেখেছে, তা বলবার জন্য খোঁচাতে লাগল অনেকে। এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। সন্তুকে নিয়ে চলল থানায়।

সন্তু এসেছিল গোয়েন্দাগিরি করতে, তাকে থানায় যেতে হল চোরের মতন।

থানায় বড়বাবু ভিড় হটিয়ে একা সন্তুকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বড়বাবুর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় অল্প-অল্প টাক, দেখলে মনে হয় সিনেমার পুলিশ। তিনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, "নাও, লেট মি হিয়ার ইওর সং ! তুমি জামা-প্যান্ট-জুতো পরে পুকুরে ডুব দিয়েছিলে কেন ?"

সন্তু বলল, "বলছি, আগে এক গেলাস জল খাব !"

সন্তুর গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ। কত দুর্গম জায়গায় কত রকম বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরের মধ্যেই সে যে বিপদে পড়েছে, তার সঙ্গে আগের কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। লোকগুলো যদি তাকে মারতে শুরু করত ? থানায় এসে সে অনেক নিরাপদ বোধ করছে।

জল খাবার পর সন্তু মুখ তুলতেই বড়বাবু বললেন, "নাও, মাই বয়, আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, নাথিং বাট দা ট্রুথ..."

বড়বাবুর কথার মাঝখানেই সন্তু বলল, "আপনি স্পেশাল আই. জি. মিঃ আর. ভট্টাচার্য কিংবা ডি. আই. জি. ক্রাইম মিঃ বি. সাহাকে একবার ফোন করবেন ?"

কথা বলতে-বলতে থানার বড়বাবুর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। তিনি ভুরু নাচাতে ভুলে গেলেন।

সেই রকম অবস্থায় প্রায় এক মিনিট থেমে থেকে তিনি বললেন, "কাদের নাম বললে ? স্পেশাল আই. জি. কিংবা ডি. আই. জি ? এঁদের ফোন করব কেন ?"

সন্তু বলল, "ওঁরা দু'জনেই আমার কাকাবাবুকে চেনেন। আমাকেও চেনেন। পুলিশ কমিশনারও একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।"

বড়বাবু হাঁক দিলেন, "বিকাশ ! বিকাশ !"

আর-একজন পুলিশ অফিসার উঁকি মারতেই বড়বাবু বললেন, "ওহে বিকাশ, এ ছেলেটি যে বড়-বড় কথা বলে ! লম্বা-লম্বা পুলিশ অফিসারদের নাম করছে।"

সন্তু বলল, "আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার

পরিচয়টা জানলে আপনাদের সুবিধে হবে। সেইজন্য আমি ওঁদের ফোন করতে বলছি।"

বিকাশ নামের কালো; লম্বা চেহারার পুলিশ অফিসারটি বলল, "তোমার গল্পটা কী আগে শুনি ?"

সন্তু বলল, "ঐ পুকুরটায় নাকি দুটো ছেলে ডুবে গেছে, তাদের আর পাওয়া যায়নি, সেইজন্য আমি পুকুরটা দেখতে এসেছিলুম।"

"তারপর জামা-জুতো পরে জলে নেমে গেলে ?"

"ইচ্ছে করে নামিনি। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম।"

বড়বাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। পা পিছলে কি কেউ জলে পড়ে যেতে পারে না ?"

বিকাশ বলল, "স্যার, বাইরে অনেক লোক ভিড় জমিয়ে আছে। হৈ-হল্লা করছে। তারা এত সহজ গল্প বিশ্বাস করবে না !"

বড়বাবু রেগে উঠে বললেন, "তাদের জন্যে কি রোমহর্ষক গল্প বানাতে হবে ? মহা মুশকিল ! এ-ছেলেটি বড় বড় পুলিশ অফিসারদের নাম করছে, যদি সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চেনা থাকে ? ফোন করো ! ফোন করো ! ওহে খোকা, কী নাম তোমার ?"

সন্তু বলল, "আমার কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তাঁর নাম বলুন। আমাকে সন্তু নামে উনি চিনবেন।"

ফোনে ঐ দু'জনের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বড়বাবুর মুখের চেহারাটাই বদলে যেতে লাগল। চোখ দুটো হল গোল-গোল আর ভুরুদুটো উঠে গেল অনেকখানি।

তিনি বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ ? কী বলছেন স্যার ? বিখ্যাত ? অ্যাডভেঞ্চার করে ? ওদের নিয়ে বই লেখা হয়েছে ? না স্যার, আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না, বই পড়ার সময় পাব কখন ! হ্যাঁ। ছেলেটি আমার সামনেই বসে আছে...আপনাকে দেব, কথা বলবেন ?"

স্পেশাল আই. জি. সাহেব টেলিফোনে হাসতে-হাসতে বললেন, "কী হে সন্তু, তিলজলার পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন ? ওখানে কি গুপ্তধন আছে নাকি ?"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, মানে এমনিই। পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটছিলুম, হঠাৎ পা পিছলে..."

"হঠাৎ ঐ পুকুরটার ধার দিয়েই বা হাঁটতে গেলে কেন ? তুমি কি একা-একাই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ নাকি ?"

"না, এমনিই বেড়াতে এসেছিলুম এদিকে..."

এরপর বড়বাবু থেকে শুরু করে থানার সমস্ত লোক দারুণ খাতির করতে লাগল সন্তুকে। বাইরের ভিড় হটিয়ে দেওয়া হল। সন্দেশ-রসগোল্লা-শিঙাড়া

এসে গেল সন্তুর জন্য। সন্তু খেতে চায় না, তবু ওঁরা ছাড়বেন না।

তারপর পুলিশের গাড়ি সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে এল তাদের বাড়ির কাছাকাছি।

সন্তুর মনটা তবু খুব খারাপ হয়ে রইল। লজ্জাও করছে খুব। প্রথমবারেই এরকম ব্যর্থতা। ছি ছি ছি!

বাড়িতে পৌঁছেই সন্তু দেখল একজন অপরিচিত লোক বসে আছেন তাদের বসবার ঘরে। বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

ভিজে জামা-কাপড় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই সন্তু পাশের বারান্দা দিয়ে সুট করে উঠে যাচ্ছিল ওপরে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, "কে রে? সন্তু নাকি? এদিকে আয়...শুনে যা!"

"আসছি", বলেই সন্তু এক দৌড়ে চলে গেল ওপরে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট বদলে আবার নীচে নেমে এল।

বাবা বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই ভদ্রলোক তোর জন্য কখন থেকে বসে আছেন! দ্যাখ, রাজা তোর নামে চিঠি পাঠিয়েছে।"

সন্তু তাড়াতাড়ি কাকাবাবুর চিঠিটা নিয়ে খুলল। চিঠিটা এসেছে দিল্লি থেকে। কাকাবাবু লিখেছেন:

স্নেহের সন্তু,

একটা কাজের জন্য দিল্লি এসেছিলাম। দু' চারদিনের মধ্যেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরশু থেকে খুব জ্বরে পড়ে গেছি। বেশ কাবু করে দিয়েছে। কাজটা শেষ না করে ফিরে যেতে চাই না। ভেবেছিলাম এবার তোর সাহায্যের কোনও দরকার হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তোকে সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। দিন দশেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে এলে কি তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে? দাদা আর বৌদিকে জিজ্ঞেস করবি। যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, তাহলে আগামীকালই চলে আসতে হবে। যে ভদ্দরলোকের হাতে চিঠি পাঠাচ্ছি, তিনিই প্লেনের টিকিট পৌঁছে দেবেন। দিল্লি এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য লোক থাকবে। দাদাকেও আলাদা চিঠি দিলাম। ইতি

কাকাবাবু

পুনশ্চ: তোর একটা পাসপোর্ট করানো হয়েছিল, মনে আছে? সেটা সঙ্গে নিয়ে আসবি।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই সন্তু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এতক্ষণের মনখারাপ আর লজ্জা এক নিমেষে কোথাও উধাও হয়ে গেল।

বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, "হ্যাঁ, চলে যা! অসুখে পড়েছে, একা-একা আছে! কী অসুখ সে-কথাও লেখেনি!"

আগন্তুকটি বললেন, "আমি তাহলে টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখছি। কাল বিকেলের ফ্লাইটে..."

ওপরে এসে সন্তু কাকাবাবুর চিঠিখানা যে কতবার পড়ল তার ঠিক নেই। অতি সাধারণ চিঠি, তবু দুটো জিনিস বোঝা গেল না। কাকাবাবু কোন্ কাজে দিল্লি গেছেন? আর পাসপোর্ট নেবার কথা লিখলেন কেন? দিল্লি যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না।

॥৩॥

প্লেনে চড়া সন্তুর পক্ষে নতুন কিছু নয়, তবে আগে কখনও সে একা কোথাও যায়নি। এয়ারবাস-ভর্তি লোক, একজনও সন্তুর চেনা নয়। বেশ কয়েকজন বিদেশিও রয়েছে।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু একটা বই এনেছে সঙ্গে, কিন্তু বই পড়ায় মন বসছে না। সে যাত্রীদের লক্ষ করছে। বিমানটা আকাশে ওড়ার খানিক পরেই অনেকে সিট বেল্ট খুলে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কারুর কারুর ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় প্লেনে চড়া তাঁদের কাছে একেবারে জলভাত। মিনিবাসে চেপে রোজ অফিসে যাবার মতন প্লেনে চেপে রোজ দিল্লি বা বোম্বে যান।

কয়েকদিন আগেই শ্রীনগরে একটা প্লেন হাইজ্যাকিং হয়েছে। এয়ারপোর্টে বাবা এসেছিলেন সন্তুকে পৌঁছে দিতে, তিনি বারবার ঐ কথা বলছিলেন। বাবা ভয় পাচ্ছিলেন, হঠাৎ যদি প্লেনটা হাইজ্যাকিং হয়ে কোনও বিদেশে চলে যায়, তাহলে সন্তু একা-একা কী করবে!

সন্তুর কিন্তু হাইজ্যাকিং সম্পর্কে মোটেই ভয় নেই। বরং মনে-মনে একটু ইচ্ছে আছে, সেরকম একটা কিছু হলে মন্দ হয় না! এখন সে যাত্রীদের মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ কি হাইজ্যাকার হতে পারে? বাথরুমের কাছে তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মধ্যে দু'জনের মুখে দাড়ি, একজন পরে আছে একটা চামড়ার কোট। ওরা যে-কোনও মুহূর্তে রিভলভার বার করতে পারে। চোখের দৃষ্টিও বেশ সন্দেহজনক!

আধঘণ্টার মধ্যেও কিছুই হল না। সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। পাতলা-পাতলা মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি ভাবলেই মনটা কী রকম যেন হাল্‌কা লাগে।

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কিছু একটা ঘোষণা হতেই সে দারুণ চমকে উঠল। তাহলে কি এবারে শুরু হল নাটক?

না, সেসব কিছু না। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সবাইকে সিটবেল্ট বেঁধে নিজের নিজের জায়গায় বসতে। বাইরে ঝড় হচ্ছে।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে সেই সন্দেহজনক চরিত্রের তিনটি ছেলেকে দেখতে পেল না! জানলা দিয়ে তাকালেও বাইরে ঝড় বোঝা যায় না।

শেষ পর্যন্ত প্লেন হাইজ্যাকিংও হল না, ঝড়ের জন্য কিছু বিপদও ঘটল না। বিমানটি নিরাপদে এসে পৌঁছল দিল্লিতে।

প্লেন থেকে নেমে সন্তু লাউঞ্জে এসে দাঁড়াবার একটু পরেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা একজন লোক এসে বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

সন্তু একটু অবাক হল। লোকটিকে সে চেনে না। লোকটি তার নামও জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু লোকটি এমন জোর দিয়ে বলল কথাটা যে, অমান্য করা যায় না। সন্তু চলল তার পিছু-পিছু।

লোকটি একেবারে এয়ারপোর্টের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সন্তু বলল, "আমার সুটকেস ? সেটা নিতে হবে যে !"

লোকটি বলল, "হবে। সব ব্যবস্থা হবে।"

বাইরে আর-একজন লোককে আঙুলের ইশারায় ডেকে সেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা লোকটি বলল, "একে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাও, আমি ওর সুটকেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি !"

সন্তু এবারে বলল, "দাঁড়ান,আপনারা কার কাছ থেকে এসেছেন ? আমার নাম কি আপনারা জানেন ?"

প্রথম লোকটি এবারে মুখ ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখে নিয়ে বলল, "নাম-টাম বলার দরকার নেই। তোমাকে তোমার কাকাবাবুর কথামতন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। চট করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ো।"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু আর আপত্তি করল না। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে গিয়ে একটা ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসল। একটুক্ষণের মধ্যেই সুটকেসটা দিয়ে গেল একজন, গাড়িটা স্টার্ট নিল।

অনেকদিন আগে কাশ্মীর যাওয়ার পথে সন্তুরা দিল্লিতে নেমেছিল একদিনের জন্য। সেবারে দিল্লি ভাল করে দেখা হয়নি। দিল্লিতে কত কী দেখার আছে। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে, রাস্তার দু'পাশে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না।

গাড়িতে যে লোকটি সঙ্গে চলেছে, সে একটাও কথা বলেনি সন্তুর সঙ্গে। বাঙালি কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সন্তু নিজে থেকে যেচে কথা বলতে পারে না অপরিচিত লোকের সঙ্গে। সে-ও চুপ করে রইল। কিন্তু একটু যেন অস্বাভাবিক লাগছে। সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যেন তাড়াহুড়া করে নিয়ে আসা হল তাকে। পাইলটের মতন পোশাক পরা লোকটা কী করে চিনল সন্তুকে ? সে কেন বলল, কোনও নাম বলার দরকার নেই ?

অনেক রাস্তা ঘুরে, একটা আলো-ঝলমলে পাড়ার মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। গাড়ির চালক নিজে না নেমে বলল, "আপ উতরিয়ে !"

সন্তু গাড়ি থেকে নামতেই গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, আমার সুটকেস !"

বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "আপ অন্দর আইয়ে !"

সন্তু বলল, "হামারা সুটকেস লেকে ভাগ গিয়া !"

লোকটি হেসে বলল, "ফিক্‌র মাত কিজিয়ে, সুটকেস পৌঁছে জায়গা !"

লোকটির হাসির মধ্যে যথেষ্ট ভরসা আছে। তাই সন্তু আর কিছু না বলে চলে এল ওর সঙ্গে। লিফ্‌টে পাঁচতলায় পৌঁছে লোকটি একটা ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা মারল।

দরজা যিনি খুললেন, তাঁকে দেখে সন্তুর মুখটা খুশিতে ভরে গেল। যাক, তা হলে ঠিক জায়গাতেই আনা হয়েছে। আর সুটকেসের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

ছিপছিপে লম্বা লোকটির নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে সি. বি. আই-এর একজন বড়কর্তা। কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সন্তুকেও ইনি ভালই চেনেন। এই তো গত বছরেই ত্রিপুরায় ইনি এসেছিলেন কাকাবাবুকে সাহায্য করতে। নরেন্দ্র ভার্মা কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে বাংলা মোটামুটি ভালই জানেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এসো, সনটু ! কেমুন আছ ? রাস্তায় গোলমাল হয়নি তো কিছু ? টায়ার্ড ?"

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "না, একটুও টায়ার্ড নই। আপনি ভাল আছেন তো ?"

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, "ভাল কী করে থাকব ? তোমার আংক্‌ল দিল্লিতে এসে এমুন ঝোন্‌ঝাট বাধাল, অথচ আমি কিছুই জানি না ! আমাকে আগে কোনও খবরই দেয়নি ! এসব কী বেপার বলো তো ?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সে তো কিছুই জানে না।

ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু কোথায় ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এখানে নেই। সেইফ জায়গায় আছে। আচ্ছা সনটু, তুমি বলো তো, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভ্‌স। তোমার এই কাকাবাবুর কখানা জীবন ?"

"কেন, কী হয়েছে আবার ?"

"আরে ভাই, ডেলহিতে আসবার আগে আমাকে একটা চিট্‌ঠি দিল না, এখানে এসে ভি খবর দিল না। আমি খবর পেলাম মার্ডার অ্যাটেম্‌ট হবার পর ?"

"অ্যাঁ ? মার্ডার অ্যাটেম্‌ট ? কার ওপর ?"

"তোমার কাকাবাবুর ওপর ! আবার কার ওপর ? কেন, তোমাকে চিট্‌ঠি লেখেননি ?"

"চিঠিতে তো লিখেছেন, ওঁর জ্বর হয়েছে !"

"হাঁ হাঁ, তা তো লিখবেনই। আসল কথা লিখলে তোমার মা-বাবা বহোত দুশ্চিন্তা করতেন তো! এবারে বড় রকম ইনজুরি হয়েছে, খুব জোর বেঁচে গেছেন!"

"আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই।"

"তা হবে না। তোমার কাকাবাবুই বলেছেন, তোমাকে সাবধানে রাখতে। কারা মারল তা তো বোঝা গেল না। তোমার কাকাবাবুর অনেক এনিমি, তবে কে হঠাৎ দিল্লিতে এসে মারতে যাবে? রায়চৌধুরী আমাকে বলল, তোমাকেও সাবধানে রাখতে। তোমার ওপর অ্যাটেম্‌ট হতে পারে। রায়চৌধুরীর ওঁপর ভি ফিন্ অ্যাটাক হতে পারে...।"

সন্তুর কাঁধে হাত রেখে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বেশি চিন্তা কোরো না। এখন ভাল আছেন কাকাবাবু। এবারে বলো তো, কী কেস নিয়ে এসেছেন দিল্লিতে?"

সন্তু বলল, "আপনি জানেন না, আমি জানব কী করে? আমায় তো কিছুই বলেননি।"

"গভর্নমেন্টের কোনও কেস হলে আমি ঠিকই জানতুম। সে সব কিছু না। শুনলাম কী, একজন আরবের সঙ্গে তোমার কাকাবাবুর খুব দোস্তি হয়েছে।"

"আরব?"

"হ্যাঁ। মিড্‌ল ইস্টের কোনও দেশের লোক। লোকটাকে আমি দেখিনি এখনও। রায়চৌধুরীও কিছু ভাঙছে না আমার কাছে। বলছে, ই সব তোমাদের গভর্নমেন্টের কিছু বেপার নয়।"

"কলকাতাতেও কাকাবাবুর কাছে একজন লোককে আসতে দেখেছি। যাকে দেখে সাহেবও মনে হয় না। ভারতীয়ও মনে হয় না।"

"প্রোবাব্‌লি দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যান। লোকটাকে ধরতে হবে। কোন্ চক্করে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তোমার কাকাবাবুকে।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেছে। দিল্লিতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না, এটা সে চিন্তাই করতে পারেনি।

সে জিজ্ঞাসা করল, "নরেন্দ্রকাকা, আমি কি এখানেই থাকব নাকি?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, একঘণ্টা বাদ তোমাকে আর এক গেস্টহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখতে হবে কি, তোমায় কেউ ফলো করছে কি না। অন্য গেস্টহাউসে তোমার সুটকেস পেয়ে যাবে।"

"কাকাবাবুর সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলা যায় না?"

"আজ অসুবিধে আছে। কাল হবে। আজ রাতটা ঘুমোও।"

ঘণ্টাখানেক বাদে সন্তুকে আবার আর একটি গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি বাড়িতে। এটা একটা মস্ত বড় গেস্টহাউস। অনেক লোকজন। নরেন্দ্র ভার্মা নিজে সন্তুকে দিয়ে গেলে একটি ঘরে। সেখানে

আগে থেকেই তার সুটকেস রাখা আছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার রাতের খাবার এই ঘরেই এসে যাবে। আর কিছু লাগলে বেল বাজিয়ে ডাকবে বেয়ারাকে। পয়সার চিন্তা কোরো না। আর, আজ রাতটা একলা বাইরে যেও না!"

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর সন্তু বিছানার ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটা অচেনা জায়গায় সে একদম একা। কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

গতকাল প্রায় এই সময় সন্তু তিলজলার কাছে একটা থানায় বসেছিল, আর আজ সে দিল্লিতে একটা গেস্টহাউসে। আগামীকাল আবার কী হবে কেউ বলতে পারে না।

রাত্তিরটা এমনিই কেটে গেল। ভাল ঘুম হয়নি সন্তুর, সারা রাত প্রায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে এল বাইরে।

এখনও অনেকেই জাগেনি। বাড়িটার সামনের বাগানে অনেক রকম ফুল। গেটের বাইরে খুব চওড়া একটা রাস্তা। খুব সুন্দর একটা সকাল, কিন্তু সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে আছে।

সন্তু বড় রাস্তাটায় খানিকটা হেঁটে বেড়াল। বেশি দূর গেল না। দিল্লির রাস্তা সে কিছুই চেনে না।

নরেন্দ্র ভার্মা এলেন ন'টা বাজার খানিকটা পরে। সন্তু তখন নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। এখানে ব্রেকফাস্টে অনেক কিছু দেয়, ফলের রস, কর্নফ্লেকস, দুধ আর কলা, টোস্ট আর ওমলেট, আর একটা সন্দেশ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী সন্তু, ইউ আর ইন ওয়ান পিস? কেউ তোমাকে গুলি করেনি কিংবা কিডন্যাপ করার চেষ্টাও করেনি?"

সন্তু বলল, "কেউ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "চলো, তৈয়ার হয়ে নাও। রাজা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

সন্তুর তৈরি হয়ে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

দিনের আলোয় দিল্লি শহরটাকে ভালভাবে দেখল সন্তু। রাস্তাগুলো যেমন বড় বড়, তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দু'পাশে বড়-বড় বাড়ি। দিল্লির নাম শুনলেই সন্তুর মনে পড়ে লালকেল্লা আর কুতুব মিনারের কথা। কিন্তু সে-দুটো দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা প্রকাণ্ড, গোলমতন বাড়ি দেখে সন্তু চিনতে পারল। ছবিতে অনেকবার দেখেছে, ওটাই পার্লামেন্ট ভবন।

নরেন্দ্র ভার্মার গাড়ি এসে থামল একটা নার্সিং হোমের সামনে। তিনতলার একটা ক্যাবিনের দরজা খুলতেই কাকাবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর পেট আর বাঁ হাত জড়িয়ে মস্ত বড় ব্যাণ্ডেজ। মুখে

কিন্তু বেশ হাসিখুশি ভাব। ক্যাবিনটা বেশ বড়, হোটেলের সুইটের মতন। সামনের দিকে বসবার জায়গা, দুটি সোফা ও দুটি চেয়ার রয়েছে, পেছন দিকে খাট আর একটা ছোট টেবিল। কাকাবাবু বসে আছেন একটা সোফায়, অন্যটিতে বসে আছেন একজন লম্বামতন লোক। সন্তু চিনতে পারল, এই লোকটিকেই কলকাতায় তাদের বাড়িতে কয়েকদিন আসতে দেখেছে। এঁরা দু'জনে মনোযোগ দিয়ে কী যেন আলোচনা করছিলেন। সন্তুদের দেখে থেমে গেলেন।

কাকাবাবু সন্তুকে ডেকে বললেন, "আয় সন্তু, কাল রাত্তিরে তোর একা থাকতে খারাপ লাগেনি তো ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দু'জন গার্ড পোস্টেড ছিল ওর ঘরের দিকে নজর রাখার জন্য, সন্তু তা টেরই পায়নি।"

সন্তু বেশ অবাক হল। সত্যি সে কিছু বুঝতে পারেনি তো !

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু হবে না। আমাকে কোনও উটকো ডাকাত মারতে এসেছিল বোঝা যাচ্ছে। এটা কোনও দলের কাজ নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উট্‌কো ? উট্‌কো কথাটার মানে কী আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই, সাধারণ একটা কেউ।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে গুলি করে পালাল, ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিল না, এ কি সাধারণ ডাকাত ?"

অপরিচিত লোকটি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। এবারে মুখ তুলে বললেন, "আই ফিল গিল্‌টি !"

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, "না, না, আপনার কোনও দায়িত্ব নেই। আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি !"

তারপর সন্তুদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন... এঁর নামটা মস্ত বড়, সবটা বললে মনে থাকবে না, সবাই এঁকে আল মামুন বলে ডাকে। ইনি একজন ব্যবসায়ী।"

ভদ্রলোক সন্তুর দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, "গুড মর্নিং, হাউ ডু ইউ ডু ?"

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আই মাস্ট গো ! মিস্টার রায়চৌধুরী, আই উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ !"

বেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্ট মনে হল, ওঁর মুখে যেন একটা ভয়ের ছাপ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন, তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই অমনভাবে তাকাচ্ছিস কেন ? এই ব্যাণ্ডেজটা দেখতেই এত বড়, আসলে বিশেষ কিছু হয়নি। পাঁজরা ঘেঁষে একটা গুলি চলে গেছে, কিন্তু পাঁজরা-টাজরা ভাঙেনি কিছু। ব্যাটারা কেন যে এরকম

এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ! টিপ করতেই শেখেনি !”

সন্তু একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। পেটে গুলি লেগেছে, তা নিয়েও কাকাবাবু ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারেন !

নরেন্দ্র ভার্মা তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন, “আমার লোক লাগিয়ে দিয়েছি, তোমার পাখি কোন্ বাসায় থাকে তা ঠিক জেনে আসবে।”

কাকাবাবু হাসলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এবারে সব খুলে বলো তো রাজা ! তুমি আমার ওপরেও ধোঁকা চালাচ্ছ ? আমাদের না জানিয়ে ও লোকটার সঙ্গে তোমার কিসের মামলা ?”

কাকাবাবু সে-রকমই হাসতে হাসতে বললেন, “আরে সেরকম কিছু না। এর মধ্যে কোনও ক্রাইম বা ষড়যন্ত্র বা বড় ধরনের রহস্যের ব্যাপার নেই। ওই লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল, তাই আমি কৌতূহলী হয়ে এসেছি দিল্লিতে।”

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, “ক্রাইম কিছু নেই ? তবে গুলিটা চালাল কে ?”

কাকাবাবু বললেন, “সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। আমি যেজন্য দিল্লিতে এসেছি তার সঙ্গে এর হয়তো কোনও সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে। আচ্ছা, আমি সব বুঝিয়ে বলছি, সুস্থির হয়ে বোসো।”

সন্তুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুই জানিস, হিয়েরোগ্লিফিক্স কাকে বলে ?”

সন্তু বলল, “হ্যাঁ !”

কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা দু'জনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, “অ্যাঁ ? তুই জানিস ? বল তো কাকে বলে ?”

সন্তু বলল, “হিয়েরোগ্লিফিক্স হচ্ছে এরকম ছবির ভাষা। মিশরের পিরামিডে কিংবা অন্য-সব স্মৃতিস্তম্ভে ছবি এঁকে এঁকে অনেক কথা লেখা হত !”

“অনেকটাই ঠিক বলেছিস। এ তুই কোথা থেকে শিখলি ?”

“একটা কমিক্সে পড়েছি।”

“তা হলে তো কমিক্সগুলো যত খারাপ ভাবতুম তত খারাপ নয় !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তুমি যে শব্দটা বললে, আমি নিজেই তো তার মানে জানতুম না।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে তুমিও কমিক্স পড়তে শুরু করে দাও ! আচ্ছা, এবার তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। এই যে আল মামুন নামে ভদ্রলোককে দেখলে, ইনি কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছিলেন। একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চান। উনি কয়েকটা লম্বা-লম্বা হলদে কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে লাল রঙের অনেক ছোট-ছোট ছবি

আঁকা। দেখলে মনে হয়, যে এঁকেছে, তার আঁকার হাত খুবই কাঁচা, এবং খুব সম্ভবত একজন বুড়ো লোক। আল মামুন বলেছেন, ঐ ছবিগুলো এঁকেছেন তাঁর এক আত্মীয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই ছবিগুলো, ঐ যে কী নাম বললে, সেই ভাষায় লেখা?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্স!"

কাকাবাবু হাহা করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে এই ভাষা। এখন কি আর এই ভাষায় কেউ লেখে? লিখলেও বুঝতে হবে সে-লোকটি পাগল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিগুলো তোমার কাছে নিয়ে যাবার মানে কী? তুমি কি ঐ ভাষার একজন এক্সপার্ট?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলতে পারো। এক সময় আমি ঐ নিয়ে চর্চা করেছি। তোমার মনে নেই, নরেন্দ্র, বছর দশেক আগে আমি টানা ছ' মাস ইজিপ্টে ছিলাম? মিশরের সব হিয়েরোগ্লিফিক্সের পাঠ আজও উদ্ধার করা যায়নি। অনেকেই চেষ্টা করছেন। আমি কিছু-কিছু পড়তে পারি। এ সম্পর্কে আমার লেখা কয়েকটা প্রবন্ধও বিদেশি কাগজে বেরিয়েছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা জানতে চাইলেন, "ঐ আল মামুন কোন্ দেশের লোক?"

"ইজিপশিয়ান। ব্যবসা সূত্রে প্রায়ই আসতে হয় এদেশে। এখান থেকে উনি চা, সেলাইকল, সাইকেল, এইসব জিনিস নিয়ে যান নিজের দেশে।"

"তা একজন ব্যবসায়ীর এরকম ইতিহাসে উৎসাহ?"

"সেটাও একটা মজার ব্যাপার। ঐ ভদ্রলোক প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ছবিগুলো বোধহয় ইজিপ্টের কোনও পিরামিডের দেয়াল থেকে কপি করা। কিন্তু তা-ও নয়। আল মামুন কোনও দিন পিরামিড চোখেও দেখেননি!"

"অ্যাঁ? ইজিপ্টের লোক অথচ পিরামিড দেখেনি!"

"এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভারতবর্ষে সব লোক কি তাজমহল দেখেছে? হিমালয়ই বা দেখেছে ক'জন? আল মামুন দূর থেকে হয়তো একটা দুটো পিরামিড দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু ভেতরে কখনও যাননি। উনি বলছেন যে, এই দিল্লিতেই ওঁর এক আত্মীয় থাকেন, ছবিগুলো তিনি এঁকেছেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "ধেত্! কী তুমি সব ছবি-টবির কথা বলছ, কোন্ বুড়ো কী এঁকেছে, তাতে আমি কোনও আগ্রহ পাচ্ছি না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই তো তোমাকে আগে এসব বলতে চাইনি।"

"কিন্তু এর সঙ্গে তোমাকে মার্ডার করার সম্পর্ক কী? মানে বলছি কী, তোমাকে হঠাৎ কেউ মারতে এল কেন?"

"সম্পর্ক একটাই থাকতে পারে। আল মামুন ঐ ছবিগুলোর অর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা হু-ই-ই করে শিস দিয়ে উঠে বললেন, "এক লাখ টাকা? কয়েকটা ছবি পড়ে দেবার জন্য? কী আছে ঐ ছবির মধ্যে? তুমি মানে বুঝেছিলে?"

"আগে আর-একটা ব্যাপার শোনো। আল মামুনের ওই যে আত্মীয়, তাঁর নাম মুফ্তি মহম্মদ। তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি, তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তাঁর বয়েস নাকি সাতানব্বই, শরীর বেশ শক্তসমর্থ। শুধু গত বছর থেকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে দিল্লিতে।"

"সাতানব্বই বছর বয়েস? তার আবার চিকিৎসা?"

"এটা দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী-ফকিররা অনেক বাঁচেন। তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সাধক মুফ্তি মহম্মদের শুধু কথা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকছেন?"

"আল মামুনের মুখে যা শুনেছি, উনি লিখতে জানেন না। আগে কখনও ছবিও আঁকেননি। মুসলমান সাধকেরা কেউ ছবি আঁকেন না। ইনি ছবি এঁকেছেন ঘুমের ঘোরে।"

"অ্যাঁ? কী গাঁজাখুরি গল্প শুরু করলে রাজা?"

"আর-একটু ধৈর্য ধরে শোনো, নরেন্দ্র। আমি যা শুনেছি, তা-ই বলছি। ধর্মীয় গুরু বলে মুফ্তি মহম্মদকে হাসপাতালে রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে আলাদা একটা বাড়িতে। এক-একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ঐ ছবিগুলো আঁকছেন।"

"হলদে কাগজে, লাল কালিতে? ঘুমের মধ্যে তিনি সে-সব পেলেন কোথায়?"

"লাল কালি নয়, লাল পেন্সিল। উনি যে ঘরে থাকেন, তার পাশের ঘরের টেবিলে অনেক রকম কাগজ আর পেন্সিল থাকে। সেটা আল মামুনের অফিস-ঘর। মুফ্তি মহম্মদ সাহেব ঘুমের মধ্যেই পাশের ঘরে উঠে এসে, বেছে বেছে হলদে কাগজ আর লাল পেন্সিলে ছবিগুলো আঁকছেন। ছবিগুলো যে হিয়েরোগ্লিফিক্সেরই মতন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিছু কিছু পরিষ্কার অর্থ পাওয়া যায়।"

"কী মানে বুঝলে?"

"সেটা এখন বলা যাবে না। খুব গোপন ব্যাপার। সাধক মুফ্তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছেন। আল মামুন তাঁদের কিছু জানাতে চান না। গুরুদেব কী লিখছেন সেটা তিনি নিজে আগে জেনে নিতে চান।"

"সেইজন্য দিতে চান এক লাখ টাকা? উনি কি ভাবছেন, এটাই গুরুর

বিষয়-সম্পত্তির উইল ?"

"গুরুর উপদেশও অনেকের কাছে খুব মূল্যবান।"

"তুমি তবে এক লাখ টাকা পেয়ে গেছ, আর টাকার লোভেই দুশমন তোমাকে গুলি করতে এসেছিল ?"

"সেই টাকা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ঐ কাগজে কী লেখা হয়েছে, তা আমি আল মামুনকে বলিনি এখনও !"

"বলোনি ? ওকেও বলোনি কেন ?"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "এক লাখ টাকা দিতে চায়, তবু ওকে তুমি দু'চারটা ছবির মানে বলে দাওনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ওকে কিছু বলিনি, তার কারণ আমি আল মামুনের কোনও কথা বিশ্বাস করিনি।"

সন্তু এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করে শুনছিল, এবারে সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। টাকার লোভে কাকাবাবু কোনও কাজ করবেন, তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "ওই ছবির ভাষা থেকে আমি বুঝেছি, তা এখনকার কোনও ব্যাপারই নয়। অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। তাও শেষ হয়নি। আমি পেয়েছি মাত্র চারখানা হলদে কাগজ। এর পরে যেন আরও আছে। সেইজন্য আমি আল মামুনকে বলেছিলুম, আমি গুরু মুফ্‌তি মহম্মদকে নিজের চোখে দেখতে চাই। সেইজন্যই আমার দিল্লি আসা।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "দেখা হয়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। এতদিন দিল্লি এসে বসে রইলুম, তবু আল মামুন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন না। কখনও বলেন যে, ওঁর গুরুর মেজাজ ভাল না থাকলে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান না। আবার কখনও বলেন যে, অন্য শিষ্যরা সব সময় ঘিরে থাকে, সেইজন্য সুযোগ হচ্ছে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার ঐ আল মামুন কোথায় থাকে আমি আজই জেনে যাচ্ছি। আমি ওকে ফলো করার জন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছি। এবারে বলো, তোমার ওপর যে-লোকটা গুলি চালাতে এসেছিল, সে লোকটা কেমন ? সেও কি পরদেশি ? তার মুখ তুমি নজর করেছিলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মুখ দেখেছি, কিন্তু একপাশ থেকে। আমার ধারণা সে একটা ভাড়াটে খুনি। কেউ তাকে টাকা দিয়ে বলেছে আমাকে সাবাড় করে দিতে। দ্যাখো, আমার ওপর অনেকের রাগ আছে। কত পুরনো শত্রু আছে। তাদেরই কেউ দিল্লিতে আমায় চিনতে পেরে খতম করে দিতে চেয়েছে। ও

ঘটনায় গুরত্ব দেবার কিছু নেই !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তুমি কী বলছ, রাজা ?” একটা লোক তোমাকে খতম করে দিতে এসেছিল, আর তাতে কোনও গুরুত্ব নেই ? তাজ্জব ! লোকটা যদি আবার আসে ? শুনেছ সন্টু, তোমার কাকাবাবু কেমুন ছেলেমানুষের মতন কথা বলেন !”

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, “আরে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে তো কোনও কাজই করা যায় না।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “লোকটা কি রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে এসে গুলি করেছিল ?”

কাকাবাবু বললেন, “তখন রাত বেশি না, এগারোটা হবে বড়জোর। হোটেলের ঘরে বসে আমি পড়াশুনো করছিলাম। ঘরের পাশেই একটা ছোট বারান্দা, তার দরজাটা খোলা। একটা শব্দ হতেই চোখ তুলে দেখি যে, বাইরে থেকে বারান্দায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে এল। তার হাতে রিভলভার। আমারও বালিশের তলায় রিভলভার থাকে, তুই জানিস। কিন্তু আমি বসে ছিলাম বালিশটা থেকে বেশ দূরে। হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার সময় পেলাম না। লোকটা এসেই কোনওরকম কথাবার্তা না বলে রিভলভার তুলল আমার কপাল লক্ষ করে। যদি টিপ করে গুলি চালাত, তা হলে আমি সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতাম। তখন বাঁচার একটাই উপায়। আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে বললুম, “ব্লাডি ফুল ! লুক বিহাইণ্ড !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “কপালের সামনে রিভলভারের নল দেখেও তুমি চিৎকার করতে পারলে ? তোমার নার্ভ আছে বটে !”

কাকাবাবু বললেন, “আমি আগেও অনেকবার এই রকম চেঁচিয়ে সুফল পেয়েছি। হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হলে পাকা-পাকা শিকারিদেরও টিপ নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তাই হল। আমার ধমক শুনে লোকটার হাত কেঁপে গেল একটু, তার গুলি লাগল আমার পাঁজরায়। আমি সাঙ্ঘাতিক আহত হবার ভান করে ঝাঁপিয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের তলা থেকে রিভলভার বার করে এনেছি। লোকটাকে আমি তখন গুলি করতে পারতুম। কিন্তু আমি দেখতে চাইলুম লোকটা এর পর কী করে ! কোনও জিনিসপত্তর নিতে চায় কি না। লোকটা কিন্তু আর কিছু করল না। সে ভাবল বোধহয় যে, একটা গুলি চালিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আবার টপ করে বারান্দা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “হাঁ, ভাড়াটে খুনি বলেই মালুম হচ্ছে। দিল্লিতে এরকম অনেক আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে ওকে ভাড়া করেছিল, সে ওকে পুরো টাকা দেয়নি। এত কাঁচা কাজের জন্য ওর পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া

উচিত নয়।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “লোকটা সাকসেসফুল হয়নি বলে তোমার আফসোস হচ্ছে মনে হচ্ছে!”

কাকাবাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন। নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে লাগলেন।

এই সময় বাইরের রাস্তায় একটা হৈচৈ আর দুমদাম শব্দ হতে লাগল। সন্তু চলে এল জানলার কাছে।

কী যেন একটা কাণ্ড হয়েছে রাস্তায়। লোকজন ছোটাছুটি করছে। একটা বাসে আগুন লেগে গেছে।

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে এসে উঁকি দিয়ে বললেন, “ওঃ! এমন কিছু নয়। বাস বোধহয় একটা লোক চাপা দিয়েছে, তাই পাবলিক রেগে গিয়ে বাসটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! এসব তোমাদের ক্যালকাটাতে আগে হত, এখন আমদানি হয়ে গেছে দিল্লিতেও!”

॥ ৪ ॥

সেদিন দিল্লি শহরের অনেক রাস্তাতেই খুব গণ্ডগোল, মারামারি চলল। পরের দিন কারা যেন ডেকে বসল হরতাল। বাস, ট্যাক্সি, অটো রিকশা সব বন্ধ। সকালের দিকে কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি বেরুলেও লোকেরা বন্ধ করে দিল ইট-পাটকেল মেরে। দিল্লির চওড়া-চওড়া রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা।

এত বড় একটা ব্যস্ত শহরকে দিনের বেলা একেবারে শুনশান দেখলে কেমন অদ্ভুত লাগে!

আগের রাত্তিরে সন্তু ফিরে এসেছিল গেস্ট হাউসে। সকাল থেকে সে ছটফট করছে। কী করে সেই নার্সিংহোমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? গাড়ি বন্ধ বলে নরেনকাকাও আসতে পারবেন না। সন্তু যে রাস্তা চেনে না। না হলে সন্তু হেঁটেই চলে যেতে পারত।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্তু আর থাকতে পারল না, বেরিয়ে পড়ল। সন্তু জানে, হরতালের দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ কিছু বলে না। কয়েকটা সাইকেলও চলছে।

বেশিদূর যেতে হল না, একটু পরেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সন্তুর পাশে। ড্রাইভারের পাশ থেকে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “উঠে পড়ো সন্টু! একেলা কোথা যাচ্ছিলে?”

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল নার্সিং হোমে।

কাকাবাবু খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, “এসেছ? আমি ভাবছিলাম যে কী করে আসবে! শোনো নরেন্দ্র, রফি মার্গ কোথায়? এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায়?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “রফি মার্গ? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এটা

চিত্তরঞ্জন পার্ক আর রফি মার্গ সেই কনট প্লেসের কাছে। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব!"

কাকাবাবু বললেন, "নেপোলিয়ন কী বলেছিলেন জানো না? অসম্ভব বলে কিছু নেই তাঁর ডিক্‌শনারিতে।"

"সেটা নেপোলিয়নের বেলা সত্যি হতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কী ব্যাপার, তুমি রফি মার্গ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাও নাকি?"

"হ্যাঁ। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

কাকাবাবু উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, নরেন্দ্র ভার্মা বাধা দিয়ে বললেন, "আরে, ঠারো, ঠারো! হঠাৎ রফি মার্গ হেঁটে যেতে হবে কেন সেটা শুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আল মামুন ফোন করেছিল একটু আগে।"

"তোমার এ-ঘরে তো ফোন নেই?"

"দোতলায় আছে। সেখানে নেমে গিয়ে আমি ফোন ধরেছি।"

"এখনও তোমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যায় করেছ। যাই হোক, তারপর কী বলল, টেলিফোনে?"

"গুরু মুফ্‌তি মহম্মদ আবার ঘোরের মাথায় ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আজ আর ওখানে কোনও লোকজন নেই। আমরা এখন গেলে দেখতে পারি।"

"এই যে শুনেছিলুম উনি মাঝরাতে ছবি আঁকেন?"

"মাঝরাতেই যে আঁকবেন, তার কোনও মানে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আঁকতে শুরু করেন। শুনলুম যে, উনি কাল সারারাত ঘুমোননি, বিছানার ওপর ঠায় বসেছিলেন, ঘুমিয়েছেন সকাল আটটায়। চলো, চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

"শোনো রাজা, নেপোলিয়ন যাই-ই বলুন, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বারণ করেছেন। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে অতদূর যেতে চাও?"

"আরে ডাক্তারদের কথা সব সময় মানলে চলে না। আমি ভাল আছি বেশ। অনায়াসে যেতে পারব!"

"পাগলামি কোরো না, রাজা। আমাদের মতন লোকেরই হেঁটে যেতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবে? পুলিশের গাড়িটা ছেড়ে দিলাম... ঠিক আছে টেলিফোনে আর-একটা গাড়ি আনাচ্ছি, সেই গাড়িতে যাব।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সে-কথা আগেই ভেবেছিলাম। আল মামুনকে আমি বলেছিলাম, আজ তো গাড়িঘোড়া চলছে না, যেতে গেলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। আল মামুন তীব্র আপত্তি করে বলেছে, না পুলিশের গাড়িতে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। ও-বাড়ির সামনে

পুলিশের গাড়ি থামলেই সকলের চোখে পড়ে যাবে। মুফ্‌তি মহম্মদের মতন সম্মানিত মানুষের কাছে পুলিশ এসেছে, এ-কথা জানলে তার শিষ্যরা চটে যাবে খুব!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাও একটা কথা বটে। পরদেশি নাগরিক, ঝটাক্‌সে ওদের কাছে পুলিশের গাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। তা হলে কী উপায়?"

"হেঁটেই যেতে হবে। শুধু-শুধু দেরি করছ কেন?"

"রাজা, তুমি বুঝতে পারছ না, ক্র্যাচ নিয়ে হেঁটে পৌঁছতে তোমার কম সে কম চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ততক্ষণ কি তোমার ঐ বুঢ়াবাবা বসে বসে ছবি আঁকবেন?"

কাকাবাবু এবারে ব্যাপারটা বুঝলেন। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এ তো আর পাহাড়ে ওঠা নয়, শুধু-শুধু একটা শহরে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটার কোনও মানে হয় না!

একটু চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, "আর একটা উপায় আছে, কোনও ডাক্তারের গাড়ি যেতে পারে, তাই না? ডাক্তারের গাড়ি কিংবা হাসপাতালের গাড়ি নিশ্চয়ই আটকাবে না?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, তা হতে পারে। দেখি কোনও ডাক্তারের গাড়ি জোগাড় করা যায় কি না।"

সন্তু বলল, "সাইকেলেও যাওয়া যায়। আমি দেখলুম রাস্তায় সাইকেল চলছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস! তা হলে দেখলি তো সাইকেল শেখারও উপকারিতা আছে। এক-এক সময় কত কাজে লাগে। ডাক্তারের গাড়ি যদি করা না যায়, তাহলে তুই আর নরেন্দ্র সাইকেলে চলে যেতে পারবি। পায়ের জন্য আমি তো আজকাল আর সাইকেল চলাতে পারি না।"

নরেন্দ্র ভার্মা নীচে থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখন তো একটাও ডাক্তারের গাড়ি নেই। তবে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান একটু বাদেই ফিরবে।"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "একটু বাদে মানে কতক্ষণ বাদে? দ্যাখো, না হয় দুটো সাইকেলেই জোগাড় করো।"

শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল। নানান জায়গায় টেলিফোন করেও কোনও ডাক্তারের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। সবাই বলেছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারে। কাকাবাবু অত দেরি করতে রাজি নন। নার্সিং হোমের দরোয়ানদের কাছ থেকে দুটো সাইকেল জোগাড় হল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা।

এ রকম ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে আরাম। হরতালের দিন কলকাতার রাস্তায় ছেলেরা ফুটবল খেলে, কিন্তু দিল্লিতে সে-রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় মানুষজন খুব কম।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই কলেজ-জীবনের পর আর সাইকেল চালাইনি। তোমার কাকাবাবুর পাল্লায় পড়ে কত কী যে করতে হয় আমাকে! অবশ্য, খারাপ লাগছে না। আচ্ছা সন্টু, একটা সত্যি কথা বলবে?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"একটা বুড়ো সাধু কী সব ছবি আঁকছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোনও মানে আছে? আমরা কি বুনোহাঁস তাড়া করছি না?"

"সব ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না, নরেনকাকা!"

"চলো, গিয়ে দেখা যাক!"

সাইকেলে রফি মার্গ পৌঁছতেই এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা দিল্লির সব রাস্তা খুব ভাল চেনেন, তাই ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না।

এই রাস্তার সব বাড়িই অফিসবাড়ি বলে মনে হয়। তারই মধ্যে একটি ছোট, হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। ছোট হলেও বাড়িটি দেখতে খুব সুন্দর, সামনে অনেকখানি ফুলের বাগান।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, কিন্তু এ-বাড়িতে যে ইজিপশিয়ানরা থাকে, কোনও দিন জানতেই পারিনি। দিল্লিতে যে কত কিসিমের মানুষ থাকে!"

গেটের সামনে একজন দরোয়ান বসে আছে। তার কাছে আল মামুনের নাম করতেই সে দোতলায় উঠে যেতে বলল।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোনও মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। দোতলাতেও সিঁড়ির মুখে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট। ওরা সেখানে এসে দাঁড়াতেই আল মামুন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের কোনও রকম শব্দ করতে নিষেধ করলেন। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়ার ইজ মিঃ রায়চৌধুরী?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গাড়ি জোগাড় করা যায়নি বলে তিনি আসতে পারেননি!"

আল মামুনের মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনাদের তো ডাকিনি। আপনাদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আপনারা ফিরে যান।"

এই কথা বলে আল মামুন পেছন ফিরতেই নরেন্দ্র ভার্মা গেটের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আল মামুনের একটা হাত চেপে ধরলেন। তারপর খুব আস্তে অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, "আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরী আমাকে আর তাঁর ভাইপোকে পাঠিয়েছেন এখানে কী ঘটছে, তা দেখে গিয়ে রিপোর্ট করবার জন্য। এই হরতালের দিনেও আমরা কষ্ট করে এমনি-এমনি ফিরে যাবার জন্য আসিনি। গেট খুলুন।"

নরেন্দ্রা ভার্মা এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু এক-এক সময় তাঁর মুখখানা

এমন কঠিন হয়ে যায় যে, দেখলে ভয় লাগে।

আল মামুন আর দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "জুতো খুলে ফেলুন!"

খালি পায়ে একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে এসে ওরা ঢুকল একটা মাঝারি সাইজের ঘরে। সে-ঘরে খাট-বিছানা পাতা, কিন্তু বিছানাতে কেউ নেই। বিছানার ঠিক পাশেই অন্য একটা ঘরে যাওয়ার দরজা।

আল মামুন ওদের ইশারা করলেন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

অন্য ঘরটিতে রয়েছে একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে আছেন একজন খুবই লম্বা মানুষ, পরনে একটা কালো রঙের আলখাল্লা। তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা উলের মতন, আর মুখভর্তি সাদা দাড়ি পাতলা তুলোর মতন। হাতে একটা লাল ফেল্ট পেন, টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে কাগজে তিনি ছবি আঁকছেন।

সত্যি, দেখলে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আঁকছেন। চোখ দুটি প্রায় বোজা, হাতের কলমটা দিয়ে একটা দাগ কেটে থেমে যাচ্ছেন, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার একটা দাগ কাটছেন।

সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা প্রায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই দৃশ্য। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ছবি আঁকছেন, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

মুফ্‌তি মহম্মদ একবার হঠাৎ এই দরজার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো খোলা, তবু তিনি ওদের দেখতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তাঁর মুখে যেন একটা পবিত্র ভাব ফুটে আছে। দেখলেই ভক্তি জাগে।

আবার মুখ ফিরিয়ে ছবি আঁকাতে মন দিলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "এবার চলো!"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে খানিকটা আসতেই সিঁড়িতে ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠল।

আল মামুন ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখের কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট তিনি ভুল করে খোলা রেখে এসেছিলেন। তিনি গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ভেতরে ঢুকে এলেন ক্রাচ বগলে নিয়ে একজন মানুষ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আনডন্‌টেড রাজা রায়চৌধুরী! তাঁকে কেউ পেছনে ফেলে রেখে আসতে পারে না!"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, "তোমরা চলে আসার পরেই একটা অ্যামবুলেন্স পেয়ে গেলাম।"

তারপর তিনি আল মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কী? এখনও ছবি আঁকছেন?"

ওরা তিনজনই এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "চলো। আমি একটু দেখি। ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলা খুব দরকার।"

আল মামুন সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নো নো নো, দ্যাট ইজ আউট অব কোয়েশ্চেন। ওঁকে এই অবস্থায় কিছুতেই ডিসটার্ব করা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি। আপনারা বুঝতে পারছেন না, কারুর সঙ্গে কথা বলার জন্যই উনি ওই ছবিগুলো আঁকছেন?"

আল মামুন বললেন, "কী করে কথা বলবেন আপনি? ওঁর গলার আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে, উনি কোনও উত্তর দিতে পারবেন না। আপনার ইংরিজি প্রশ্নও উনি বুঝবেন না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। রাজা, উনি তোমার প্রশ্ন বুঝবেন কী করে? আল মামুন যদি বুঝিয়ে দেন, তা হলেই বা উনি কী করে উত্তর দেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই আমি প্রশ্ন করব।"

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করলেন। তারপর দেখালেন সেটা খুলে। তাতেও কতকগুলো ছোট-ছোট ছবি আঁকা।

কাকাবাবু বললেন, "এই ছবির ভাষা তোমরা কেউ বুঝবে না, উনি হয়তো বুঝতে পারেন।"

কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল সেই ঘরে। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। আল মামুন কাকাবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন পাশের ঘরে।

কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন মুফ্তি মহম্মদ। আল মামুন খুব বিনীতভাবে কিছু বললেন তাঁকে। খুব সম্ভবত কাকাবাবুর পরিচয় দিলেন।

কাকাবাবু কপালের কাছে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "আদাব।"

তারপর তাঁর ছবি-আঁকা কাগজটা ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের ওপর।

মুফ্তি মহম্মদ এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছেন পুরোপুরি। কেননা, সেই কাগজটা দেখেই তাঁর মুখে দারুণ অবাক ভাব ফুটে উঠল। একবার কাগজটার দিকে, আর একবার কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

তারপর হাতছানি দিয়ে কাকাবাবুকে কাছে ডাকলেন। কাকাবাবু তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর লম্বা ডান হাত রাখলেন কাকাবাবুর মাথায়, নিজে চোখ বুজে রইলেন একটুক্ষণ। ঠিক যেন তিনি কাকাবাবুকে আশীর্বাদ করছেন ভারতীয়দের প্রথায়।

একটু পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাল কলমটা তুলে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর হাত যেন চলছেই না। খুব অলসভাবে দাগ কাটছেন, বোঝা যায় তাঁর হাত কেঁপে যাচ্ছে। একটুখানি এঁকেই তিনি তাকাচ্ছেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ঘাড় নাড়ছেন।

মাত্র তিনটি ছবি কোনওক্রমে আঁকার পরেই তাঁর হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। মুখখানা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর, তারপর একেবারে নুয়ে টেবিলের ওপর পড়ে যাবার আগেই কাকাবাবু আর আল মামুন দু'দিক থেকে ধরে ফেললেন তাঁকে।

॥৫ ॥

কাকাবাবু আর সন্তুকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে একটা সরকারি গেস্ট হাউসে। এর মধ্যে দু'বার হামলা হয়ে গেছে কাকাবাবুর ওপর। কাকাবাবুর বন্ধুরা সবাই বলছেন ওঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে। এখানে থাকলে ওঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু সে-কথা কিছুতেই শুনবেন না।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদ সেদিন সেই চেয়ারে বসেই মৃত্যু বরণ করেছেন। শেষ সময়ে তাঁর মুখে কোনও যন্ত্রণার ছাপ ছিল না, বরং ফুটে উঠেছিল অপূর্ব সুন্দর হাসি। যেন তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে এই জীবন শেষ করে চলে গেলেন।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছে। এই শিষ্যদের আবার দুটি দল। এক দলের নেতা আল মামুন, আর অন্য দলটির নেতা হানি আলকাদি নামে একজন। শিষ্যদের ধারণা, সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর শেষ উইল ছবি দিয়ে লিখে গেছেন। শুধু রাজা রায়চৌধুরীই সেই ছবির মানে জেনেছে। রাজা রায়চৌধুরী বাইরের লোক, সে কেন এই গোপন কথা জানবে ? আল মামুন কেন রাজা রায়চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ? দ্বিতীয় দলের নেতা হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নিজে নেতা হবার মতলবে সেই উইলের কথা অন্য কারুকে জানতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই, আল মামুনও রেগে গেছে কাকাবাবুর ওপর। বৃদ্ধ মুফ্‌তি মহম্মদের আঁকা ঐ ছবিগুলোর যে কী মানে, তা কাকাবাবু আল মামুনকেও বলেননি।

এমন কী, নরেন্দ্র ভার্মা বারবার জিজ্ঞেস করলেও কাকাবাবু মুচকি হেসে বলেছেন, "ধরে নাও, ঐ ছবিগুলোর কোনও মানে নেই। আমি অবশ্য একরকম মানে করেছি, সেটা ভুলও হতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী মানে বুঝেছ, সেটাই শুনি !"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটাও বলা যাবে না। মুফ্‌তি মহম্মদ নিষেধ করে গেছেন।"

"অ্যাঁ ! উনি কখন নিষেধ করলেন তোমায় ? আমরা তো কাছেই দাঁড়িয়ে

ছিলুম !”

“কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি সব বোঝা যায় ? দেখলে না, আমি মুফ্‌তি মহম্মদকে লিখে কিছু প্রশ্ন জানালুম। উনিও ছবি এঁকে তার উত্তর দিলেন।”

“তুমি কী প্রশ্ন করেছিলে ?”

“আমি একটা মানে উল্লেখ করে জানতে চেয়েছিলুম, আপনি কি এটাই বোঝাতে চাইছেন ? উনি তার উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ কিছুই লিখলেন না। উনি লিখলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, তার আগে কারুকে কিছু বোলো না।”

“যাচাই করে দেখো, মানে ? অন্য কোনও পণ্ডিতের পরামর্শ নেবে ? না, তাও তো পারবে না। অন্য কারুকে বলাই তো নিষেধ।”

“এটা যাচাই করার জন্য আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। ইজিপ্টে !”

সন্তু বলে উঠল, “পিরামিডের দেশে ?”

কাকাবাবু চোখ দিয়ে হেসে বললেন, “মনে হচ্ছে তোর এবারে বিদেশ ঘোরা হয়ে যাবে, সন্তু !”

সন্তুর মনে পড়ে গেল রিনির কথা। সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে রিনি কায়রো বেড়াতে গেছে। তখন সে-কথা শুনে সন্তুর হিংসে হয়েছিল। এবারে সে-ই কায়রোতে পৌঁছে রিনিদের চমকে দেবে। কাকাবাবু এইজন্যই পাসপোর্ট আনতে বলেছিলেন ?

নরেন্দ্র ভার্মা চিন্তিতভাবে বললেন, “রাজা, এখন ইজিপ্টে গেলে তুমি যে একেবারে বাঘের মুখে গিয়ে পড়বে ! এখানেই তুমি দু'তিনবার বিপদে পড়েছিলে। দিল্লিতে যে এত ইজিপশিয়ান থাকে জানা ছিল না। ওখান থেকে আমাদের দেশে অনেকে পড়া-লিখা করতে আসে। বিজ্‌নেসের জন্যও আসে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ঐ যে হানি আলকাদি নামের লোকটা, ওর অনেক গোঁড়া সাপোর্টার আছে। ওর পার্টি একবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। মুফ্‌তি মহম্মদের সিক্রেট তুমি যদি আগে ওদের কাছে ফাঁস না করো, তা হলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না !”

কাকাবাবু বললেন, “বাঘের মুখে গিয়ে পড়তেই তো আমার ইচ্ছে করে। তুমি কি ভাবছ, পুলিশ-পাহারায় আমি এখানে বসে থাকব ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তোমাকে এখন ইজিপ্ট পাঠাতে রাজি হবে না। ও দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ ভাল সম্পর্ক আছে, তুমি গিয়ে যদি এখন একটা গণ্ডগোল পাকাও...”

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, “কিছু গণ্ডগোল পাকাব না। আমাকে গভর্নমেন্টেরও পাঠাবার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব। তুমি বরং একটু সাহায্য করো, নরেন্দ্র। আজকের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ভিসা জোগাড় করে দাও।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি এখনও বলছি, তোমাদের ওখানে যাওয়া উচিত নয়।"

কাকাবাবু এবারে হেসে ফেলে বললেন, "তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি, নরেন্দ্র? আমরা বেশ ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছি, তোমার যাওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না!"

"মজা? তুমি ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছ? হানি আলকাদিকে আমি যতটা চিনেছি, সে একটা দুর্দান্ত টাইপের লোক!"

"আরে, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকদের খুব সহজে বাগ মানানো যায়। যাদের বাইরে থেকে নরম-সরম মনে হয়, তাদেরই মনের আসল চেহারাটা বোঝা শক্ত। দেখো না ওখানে কত মজা হয়। ফিরে এসে তোমাকে সব গল্প শোনাব।"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে তাঁর হাতব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করলেন। সেটা নরেন্দ্র ভার্মার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে জমা রইল। বিদেশে যাচ্ছি, সঙ্গে আর্মস নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "হানি আলকাদির দলবল তোমার ওপর সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে জেনেও তুমি কোনও হাতিয়ার ছাড়া অত দূরের দেশে যাবে?"

কাকাবাবু নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে ইয়ার্কির সুরে বললেন, "কাঁধের ওপর যে জিনিসটা রয়েছে, তার থেকে আর কোনও অস্ত্র কি বড় হতে পারে?"

নরেন্দ্র ভার্মা এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন তিনি বলতে চান, আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

সন্ধেবেলা নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "শোন্, এখানে খুব সাবধানে থাকবি। একা বাইরে বেরুবি না। ওরা যদি তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখে, তা হলে আমার ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে।"

সন্তু মুখে 'আচ্ছা' বললেও তলার ঠোঁটটা এমনভাবে কাঁপাল যাতে বেশ একটু গর্ব-গর্ব ভাব ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ করে কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, তুই মনে মনে ভাবছিস তো, তোকে কে আটকে রাখবে! তুই ঠিক পালাতে পারবি, তাই না? তাতেই তো আমার বেশি চিন্তা। তোর মতন বয়েসি একটা ছেলেকে সহজে মারে না, কিন্তু তুই পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত গুলিটুলি ছুঁড়বে। এর আগে তুই যতবার পালাবার চেষ্টা করেছিস, ততবার বেশি বিপদে পড়েছিস, মনে নেই?"

সন্তু বলল, "প্রত্যেকবার নয়। সেবারে ত্রিপুরায় যে আমি পালিয়েছিলুম, আর আমায় কেউ ধরতে পারেনি!"

কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। মানলুম। কিন্তু এবারে দিল্লিতে আর কায়রোতে গিয়ে সব সময় আমার সঙ্গে থাকবি। একা-একা গোয়েন্দাগিরি করার চেষ্টা করবি না।"

সন্তুর মনে পড়ল, সে একা তিলজলায় রহস্যসন্ধান করতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়েছিল। ভাগ্যিস কাকাবাবু সে-কথা জানেন না।

অবশ্য সন্তু তখনই ঠিক করল, তা বলে সে দমে যাবে না। ভবিষ্যতে আবার সে ঐ রকম চেষ্টা করবে। সে একা-একা একটা রহস্যের সমাধান করে কাকাবাবুকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

পরদিন কাকাবাবু টেলিফোনেই অনেক কাজ সেরে ফেললেন। তার পরের দিনই তাঁদের ইজিপ্ট যাত্রা। নরেন্দ্র ভার্মা গোমড়া মুখে ওঁদের পৌঁছে দিতে এলেন এয়ারপোর্টে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগের মুহূর্তে নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রাজা, এখনও কি মনে হচ্ছে তোমরা ওখানে মজা করতে যাচ্ছ ?"

কাকাবাবু চোখ টিপে বললেন, "হ্যাঁ, দারুণ মজা হবে। ইশ, তুমি যেতে পারলে না !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি খোঁজ পেয়েছি হানি আলকাদিও আজ সকালে অন্য একটা প্লেনে ইজিপ্ট চলে গেছে। নিশ্চয়ই এমব্যাসি থেকে খবর পেয়েছে যে, তুমি ইজিপ্টের ভিসা নিয়েছ !"

কাকাবাবু সে খবর শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, "তা তো যাবেই। নইলে মজা জমবে কেন ? আল মামুন যায়নি ? সে তো রাগ করে আমার সঙ্গে আর দেখাই করে না !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তার খবর জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাবে, সেও নিশ্চয়ই যাবে। আচ্ছা নরেন্দ্র, ফিরে এসে সব গল্প হবে।"

এই তো ক'দিন আগেই সন্তু প্লেনে চেপে কলকাতা থেকে এসেছে দিল্লিতে। সেই প্লেনটা ছিল এয়ারবাস আর এটা বোয়িং। একটা শিহরন জাগছে সন্তুর বুকের মধ্যে। বিদেশ, বিদেশ ! পিরামিডের দেশ। ক্লিওপেট্রার দেশ।

প্লেন আকাশে ওড়বার পরেই সন্তু সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস ?"

সন্তু মুখ খুলে কিছু বলার আগেই কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাথরুমে যাবার কথা বলবি তো ? শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না। পুরো প্লেনটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়েছে দেখে আয়। চলন্ত প্লেনে তো আর তোকে কেউ কিডন্যাপ করবে না ! এক যদি প্লেনটা কেউ হাইজ্যাক করে ! তা যদি করেই, তা হলে আর কী করা যাবে !"

সন্তুর আসল উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের মুখগুলো ভাল করে দেখা। চেনা কেউ আছে কি না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আল মামুনও এই প্লেনে রয়েছে। প্রথম থেকেই ঐ লোকটিকে সন্তু ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। লোকটির সব সময় কী রকম যেন গোপন-গোপন ভাব। মনের কথা খুলে বলে না। আল মামুন প্রথমেই কাকাবাবুকে এক লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়েছিল।

মুফতি মহম্মদ মরে যাবার পর আল মামুন খুব একটা দুঃখ পেয়েছেন এমন মনে হয়নি। তিনি কাকাবাবুকে বলেছিলেন যে, কাকাবাবু যদি সব ছবিগুলোর ভাষা শুধু আল মামুনকেই জানিয়ে দেন, তা হলে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তা কী করে হবে ? আপনার গুরুই যে বলতে বারণ করেছেন !"

না, প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে একজনও চেনা মানুষ দেখতে পেল না সন্তু। কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী রয়েছে, কিন্তু তারা কেউ বাংলায় কথা বলছে না।

তখনও সন্তু জানে না যে, তার জন্য একটা দারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

খাবার দিচ্ছে দেখে সন্তু এল নিজের জায়গায়। টেবিলটা খুলে পেতে নিল।

খেতে খেতে কাকাবাবু বললেন, "তুই হিয়েরোগ্লিফিক্সের মানে বলে আমায় চমকে দিয়েছিলি। পিরামিডগুলো কেন তৈরি হয়েছিল তাও তুই জানিস নিশ্চয়ই ?"

সন্তু বলল, "রাজা-রানিদের সমাধি দেবার জন্য। ভেতরে অনেক জিনিসপত্তর রাখা থাকত, রাজা-রানিরা ভাবতেন যে, তাঁরা আবার বেঁচে উঠবেন !

"সবচেয়ে পুরনো পিরামিড কতদিন আগে তৈরি হয়েছে বল তো ?"

"সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে !"

"এটা আন্দাজে বললি, তাই না ?"

ধরা পড়ে গিয়ে সন্তু লাজুকভাবে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "খুব পুরনো পিরামিডগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ থেকে ২১৬০ বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তা হলে বলা যেতে পারে মোটামুটি সাড়ে চার হাজার বছর আগে। যাই হোক, পিরামিড তো অনেকগুলোই আছে। এর মধ্যে গিজার পিরামিড খুব বিখ্যাত। আর একটা আছে খুফু। এটা বিরাট লম্বা। এখন তো পৃথিবীতে মস্ত-মস্ত বাড়ি তৈরি হয়েছে। এক সময় নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি, তারপর ..."

"এখন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার সবচেয়ে বড় !"

"হুঁ, তাও জানিস দেখছি। কিন্তু ঐ খুফুর পিরামিড এখনও ঐ সব বড়-বড় বাড়ির সঙ্গে উচ্চতায় পাল্লা দিতে পারে। এবারে তোকে একটা ভূতের গল্প বলি

শোন্ ! পিরামিডগুলোর আশেপাশে আরও অনেক গোপন সমাধিস্থান আছে মাটির নীচে। বাইরের থেকে সেগুলো বোঝাই যায় না। সাহেবরা একটা-একটা করে সেগুলো আবিষ্কার করেছে। সম্রাট খুফুর মায়ের নাম ছিল হেটেফেরিস। তাঁর সমাধিস্থানের কথা অনেকে জানতই না। একজন সাহেব সেটি আবিষ্কার করেন। সেখানে কোনও পিরামিড নেই, মাটির নীচে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিল সেই সমাধি। মমিগুলো যে কফিনের মধ্যে রাখে, তাকে বলে সারকোফেগাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলেন, তিনি সেখানে অনেক কিছু দেখতে পেলেও সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পেলেন না।"

"কেউ মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছে !"

"হ্যাঁ, পিরামিড থেকে অনেক মমি চুরি গেছে বটে, কিন্তু রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থানে তো কেউ আগে ঢোকেনি। তাছাড়া, রাজা-রানিদের সমাধিস্থানে অনেক দামি দামি জিনিস থাকত। যেমন সোনার খাট, সোনার জুতো, মণিমুক্তো-বসানো পানপাত্র, আরও অনেক কিছু। প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেন, সেই চার্লস ব্রকওয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, শুধু মমিটাই ছিল না। চোরেরা আর-কিছু নিল না, শুধু মমিটাই নিল ? চোরেরা তো মমি নেয় বিক্রি করবার জন্যই !"

"তারপর ?"

"এর এক বছর তিন মাস বাদে একদল পুরাতত্ত্ববিদ আবার ঐ সুড়ঙ্গে নামেন। তাঁরা কিন্তু সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পান। তাঁরা সেই মমির ছবিও তুলেছিলেন। মিশর সরকারের অনুমতি ছাড়া মমি সরানো যায় না। তাই তাঁরা সেদিন আর কিছু করেননি। ওপরে পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। পরদিন আবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল সারকোফেগাসের মধ্যে মমি নেই ! আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাই নিয়ে সে-সময় অনেক হৈচৈ হয়েছিল, পৃথিবীর বহু কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল, এই নিয়ে বইও লেখা হয়েছে। চার্লস ব্রকওয়ে অবশ্য দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটির বক্তব্য একটুও বিশ্বাস করেননি।"

আরও কিছু শোনবার জন্য সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "তোকে এমনি একটা রহস্যকাহিনী শোনালুম। আমরা যে-কাজে যাচ্ছি তার সঙ্গে রানি হেটেফেরিসের সমাধির খুব একটা সম্পর্ক নেই।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এঁটো প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল এয়ার-হস্টেসরা। তার একটু পরে একজন এয়ার-হস্টেস সন্তুর কাছে এসে ইংরিজিতে বলল, "তোমার নাম তো সন্তু, তাই না ? প্লিজ কাম উইথ মি ! তোমাকে আর-একবার সিকিউরিটি চেক করা হবে।"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। এয়ার-হস্টেসটি কাকাবাবুকে বলল, "আই অ্যাম সরি স্যার, এই ছেলেটি সন্দেহজনকভাবে সারা প্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেইজন্য ক্যাপ্টেন বললেন, ওকে একবার সার্চ করে দেখতে হবে ! আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি !"

কাকাবাবু বললেন, "গো অ্যাহেড !"

সন্তু একই সঙ্গে আশ্চর্য হল, রেগে গেল, আবার বেশ মজাও পেল। এরা তাকে হাইজ্যাকার ভাবছে নাকি ? সঙ্গে একটা খেলনা পিস্তল থাকলেও এদের বেশ ভয় দেখানো যেত।

এয়ার-হস্টেসটি সন্তুকে নিয়ে এল ককপিটে। সেখানকার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা মাত্র একজন বলে উঠল, "হ্যান্ডস আপ !"

তারপরই হেসে উঠল হো হো করে !

সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "বিমানদা !"

সন্তুদের পাড়ার যে বিমান পাইলট, সে-ই এই প্লেনের ক্যাপটেন। এরকম যোগাযোগ যে ঘটতে পারে, তা সন্তুর একবারও মনে হয়নি।

এয়ার-হস্টেস আর কো-পাইলটরা হাসছে সন্তুর ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখে। এয়ার-হস্টেসটি বলল, "আমি যখন গিয়ে বললুম যে, ওকে সার্চ করা হবে, তখন এই ইয়াং জেন্টলম্যানটির মুখ একেবারে ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে সত্যি বোমা-পিস্তল কিছু আছে নাকি ?"

বিমান অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সন্তুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুও দেখলুম রয়েছেন। তোরা কোথায় যাচ্ছিস ?"

সন্তু বলল, "ইজিপ্টে।"

বিমান বলল, "ইজিপ্টে ? সেখানে তোরা কোন্ ব্যাপারে যাচ্ছিস ? নিশ্চয়ই বেড়াতে নয় ?"

সন্তু এবার একটু ভারিক্কি ভাব করে বলল, "সেটা এখন বলা যাবে না !"

বিমান অন্যদের বলল, "জানো, এই যাঁকে কাকাবাবু বলছি, তিনি একজন ফ্যানটাসটিক পার্সন। পৃথিবীতে যে-সব মিস্ট্রি অন্য কেউ সল্‌ভ করতে পারে না, সেগুলো তিনি সল্‌ভ করার চেষ্টা করেন। যেমন ওঁর জ্ঞান, তেমনি সাহস !"

কো-পাইলট মিঃ কোহলি বললেন, "তাহলে আমরা সবাই তাঁকে একবার দেখতে চাই।"

বিমান বলল, "আর একটা মজা করা যাক। সন্তুকে আমরা এখানে আটকে রাখি, তা হলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই এক সময়ে এখানে ছুটে আসবেন।"

ককপিটে বসে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। প্লেনটা মেঘের রাজ্য দিয়ে যাচ্ছে বটে তবু মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নীচের পৃথিবী। বিমান সন্তুকে বোঝাতে লাগল আকাশের মানচিত্র।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কাকাবাবু সন্তুর কোনও খোঁজ করলেন না। বিমান বলল, "চল রে, সন্তু, আমিই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দূর থেকে দেখা গেল কাকাবাবু বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ওরা কাছে যাবার পর কাকাবাবুকে ডাকতে হল না, তিনি মুখ তুলে, একটুও অবাক না হয়ে, স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী খবর, বিমান ?"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতেন আমি এই প্লেনে থাকব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতুম না ! তবে জানাটা শক্ত কিছু নয়। সন্তুকে নিয়ে যাবার পরই মনে পড়ল, প্লেন টেক অফ করার পর ঘোষণা করা হয়েছিল, ক্যাপটেন ব্যানার্জি এবং তাঁর ক্রু-রা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে। তখন দুই আর দুইয়ে চার করে নিলুম !"

বিমান একটু হতাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কখনও চমকে যান না, বা অবাক হন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন হব না ? পৃথিবীতে অবাক হবার মতন ঘটনাই তো বেশি। তবে এত সামান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হই না।"

"কাকাবাবু, মিশরে কী ব্যাপারে যাচ্ছেন, জানতে পারি ?"

"অতি সামান্য ব্যাপার !"

"তার মানে এখন বলবেন না ! ইশ্, আমাকে রিলিজ করছে আথেন্সে। যদি কায়রোতে নামতে পারতুম ! দেখি যদি ম্যানেজ করে চলে আসতে পারি। কায়রোতে আপনারা কোথায় উঠবেন ?"

"উঠব তো ওয়েসিস হোটেলে। কিন্তু কায়রোতে আমরা দু'একদিনের বেশি থাকব না। মেমফিসে চলে যাব ! সেখানে কোথায় উঠব তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "বিমানদা, তুমি সিদ্ধার্থদাকে চেনো তো ? স্নিগ্ধাদির বর ? ওরা এখন কায়রোতে আছেন। তুমি ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে খোঁজ কোরো ! সিদ্ধার্থদা ফার্স্ট সেক্রেটারি..."

কাকাবাবু একটু ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে।

॥৬॥

এয়ারপোর্টে যে সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা, রিনি সবাই উপস্থিত থাকবে এটা অবশ্য সন্তুও জানত না। কাকাবাবু তো আশাই করেননি। এটা নরেন ভার্মার কীর্তি, তিনি কায়রোর ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা দেখে সিদ্ধার্থ নিজেই এসেছে।

কায়রোতে প্লেনটা এক ঘণ্টা থামে। বিমানও নেমে এসে একবার ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে গেল।

রিনি সন্তুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, সন্তু, কলকাতায় যখন দেখা হল, তখন তো একবারও বললি না যে, তোরা এখানে

আসবি ?”

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, “আমরা কখন যে কোথায় যাব, তার তো কোনও ঠিক থাকে না। আজ কায়রোতে এসেছি, পরশুই হয়তো আবার মস্কো চলে যাব !”

রিনি ঠোঁট উল্টে বলল, “ইশ্, আর চাল মারিস না ! আমরা-আমরা করছিস কেন রে ? তুই তো কাকাবাবুর বাহন ! উনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তাই তোকে সঙ্গে আনেন।”

কলকাতায় থাকতে রিনি কায়রো বেড়াতে আসছে শুনে সন্তুর ঈর্ষা হয়েছিল। এখন তার মনে হল, এইসব অবোধ মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কোনও মানেই হয় না ! সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সন্তুকে আরও রাগাবার জন্য রিনি বলল, “তুই সেই গল্পটা জানিস না ? চাষের খেতে একটা গোরুর শিং-এ একটা মশা বসেছিল। একজন লোক সেই মশাটাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে মশা, তুমি এখানে কী করছ ? মশা বলল, আমরা হাল চাষ করছি ! তুই হচ্ছিস সেই মশা ! হি-হি-হি-হি !”

বেশ রাগ হয়ে গেলেও সন্তুর মনে হল, রিনি এই ধরনের কথা বলছে কেন ? ও কি তিলজলার সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা জেনে গেছে ?

সন্তু রিনির কাছ থেকে সরে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, “চলুন কাকাবাবু, বাড়িতে গিয়ে সব গল্প শুনব। আমার বাড়িটা খুব সুন্দর জায়গায়, আপনার পছন্দ হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার বাড়ি ? না, সেখানে তো আমরা যাচ্ছি না !”

সিদ্ধার্থদা নিরাশ হয়ে বললেন, “সে কী ? আমার বাড়িতে যাবেন না ? কেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “কিছু মনে কোরো না। আমি হোটেল বুক করেই এসেছি। আমি যে ব্যাপারে এসেছি, তাতে তোমার জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তুমি তো সরকারি কাজ করো !”

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, “সন্তু, তুই গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে পারিস। বিদেশে এসে কোনও চেনা লোকের কাছে তোর থাকতে ভাল লাগবে।”

সন্তু মুখের এমন ভাব করল যেন সে প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষত রিনি ওরকম কথা বলার পর সে আর রিনির সঙ্গে একটা মিনিটও কাটাতে চায় না।

স্নিগ্ধাদি অনুযোগের সুরে বলল, “কাকাবাবু, আপনি যাবেন না ? আমি আপনাদের জন্য চিংড়ির মালাইকারি রান্না করে রেখেছি। কত কষ্টে জোগাড় করলুম চিংড়ি...”

কাকাবাবু এবারে হালকা গলায় বললেন, “তুমি কী করে জানলে ঐ জিনিসটা

আমার সবচেয়ে ফেভারিট ? ঠিক আছে, সন্ধেবেলা গিয়ে খেয়ে আসব ! কিন্তু উঠতে হবে হোটেলেই ।”

ওয়েসিস হোটেলটি বিশেষ বড় নয় । শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে । গরমকাল বলে এই সময়ে টুরিস্টদের ভিড় নেই, হোটেল প্রায় ফাঁকা । সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা আর রিনি সন্তুদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল । কথা হল যে, সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ আবার এসে ওদের নিয়ে যাবে বাড়িতে ।

কাকাবাবু ঘর থেকেই দু'তিনটে টেলিফোন করলেন । তারপর তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সন্তুকে বললেন, “তুই চান-টান করে নে । আজ দুপুরে আমরা ঘরেই খেয়ে নেব । দুপুরে যা চড়া রোদ ওঠে, বাইরে বেরুনোই যায় না ।”

গরমে সন্তুর গা চ্যাটচ্যাট করছিল, সে ঢুকে গেল বাথরুমে । সেখানকার জানলা দিয়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে ট্রলি বাস চলছে । ঐটাই যা নতুনত্ব, নইলে কায়রো শহরটাকে বিদেশ বিদেশ মনে হয় না, ভারতবর্ষের যে-কোনও বড় শহরেরই মতন । ইজিপ্ট দেশটা যদিও আফ্রিকার মধ্যে, কিন্তু এখানে কোনও মানুষ নেই । বর্তমান ইজিপ্টের অধিবাসীরা জাতিতে আরব ।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে সন্তু দেখল, কাকাবাবু তাঁর নোটবুকে কী সব লিখছেন । সন্তু চুল আঁচড়াতে শুরু করতেই জরজায় ঠক ঠক শব্দ হল । কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন ।

সন্তু দরজা খুলতেই একজন মাঝারি চেহারার লোক জিজ্ঞেস করলেন, “মিঃ রাজ্‌জা রায়চৌধারি হিয়ার ?”

কাকাবাবু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, “মান্টো ? কাম ইন ! কাম ইন !”

লম্বা লোকটি প্রায় ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন । একেবারে দৃঢ় আলিঙ্গন । তারপর কোলাকুলির ভঙ্গি করে তিনি সরে দাঁড়ালেন ।

এই গরমেও ভদ্রলোক একটা আলখাল্লার মতন পোশাক পরে আছেন । মাথায় ফেজ টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা । দাড়ি-গোঁপ কামানো ।

কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আলি সাদাত মান্টো, কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর, আমার পুরনো বন্ধু ।”

মান্টো ইংরিজিতে বললেন, “রায়চৌধারি, তুমি যে এই সময় কায়রোতে এসেছ, তা শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে । তুমি কী কাণ্ড করেছ ? জানো, এখানকার সব কাগজে তোমার কথা বেরিয়েছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “তাই নাকি ? তা হলে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছি বলো ! কী লিখেছে কাগজে আমার সম্পর্কে ?”

মান্টো একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, “খুব গুরুতর অভিযোগ ।

এখানকার এক বিখ্যাত নেতা মুফ্‌তি মহম্মদ চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেখানে তিনি কয়েকদিন আগে হঠাৎ মারা যান। শেষ মুহূর্তে তিনি যে উইল করে যান, তুমি নাকি সেটা চুরি করেছ।"

কাকাবাবু অট্টহাসি করে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে, একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছে ?"

মান্টোর মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, "হাসির ব্যাপার নয়, রায়চৌধারি ! এখানে হানি আলকাদি নামে একজন জঙ্গি নেতা আছে। সে দাবি জানিয়েছে যে, ভারত সরকারের ওপর চাপ দিয়ে তোমাকে এখানে ধরে আনাতে হবে। আর তুমি নিজেই এখানে চলে এসেছ ? তোমার কতটা বিপদ তা বুঝতে পারছ না ?"

কাকাবাবু তবু হাল্‌কা চালে বললেন, "উইল যদি আমি চুরি করেই থাকি, তা হলে ভারতবর্ষে বসে থেকে লাভ কী ? মুফ্‌তি মহম্মদের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু তো এদেশেই। তাই না ?"

"রায়চৌধারি, তুমি গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। হানি আলকাদি অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। তার দলের ছেলেরা খুব গোঁড়া, নেতার হুকুমে তারা যা খুশি করতে পারে।"

"মান্টো, তুমি বিশ্বাস করো যে, আমি কারুর উইল চুরি করতে পারি ?"

"না, না, না, আমি সে-কথা ভাবব কেন ? তোমাকে তো আমি চিনি ! তা ছাড়া মুফ্‌তি মহম্মদের উইল নিয়ে তুমি কী করবে ? আসলে কী হয়েছে বলো তো ?"

"তার আগে তুমি আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও ! মুফ্‌তি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না, একথা ঠিক তো ?"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। উনি কোনওদিন স্কুল-কলেজে যাননি, পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তবে জ্ঞানী লোক ছিলেন।"

"উইল লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অনেকদিন ধরে ওঁর গলার আওয়াজও একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে উইল তৈরি হল কী করে ?"

"তাও তো বটে ?"

"এ সম্পর্কে তোমাদের কাগজে কিছু লেখেনি ?"

"না, কিছু লেখেনি। তবে হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নামে একজন ব্যবসায়ী তোমার সঙ্গে মুফ্‌তি মহম্মদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর তুমি ঐ কাণ্ডটা করেছ !"

"মান্টো, তোমাকে আমি আসল ঘটনাটা পরে বলব। তার আগে তুমি মুফ্‌তি মহম্মদ সম্পর্কে কী জানো আমাদের বলো তো। তুমি কি ওঁকে চিনতে ?"

"হ্যাঁ, ইজিপ্টে তাঁকে কে না চেনে। ওঁর বয়েস হয়েছিল একশো বছর।"

"আমি শুনেছি সাতানব্বই।"

"তা হতে পারে। ওঁর জীবনটা বড় বিচিত্র। খুব গরিবঘরের সন্তান ছিলেন। ওঁর যখন সাত বছর বয়েস, তখন ওঁর বাবা আর মা দু'জনেই মারা যান। সাত বছর বয়েস থেকে উনি রাস্তায় ভিক্ষে করতেন। একটু বড় হয়ে ওঠার পর শুরু করেন কুলিগিরি। তারপর তিনি হলেন বিদেশি ভ্রমণকারীদের গাইড। ইংরেজ আর ফরাসিরা যখন বিভিন্ন পিরামিডে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেন, সেই সময়ে তিনি অনেক অভিযানে ওদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। লেখাপড়া না শিখলেও উনি ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আর ফরাসি বলতে পারতেন। আর ওঁর গানের গলাও নাকি ছিল খুব সুন্দর। এই সময় ওঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু উনি ওখানেই থেমে থাকলেন না। গাইডের কাজ ছেড়ে দিয়ে উনি যোগ দিলেন একটা বিপ্লবী দলে। তখন ইজিপ্টের রাজা ছিলেন ফারুক। তুমি তো জানো, রাজা ফারুককে সরিয়ে দেবার জন্য এখানকার বিপ্লবীরা কত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মুফতি মহম্মদ হয়ে উঠলেন একটা প্রধান বিপ্লবী দলের নেতা।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই রাজা ফারুকের নাম শুনেছিস ? রাজত্ব হারাবার পর এই ফারুক বলেছিলেন, এরপর পৃথিবীতে আর মোটে পাঁচজন রাজা থাকবে। তাসের চারটে রাজা আর ইংল্যাণ্ডের রাজা ! হ্যাঁ, মান্টো তারপর বলো !"

মান্টো বললেন, "রাজা ফারুককে যে রাজত্ব ছেড়ে পালাতে হয়, তার পেছনে মুফ্‌তি মহম্মদের দলের অনেকটা হাত ছিল। রাজা ফারুকের পর এলেন জেনারেল নেগুইব। অনেকে তখন দাবি তুলেছিল যে, মুফ্‌তি মহম্মদেরই উচিত এ দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া। মুফ্‌তি মহম্মদ নিজে তা কিছুতেই হতে চাননি, তিনি বলতেন যে, তিনি এক সময় রাস্তায় ভিক্ষে করতেন, রাস্তাতেই তাঁর স্থান। এর পর জেনারেল নাসের যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন মুফ্‌তি মহম্মদ ঘোষণা করলেন যে, নাসেরই সুযোগ্য ব্যক্তি, আর বিপ্লব আন্দোলন চালাবার দরকার নেই। রাতারাতি তিনি সব কিছু ছেড়ে ফকিরের পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনওদিন তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন, নিজেও খুব সাধারণভাবে দিন কাটাতেন। দেশের মানুষ তাঁকে একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দের মতন। উনিও আগে বিপ্লবী ছিলেন, পরে সাধক হয়ে যান। মুফ্‌তি মহম্মদ কি কোনও আশ্রম করেছিলেন বা ওঁর অনেক বিষয়সম্পত্তি ছিল ?"

মান্টো বললেন, "না, না, সেসব কিছু না। ওঁর অনেক ভক্তশিষ্য ছিল বটে। কিন্তু উনি নিজেকে বলতেন ফকির। ওঁর নিজস্ব কোনও সম্পত্তিই ছিল

না।”

“তা হলে একজন ফকিরের উইল নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটি কেন? ফকিরের আবার উইল কী? অথচ আল মামুন সেই উইলের জন্যই আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। হানি আলকাদি আমার মুণ্ডু চাইছে। এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!”

“তার কারণ আছে, রায়চৌধারি! মুফ্‌তি মহম্মদ এক সময় একটা বড় বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। হঠাৎ সেই দল ভেঙে দেন। একটা বিপ্লবী দল চালাতে গেলে প্রচুর টাকা আর অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রাখতে হয়। মুফ্‌তি মহম্মদের দলেও সেরকম টাকা আর অস্ত্র ছিল। অনেকেরই প্রশ্ন, সেগুলো কোথায় গেল? তিনি নিজে কিছুই ভোগ করেননি। এখনও কয়েকটা বিপ্লবী দল এদেশে আছে, তুমি জানো নিশ্চয়ই। এই তো সেদিন এই রকম একটা দলের লোকেরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে খুন করেছে। আমি তোমাকে চুপিচুপি বলছি, আমার ধারণা, ঐ হানি আলকাদির দলের লোকেরাই এই খুনটা করেছে। তাহলেই বুঝতে পারছ, ওরা কত সাঙ্ঘাতিক!”

“তুমি চিন্তা কোরো না, মান্টো। হানি আলকাদি আমাকে এখন খুন করবে না, যদি তার একটুও বুদ্ধি থাকে!”

“তুমি এত নিশ্চিত হতে পারছ কী করে জানি না। আচ্ছা, এবার বলো তো, মুফ্‌তি মহম্মদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? তুমি তাঁর উইল চুরি করেছ, এরকম কথা উঠছে কেন?”

“তুমি বললে, মুফ্‌তি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না। তুমি কি জানো, তিনি হিয়েরোগ্লিফিক্‌স ভাষা জানতেন?”

মান্টো যেন হতবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, “আমি নিজেই তো ঐ ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে পারি না। তবে, আমি তোমার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। মনে পড়ছে যেন, বছর চল্লিশেক আগে মুফ্‌তি মহম্মদ একটা পিরামিডের ভেতরের লিপির মানে এক সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য অনেকে ভেবেছিল, উনি আন্দাজে বলেছেন। উনি তা হলে ঐ ভাষায় উইল রচনা করে গেছেন?”

“না। মুফ্‌তি মহম্মদ কোনও উইল করে যাননি। অন্তত আমি সে রকম কিছু জানি না। মৃত্যুর আগে উনি ওঁর শেষ একটা ইচ্ছে কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা আমি খানিকটা ধরতে পারি। ওঁর সেই শেষ ইচ্ছেটা এতই অদ্ভুত যে, আমি বেশ অবাক হয়েছিলুম। তাতে টাকা পয়সার কোনও ব্যাপারই নেই। আমি ছবি এঁকে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি যা বুঝেছি তা সঠিক কি না। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তারপর ছবি এঁকে জানালেন যে, আমি আগে নিজে যাচাই না করে যেন কারুকে না বলি!”

"যাচাই করা মানে ? কী যাচাই করবে ?"

"সেটা যাচাই না করে তো বলা যাবে না। যাক, সে-সব পরে জানতে পারবে। এখন অন্য কথা বলা যাক। তোমার বাড়ির খবর কী ? বৌদি কেমন আছেন ! তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি হল ?"

দু'একটা সাধারণ কথার পর মান্টো আবার বললেন, "রাজ্জা রায়চৌধারি, আমি তোমার সম্পর্কে সত্যি চিন্তিত। হানি আলকাদি তোমার ওপর রেগে আছে, আর তুমি এরই মধ্যে কায়রো এসে পড়েছ ! যদি টের পেয়ে যায়..."

কাকাবাবু বললেন, "আবার ওই কথা ! ছাড়ো তো ! শোনো, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলুম...রানি হেটেফেরিস-এর মমি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে ?"

মান্টো চমকে উঠলেন। তারপর তাঁর চোখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি এটাও জানো ! রানি হেটেফেরিসের মমি তার সারকোফেগাসের মধ্যে এক-একবার দেখা গেছে, আবার উধাও হয়ে গেছে। সবাই বলত সেটা অলৌকিক ব্যাপার। বছর তিরিশেক ধরে অবশ্য সেই মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তুমি এই প্রশ্ন করলে ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এমনিই। প্লেনে আসবার সময় সন্তুকে ঐ গল্পটা বলছিলুম কি না। তাই ভাবলুম, ও নিশ্চয়ই শেষটা শুনতে চাইবে। তিরিশ বছর ধরে রানির মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি ?"

মান্টো কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজায় ঠকঠক শব্দ হল। একজন কেউ বলল, "রুম সার্ভিস। ইয়োর লাঞ্চ ইজ রেডি স্যার !"

সন্তু দরজা খুলতেই হোটেলের বেয়ারার বদলে তিনজন সশস্ত্র লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল। একজন দাঁড়াল দরজায় পিঠ দিয়ে। অন্য দু'জন লম্বাটে ধরনের রিভলভার তুলে ধরল ওদের দিকে।

মিউজিয়ামের কিউরেটার মান্টোর মুখখানা ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। দিনদুপুরে হোটেলের কামরার মধ্যে যে এরকম গুণ্ডামি চলতে পারে, তা তিনি যেন কল্পনাই করেননি কোনওদিন। এরা এসেছে যখন, নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে ! এদের তিনজনেরই গায়ে খাকি জামা, একজনের গলায় একটা স্কার্ফ বাঁধা।

দরজায় ঠেস দেওয়া দলপতি ধরনের চেহারার লোকটি মান্টোকে বলল, "ইউ কিপ কোয়ায়েট। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ !"

কাকাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি হানি আলকাদির লোক ? সে কোথায় ?"

গলায় স্কার্ফ-বাঁধা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমরা এখানে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি। হুকুম করতে এসেছি। প্রফেসার, পায়ে জুতো পরে নাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব !"

কাকাবাবু বললেন, "প্রফেসার ? কে প্রফেসার ? আমি তো প্রফেসার নই। তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ !"

লোকটি পকেট থেকে একটা ফোটো বার করে দেখিয়ে বলল, "না। আমাদের ভুল হয়নি। নাউ, গেট গোয়িং !"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, পাকা কাজ ! শোনো, আমাকে ওরকমভাবে হুকুম দেওয়া যায় না। আমার এখন এখান থেকে যাবার ইচ্ছে নেই। হানি আলকাদির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, আমরা একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব !"

একজন লোক রুক্ষভাবে কাকাবাবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "আরে ল্যাংড়া, চল্ শিগগির !"

কাকাবাবুর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। চোখে জ্বলে উঠল আগুন। তিনি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন লোক তিনটিকে। তারপর তীব্র গলায় বললেন, "দিল্লিতে আমার ওপর তিনবার অ্যাটেম্প্ট হয়েছিল, এখানেও দিনের বেলা গুণ্ডামি করতে এসেছ। তোমরা ভেবেছ কী ? আমাকে চেনো না তোমরা !"

দু'হাতের ক্রাচ দুটো তুলে তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে মারলেন দু'জন লোকের হাতে। তাদের হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল, দু'জনেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। মান্টো ভয়ের চোটে মাটিতে বসে পড়লেন। সন্তু একটা রিভলভার তুলে নেবার চেষ্টা করতেই দরজায় ঠেস-দেওয়া তৃতীয় লোকটি শান্ত গলায় বলল, "স্টপ দ্যাট ফানি বিজ্‌নেস। আই উইল শুট টু কিল !"

কাকাবাবু সেই লোকটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "করো তো গুলি, দেখি তোমার কত সাহস ! আমায় গুলি করলে তোমার নিজের মাথা বাঁচবে ? হানি আলকাদি আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় চায়। আমাকে মেরে ফেললে সে কিছুই আর জানতে পারবে না !"

তৃতীয় লোকটি বলল, "হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তোমাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যদি যেতে অস্বীকার করো তা হলে তোমার পায়ে গুলি করে তোমার আর একটা পা'ও খোঁড়া করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। তুমি তাই চাও ?"

মাটিতে বসে থাকা অবস্থায় মান্টো বললেন, "রায়চৌধারি, প্লিজ মাথা গরম কোরো না ! ওরা যা বলে তাই-ই করো। ওদের কথা মেনে নাও !"

তৃতীয় লোকটি বলল, "প্রফেসার, তুমি ভালভাবে চলে এসো আমাদের সঙ্গে। তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না !"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ভদ্রভাবে আমাকে আগে অনুরোধ করলেই পারতে। ঘরে ঢুকে গুণ্ডার মতন রিভলভার ওঁচালে কেন ? তোমরা গুণ্ডা না বিপ্লবী ? তোমাদের দেশে আমি অতিথি হয়ে এসেছি, হানি আলকাদির উচিত ছিল নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা।"

তৃতীয় লোকটি অনুচ্চ গলায় হেসে উঠে বলল, "তুমি সত্যি একজন অদ্ভুত লোক, তা স্বীকার করছি। হানি আলকাদির নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়, আর তুমি তাকে ধমকাচ্ছ!"

কাকাবাবু বললেন, "তাকে আমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, আমার গায়ে হাত তুললে এ-দেশের সরকার হানি আলকাদিকে ছাড়বে না।"

"এখন কথা কাটাকাটি করার সময় নেই। তুমি এক্ষুনি চলো আমাদের সঙ্গে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কোনও ভয় নেই, সন্তু। আমি আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে তোকে খবর পাঠাব। যদি কোনও খবর না পাস, তা হলে সিদ্ধার্থকে বলবি এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টে খবর দিতে।"

মান্টোকে বললেন, "আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে!"

তৃতীয় লোকটি সন্তুদের বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে বেরুবে না। পুলিশে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার আংকেলের খবর আমরা যথাসময়ে জানিয়ে দেব!"

ওরা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

মান্টো উঠে এসে সন্তুকে ধরে বললেন, "বাপ রে বাপ! তিন তিনটে রিভলভার। আমি আগে কক্ষনো এরকম দেখিনি। যদি একটা থেকে গুলি ফশকে বেরিয়ে আসত! তোমার আংকল কী সাংঘাতিক লোক! আমার এখনও পা কাঁপছে!"

কাকাবাবু যে ক্রাচ দিয়ে দুটো রিভলভারধারীকে হঠাৎ অমন মারতে শুরু করবেন, তা সন্তু এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর অমন রুদ্র মূর্তি সে দেখেনি কখনও আগে। এখনও তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

এরই মধ্যে সন্তু ভাবল, এখন কী করা যায়? কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, টেলিফোন তুলে হোটেলের রিসেপশানিস্টকে সে-কথাটা জানিয়ে দিলে হয় না?

সন্তু সে-কথা মান্টোসাহেবকে বলতেই তিনি সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, "খবর্দার, ওরকম কিছু করতে যেও না! ওরা যা বলে গেল, তা-ই শুনতে হবে। তুমি জানো না ওরা কত নিষ্ঠুর। ঘরে ঢুকেই কেন যে ওরা গুলি চালাতে শুরু করল না, তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সেটাই ওদের স্টাইল। ওরা কারুকে কোনও কথা বলার সুযোগ দেয় না!"

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। সে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

তারপর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে নিয়ে বলল, "কাকাবাবু জানতেন, ওরা গুলি

করবে না। বুঝলেন না, সব জিনিসটাই রয়েছে কাকাবাবুর মাথার মধ্যে। উনি নিজে থেকে না বললে কেউ ওঁর কাছ থেকে জোর করে কথা বার করতে পারবে না!"

মান্টো বিরক্তভাবে বললেন, "হুঁঃ! কী যে ঝঞ্ঝাট! এসো, বিছানায় বসে থাকি, দশ মিনিট কাটুক। দিনের বেলা হোটেলের ঘর থেকে একজনকে ধরে নিয়ে গেল? ছি, ছি, ছি, কী যে হয়ে গেল দেশটা! দশ মিনিট বাদে আমাদের এই ঘর থেকে কে বার করবে? যদি কেউ এসে দরজা খুলে না দেয়?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিঃ মান্টো, আপনি হানি আলকাদিকে নিজের চোখে দেখেছেন কখনও?"

"না। দেখিনি, দেখতেও চাই না! তবে কাগজে ছবি দেখেছি অবশ্য!

"আমার ভয় হচ্ছে। কাকাবাবুকে কেউ হুকুমের সুরে কথা বললে উনি কিছুতেই তা শুনতে চান না। সেইজন্য ওরা রাগের মাথায় যদি কাকাবাবুকে কিছু করে বসে!"

"তোমার কাকাবাবুর উচিত ছিল এরকম কাজের ভার না নেওয়া! মুফ্‌তি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল, তা যাচাই করে দেখা ওঁর কী দরকার! আচ্ছা, ইয়াংম্যান, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো মুফ্‌তি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।"

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কাকাবাবু আমাকে কিছু বলেননি। তবে আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। কিন্তু মাফ করবেন, আমার আন্দাজটাও আমি আপনাকে এখন জানাতে পারব না!"

॥ ৭ ॥

কাকাবাবু ইজিপ্টে আগে এসেছিলেন, কায়রো শহর এবং কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গা তাঁর বেশ চেনা। এরা তাঁর চোখ বাঁধেনি। হোটেলের বাইরে এসে একটা জিপগাড়িতে তুলেছে। পাশে কেউ রিভলভার উঁচিয়ে নেই। এরা বুঝেছে যে, এই মানুষটিকে অযথা ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।

কায়রো শহর থেকে পাঁচ-ছ'মাইল দূরেই তিনটি পিরামিড পাশাপাশি। কাছেই জগৎ-বিখ্যাত স্ফিংকস। এখন টুরিস্ট সিজ্‌ন না হলেও স্ফিংকসের সামনে মোটামুটি ভিড় আছে। এই দুপুর-রোদের মধ্যেও। সেখানে রয়েছে অনেক উটওয়ালা আর ক্যামেরাম্যান। এরা টুরিস্টদের একেবারে কান ঝালাপালা করে দেয়।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, গাড়িটা এই জায়গার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল মেমফিসের দিকে। আগেকার তুলনায় এই রাস্তায় অনেক বেশি বাড়িঘর তৈরি

হয়ে গেছে। মধ্যে-মধ্যে দু'একটা উঁচু-উঁচু সরকারি বাড়ি। আগে এ-রাস্তায় অনেক খেজুরগাছ ছিল, এখন আর চোখে পড়ে না।

মেমফিস বেশি দূর নয়। কায়রো থেকে দশ-বারো মাইল। সড়ক-পথে খানিকটা যাবার পরেই শুরু হয়ে যায় মরুভূমি। গাড়িটা কিন্তু মেমফিসের দিকে গেল না, ধুধু মরুভূমির মধ্যে ছুটতে শুরু করল।

কাকাবাবু ভাবলেন, আগেকার দিনে আরবসর্দাররা মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকত দলবল নিয়ে। এখন আরবরা অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, তারা এয়ার-কণ্ডিশান্ড বাড়িতে থাকে। হানি আলকাদি কি এখনও পুরনো কায়দা বজায় রেখেছে ? নইলে এই মরুভূমির মধ্যে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় ! গাড়ির কোনও লোক একটিও কথা বলছে না। কাকাবাবুও তাদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন না !

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর দূরে দেখা গেল ভাঙা দেওয়াল-ঘেরা একটা প্রাচীন প্রাসাদ। তার অনেক ঘরই ভেঙে পড়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সেখানে মানুষজন থাকে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায়, একটা উঁচু পাঁচিলের আড়ালে দুটো উট বাঁধা আছে আর তিনখানা স্টেশান ওয়াগন।

জিপটা থামবার পর অন্যরা কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু নিজেই নেমে পড়লেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন চারদিকটা।

একজন কাকাবাবুকে বলল, "ফলো মি !"

খানিকটা ধ্বংসস্তূপ পার হবার পর ওরা এসে পৌঁছল একটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাথরের ঘরে। সেখানে খাট-বিছানা পাতা আছে। রয়েছে একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের আলমারি, সেটা বন্ধ।

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে কাকাবাবুকে বলল, "তুমি এইখানে বিশ্রাম নাও ! তোমার কি খিদে পেয়েছে ? তা হলে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বিশ্রাম নিতে চাই না, আমার জন্য খাবার পাঠাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি হানি আলকাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

লোকটি বলল, "অল ইন গুড টাইম। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? এখন বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। আশা করি তুমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। এই মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে তোমার ওই ক্রাচ নিয়ে তুমি এক মাইলও যেতে পারবে না !"

লোকটা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাকাবাবু চোখ বুজে, কপালটা কুঁচকে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে গেছে। একটা পা অকেজো বলে এখন আর চলাফেরার স্বাধীনতা নেই তাঁর। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তার জন্য দু'খানা জোরালো পা থাকা খুবই দরকারি। অনেকদিন বাদে তিনি ভাঙা পা'খানার জন্য দুঃখ বোধ

করলেন।

একটু বাদে কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন খাটে। দুপুরে খাওয়া হয়নি, তাঁর বেশ খিদে পাচ্ছে, কিন্তু এদের এখানে তিনি খেতে চান না। ভেতরে ভেতরে তাঁর এখনও খুব রাগ জমে রয়েছে। একবার রাগ হলে সহজে কাটতে চায় না।

শুয়ে পড়বার পর তিনি দেখলেন বালিশের পাশে দু'খানি বই। কৌতূহলের বশে তিনি প্রথমে একটি বই তুলে নিলেন। সেটি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব শেক্সপিয়ার। কাকাবাবু দারুণ অবাক হলেন। এই মরুভূমির মধ্যে, একটা প্রায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে শেক্সপিয়ারের কবিতা! অন্য বইটি দেখে আরও অবাক হলেন। সেটাও ইংরেজি কবিতা, 'সং অফারিংগ্‌স' বাই স্যার আর. এন টেগোর!

কাকাবাবু বিহ্বলভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালেন। বইখানি এমনি-এমনি এখানে পড়ে নেই। কেউ একজন মন দিয়ে পড়েছে। অনেক কবিতার লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া!

প্রায় আধ ঘণ্টা বই দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর একটা শব্দ শুনে কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

দেওয়াল-আলমারিটার পাল্লা খুলে গেছে। সেটা আসলে একটা দরজা। তার পাশ্‌ দিয়ে নেমে গেছে মাটির নীচে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একজন লোক দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

লোকটিকে দেখে প্রথমেই কাকাবাবুর মনে হল সিনেমার নায়ক। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। অন্তত ছ'ফুট লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য, গৌর বর্ণ, টিকোলো নাক, মাথার চুল আধ কোঁকড়ানো। মুখে সরু দাড়ি। সে পরে আছে একটা ব্লু জিন্‌স আর ফিকে হলদে টি শার্ট। সেই শার্টে একটা সিংহের মুখ আঁকা। তার কোমরে একটা বুলেটের বেল্ট, আর দু'পাশে দুটো রিভলভার। সে-দুটোর বাঁট আবার সাদা। লোকটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়।

লোকটিকে দেখে কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল।

লোকটি অর্ধেক ঠোঁট ফাঁক করে হেসে নিখুঁত উচ্চারণে ইংরিজিতে বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী, গুড আফটারনুন। আশা করি তোমার এখানে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমিই হানি আলকাদি?"

লোকটি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর মেঝেতে নেমে এসে বলল, "ঘরের মধ্যে এখনও গরম, বাইরে কিন্তু চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চলো আমরা বাইরে গিয়ে বসি। তোমাকে আমরা ফাইনেস্ট ইন্ডিয়ান টি খাওয়াব। সেই সঙ্গে ফিশ কাবাব! তোমরা বেঙ্গলিরা তো ফিশ ভালবাসো!"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব প্লেজানট্রিস বন্ধ করো। আগে আমি তোমার কাছ থেকে কয়েকটা এক্সপ্লানেশান চাই। তুমি আমাকে এখানে ধরে আনিয়েছ

কেন ? আমি ভারতীয় নাগরিক, আমাকে বন্দী করার কী অধিকার আছে তোমার ?"

হানি আলকাদি খুব অবাক হবার ভান করে বলল, "ধরে এনেছি ? মোটেই না ! তোমার কি হাত বাঁধা আছে ? তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি। তুমিই তো শুনলুম আমার দু'জন লোককে হাতে এমন মেরেছ যে, এক বেচারির কব্জি মুচকে গেছে !"

কাকাবাবু স্থির দৃষ্টিতে হানি আলকাদির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রিভলভার উঁচিয়ে নেমন্তন্ন করাই প্রথা ? আমি আগেও এখানে এসেছি, অনেক নেমন্তন্ন খেয়েছি, কোনওদিন তো এরকম দেখিনি ?"

হানি আলকাদি লজ্জিত ভাব করে বলল, "আরে ছি ছি ছি, হোয়াট আ শেম ! আমার লোকেরা এরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে ! আমি মোটেও সেরকম নির্দেশ দিইনি। অবশ্য তোমার সব কথা শুনেটুনে ওরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সত্যি বলছি, আমরা এখানে অনেকেই ভারতীয়দের খুব পছন্দ করি। আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ টেগোরের খুব ভক্ত। সবাই আমাকে বিপ্লবী বলে জানে, কিন্তু আমি একজন কবিও বটে। ছদ্মনামে আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কোনও ভক্ত কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে রাখে, এটা দেখা আমার পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। যাক গে যাক, আমি তোমার কাছে জানতে চাই..."

হানি আলকাদি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো তুলে ধরে বলল, "তুমি বড্ড রেগে আছ। এই নাও, বাইরে চলো, আকাশটা কী সুন্দর হয়ে আছে এখন, দেখলে তোমার মন ভাল হয়ে যাবে !"

অগত্যা কাকাবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখানকার ফাঁকা চত্বরে একটা টেবিল ও দুটি চেয়ার পাতা হয়েছে। কিছু লোকজন সেখানে খাবারদাবার আর চায়ের পট সাজিয়ে দিচ্ছে। আকাশটার একপ্রান্তে টকটকে লাল। তার পরের দিকটার মেঘে অনেক রঙের খেলা। বড় অপূর্ব দৃশ্য।

কাকাবাবু তবু বললেন, "শোনো হানি আলকাদি, আমার কতকগুলো প্রিন্সিপ্‌ল আছে। তোমার সঙ্গে বসে আমি খাবার কেন, এক গেলাস জলও খাব না। কারণ তুমি খুনি। তুমি বিনা দোষে আমাকে হত্যা করবার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলে দিল্লিতে !"

হানি আলকাদি বলল, "তোমাকে হত্যা করতে ? মোটেই না ! তা হলে এটা দ্যাখো !" বলেই চেঁচিয়ে ডাকল, "মোসলেম ! মোসলেম !"

অমনি একজন লোক বেরিয়ে এল পাশের গলি থেকে। কাকাবাবু তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। এই লোকটাই দিল্লিতে তাঁর আততায়ী হয়ে এসেছিল

এক রাত্তিরে।

হানি আলকাদি অনেক দূরের একটা খেজুরগাছ দেখিয়ে সেই লোকটিকে কী যেন বলল আরবি ভাষায়। তারপর নিজের একটা রিভলভার দিল লোকটির হাতে।

লোকটি চোখ বন্ধ করে এক পাশ ফিরে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে উড়ে গেল খেজুর গাছের ডগাটা।

হানি আলকাদি যেন তাতেও খুশি হল না। লোকটির পাশে গিয়ে ধমক দিয়ে কী যেন বলতে লাগল। লোকটি আবার রিভলভার তুলে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল। ট্রিগার টিপতে যাবে এমন সময় হানি আলকাদি চেঁচিয়ে বলল, "ব্লাডি ফুল! লুক বিহাইণ্ড!" বলেই লোকটির কাঁধের ওপর একটা থাপ্পড় কষাল।

লোকটি তবুও গুলি ছুঁড়ল এবং এবারেও খেজুরগাছটার ডগার খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

হানি আলকাদি হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "দেখলে? দেখলে তো? এই মোসলেম আমার বডিগার্ড। পৃথিবীতে যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওর মাথা ঠাণ্ডা। টিপ অব্যর্থ। তোমার কাছে ওকে পাঠিয়েছিলাম শুধু তোমাকে একটুখানি আঘাত দেবার জন্য। তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইলে ও ঠিকই মেরে আসত! তখনও তোমার সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতুম না। তোমাকে একটু ভয় দেখিয়ে আমাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম।"

হঠাৎ কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে হানি আলকাদি খুবই অনুতপ্ত গলায় বলল, "তোমাকে আঘাত দিতে হয়েছিল বলে আমি ক্ষমা চাইছি। ঐ যে বললুম, তখন তোমার সম্পর্কে ভাল করে জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলুম, তুমি আল মামুনের একটা ভাড়াটে লোক!"

হানি আলকাদির এতখানি বিনীত ব্যবহার দেখে কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন। কোমরে দু'দুটো পিস্তল থাকলেও লোকটি সত্যিই একজন কবি!

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবারে বুঝেছি। আমার অবশ্য বেশি আঘাত লাগেনি!"

"চলো, তা হলে কিছু খেয়ে নিই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, ভাল জাতের ভারতীয় চা একটু ঠাণ্ডা হলেই বিস্বাদ হয়ে যায়।"

দু'জনে এসে বসলেন টেবিলে। হানি আলকাদি যত্ন করে কাকাবাবুর প্লেটে খাবার তুলে দিল। চা বানাল সে নিজেই। কাকাবাবু চা পান করতে করতে আকাশে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

চা শেষ করে হানি আলকাদি একটা চ্যাপ্টা ধরনের সিগারেট ধরাল। তারপর কাকাবাবুর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, "এবারে দাও!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী?"

"মুফ্‌তি মহম্মদের উইল! তারপর আমার লোকেরা তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।"

"যদি আমি না দিই?"

"তা হলে তুমি আমাদের এখানেই সম্মানিত অতিথি হয়ে থাকবে। আমরা রোজ তোমাকে অনুরোধ করব। যাতে তুমি দিয়ে দাও! কিংবা সেগুলো কোথায় আছে তুমি বলে দাও! মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের গুরু মুফ্‌তি মহম্মদের সম্পদ আটকে রেখে তোমার কী লাভ? তা তো তুমি নিজে ভোগ করতে পারবে না। তুমি কি তা ইজিপ্টের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে? সে সব দিন আর নেই!"

"শোনো হানি আলকাদি, তোমাদের গুরু মুফ্‌তি মহম্মদের কোনও সম্পদ ছিল কি ছিল না তা আমি জানি না। থাকলেও তা ভোগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তিনি তো ফকির ছিলেন শুনেছি, তাঁর সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের এত আগ্রহ কেন?"

"ফকির হবার আগে তিনি এক বিরাট বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা ছিল তাঁর দলের। সে সব কোথায় গেল?"

"তিনি তো বিপ্লবী দল ভেঙে দিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এতদিনেও তোমরা তার সন্ধান পাওনি?"

"না। কেউ তা পায়নি। ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করত না। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি নিশ্চয়ই সব বলে দিয়ে গেছেন। সেই সন্ধানই আমরা জানতে চাই! উনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেগুলো আমাদের দিয়ে দাও!"

"সেগুলো তো আমার কাছে নেই। আল মামুন সেগুলো শুধু আমাকে দেখতে দিয়েছে, আমাকে তো দেয়নি!"

"ইয়া আল্লা! আমরা বরাবর ভেবেছি, সেগুলো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ। আল মামুনের একটা লোককে আমরা ধরে এনে টর্চার করেছিলুম, সেও ঐ কথাই বলেছে!"

"না, তা নয়। ছবিগুলোতে কী লেখা আছে তা একমাত্র আমি জানি। ছবিগুলো আল মামুন নিজের কাছেই রেখেছে, কিন্তু ওতে কী লেখা আছে তা ও কিছুই জানে না। অবশ্য ও লণ্ডনে লর্ড পেমব্রোকের কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে পারে, তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে ওগুলো ডিসাইফার করে দিতে পারবেন।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি কি জানো না, লর্ড পেমব্রোক মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মারা গেছেন? সুতরাং এখন পর্যন্ত শুধু তুমিই ওগুলোর অর্থ জানো! দেরি করার সময় নেই। আজই আমরা সব কিছু জানতে চাই।"

"আল মামুনও ছবিগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছিল। তাকে বলিনি। তা

হলে তোমাদের বলব কেন ?"

এই প্রথম হানি আলকাদি রেগে উঠল। টেবিলের ওপর এমন জোরে একটা ঘুসি মারল যে, কাপ-প্লেটগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝন করে। তার ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

সে বলল, "কী বলছ তুমি, আমাদের সঙ্গে ঐ পিশাচটার তুলনা ? আমরা বিপ্লবী, আমরা কেউ নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবি না! আর ঐ লোকটা, ঐ আল মামুন, ও তো একটা ঘৃণ্য লোভী মানুষ। ওর অনেক টাকা, তবু ওর টাকার আশ মেটে না। ও মুফ্‌তি মহম্মদকে দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিল শুধু এই লোভে যে, যদি মুফতি মহম্মদ শেষ পর্যন্ত ওকেই সব কিছুর সন্ধান বলে দেন! ওকে আমি খুন করব! নিজের হাতে।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে তোমরা যা ইচ্ছে করো। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন ?"

হানি আলকাদি নিজের রাগ খানিকটা সামলে নিল। তারপর সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে জড়াচ্ছি, তার কারণ, তুমিই এখন পর্যন্ত মুফতি মহম্মদের উইলের অর্থ জানো। তুমি যদি আমাদের বলতে না চাও, তা হলে আর কেউ যাতে জেনে না ফেলে, সেজন্য আমরা তোমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে বাধ্য হব!"

কাকাবাবু বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম। আমার কাটা মুণ্ডু কোনও কথা বলবে না!"

হানি আলকাদি এবারে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি টেগোরের দেশের লোক, গান্ধীর দেশের লোক, তোমরা ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করো, তা আমরা জানি। কিন্তু তোমরা তো আমাদের এদিককার দেশগুলোর অবস্থা জানো না! সে যাই হোক, তোমার মুণ্ডু কাটার কথা আমি এমনিই রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। তুমি আমাদের বলো বা না-ই বলো, আমরা তোমার কোনওই ক্ষতি করব না। তবু আমি কাতরভাবে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের দল এখন এমন অবস্থায় রয়েছে, প্রচুর টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র না পেলে আমরা আজ কাজ চালাতে পারব না! সেইজন্যেই মুফ্‌তি মহম্মদের উইলের ওপর আমরা এত আশা রেখেছি!"

কাকাবাবু হানি আলকাদির কাঁধ ধরে বললেন, "ওঠো, চেয়ারে বোসো! শোনো, তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাকে আমি খোলাখুলি বলছি, মুফতি মহম্মদ শেষ উইল করেছিলেন কি না, তা আমি জানি না। সত্যিই জানি না!"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। তা হলে বলো, ছবিতে এঁকে এঁকে উনি কী বুঝিয়েছিলেন ?"

"সেটা বলতে পারো এক ধরনের ছেলেমানুষি। একজন সাতানব্বই বছরের

বৃদ্ধের শেষ কৌতুক। সেটা জেনে তোমার বা আল মামুনের কোনওই লাভ হবে না। বরং আমার মতন যে-সব লোক ইতিহাসের ব্যাপারে কৌতূহলী, তাদেরই আগ্রহ হবে। মুফতি মহম্মদ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সেটা আমি যাচাই করার আগে যেন কারুকে না বলি। সেটা যাচাই করার পর আমি তোমাকে বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় কয়েকটা সাহায্য করতে হবে।"

"কী সাহায্য বলো?"

"আমাকে একটা পিরামিডের মধ্যে ঢুকতে হবে। হয়তো একটা সমাধি-কুয়োর মধ্যেও নামতে হতে পারে। এজন্য গাইড চাই, উট চাই, আর কিছু সরঞ্জাম চাই। তুমি যদি সে-সব ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি যদি কোনও গুপ্ত সম্পদের সন্ধান জানতে পারি, তবে তা তোমাকেই আগে জানাব।"

হানি আলকাদি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ইটস্ আ ডিল! তুমি কবে রওনা হতে চাও বলো? কাল সকালে?"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে দু'একটা কাজ আছে। মেমফিসে ডাগো আবদাল্লা নামে পুরনো একজন গাইডকে আমি চিনতাম। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আমার দরকার হবে। আর হোটেল ওয়েসিস থেকে আমার ভাইপো সন্তুকেও আনাতে হবে এখানে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিতে পারবে?"

হানি আলকাদি বলল, "তুমি এক্ষুনি চিঠি লেখো। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ডাগো আবদাল্লাও বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। তাকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।"

তারপরই সে তার লোকজনদের হুকুম করল কাগজ আর কলম আনবার জন্য। সে-সব এসে গেলে কাকাবাবু চিঠি লিখতে শুরু করলেন!

স্নেহের সন্তু,

আমি ভাল আছি। এরা আমাকে বেশ যত্নে রেখেছে। হানি আলকাদি লোকটি মন্দ না, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে আমরা একটা অভিযানে বেরুব, সেজন্য তোকে আসতে হবে এখানে। তোকে যা করতে হবে তা বলছি। এই চিঠি যে নিয়ে যাবে, সে কাল সকালে তোকে একটা উট ভাড়া করে দেবে। সেই উটে চেপে তুই মেমফিসে চলে আসবি। সেখানে স্টেপ পিরামিড আছে, চিনতে তোর অসুবিধে হবে না। অন্য পিরামিডের চেয়ে এর চেহারাটা একেবারেই আলাদা। এর বাইরের গা দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন উঠে গেছে। তুই সেখানে এসে অপেক্ষা করবি। এখানকার লোক তোকে গিয়ে নিয়ে আসবে।

চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধের মধ্যে দেখা হবে।

ইতি কাকাবাবু

পুনশ্চ : সিদ্ধার্থকে সঙ্গে আনবার কোনওই দরকার নেই। ওকে বুঝিয়ে বলবি। আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, তাতে সরকারি লোকজনদের না জড়ানোই ভাল। মান্টোকে বলবি, আমি আর তিন-চারদিন পরে ওর সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা করব!

॥৮॥

বিমান বলল, "আরে সন্তু, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কাকাবাবু তো চিঠিতে লিখেছেন সিদ্ধার্থদাকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে। আমাদের কথা তো বারণ করেননি। তাছাড়া আমি তো সেই সেন্সে ঠিক টেকনিক্যালি সরকারি লোক নই!"

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "যাই বলো বিমানদা, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে কাকাবাবু আমাকে একলাই যেতে বলেছেন। অন্য কারুর সাহায্য নেবার দরকার হলে তা নিশ্চয়ই জানাতেন।"

বিমান বলল, "তুই কিছু বুঝিস না। বন্দী অবস্থায় কেউ অত কিছু লিখতে পারে? ঐ যে কাকাবাবু লিখেছেন না 'এরা আমাকে খুব যত্নে রেখেছে', তার মানে কী বুঝলি তো? দু'পাশে দু'জন লোক লাইট মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

রিনি বলল, "আমি তো যাবই! শুধু ছেলেরাই বুঝি একা-একা অ্যাডভেঞ্চার করবে!"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই যাবি! আমি আথেন্স থেকে হুড়োহুড়ি করে চলে এলুম, তার আগেই দেখি যত সব কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি থাকলে কি আর ওরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে পারত?"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, "তুমি থাকলে কী করতে, বিমান? শুনলেই তো যে তিনজন লোক এসেছিল, উইথ আর্মস। কাকাবাবু দু'জনকে টিট করেছিলেন, কিন্তু থার্ড লোকটা ছিল সত্যিকারের টাফ্।"

বিমান বলল, "আমি থাকলে তাকে একখানা স্কোয়ার কাট ঝাড়তুম! জিজ্ঞেস করো না সন্তুকে, সুন্দরবনে 'খালি জাহাজের রহস্য' সমাধান করতে গিয়ে আমি ক'টা লোককে শায়েস্তা করেছিলুম।"

সন্তুর এসব কথাবার্তা একদম পছন্দ হচ্ছে না। সে ছটফট করছে কখন বেরিয়ে পড়বে।

আগের দিন কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যাবার পর সন্তু আর মান্টোসাহেব এক ঘণ্টার আগে ছাড়া পায়নি। দশ মিনিট পরে ওরা রিসেপশনে ফোন করেছিল,

কেউ উত্তর দেয়নি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত এক ঝাড়ুদার দরজা খুলে দিয়েছিল।

মান্টোসাহেব একটু পরেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সন্তু চুপচাপ বসে ছিল ঘরের মধ্যে। সেইরকমই ছিল কাকাবাবুর নির্দেশ।

সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ এসে সব শুনে হতবাক। এরই মধ্যে কাকাবাবুকে গুম্ করেছে ? দিনদুপুরে ? সিদ্ধার্থ তক্ষুনি একটা হৈচৈ বাধিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্তু তাকে নিষেধ করেছে। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে, বিপদ দেখলে একেবারে ঘাবড়ে গেলে চলে না। কাকাবাবু বলে গেছেন কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে কোনও খবর না দিলে তারপর এখানকার গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

সিদ্ধার্থ সন্তুকে তখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাতেও সন্তু রাজি হয়নি। কাকাবাবু খবর পাঠাবেন এই হোটেলেই। এখানেই সন্তুকে অপেক্ষা করতে হবে। সিদ্ধার্থ বলেছিল, "তুমি রাত্তিরে এই হোটেলে একলা থাকবে ? তা হতেই পারে না। আবার যদি হামলা হয় ?"

সে-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটু পরেই। রাত আটটার সময় সেই হোটেলে এসে হাজির হয়ে গেল বিমান। আথেন্স থেকে সে অন্য একটা ফ্লাইট ধরে চলে এসেছে। ঠিক হল, বিমানই থাকবে সন্তুর সঙ্গে ঐ হোটেল-ঘরে।

প্রায় মাঝরাত্তিরে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল একজন লোক। মাঝবয়েসি, মোটাসোটা গোলগাল ধরনের চেহারা। মাথাভর্তি চকচকে টাক। দেখলে বিপ্লবী বলে মনেই হয় না।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি একটি কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্সির লোক। তাঁর এক মক্কেল এই জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে, এবং তাঁকে বলা হয়েছে কাল সকালে একটা উট ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। কাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় উট তৈরি থাকবে স্ফিংকসের সামনে। এদিককার পার্টি যেন বাসে করে সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়।

বিমান সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার মক্কেল কে ? কোথা থেকে এই চিঠিটা এসেছে ?"

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, "তা বলা যাবে না। বিজনেস সিক্রেট। গুড নাইট !"

চিঠি পড়েই সন্তু ঠিক করেছিল সে একাই যাবে। কিন্তু বিমান ঝামেলা বাধাল। সন্তুকে সে কিছুতেই একা ছাড়বে না। তা ছাড়া সে নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। রিনিরও সেই একই আবদার।

সন্তু অনেকবার আপত্তি করার পর বিমান বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে ! তুই উটের পিঠে চেপে মেমফিস যাবি, আমরা বুঝি আর একটা উট ভাড়া করে তোর পাশাপাশি যেতে পারি না ! অন্য টুরিস্টরা যাবে না ? যে-কেউ ইচ্ছে করলে

মেমফিসের পিরামিড দেখতে যেতে পারে।”

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। স্ফিংকসের কাছে এসে সন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট উটে চাপল, বিমান আর রিনি বসল আর-একটা ভাড়া-করা উটে।

স্ফিংকস আর কাছাকাছি পিরামিডগুলোতে সকালবেলাতেই অনেক টুরিস্ট এসেছে। সন্তু সতৃষ্ণভাবে একবার স্ফিংকসের দিকে তাকাল। তার ভাল করে দেখা হল না।

বিমান বলল, “জানিস সন্তু, সন্ধেবেলা এখানে সনে-লুমিয়ের হয়। আলোর খেলাতে পুরনো মিশরের ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়।”

রিনি বলল, “আমাদের দিল্লিতে লালকেল্লায় যে-রকম আছে ?”

সন্তুর এসব কথায় মন লাগছে না। সে খালি ভাবছে, কখন কাকাবাবুর কাছে পৌঁছবে। সে শুনেছে, আরব গেরিলারা মানুষ খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না।

উটের পিঠে চাপার অভিজ্ঞতাও সন্তুর এই প্রথম। সমস্ত শরীরটা দোলে। সামনে ধুধু করছে মরুভূমি। সন্তুর হঠাৎ যেন সব ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। সে স্বপ্ন দেখছে না তো ? সত্যিই কি সে উটের পিঠে চেপে মরুভূমি পার হচ্ছে ?

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা :

ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !

পাশ থেকে বিমান বলল, “দেখবি কাল গায়ে কীরকম ব্যথা হয়। তখন উটে চড়ার মজাটা টের পাবি। বিছানায় শোবার বদলে সারা রাত ইচ্ছে করবে দাঁড়িয়ে থাকতে।”

রিনি জিজ্ঞেস করল, “আমরা কি আজই ফিরে আসব ?”

বিমান বলল, “এই রে, এরই মধ্যে ফেরার চিন্তা ? চল্ তা হলে এক্ষুনি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।”

রিনি বলল, “মোটেই না ! আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ?”

বিমান বলল, “দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার সারাদিনও লেগে যেতে পারে। উটের যেরকম মেজাজ মর্জি হবে।”

রিনি জিজ্ঞেস করল, “এই সন্তু, তুই কথা বলছিস না কেন রে ? তুই গোমড়া মুখে রয়েছিস সকাল থেকে...”

গতকাল এয়ারপোর্টে রিনি যে সন্তুকে অপমান করেছিল তা বোধহয় সে নিজেই ভুলে গেছে। তারপর থেকেই সন্তুর আর কথা বলার ইচ্ছে নেই রিনির সঙ্গে।

সন্তুর উটটা যে চালাচ্ছে, তার বয়েস প্রায় সন্তুরই সমান। সে দু'চারটে

ইংরিজি শব্দ মোটে জানে। সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে 'ইয়েস মাস্টার, নো মাস্টার' বলে।

ওদের দুটো উট ছাড়া আর কোনও টুরিস্ট যাচ্ছে না উটের পিঠে চেপে। অসহ্য গরম, রোদ একেবারে গনগন করছে। এত গরমেও কিন্তু একটুও ঘাম হয় না।

মাত্র আধ ঘণ্টা চলার পরেই মনে হল দূর থেকে একটা বিশাল কালো রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বিমান চেঁচিয়ে বলল, "এই রে, সর্বনাশ, ঝড় আসছে!"

সন্তুর উট-চালক মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নো অ্যাফ্রেড মাস্টার! নো ডেঞ্জার!"

দু'জন চালকই তাদের দুটো উটকে বসিয়ে দিল মাটিতে। সন্তুরা নেমে পড়ল চটপট। সবাই মিলে উটের পিঠের আড়ালে বসল। বিমান বলল, "ঝড়ের ধুলো একদিক থেকে আসে তো, তাই একটু আড়ালে বসলেই গায়ে কিছু লাগে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ঘূর্ণিঝড় হয় না?"

বিমান বলল, "তাও হয় মাঝে-মাঝে। তখন উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয় আর কান ঢাকা দিতে হয়।"

রিনি বলল, "কী দারুণ লাগছে! ঠিক সিনেমার মতন। আজই ফিরে গিয়ে মা'কে একটা চিঠি লিখব।"

বিমান বলল, "তুই এখনও ভাবছিস আজই ফিরবি? মেমফিসে তোকে একটা রেস্ট হাউসে রেখে আমি আর সন্তু যাব কাকাবাবুর কাছে।"

রিনি বলল, "আহা-হা, অত শস্তা নয়। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে!"

এর পরেই মাথার ওপর দিয়ে ঝড় এসে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, কিছুই আর দেখা যায় না। সেই প্রচণ্ড শনশন শব্দ। ওরা কান ঢেকে মুখ নিচু করে রইল, আর কথা বলারও উপায় নেই।

সেই ঝড় যেন আর থামতেই চায় না। কতক্ষণ যে চলল তার ঠিক নেই। উট দুটো মাঝে-মাঝে ভ-র-র-র ভ-র-র-র করে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, শুধু সেই শব্দ ঝড়ের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যায়।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ ঝড় শেষ হয়ে গেল এক সময়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। আগে মরুভূমিটা ছিল সমতল। এখন কাছাকাছি অনেকগুলো বালির পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। বেশি দূর পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

বিমান বলল, "ঝড় হয়ে যাবার এই আর এক মুশকিল। এই সব স্যান্ড ডিউনস পার হতে উটগুলোর বেশি সময় লাগে।"

আবার ওরা চেপে বসল উটের পিঠে। আর কোনও ঘটনা ঘটল না। প্রায়

দু'ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে যাত্রা। তারপর দূরে দেখা গেল কয়েকটি পিরামিডের চূড়া, আর মেমফিস শহরের চিহ্ন।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, এই মেমফিস ছিল মিশরের প্রাচীন রাজধানী। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের দেশে আর্য-সভ্যতার জন্ম হয়নি।"

সন্তু মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে বলল, "স্টেপ পিরামিড কোথায়? ঐ তো, ঐ যে! সত্যি দেখলেই চেনা যায়।"

রিনি বলল, "ঐ পিরামিডটার ছবি অনেক বইতে দেখেছি। আচ্ছা বিমানদা, বেশির ভাগ বইতে ঐ পিরামিডটার ছবিই দেয় কেন? আরও তো কত পিরামিড রয়েছে।"

বিমান বলল, "কারণ এই পিরামিডটাই সবচেয়ে প্রাচীন। একেবারে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।"

সন্তু উটওয়ালাকে ঐ পিরামিডের দিকে যেতে বলল।

স্টেপ পিরামিডের গায়ে ধাপে-ধাপে খাঁজ কাটা আছে। দূর থেকে সিঁড়ির মতন দেখালেও কাছে এলে বোঝা যায় ধাপগুলো অনেক উঁচু উঁচুতে। সহজে বেয়ে ওঠার উপায় নেই।

ওরা উট থেকে নেমে দাঁড়াল। সেখানে আর কোনও লোক নেই।

উটওয়ালা দু'জন বলল, "গাইড কল মাস্টার? ফিফটি পিয়াস্তা! মি গিভ ফিফটি পিয়াস্তা!"

সন্তু বলল, "না, গাইডের দরকার নেই। আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।"

রিনি বলল, "বাবা রে, একটাও মানুষজন নেই। আমাদের যদি এখানে মেরে পুঁতে রাখে, কেউ টেরও পাবে না।"

এতক্ষণ বাদে সন্তু রিনিকে বলল, "অতই যদি ভয়, তা হলে কে আসতে বলেছিল তোকে?"

রিনি বলল, "বেশ করেছি!"

তারপর সে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

বিমান বলল, "চিঠিটা জেনুইন ছিল তো? আমি কাকাবাবুর হাতের লেখা চিনি না।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জেনুইন। তা ছাড়া এখানে আর কে বাংলাতে চিঠি লিখবে?"

খানিকবাদে দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল।

সন্তু বলল, "ঐ আসছে!"

রিনি বলল, "মরুভূমিতে যদি জিপগাড়ি চলে, তা হলে আর উটে চড়বার দরকার কী? আমার বিচ্ছিরি লেগেছে!"

জিপটা কাছে এসে থামতেই তার থেকে একজন বলশালী লোক নামল। লোকটি যত না লম্বা, তার চেয়ে বেশি চওড়া।

সে প্রথমেই সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সোনটু ? সোনটু ? মি ডাগো আবদাল্লা। মি কাম ফ্রম রায়চৌধুরী। ইউ কাম উইথ মি !"

বিমান বলল, "তোমার কাছে রায়চৌধুরীর কোনও চিঠি আছে ?"

ডাগো আবদাল্লা মাথা নেড়ে জানাল, না।

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কী করে বিশ্বাস করব !"

আচমকা যে-রকম মরুভূমিতে ঝড় উঠেছিল, ঠিক সেইরকমভাবে আচমকা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

স্টেপ পিরামিডের আড়াল থেকে খুব জোরে ছুটে এল একটা স্টেশন ওয়াগন। বিকট শব্দ করে সেটা ব্রেক কষল ডাগো আবদাল্লার ঠিক পেছনে। চাপা পড়বার ভয়ে ডাগো একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের দিকে।

গাড়ি থেকে টপটপ করে নেমে পড়ল চারজন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন অতিকায় চেহারার লোক প্রায় এক হাতেই সন্তুকে একটা বেড়ালছানার মতন উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল গাড়ির মধ্যে।

রিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

একজন লোক বিমানের দিকে ফিরে বলল, "ইউ গো ব্যাক।"

আর-একজন লোক মাটিতে পড়ে থাকা ডাগো আবদাল্লার পিঠের ওপর নিজের বুটজুতোসুদ্ধু পা তুলে দিয়েছে। কর্কশ গলায় সে বলল, "হেই ডাগো, ইউ ওয়ান্ট টু ডাই ?"

রাগে, অপমানে ডাগো আবদাল্লার মুখখানা অদ্ভুত হয়ে গেছে। মানুষটার অতবড় চেহারা, কিন্তু চারখানা রাইফেলের বিরুদ্ধে সে কী করবে ! ডাগো যে জিপে এসেছে, তাতে রয়েছে শুধু একজন ড্রাইভার। তার দিকেও একজন রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

ডাগোর পিঠে যে পা তুলে আছে, সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ডাগো, তুই মরতে চাস ? আমি ঠিক পাঁচ গুনব !"

ডাগো ফিসফিস করে বলল, "নো, এফেন্দি !"

লোকটি পা'টা সরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। সেটা ডাগোর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা তোর মালিককে দিবি ! বলবি, বারো ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চাই !"

ডাগো আস্তে-আস্তে মাটি থেকে উঠল। দুটো রাইফেল তাক করা রয়েছে তার দিকে। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে জিপে উঠল।

একজন হুকুম দিল, "স্টার্ট !"

জিপটা চলতে শুরু করার পরেও কিছুক্ষণ রাইফেলের নল তোলা রইল

সেদিকে।

জিপটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ওরা বিমান আর রিনির দিকে ফিরল। রিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে আছে, তার সারা শরীর কাঁপছে। বিমান তাকিয়ে আছে অসহায়ভাবে। সন্তুকে নেবার জন্য দুটো দলের লোক এসেছে। এর মধ্যে কারা যে কোন্ দলের, তা সে বুঝতে পারছে না। তার নিজেরও কিছুই করার নেই। সুন্দরবনের ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা আর আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করা তো এক কথা নয়। এরা প্লেন ধ্বংস করে, ডিনামাইট দিয়ে গোটা বাড়ি উড়িয়ে দেয়।

রাইফেলের নল দোলাতে দোলাতে একজন বলল, "গেট গোয়িং ! গেট গোয়িং !"

রিনির হাত ধরে বিমান এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। ওদের উটওয়ালা ততক্ষণে তার উটটাকে বসিয়ে ফেলেছে। বিমান রিনিকে নিয়ে চেপে বসল উটের পিঠে।

ওদের একজন এবার অকারণেই আকাশের দিকে রাইফেল তুলে একবার ট্রিগার টিপল। সেই আওয়াজে উট দুটোই দৌড় দিল তড়বড়িয়ে।

স্টেশান ওয়াগনটা সন্তুকে নিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

ওদিকে হানি আলকাদি কাকাবাবুর অভিযানের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। উটের বদলে কাকাবাবু যাবেন গাড়িতে, তাতে সময় বাঁচবে। হানি আলকাদিও যাবে অন্য একটি গাড়িতে। কাকাবাবুর সঙ্গে তার শর্ত হয়েছে যে, হানি আলকাদি তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে গিজাতে। সেখান থেকে সে আর এগুতে পারবে না। কাকাবাবুর সঙ্গে শুধু যাবে সন্তু আর ডাগো আবদাল্লা। কাকাবাবু যদি চার ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসেন, তা হলে হানি আলকাদি তাঁর খোঁজ নিতে যাবেন।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাকাবাবু একাই কাটিয়েছেন। হানি আলকাদির দেখা পাওয়া যায়নি। অন্য লোকজনও বিশেষ কেউ ছিল না মনে হয়। সন্ধের দিকে এক-এক করে সব আসতে লাগল। এরা বিপ্লবী হলেও দিনের বেলায় নিশ্চয়ই অন্য কাজ করে।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কয়েকটা মশাল জ্বালা হল চত্বরে। কাকাবাবু বাইরেই চেয়ার পেতে বসে ছিলেন, এক সময় সেখানে হাতে একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত হল হানি আলকাদি। আজ তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জলপাই-সবুজ রঙের পোশাক পরা, মাথার চুলে একটা রিবন বাঁধা। চোখ দুটো একেবারে ঝকঝক করছে।

হাসিমুখে সে বলল, "হ্যালো, প্রফেসার ! হাউ আর ইউ দিস ইভনিং ?"

কাকাবাবুও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা অনেকেই আমাকে প্রফেসার

বলো কেন ? আমি তো কখনও কোনও কলেজে পড়াইনি !”

হানি আলকাদি বলল, “ওঃ হো ! আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের এখানে অনেক কলেজেই আগে ইন্ডিয়ান প্রফেসাররা পড়াতেন। সেইজন্য কোনও ডিগনিফাইড চেহারার ইন্ডিয়ান দেখলেই আমাদের প্রফেসার মনে হয়। যাই হোক, তুমি একা-একা বিরক্ত হয়ে যাওনি তো ? বাইরে বসে আকাশের রং-ফেরা দেখছিলে ?”

“সূর্যাস্তের সময় এখানকার আকাশ সত্যি বড় অপূর্ব দেখায়। দুপুরে একবার ঝড় উঠেছিল, তারপর আকাশ আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল !”

“মিঃ রায়চৌধুরী, একটা কথা বলতে পারেন ? পৃথিবীর থেকে আকাশের রং আমার বেশি সুন্দর লাগে। আকাশে নীল, সাদা, লাল, সোনালি, রুপোলি, কালো সব রং-ই দেখা যায়। কিন্তু সবুজ রং কখনও দেখা যায় না কেন ? আমি প্রায়ই এ কথাটা ভাবি।”

কাকাবাবু জোরে হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, “তোমাকে দেখার আগে তোমার সম্পর্কে কত কথাই শুনেছিলাম। তুমি নাকি সাঙ্ঘাতিক এক বিপ্লবী, ভয়ংকর নিষ্ঠুর। এখন তো দেখছি তুমি একটি স্বপ্ন-দেখা নরম স্বভাবের যুবক।”

হানি আলকাদি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, “যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারা কী করে বিপ্লবী হবে ?”

তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, “ইয়োর নেফিউ শুড বি হিয়ার এনি মিনিট। তুমি কি আজ রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়তে চাও ?”

কাকাবাবু বললেন, যতটা এগিয়ে থাকা যায়, ততটাই ভাল। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করা যেতে পারে।”

মশালটা বালিতে গেঁথে হানি আলকাদি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, “মুফতি মহম্মদ ছবির উইলে কী লিখে গেছেন, তা জানার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে। তুমি তা বলবে না, না ?”

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, “আর একটু ধৈর্য ধরো !”

এই সময় গাড়ির শব্দ হতেই দু'জনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

গাড়িটা থামতেই ডাগো আবদাল্লা ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

অতবড় চেহারার একটি লোককে শিশুর মতন কাঁদতে দেখে কাকাবাবু প্রথমে অবাক হলেও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলেন কী ঘটেছে।

হানি আলকাদি প্রায় লাফিয়ে উঠে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ? ছেলেটাকে আনিসনি ?”

ডাগো আবদাল্লা বলল, “আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও, এফেন্দি ! আমার চোখের সামনে থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি কিছুই করতে

পারিনি। ওদের চারটে রাইফেল ছিল।"

হানি আলকাদি চিৎকার করে বলল, "বেওকুফ, আগে বল, কারা নিয়ে গেছে! তুই তাদের চিনেছিস? কাদের এত সাহস যে, আমার লোকের ওপর হাত দেয়?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "হ্যাঁ চিনি, এফেন্দি। ওরাও আমাকে চিনেছে। আমার নাম ধরে ডাকল। ওরা আল মামুনের লোক!"

হানি আলকাদির সুন্দর মুখখানা এবারে রাগে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠল। সে ডাগো আবদাল্লার চুলের মুঠি ধরে বলল, "সেই কুকুরটা তোর সামনে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে গেল, তুই বেঁচে ফিরে এলি? ওদের একটাকেও তুই খতম করেছিস? আল মামুন! আজ আমি ওকে শেষ করে দেব। নিজের হাতে ওকে একটু-একটু করে কাটব!"

ডাগোকে ছেড়ে দিয়ে হানি আলকাদি হাততালি দিয়ে নিজের লোকদের ডাকতে লাগল।

ডাগো বলল, "একটা চিঠি দিয়েছে। বলেছে, বারো ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চাই।"

কাকাবাবু আরবি ভাষা মোটামুটি জানেন। ওদের কথাবার্তা প্রায় সবটাই বুঝতে পারছিলেন। এবারে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি চিঠিটা।"

চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা নয়। লিখেছে হানি আলকাদিকে। চিঠিটা এই রকম :

আল মামুন নিজে হানি আলকাদির মতন একজন নগণ্য, নির্বোধ লোককে চিঠি লেখার যোগ্য মনে করে না। আল মামুন তার দলের একজন লোক মারফত জানাচ্ছে যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে বন্দী করে রাখার কোনও অধিকার হানি আলকাদির নেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী আল মামুনের লোক। আল মামুনের কাছেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী আল মামুন, তার কথা সবাই মান্য করবে। যে আল মামুনের অবাধ্য হবে, সে শাস্তি পাবে। হানি আলকাদি যদি ১২ ঘণ্টার মধ্যে আল মামুনের আদেশ না পালন করে, তা হলে সে কঠিন শাস্তি পাবে। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ১২ ঘণ্টা পার হলে তাঁর ভাইপো খুন হবে, তার মৃতদেহ কেউ খুঁজে পাবে না। নির্বোধ হানি আলকাদি যেন আরও বেশি নির্বোধের মতন কাজ না করে।

চিঠিটা পড়ার সময় কাকাবাবু কোনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখালেন না। শান্তভাবে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন হানি আলকাদির দিকে।

হানি আলকাদি চিঠিটা পড়তে পড়তে যেন লাফাতে লাগল। পড়া হয়ে গেলে কাগজটা গোল্লা পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ওপরে লাথি কষাল কয়েকটা। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, "একটা আলুর বস্তার ইঁদুর!

বাঁধা কপির পোকা ! নর্দমার আরশোলা ঐ আল মামুনটাকে আমি টিপে মেরে ফেলব ! আজ রাতে আমার ফোর্স নিয়ে গিয়ে ঐ বাঁদরের গায়ের উকুনটাকে আমি সবংশে শেষ করব ।"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "হানি আলকাদি, এখন চ্যাঁচামেচি করার সময় নয়, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই !"

হানি আলকাদি এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী, হানি আলকাদি যখন রেগে গেছে, তখন আল মামুন আজই খতম্ হবে। মরুভূমিতে বালি আজ আল মামুনের রক্ত শুষবে ! বাজপাখিরা আল মামুনের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবে ।"

কোমর থেকে সে এমনভাবে রিভলভার বার করল, যেন আল মামুন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি সে গুলি করবে ।

এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে চারপাশে। তারা ডাগো আবদাল্লার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনছে ।

কাকাবাবু হানি আলকাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো, আল মামুনকে তো আমি ব্যবসায়ী বলেই জানতাম। কিন্তু তারও কি তোমার মতন দল আছে নাকি ? সে এত রাইফেলধারী পেল কোথায় ?"

"আছে একটা ছোট দল। সে এমন কিছু না। আমার দলে হাজার-হাজার লোক আছে। ওকে আমরা, এই দ্যাখো, এইরকমভাবে একটা মুর্গির মতন জবাই করব !"

"তোমাদের দু'দলের কি আগে থেকেই ঝগড়া ছিল ?"

"ওর দলকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। ওর দল ধর্মীয় গোঁড়ামি ছড়াতে চায়, আর আমার দল চায় দেশের সব মানুষের উন্নতি ।

"এর আগে আমরা ওদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু আল মামুনের দল যদি আমার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে আমি ওদের শেষ করে দেব। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী ওকে কে করেছে ? আমিই মুফতি মহম্মদের আসল উত্তরাধিকারী ।"

"আল মামুন বুদ্ধিমান লোক। আমার ভাইপো সন্তুকে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তুমি কী করে খুঁজে বার করবে ?"

"আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার ক্ষমতা আছে আল মামুনের ? আমি আগে ওর মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে দেব !"

"তার আগেই যদি ওরা সন্তুকে মেরে ফেলে ?"

"তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী..."

"হ্যাঁ, চিন্তা আমাকে করতেই হবে। তোমাদের দু'দলের ঝগড়ার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। আল মামুন মাত্র বারো ঘণ্টা সময় দিয়েছে ! তার শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই !"

"অ্যাঁ ? কী বলছ তুমি ? ঐ শয়তানের দাঁতের ময়লাটা ভয় দেখালেই আমরা ভয় পেয়ে যাব ? তা হতেই পারে না !"

"মাত্র বারো ঘণ্টা সময়। এর মধ্যেই সন্তুকে আমি ফেরত চাই। কোনও ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শোনো, আমি দুটো উপায় ভেবেছি। এক হচ্ছে, আমাকে ফেরত পাঠানো। আল মামুন তার চিঠিতে শুধু আমাকেই ফেরত দিতে বলেছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাহসী মানুষ বলে ভেবেছিলুম। আল মামুনের হুমকি তুমি মেনে নেবে ? তুমি কি ওর ক্রীতদাস ? তোমাকে ও হাফ মিলিয়ান ইন্ডিয়ান টাকা দিতে চেয়েছিল, তুমি তা নাওনি, সে খবরও আমি জানি !"

"শোনো হানি আলকাদি। ঐ সন্তু ছেলেটাকে আমি বড্ড ভালবাসি। ওর কোনও ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমার দলের এত শক্তি, তবু তোমরা আমার ভাইপোকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারলে না, মাঝপথ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে।"

"যদি আমরা তোমাকে না ছাড়ি ? আল মামুনের হুকুম আমি কিছুতেই মানব না !"

"তোমাদের দুই দলের ঝগড়ার জন্য আমার ভাইপোটা মারা যাবে ? হানি আলকাদি, তোমাকে দেখে আমি যা বুঝেছি, তুমি বীর, তুমি লড়াই করতে ভালবাস, কিন্তু কোনও ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই তুমি কোনওদিন মারতে পারবে না ! কিন্তু আল মামুন তা পারে।"

"তুমি দুটো উপায়ের কথা বলছিলে। দ্বিতীয়টা কী ?"

"আল মামুনকে তুমি একটা চিঠি লেখো। সে যেমন তোমাকে ধমকিয়েছে আর গালাগালি দিয়েছে, সেই রকম তুমি যতখুশি ধমক আর গালাগালি দাও। সেই সঙ্গে লেখো যে, সন্তুকে আজ রাতের মধ্যেই এখানে ফেরত পাঠাতে হবে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে যাচাই করতে গিয়ে যদি আমি কোনও ধন-সম্পদের সন্ধান পাই, তা হলে তুমি তার অর্ধেক আল মামুনকে দেবে ! তুমি আরব যোদ্ধা, তোমার কথার দাম আছে। তুমি কথা দিলে নিশ্চয়ই তা রাখবে !"

"অসম্ভব ! অসম্ভব ! অসম্ভব ! মুফতি মহম্মদ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। বিপ্লবী দলের জন্যই তিনি টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেইসব জিনিস এখানকার বিপ্লবী দলই পাবে। আল মামুনটা কে ? একটা অর্থলোভী শয়তান !"

"হয়তো টাকাপয়সা কিছুই নেই। তোমরা এমনি-এমনি ঝগড়া করছ !"

"নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য !"

"শোনো, আমার সাহায্য যদি চাও, তা হলে আমার কথা মানতেই হবে। তুমি কি এটা বোঝোনি যে, আমি যদি নিজে থেকে বলতে না চাই, তা হলে আমাকে খুন করে ফেললেও আমি মুখ খুলব না!"

"আল মামুনকে টাকাপয়সার ভাগ দিলে আমার দলের লোকরা রেগে যাবে।"

"দলের লোকদের বোঝাও! সন্তুকে যদি বাঁচাতে না পারো, তা হলে তোমরা কিছুই পাবে না! সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডাগো আবদাল্লার হাতে এক্ষুনি চিঠি লিখে স্টেপ পিরামিডের কাছে পাঠাও!"

হানি আলকাদির মুখখানা কুঁকড়ে গেছে। আল মামুনকে হত্যা করার বদলে তাকে টাকাপয়সার ভাগ দিতে হবে, এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার মনের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।

কাকাবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "শূন্যকে যদি দু'ভাগ করা যায়? মনে করো, মুফতি মহম্মদের ধনসম্পদ শূন্য। তার অর্ধেক আল মামুনকে দিতে তুমি আপত্তি করছ কেন?"

হানি আলকাদি পাশ ফিরে তার দলের একজন লোককে বলল, "এই, চিঠি লেখার কাগজ আর কলম নিয়ে এসো।"

॥ ৯ ॥

সন্তুর মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রাত তিনটের সময়। আল মামুনের লোকেরা তাকে যখন গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা লোহার রডে লেগে তার মাথা ফেটে যায়। মাথার চুল একেবারে ভিজে গিয়েছিল রক্তে। আল মামুনের লোকেরা তা দেখেও তার কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি। ডাগো আবদাল্লা তাকে এখানে ফিরিয়ে আনবার পর হানি আলকাদি নিজে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

সন্তু কিন্তু বেশ চাঙ্গাই আছে। ঐ আঘাতে সে একটুও কাবু হয়নি। কিংবা হলেও বাইরে তা প্রকাশ করছে না। বরং তার একটু আনন্দই হচ্ছে। দিল্লিতে পাঁজরায় গুলি খেয়ে কাকাবাবু কয়েকদিন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছিলেন, এখন সেও অনেকটা কাকাবাবুর সমান-সমান হল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েছেন সন্তুকে নিয়ে। সঙ্গে ডাগো আবদাল্লা। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। সন্তু সুস্থ আছে দেখে কাকাবাবু আর দেরি করতে চাননি। কাজটা তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলতে চান।

গাড়িতে যেতে-যেতে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই জানিস

পিরামিডের মধ্যে কী করে ঢুকতে হয় ? তোর কি ধারণা যে, পিরামিডের গায়ে একটা দরজা থাকে আর সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা যায় ?”

এই ব্যাপারটা সন্তুর জানা নেই। দরজা না থাকলে ভেতরে ঢোকা যাবে কী করে ?

.কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তোর কি ধারণা পিরামিডের ভেতরটা ফাঁপা ? ভেতরে সব ঘর-টর আছে ?”

সন্তু আরও অবাক হয়ে গেল ! ফাঁকা না হলে ভেতরে ঘর-টর থাকবে কী করে ? অনেক ছবিতেই সে দেখেছে যে, পিরামিডের মধ্যে মস্ত-মস্ত হলঘরের মতন, তাতে অনেক জিনিসপত্র, মূর্তি, পাথরের কফিন ইত্যাদি থাকে। তা হলে কাকাবাবু এরকম বলছেন কেন ?

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, “না রে, পিরামিডের গায়ে দরজা নেই। ভেতরটা ফাঁপাও নয়, ভেতরে ঘর-টর কিচ্ছু নেই। পিরামিডগুলো হচ্ছে সলিড পাথরের ত্রিভুজ।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “তা হলে রাজা-রানিদের কবর কোথায় থাকত ?”

“সেগুলো বেশির ভাগই মাটির নীচে। শুধু রাজা-রানিদের সমাধি নয়, তাঁদের ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্রও সেখানে থাকত। এমনকী খাট-বিছানা পর্যন্ত। অধিকাংশই সোনার। ক্লিয়োপেট্রার শোবার খাট, চটিজুতো পর্যন্ত সোনার তৈরি ছিল। এই সব মূল্যবান জিনিসপত্র যাতে চোরে চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে, তাই ঐ সব সমাধিস্থানের ঢোকার পথটাও খুব গোপন রাখা হত। পিরামিডের গা হাতড়ে কেউ সারাজীবন খুঁজলেও ভেতরে ঢোকার পথ পাবে না।”

“তাহলে সাহেবরা পিরামিডের ভেতরে ঢুকল কী করে ?”

“পিরামিডের ভেতরে না, পিরামিডের নীচে। অনেক দূরে একটা সুড়ঙ্গের মুখ থাকে। সেখান দিয়ে যেতে হয়। সাহেবরা এক-এক করে সেই সব সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে বার করেছে। খুব কষ্ট করে ঢুকতে হয়। স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি নামে একজন ইংরেজ এই সব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। এক-একটা পিরামিডের তলায় গিয়ে তিনি কত যে ধনরত্ন পেয়েছেন, তার ঠিক নেই। তবে স্যার ফ্লিণ্ডার্সও প্রথম দু'একটা সমাধিস্থানের ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন, তাঁরও আগে চোরেরা অন্য দিক থেকে সুড়ঙ্গ কেটে এসে ভেতরে ঢুকেছিল। আমার ধারণা, মুফতি মহম্মদ এই স্যার ফ্লিণ্ডার্সের দলে গাইডের কাজ করতেন। উনি অনেকদিন সাহেবদের কাছে প্রথমে মালবাহক কুলি, তারপর গাইডের কাজ করেছিলেন, তা তো শুনেছিস মান্টোর কাছে !”

হ্যাঁ। তারপর গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবী হলেন।”

“সাহেবরা পিরামিডের সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে গিয়ে সমস্ত সোনার জিনিস আর দামি-দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে দেখে এ-দেশের অনেক লোক চটে

গিয়েছিল। মুফতি মহম্মদ তো নিজের চোখেই দেখেছেন, সাহেবরা মিশরের সম্পদ লুট করছে। তাই তিনি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন, এই সব আটকাবার জন্য। হয়তো তিনি নিজেও কোনও-কোনও সমাধিস্থান থেকে সোনাদানা তুলে নিয়ে গিয়ে সেসব তাঁর দলের কাজে লাগিয়েছেন।"

"উনি ছবি এঁকে-এঁকে সেই সব সোনা কোথায় লুকোনো আছে তাই বুঝিয়ে গেছেন, তাই না?"

"না রে, আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমি যে সবাইকে বলেছি যে, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছাপত্রে টাকা-পয়সা, সোনাদানার কথা কিছু নেই, তা সত্যিই। উনি সেসব কিছু জানিয়ে যাননি।"

ডাগো আবদাল্লা মুখ ফিরিয়ে বলল, "গিজার বড় পিরামিড তো এসে গেছে, এফেন্দি। এবার কোন্ দিকে যাব?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদির গাড়ি কোথায়?"

ডাগো বলল, "ওদের গাড়ি একটু আগেই পৌঁছে গেছে। সামনে থেমে আছে।"

"ওদের ওখানেই থেমে থাকতে বলো। তুমি ডান দিকে চলো।"

আর কিছুক্ষণ বাদে আর-একটি মাঝারি আকারের পিরামিডের কাছে এসে কাকাবাবুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবু চারদিকে তাকালেন। ধারেকাছে কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। তবে বালির ওপর একটা গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। হয়তো আগের দিন কোনও টুরিস্টের গাড়ি এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "ডাগো, আমি এই পিরামিডের নীচে যাব।"

ডাগো কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। করুণ হয়ে এল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল, "আপনি যাবেন, এফেন্দি?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কেন ও এই কথা বলছে জানিস? আগেরবার যখন আমি ইজিপ্টে এসেছিলাম, তখন ডাগো সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। ওকে নিয়ে আমি অনেক সমাধিতে নেমেছি। তখন আমার দুটো পা'ই ভাল ছিল। ডাগো ভাবছে, এখন এই খোঁড়া পা নিয়ে আমি আর নীচে নামতে পারব না!"

কাকাবাবু ডাগোকে বললেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারব। আগেরবার আমরা এর মধ্যে একসঙ্গে নেমেছিলাম মনে নেই?"

ডাগো বলল, "আপনার কষ্ট হবে, এফেন্দি!"

"তা হোক, তুমি কাজ শুরু করে দাও!"

গাড়ি থেকে কয়েকটা জিনিসপত্র নামানো হল। তিনটে শক্তিশালী টর্চ গুঁজে নেওয়া হল তিনজনের কোমরে। একটা ছোট ঝোলাব্যাগ কাকাবাবু চাপিয়ে দিলেন সন্তুর কাঁধে।

পিরামিড থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ডাগো শুয়ে পড়ল এক জায়গায়। হাত দিয়ে বালি সরাতে লাগল। তারপর বেরিয়ে পড়ল একটা কাঠের পাটাতন। সেটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার গর্ত নেমে গেছে যেন পাতালে।

কাকাবাবু বললেন, "কাঠের পাটাতনের বদলে এখানে আগে পাথর চাপা দেওয়া থাকত। তার ওপর অনেকখানি বালি ছড়িয়ে দিলে আর কারুর বুঝবার উপায় ছিল না। খুব সাবধানে নামবি কিন্তু সন্তু। একটু পা পিছলে গেলেই অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবি।

ঠিক হল, ডাগো যাবে সবচেয়ে আগে, মাঝখানে কাকাবাবু, সবশেষে সন্তু। ডাগো একটা মোটা দড়ি আলগা করে জড়িয়ে দিল তিনজনের কোমরে। এখানে ক্রাচ নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই বলে কাকাবাবু সে-দুটো রেখে গেলেন বাইরে।

সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। দু'দিকের দেওয়ালে দু'হাতের ভর দিয়ে বসে-বসে নামতে হয়। হাতের বেশ জোর লাগে।

সন্তু ভাবল, "নীচে নামবার কী অদ্ভুত ব্যবস্থা। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে এই ব্যবস্থাটাই বোধহয় সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিল।

কাকাবাবুর যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছে সন্তু। ওঁর ভাঙা পা'টার ওপরেও জোর পড়ছে কিনা। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "তুই ঠিক আছিস তো, সন্তু?"

কাকাবাবুর মুখ ভর্তি চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

ওপরের আলো খানিকটা মাত্র ভেতরে ঢোকে, তারপরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডাগো কী কায়দায় যেন একটা টর্চ জ্বেলে বগলে চেপে আছে। আর মাঝে-মাঝে আরবি ভাষায় কী যেন বলে উঠছে। হয়তো কোনও প্রার্থনামন্ত্র!

মিনিট দশেক পরে ওরা পৌঁছে গেল সমতল জায়গায়। ঘড়িতে দশ মিনিট কাটলেও মনে হয় যেন কয়েক ঘণ্টা লেগে গেছে।

তিনটে টর্চের আলোয় দেখা গেল সেখানে একটি চৌকো ছোট ঘর। ঘরটা একেবারে খালি। দেওয়ালেও কোনও ছবি নেই। ঘরের একটা দেওয়ালে, নীচের দিকে একটা চৌকো গর্ত। তার মধ্য দিয়ে একটা সরু পথ। সেই পথে খানিকটা যাবার পর আর-একটি দেওয়াল, সেই দেওয়ালের গায়ে একটি লোহার দরজা। দেখলেই বোঝা যায়, সেই দরজাটা নতুন বসানো হয়েছে, আগে অন্যকিছু ছিল।

দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তারপরই একটি বিশাল হলঘর। এখানকার দেওয়ালে বড়-বড় ছবি আঁকা। কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, "সব নিয়ে গেছে। আগেরবার এসেও অনেক কিছু দেখেছিলাম। তাই না, ডাগো?"

ডাগো বলল, "হ্যাঁ, এফেন্দি। কিছুই থাকে না। চোরেরা সব নিয়ে নেয় বলে গভর্নমেন্ট এখন নিজেই তুলে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে রাখে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ডাগো, সেই ল্যাবিরিন্থটা কোথায়?"

ডাগো বিস্মিতভাবে বলল, "সেটাতেও যাবেন?"

"আপনার আরও কষ্ট হবে। এক কাজ করি, এফেন্দি। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।"

"তার দরকার হবে না। তুমি পথটা খুঁজে বার করো। আমার জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

হলঘরটা পার হয়ে এক জায়গায় এসে ডাগো একটা চৌকো পাথরের স্ল্যাব সরাল। তার মতন শক্তিশালী লোক ছাড়া অতবড় পাথর সরাতে যে-সে পারবে না। তারপর একটা ছোট গোল জায়গা। সেখানে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সে আবার একটা পাথরের পাটাতন সরিয়ে ফেলল। এখানে আবার আর-একটা সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবু বললেন, "এইখানে আমাদের যেতে হবে, সন্তু।"

তারপর তিনি ডাগোকে বললেন, "আর তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ফিরে যাও!"

দারুণ চমকে উঠে ডাগো বলল, "কী বলছেন, এফেন্দি? আমি যাব না? আমাকে বাদ দিয়ে আপনি এই বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন কী করে?"

"ঠিক পেরে যাব। তুমি বড় হলটায় অপেক্ষা করো, কিংবা ওপরেও উঠে যেতে পারো। আমরা ফেরার সময় তোমাকে ডাকব!"

"না, না, না, তা হয় না! আপনাকে এখানে ফেলে রেখে গেলে হানি আলকাদি আমায় আস্ত রাখবে না!"

"হানি আলকাদির সঙ্গে আমার এই রকমই কথা আছে। আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা আমি দেখার আগে, অন্য কেউ জানতে পারবে না। মুফতি মহম্মদের এটা আদেশ। এই আদেশ তো সকলকে মানতেই হবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ডাগো। তুমি আমাদের যা উপকার করলে, তার কোনও তুলনা নেই। তোমাকে ছাড়া আর কারুকে বিশ্বাস করে আমি এখানে আসতে পারতুম না।"

ডাগো মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন সেই ল্যাবিরিন্থের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সন্তু। ভেতরটা খুব আঁকাবাঁকা। একটু অন্যমনস্ক হলেই মুখে গুঁতো লাগবে। আগেরবার আমার নাক থেঁতলে গিয়েছিল। এখন কি বুঝতে পারছিস যে, আমাদের মাথার ওপরে রয়েছে একটা বিরাট পিরামিড?

সন্তুর বুক টিপটিপ করছে। মাটির কত নীচে, জমাট অন্ধকার ভরা এক সুড়ঙ্গ। আর কি ওপরে ওঠা যাবে ? যদি হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায় ? ডাগো সঙ্গে থাকায় তবু খানিকটা ভরসা ছিল।

সন্তুর কাঁধ ধরে কাকাবাবুকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে হচ্ছে। সন্তু টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে খুব সাবধানে। একটুখানি অন্তর-অন্তরই সুড়ঙ্গটা বাঁক নিয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পাচ্ছিস নাকি রে, সন্তু ?"

সন্তু শুকনো গলায় বলল, "না !"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা বুঝতে পারছিস ?"

"না।"

"এক-একটা সমাধিস্থান খুব গোপন রাখা হত। কেন যে এত গোপনীয়তা তা জানা যায় না। হয়তো দামি জিনিসপত্র অনেক বেশি রাখা হত সেখানে। এটা সেইরকম একটা গোপন সমাধিতে যাবার পথ। কত কষ্ট করে এরকম সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। হয়তো এই সমাধিতে যাবার আরও কোনও রাস্তা আছে, যা আমরা এখনও জানি না। রাজা-রানিরা কি এত কষ্ট করে যেতেন ?"

"আমরা কোন্ সমাধিতে যাচ্ছি ?"

"রানি হেটেফেরিসের গল্প তোকে বলেছিলুম, মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, সেই যে কফিনের মধ্যে যাঁর মমি খুঁজে পাওয়া যায়নি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকের ধারণা, এই জায়গাটা ভুতুড়ে। সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে, আবার মাঝে-মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোর ভূতের ভয় নেই তো ?"

"অ্যাঁ ? না !"

"মুফতি মহম্মদ নামে একজন বৃদ্ধ কী সব ছবি এঁকেছিলেন, তা দেখে আমাদের কি এত কষ্ট করে এত দূরে আসার কোনও দরকার ছিল, বল ?"

সন্তু এ-কথার কী উত্তর দেবে ! সে কিছুই বলল না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আমি এলুম কেন জানিস ? ঐ যে মুফতি মহম্মদ নির্দেশ দিলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, সেইজন্যই আমার কৌতূহল হল। এটা যেন বৃদ্ধের এক চ্যালেঞ্জ !"

টর্চের আলো এবারে একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ল। সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে ! সুড়ঙ্গটা খুব বেশি লম্বা নয়।

ফাঁকা জায়গাটিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পর একটি বেশ বড় চৌকো ঘর।

কাকাবাবু বললেন, "এই হল রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থান। এক সময় নাকি এখানে অতুল ঐশ্বর্য ছিল। একজন রানির যত জিনিস ব্যবহারে লাগে, সেই সব কিছু। ওরা বিশ্বাস করত কি না যে, রাজা-রানিরা আবার হঠাৎ

একদিন বেঁচে উঠতে পারে। তখন সব কিছু লাগবে তো!"

ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটি কারুকার্য-করা পাথরের কফিন। আরও তিন-চারটে কফিন ছড়ানো রয়েছে এদিক-ওদিক।

বড় কফিনটা দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের সারকোফেগাস। তার আগে দেখা যাক, এর মধ্যে রানির মমি আছে কি না! যদি থাকে, তা হলে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে।"

সারকোফেগাসের ওপরে রানির ছবি আঁকা। কাকাবাবুর সঙ্গে ধরাধরি করে সন্তু ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলল।

ভেতরটা ফাঁকা।

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "জানতুম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অন্য কফিনগুলো খুলে দেখব?"

"কোনও লাভ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়ামে মমিগুলো ভাল দামে বিক্রি হয়। চুরি যাবার ভয়ে সব মমি সেইজন্য ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

সন্তু টর্চের আলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল দেওয়ালগুলো। প্রত্যেক দেওয়ালেই অসংখ্য ছবি। এইগুলোই হিয়েরোগ্লিফিকস। বোধহয় রানির জীবনকাহিনী লেখা আছে। কত শিল্পী, কত পরিশ্রম করে ঐ সব ছোট-ছোট ছবি এঁকেছে। কাকাবাবুও ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করতে-করতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন।

"এইবার সন্তু, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছার কথা তোকে জানাতে হবে। কারণ, তোর সাহায্য ছাড়া এর পর আমার আর কিছু করার সাধ্য নেই। তুই দেখা মানেই আমার দেখা।"

সন্তু ছিল উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে। সে তাড়াতাড়ি এদিকে চলে এল!

"কাকাবাবু, আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। এই ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরে গেছি।"

"তুই বুঝতে পেরে গেছিস? কী বুঝেছিস শুনি?"

"রানি হেটেফেরিসের মমি এখানেই কোথাও লুকোনো আছে। আর সেই লুকোনো জায়গাতেই মুফতি মহম্মদ সোনা আর টাকাপয়সা লুকিয়ে রেখেছেন।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "অনেকটা ঠিকই ধরেছিস তো। তবে টাকাপয়সার কথা নেই এর মধ্যে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা জানলে অনেকে ভাববে পাগলামি। উনি ছবি এঁকে যা জানাতে চাইছিলেন, তা হল এই: উনি খুব সংক্ষেপে লিখেছিলেন, আমি তোকে বুঝিয়ে বলছি। উনি এক সময় সাহেবদের

কাছে গাইডের কাজ করতেন। সেই সময়েই আল বুখারি নামে আর-একজন গাইডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আল বুখারি অনেকগুলো পিরামিডের নীচে এবং গোপন সমাধিস্থানে ঢোকার রাস্তাও আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সেইসব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাহেবরাই নিয়ে নিত। একজন সাহেবকে জব্দ করার জন্যই আল বুখারি মুফতি মহম্মদের সাহায্য নিয়ে রানি হেটেফেরিসের মমি এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে। মজা করবার জন্য ওরা সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে বার করে এনে সারকোফেগাসের মধ্যে রেখে দিত, মাঝে-মাঝে আবার সরিয়ে ফেলত। সেই থেকে ভূতের গল্প রটে যায়। এ রকম ব্যাপার মাত্র দু'তিনবারই হয়েছিল। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করত যে, রানির মমি প্রত্যেক বছর একবার করে ফিরে আসে। যাই হোক, আল বুখারি একটা দুর্ঘটনায় মারা যায়, মুফতি মহম্মদ গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। সেই থেকে মমিটা লুকোনো অবস্থাতেই আছে। মৃত্যুর আগে মুফতি মহম্মদ জানিয়ে দিতে চান যে, সেটা কোথায় আছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি অন্য কেউ সেই গোপন জায়গাটা জেনে ফেলে মমিটা সরিয়ে ফেলে থাকে, তা হলে মুফতি মহম্মদ মিথ্যেবাদী হয়ে যাবেন। সেইজন্যই তিনি আগে আমাকে যাচাই করে নিতে বলেছেন।"

"সেই লুকোনো জায়গাটা কোথায়?"

"সেটা তোকে খুঁজে বার করতে হবে। এই দ্যাখ, এই দেওয়ালের গায়ে মাঝে-মাঝে খাঁজ কাটা আছে। এই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে তুই ওপরে উঠতে পারবি? তোর কাঁধের ব্যাগটাতে দ্যাখ শক্ত নাইলনের দড়ি, লোহার হুক এই সব আমি এনেছি, যদি কাজে লাগে ভেবে।"

সন্তু ব্যাগ খুলে জিনিসগুলো বার করল। তারপর বলল, "আমার ওসব লাগবে না, আমি এমনিই উঠতে পারব।"

খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে সন্তু দেওয়াল বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে বললেন, "ঐ যে রানির ছবি দেখছিস, এরপর ডান দিকে পরপর নটা ছবি গুনে যা! গুনেছিস? এইবারে দশ নম্বর ছবিটার ওপর জোরে ধাক্কা দে।"

সন্তু ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, "আরও জোরে ধাক্কা দিতে হবে। আল বুখারি আর মুফতি মহম্মদ দু'জনেই গাট্টাগোট্টা জোয়ান ছিলেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া বহু বছর জায়গাটা খোলা হয়নি!"

সন্তু প্রাণপণ শক্তিতে দুম-দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল। তাও কিছুই হল না।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখ তো, ঐ এক থেকে দশ নম্বর ছবির মতন ছবি তোর মাথার কাছে ছাদেও আঁকা আছে কি না!"

"হ্যাঁ, আছে।"

"ঐখানে ধাক্কা দে!"

এবারে ছাদের সেই জায়গাটায় ধাক্কা দিতেই সন্তুর হাত অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানকার একটা পাথর ভেতরে সরে গেছে। সেখানে আরও ধাক্কা দিতে দিতে একজন মানুষ গলে যাবার মতন জায়গা হয়ে গেল।

"টর্চ জ্বালতে পারবি? দ্যাখ তো, ওখানে কী আছে!"

"মেজেনিন ফ্লোরের মতন জায়গাটা। ভেতরে একটা কফিন আছে।"

"ঐটাই খুলে দেখতে হবে। ভেতরে ঢুকতে পারবি তো? খুব সাবধানে।"

সন্তু মাথা গলাতেই নীচে বেশ জোরে একটা শব্দ হল। সন্তু চমকে গিয়ে আবার মাথাটা বার করে আনল। নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল একেবারে।

যেখানে শব্দটা হয়েছিল, কাকাবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়েছেন সেই দিকে। সেখানে একটা কফিনের ঢাকনা খুলে গেছে। তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে একটা মূর্তি। একটা মমি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সেই মূর্তি দেখে টর্চসুদ্ধ কাকাবাবুর হাতটাও কেঁপে গেল একবার। তারপর তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, "আল মামুন!"

সন্তুও এবার চিনতে পারল। কিন্তু আল মামুন এখানে আগে থেকেই এল কী করে? কাকাবাবু তো কারুকেই বলেননি যে, তিনি কোথায় যাবেন।

আল মামুনের গায়ে একটা সাদা কাপড় জড়ানো। সেটা খুলে ফেলে সে একটা লম্বা ছুরি বার করল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, "বিদেশি কুকুর! নিমকহারাম! আমি কলকাতায় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি দিল্লিতে মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোদের দেখা করিয়ে দিয়েছি। আর তুই ঐ কুত্তা আলকাদির দলে যোগ দিয়েছিস?"

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনে বললেন, "একটাই ভুল করেছি আমি। মিউজিয়ামের কিউরেটর মাস্টোর কাছে রানি হেটেফেরিসের কথা বলে ফেলেছিলাম। সে বুঝি তোমার দলে, আল মামুন? কিংবা জোর করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে ফেলেছ! তুমি এত কষ্ট করে এখানে এলে কেন আল মামুন! মুফতি মহম্মদের যদি লুকোনো টাকা পয়সা কিছু থাকেই, তুমি তো তার অর্ধেক ভাগ পাবে!"

"অর্ধেক! ঐ শয়তানটাকে আমি অর্ধেক দেব? আমি মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী। আমি তার সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে আর ঐ খোকাটাকে আমি এখানেই শেষ করে দিয়ে যাব। এই সম্পদের কথা পৃথিবীর আর কেউ জানবে না!"

"তুমি আমাদের খুন করবে? তুমি ধর্মভীরু লোক, এরকম একটা অন্যায় করলে তোমার বিবেকে লাগবে না?"

"কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, তাতে আবার বিবেকের কী আসে যায়!"

"আল মামুন, তোমার মতন খুনিদের আমি কিন্তু খুব কঠিন শাস্তি দিই!"

আল মামুন ছুরি তুলে এগিয়ে আসতেই কাকাবাবু মাটি থেকে নাইলনের দড়িটা তুলে নিলেন। সন্তু ভাবল, ওপর থেকে আল মামুনের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়বে কি না!

কাকাবাবু দড়িটা নিয়ে শপাং করে চাবুকের মতন শব্দ করে বললেন, "আগেকার দিনে তলোয়ার আর চাবুকের লড়াইয়ের কথা শোনোনি?"

বলেই তিনি চাবুকের মতন সেই দড়ির এক ঘা কষালেন আল মামুনের মুখে।

লড়াইটা শেষ হতে এক মিনিটও লাগল না। লম্বা দড়ির সঙ্গে ছুরি দিয়ে আল মামুন লড়তে পারলই না মোটে। কাকাবাবু তাকে অনবরত মারতে লাগলেন। আল মামুনের হাত থেকে ছুরি খসে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে। কাকাবাবু দড়ির ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। দড়ির বাকি অংশটা দিয়ে কাকাবাবু তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন।

তারপর যেন কিছুই হয়নি এই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তিনি সন্তুকে বললেন, "যা, ভেতরটা দেখে আয়।"

সন্তুর পা কাঁপছিল। নিজেকে একটুখানি সংযত করে সে টর্চটা মুখে চেপে নিল, তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা গলাল ভেতরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল রিনির মুখটা। রিনি তাকে ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল গরুর শিঙের ওপর বসে থাকা একটা মশা! এখন সে একা মুফতি মহম্মদের সম্পদ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনসের সেই থানাটার কথাও তার মনে পড়ে গেল এক ঝলক। সেই দারোগা যদি তাকে এই অবস্থায় দেখতেন!

ভেতরে ঢুকে গিয়ে সন্তু উবু হয়ে বসে টর্চ জ্বালল। তার গা ছম্‌ছম্ করছে। কেন যেন তার ধারণা হল, এখানে একটা অজগর সাপ থাকতে পারে। কাশ্মীরের সেই শুকনো কুয়োটার মধ্যে যে-রকম ছিল।

কিন্তু সেসব কিচ্ছু নেই। একটা শুধু কফিন, আর এক পাটি চটি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সে কফিনের ঢাকনা খুলল।

খুলতেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। সেখানে সত্যিই একটা মমি রয়েছে। সন্তু ভূতের ভয় পায় না, তবু তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

তার দৃঢ় বিশ্বাস এই মমির গায়ে জড়ানো ব্যাণ্ডেজের মধ্যেই কিংবা এর নীচে প্রচুর ধনরত্ন আছে। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে হাত তুলতেই

পারছে না।

অতি কষ্টে সন্তু চোখ বুজে হাতটা ছোঁয়াল মমির গায়ে। এবারে তার কাঁপুনি থেমে গেল। ভাল করে মমিটা পরীক্ষা করল। কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না। মমির তলাতেও কিছু নেই।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সন্তু বুঝে গেল, তার আশা ব্যর্থ হয়েছে। ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা থাকলে তা তো একটু-আধটু হবে না। অনেক হবার কথা। থাকলে ঠিকই টের পাওয়া যেত।

হতাশভাবে ফিরে এসে সন্তু গর্তটাতে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, কিছু নেই!"

"মমি নেই?"

"হ্যাঁ, মমি আছে। রানির মমিই মনে হচ্ছে, কিন্তু টাকাপয়সা বা সোনা-টোনা একটুও নেই!"

"মুফতি মহম্মদ তো টাকাপয়সার কথা বলেননি! তোকে আর-একটা কাজ করতে হবে। দ্যাখ্ তো, ঐ ঘরের দেয়ালে বা ছাদে বা কফিনের গায়ে কোনও ছবি আঁকা আছে কি না?"

সন্তু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, আছে। কফিনের ঢাকনার ভেতরের দিকে পাঁচটা ছোট ছোট ছবি আছে।"

কাকাবাবু ঝোলাব্যাগটা সন্তুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কাগজ-কলম আছে। তুই তো একটু-আধটু ছবি আঁকতে পারিস, খুব সাবধানে ঐ ছবিগুলো কপি করে নিয়ে আয় তো!"

ছবিগুলো কপি করতে সন্তুর আরও দশ মিনিট লাগল। তারপর চটিজুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সে নেমে এল। জুতোটা চামড়া বা রবারের নয়। কোনও ধাতুর। সোনারও হতে পারে। ওপরে শ্যাওলা জমে গেছে।

কাকাবাবু আল মামুনের মুখের ওপর টর্চ ফেলে বললেন, "তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি না!"

আল মামুন বলল, "আমাকে বাঁচাও। তোমাকে আমি দশ লাখ টাকা দেব!"

"তুমি আমাদের খুন করতে চেয়েছিলে! তার বদলে তুমি অন্তত একটা দিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করো!"

সন্তুকে নিয়ে কাকাবাবু সেই হলঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। সেটা পার হতেই ডাগো আবদাল্লাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে অধীরভাবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর আর ওপরে উঠতে কোনও অসুবিধে হল না।

হানি আলকাদি কোথা থেকে ছুটে এসে কাকাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ইউ গট ইট?"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, মনটা শক্ত করো। দুঃসংবাদ শুনে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেও না। মুফতি মহম্মদের গোপন কথা হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের মমি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তুমি নাও বা যে-ই নাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেখানে টাকাপয়সা বা অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া যায়নি। এই এক পাটি চটি পাওয়া গেছে, বোধহয় এটা সোনার তৈরি। কে এটা ফেলে গেছে জানি না। এর অর্ধেক তুমি ইচ্ছে করলে আল মামুনকে দিতে পারো। সে অবশ্য নীচে শুয়ে আছে। বিকেলের দিকে কোনও লোক পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

হানি আলকাদি রাগের চোটে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার এখন বিশ্রাম দরকার একটু। আমি ক্লান্ত। এখানে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে না?"

আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার ওপর এত উত্তেজনা ও পরিশ্রম। সন্তু আর কাকাবাবু দুজনেই ঘুমোল প্রায় সন্ধে পর্যন্ত।

সন্তু জেগে উঠে দেখল, রিনি, সিদ্ধার্থ, বিমান সবাই এসে বসে আছে। সিদ্ধার্থ বিমানের কাছে খবর পেয়ে কাল রাতেই এখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আজ তারা খুঁজতে-খুঁজতে গিজাতে এসে পৌঁছেছে।

রিনি বলল, "সন্তু, সব ঘটনা আমি আগে শুনব। তার আগে তুই আর কারুকে বলতে পারবি না!"

কাকাবাবু ঠিক করলেন, তখুনি কায়রোর দিকে রওনা হবেন। ডাগো আবদাল্লাকে তিনি অনেক টাকা বখশিশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, একটু পরেই সে গিয়ে যেন আল মামুনকে মুক্তি দিয়ে আসে।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদি কোথায়?"

ডাগো বলল, "সে তো চলে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছ থেকে সে বিদায় না নিয়ে চলে গেল? হতেই পারে না। তার খোঁজ নিয়ে দ্যাখো।"

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তাকে এক আরবের বাড়িতে পাওয়া গেল। সেও ঘুমোচ্ছিল। মনের দুঃখেও তো মানুষের খুব ঘুম পায়।

কাকাবাবু তাকে একলা একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোনও উপকার করতে পারলুম না, সেজন্য দুঃখিত।"

হানি আলকাদি বিষণ্ণভাবে বলল, "তবু যে তুমি মুফতি মহম্মদের কথা রাখবার জন্য এত দূরে ছুটে এসে এত কষ্ট করলে, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিয়ে কাকাবাবু বললেন, "তবে বোধহয় কিছু একটা তুমি পেয়ে যাবে! শুধু একটা মমি দেখবার জন্য কি মুফতি মহম্মদ

আমাকে এত দূর পাঠিয়েছিলেন ? এ মমিটাও একটা সংকেত !"

হানি আলকাদি বলল, "তার মানে ?"

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তারপর বললেন, "রানির লুকোনো কফিনের গায়ে কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। সেগুলোও আসলে সংকেত-লিপি। সেটা আমি তোমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছি। তাতে লেখা আছে, ফারাও আসেমহেট তৃতীয়'র সমাধিস্থান। তৃতীয় কক্ষ। ডান দিকের দেওয়ালের ওপর দিকে ঠিক পাঁচটি ছবি আঁকা আছে। আমার মনে হয়, সেই ছবি আর এই কফিনের গায়ের ছবি মুফতি মহম্মদের আঁকা। খুব সম্ভবত সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা আছে। সেখানে কী আছে না আছে তা আমি আর দেখতে চাই না। তুমি গিয়ে দ্যাখো, যা আশা করছ তা হয়তো ওখানেই পেতে পারো। গুড লাক !"

আনন্দে চকচক করে উঠল হানি আলকাদির চোখ। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে। বারবার বলতে লাগল, "ধন্যবাদ, রায়চৌধুরী, ধন্যবাদ। আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ !"

কাকাবাবু খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ আর এমন কী ব্যাপার !"

কলকাতার জঙ্গলে

কলকাতার জঙ্গলে

"কাকাবাবু, তোমাকে একটা মেয়ে ডাকছে।"

কাকাবাবু দোতলায় নিজের ঘরে বসে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কী একটা খুব পুরনো ম্যাপ দেখছিলেন মন দিয়ে। ম্যাপ দেখা কাকাবাবুর শখ, সময় পেলেই ম্যাপ নিয়ে বসেন। ম্যাপের আঁকাবাঁকা রেখার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকে উনি কী যে রস পান কে জানে! কয়েকদিন আগে সন্তুর ছোটমামা লন্ডন থেকে দু-তিনশো বছরের পুরনো কতকগুলো ম্যাপ এনে কাকাবাবুকে দিয়েছেন।

সন্তুর কথা শুনে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু, খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা, হাতে একটা ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট। এই সময়ে সে খেলতে যায়। তার গলার আওয়াজে একটু বিরক্ত-বিরক্ত ভাব।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে একটা মেয়ে ডাকছে? কে? কোথা থেকে এসেছে?"

সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, "একটা বাচ্চা মেয়ে। আগে কোনওদিন দেখিনি!"

কাকাবাবু এবারে হেসে বললেন, "একটা বাচ্চা মেয়ে আমাকে খুঁজবে কেন? কে পাঠিয়েছে, কী দরকার, এসব জিজ্ঞেস করিসনি?"

"জিজ্ঞেস করলুম তো। আমাকে কিচ্ছু বলবে না। তোমাকেই নাকি ওর দরকার। বলে দেব যে, দেখা হবে না?"

"তুই মেয়েটিকে একটু স্টাডি করিসনি? কেন এসেছে বুঝতে পারলি না?"

"আমার কথার কোনও উত্তরই দিতে চায় না। কী রকম যেন রাগী-রাগী চোখ!"

"ঠিক আছে, ওপরে নিয়ে আয় আমার কাছে।"

সন্তু মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল। কাকাবাবুর ঘরের কাছে তাকে পৌঁছে দিয়েই সে চলে গেল খেলতে।

সন্তু যাকে বাচ্চা মেয়ে বলেছে, সে আসলে প্রায় সন্তুরই বয়েসি। হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা একটা গাঢ় নীল রঙের স্কার্ট পরা, গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, কালোও নয়,

চোখে আরশোলা-রঙের ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল খোলা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে কাকাবাবুর দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "কী, এসো, ভেতরে এসো !"

মেয়েটি সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আপনিই কাকাবাবু ?"

"হ্যাঁ, আমি সন্তুর কাকাবাবু। তুমি কোথা থেকে এসেছ ?"

"আপনিই গত বছর ইজিপ্টে গিয়েছিলেন ? পিরামিডের মধ্যে ঢুকেছিলেন ?"

"হ্যাঁ !"

"ছবিতে আপনাকে অন্যরকমভাবে আঁকে। একটা ছবিতে আপনার গোঁফ ছিল না। এখন তো দেখছি আপনার মোটা গোঁফ।"

"তখন বোধহয় গোঁফ কামিয়ে ফেলেছিলাম।"

"আপনি এর পর কোথায় যাচ্ছেন ?"

"কেন বলো তো, ঠিক নেই কিছু।"

"তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব !"

এবার কাকাবাবুর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে তিনি বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে, তা বেশ তো ! কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হোক। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি কথা হয় ? তুমি এসে বোসো। তোমার নাম কী ?"

মেয়েটি পায়ের জুতো খুলে রাখল দরজার কাছে। তারপর কাকাবাবুর সামনের একটি চেয়ারে বসে বলল, "আমার নাম দেবলীনা দত্ত। ব্যস, ওইটুকুই যথেষ্ট, আমার বাবা-মায়ের নাম কিংবা আমি কোথায় থাকি, সে-সব জিজ্ঞেস করবেন না, তার কোনও দরকার নেই !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ বেশ, তুমিই তোমার পরিচয়। কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে বাইরে যাও, তা হলে তোমার বাবা-মায়ের অনুমতি লাগবে না ?"

"আমার মা নেই, আমার বাবা আমার কোনও কাজে বাধা দেন না। মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন আমার দু'মাস ছুটি, এখন আমি আপনার সঙ্গে যে-কোনও জায়গায় যেতে পারি।"

"তুমি আমার ঠিকানা জানলে কী করে ?"

"আমাদের পাশের বাড়িতে রানা নামে একটা ছেলে আছে। ওরা নতুন এসেছে। সেই রানা একদিন বলছিল যে, সে সন্তুকে চেনে। ওর বন্ধু সন্তু আন্দামানে, নেপালে, ইজিপ্টে অনেক অ্যাডভেঞ্চারে গেছে। ওর কাছ থেকে আমি সন্তুর ঠিকানাটা জেনে নিলুম, তারপর বাসে চড়ে চলে এলুম।"

"তুমি বাসে করে এসেছ, তার মানে বেশ দূরে থাকো। তা তুমি যে আমার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে যাবে, তাতে অনেক বিপদ হতে পারে জানো তো ? যখন-তখন আমরা মরেও যেতে পারি।"

"আমি বিপদ-টিপদ গ্রাহ্য করি না।"
"তুমি ক্যারাটে জানো?"
"ক্যারাটে? না।"
"সাঁতার জানো?"
"একটু-একটু, খুব ভাল জানি না।"
"ঘোড়া চালাতে জানো?"
"একবার দার্জিলিং-এ গিয়ে ঘোড়ায় চেপেছিলুম।"
"এক ঘণ্টা না আধ ঘণ্টা?"
"উঁ উঁ, আধ ঘণ্টা!"
"তোমার মাউন্টেনিয়ারিং-এর ট্রেনিং আছে?"
"না।"

কাকাবাবু ভুরু নাচিয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, "তা হলে তুমি আমার সঙ্গে যাবে কী করে? সাঁতার ভাল জানো না, আর ঘোড়ায় চেপেছ মাত্র আধ ঘণ্টা! মনে করো, ডাকাতদল তাড়া করল, ঘোড়ায় চেপে পালাতে হবে। কিংবা নদী দিয়ে যেতে-যেতে নৌকোডুবি হয়ে গেল। কিংবা পাহাড়ের খাদে পড়ে গেলে তুমি..."

"সন্তুকে যে আপনি সঙ্গে নিয়ে যান, তার এই সব ট্রেনিং আছে? দেখে তো মনে হয় ক্যাবলা!"

"ট্রেনিং ছিল না, কিন্তু সন্তু এখন সবই শিখে নিয়েছে। ওকে দেখলে শান্তশিষ্ট মনে হয়। সেটাই ওর সুবিধে। ডাকাতরা বুঝতে পারে না যে, ও একাই দু'তিন জনকে ঘায়েল করে দিতে পারে।"

"আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন না?"

"এখন কী করে নিই বলো। আগে তোমাকে তৈরি হতে হবে। কাল থেকেই ভাল করে সাঁতারটা শিখতে শুরু করে দাও, আর ময়দানে ঘোড়ায় চড়া শেখার ব্যবস্থা আছে..."

"ঠিক আছে, আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না!"

দেবলীনা রেগেমেগে উঠে চলে যাচ্ছিল, কাকাবাবু বললেন, "আরে, শোনো, শোনো, দাঁড়াও, অত রাগ করছ কেন?"

দেবলীনা বলল, "আপনার কাছে আমি আর কোনওদিন আসব না, আপনার বইও পড়ব না! আপনারা মেয়েদের কোনও চান্স দিতে চান না, আপনারা ভাবেন, ছেলেরাই বুঝি সব পারে! ছেলেদের থেকে মেয়েদের বুদ্ধি অনেক বেশি, তা জানেন?"

"একটু দাঁড়াও, আসল কথাটা শুনে যাও! সেটাই তো তোমাকে বলা হয়নি! এতক্ষণ তো তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম!"

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। কারণ, আমি তো কোথাও যাচ্ছি না!"

"কেন?"

"কোনও ব্যাপারে কেউ আমার সাহায্য চাইলে তবেই তো আমি যাই। কেউ তো আমায় ডাকছে না!"

"বাজে কথা! সেই যে সুন্দরবনে আপনি একটা খালি জাহাজের রহস্য জানতে গিয়েছিলেন, তখন কি আপনাকে কেউ ডেকেছিল?"

"এখন তো সে-রকম কোনও রহস্যও নেই!"

"বুঝেছি, সব বুঝেছি। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন না! আমিও চাই না আপনার সঙ্গে যেতে!"

আর দাঁড়াল না। মেয়েটি দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। ক্রাচ তুলে নিয়ে কাকাবাবু উঠে আসতে-আসতে তাকে আর দেখা গেল না। তার জুতোজোড়া পড়ে আছে। এতই রেগে গেছে যে, জুতো পরতেও ভুলে গেল।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, ওইটুকু মেয়ের এত রাগ!

তারপর তিনি আবার তাঁর ম্যাপ দেখার কাজে ফিরে গেলেন।

সন্ধেবেলা সন্তু ফিরে আসার পর কাকাবাবু তাকে ডেকে বললেন, "তুই সেই মেয়েটাকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলি, তারপর কী হল জানিস?"

সন্তু বলল, 'একটু পরেই তো চলে গেল। দেখলুম, আমাদের ক্লাবের পাশ দিয়ে দৌড়তে-দৌড়তে যাচ্ছে।"

"আর কিছু দেখিসনি?"

"না তো!"

"মেয়েটির যে খালি পা ছিল, তা তোর লক্ষ করা উচিত ছিল। এই দ্যাখ, ওর জুতো ফেলে গেছে!"

জুতোটা প্রায় নতুন, স্ট্র্যাপ লাগানো স্যান্ডাল, দাম খুব কম নয়। এখন এই জুতো কী হবে?

কাকাবাবু বললেন, "একপাশে সরিয়ে রেখে দে, মেয়েটি নিশ্চয়ই পরে নিতে আসবে।"

নিজেই তিনি জুতোজোড়া তুলে নিয়ে নিজের জুতোর র‍্যাকে রেখে দিলেন।

কিন্তু মেয়েটি আর জুতো নিতে ফিরে এল না।

এর প্রায় পাঁচ-ছ' দিন বাদে টিভি দেখতে-দেখতে সন্তু চমকে উঠল। খবর শুরু হবার আগে নিরুদ্দিষ্টদের ছবি দেখায়। সন্তু খেলার খবর শুনবে বলে টিভির সামনে বসে ছিল, হাতে তার একটি বই। হঠাৎ একবার চোখ তুলতেই সে দেখতে পেল একটি মেয়ের ছবি। এই মেয়েটি কয়েক দিন আগে কাকাবাবুর কাছে এসেছিল না? ঠিক সেই রকম দেখতে। ঘোষণায় বলা হল:

দেবলীনা দত্ত নামের এই মেয়েটিকে গত পাঁচ দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চোখে চশমা, মাতৃভাষা বাংলা, কেউ যদি সন্ধান দিতে পারেন...

সন্তু কাকাবাবুর ঘরে ছুটে এসে বলল, "কাকাবাবু, সেদিন যে মেয়েটি এসেছিল, জুতো ফেলে গেছে, সে তার নাম বলেছিল ?"

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, "কেন রে ? হ্যাঁ, বলেছিল, বেশ মিষ্টি নামটা, কিন্তু মনে পড়ছে না তো !"

"দেবলীনা দত্ত কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস ! কেন, কী হয়েছে ?"

"সেই মেয়েটা হারিয়ে গেছে। টিভিতে এইমাত্র বলল !"

কাকাবাবু সন্তুর কাছ থেকে সবটা ভাল করে শুনলেন। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সেদিন মেয়েটির সঙ্গে আরও ভাল করে কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েটি যে হঠাৎ অমন রেগে যাবে, তা তিনি কী করে বুঝবেন ? ওই বয়েসের মেয়েরা সাধারণত লাজুক হয়। তিনি এমন কিছু খারাপ কথা বলেননি যে, জুতো-টুতো ফেলে দৌড়ে চলে যেতে হবে। মেয়েটি কি এখান থেকেই চলে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি ? কিংবা কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেল ?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটির ঠিকানা কী ?"

সন্তু বলল, "জানি না তো ?"

"টেলিভিশনে ঠিকানা বলেনি ?"

সন্তু মুখ নিচু করল। টিভির পর্দায় ঠিকানাটা ফুটে ওঠার আগেই সন্তু উঠে এসেছে। কাকাবাবু একটু বিরক্ত হলেন। আধখ্যাঁচড়াভাবে কোনও কাজই তাঁর পছন্দ হয় না।

তিনি বললেন, "দাঁড়া, মেয়েটি আর একটা নাম বলেছিল, কী যেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, রানা, সে নাকি তোর বন্ধু, ওই নামে তোর কোনও বন্ধু আছে ?"

সন্তু একটু চিন্তা করে বলল, "হ্যাঁ, রানা বলে একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত ইস্কুলে, কিন্তু সে তো ক্লাস নাইনে ট্রান্সফার নিয়ে চলে গিয়েছিল, তারপর সে এখন কোথায় থাকে তা তো জানি না !"

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "মেয়েটা হারিয়ে গেল ? আমাদের বাড়িতে একা-একা এসেছিল... আমাদের একটা দায়িত্ব আছে !"

সন্তু বলল, "এক কাজ করব ? রকুকুকে ওর জুতোর গন্ধ শোঁকালে, রকুকু নিশ্চয়ই ওর বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে !"

কাকাবাবু বললেন, "তার চেয়ে অনেক সহজ উপায় আছে।"

কাকাবাবু চলে গেলেন টেলিফোনের কাছে। সন্তু শিস দিয়ে ওর কুকুরটাকে ডাকতেই রকুকু ছুটে এল লেজ নাড়তে-নাড়তে। রকুকু একটা সাদা রঙের স্পিৎজ।

সন্তু তার নাকের কাছে দেবলীনার একপাটি জুতো চেপে ধরে বলল, "এই, গন্ধ শুঁকে চল তো !"

রকুকু কিছুই করল না। বিরক্তভাবে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে দুটো হাঁচি দিল।

কাকাবাবু টেবিলের কাছ থেকে বললেন, "ওর জন্য ট্রেনিং দিতে হয়। যে-কোনও কুকুরই ওরকমভাবে ঠিকানা খুঁজতে পারে না !"

তিনি বেশ কয়েকবার টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে তারপর একবার সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "টিভি সেন্টার ? অরবিন্দ বসু আছেন ? নেই ? ছুটিতে ? শুনুন, একটু আগে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণায় আপনারা দেবলীনা দত্ত নামে একটি মেয়ের কথা বললেন..."

ওপাশ থেকে কাকাবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে একজন বললেন, "ওসব খবর এখান থেকে জানানো যাবে না। নিউজ ডিপার্টমেন্টে খোঁজ করুন !"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, লাইন ছাড়বেন না। টেলিফোনের কানেকশান পাওয়া খুব শক্ত। ব্যাপারটা খুব জরুরি। একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে, বেশি দেরি হলে তার খুব ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, মেয়েটির বাড়ির ঠিকানাটা জানা আমার খুবই দরকার। আপনার গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে আপনি ভাল লোক, আপনিই একটু কষ্ট করে ঠিকানাটা জেনে এসে আমাকে বলুন।"

"একটু ধরুন ! কী নাম বললেন, দেবলীনা দত্ত ?"

একটু বাদেই ওপাশ থেকে আবার শোনা গেল, "লিখে নিন, ৪৫/১ এফ, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, বাবার নাম শৈবাল দত্ত।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই ভাল লোক।"

ফোনটা নামিয়ে রেখে কাকাবাবু বললেন, "দেখলি, সামান্য একটু প্রশংসায় কী রকম কাজ হয়ে যায়।"

সন্তু বলল, "মেয়েটা অত দূর থেকে এসেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, তাই তো দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির বাবার সঙ্গে এক্ষুনি একবার দেখা করা দরকার।"

"কাকাবাবু, আমি সঙ্গে যাব ?"

একটু চিন্তা করে কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তুই গেলে ভাল হয়। তা হলে আর দেরি করে লাভ কী ! মেয়েটির জুতোজোড়া একটা প্যাকেটে ভরে নে।"

রাস্তায় বেরিয়ে খানিকটা চেষ্টার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। এই মাত্র প্রায় গোটা শহর জুড়ে লোডশেডিং হয়ে গেল। তার ওপর আবার টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় কিছুই দেখা যায় না। মনে হয় যেন ট্যাক্সিটা যাচ্ছে গভীর এক জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।

প্রিন্স আনোয়ার শা রোডে বাড়ির নম্বর খুঁজে পেতে বেশ খানিকটা সময়

লাগল। বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে ঢুকে একটা দোতলা বাড়ি। ওপরের একটি ঘরে নিয়ন আলো জ্বলছে। খুব সম্ভবত ব্যাটারির আলো।

কলিং বেল বাজবে না, তাই কাকাবাবু তাঁর একটা ক্রাচ দিয়ে দরজায় খটখট শব্দ করলেন। ভেতর থেকে একজন কেউ বলল, "কে?"

কাকাবাবু বললেন, "শৈবাল দত্ত বাড়ি আছেন?"

খালি গায়ে একজন লোক দরজা খুলল, তার হাতে টর্চ। সে বলল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন? বাবু তো এই সময় কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "বাবুকে বলো, আমরা তাঁর মেয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

লোকটি বলল, "খুকুমণি? তার দেখা পেয়েছেন? কোথায় সে?"

"তোমার বাবুকে ডাকো, তাঁকেই সব কথা বলব!"

লোকটি ওদের ভেতরে আসতে বলল না, দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল। একটু পরে সিঁড়ি দিয়ে চটির ফটফট শব্দ করে নেমে এলেন শৈবাল দত্ত, তাঁরও হাতে একটি টর্চ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "কী চাই আপনাদের? আমার মেয়ের সম্পর্কে কী বলছেন?"

কাকাবাবু একটু এগিয়ে যেতেই শৈবাল দত্ত ধমক দিয়ে বললেন, "কাছে আসবার দরকার নেই। যা বলবার ওইখান থেকেই বলুন।"

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, "সত্যি, যা অন্ধকার, এর মধ্যে কারুকেই বিশ্বাস করা যায় না। আপনার ভয় নেই, আমরা চোর-ডাকাত নই। আমি একজন খোঁড়া মানুষ, আপনার সঙ্গে দু'একটা কাজের কথা বলতে এসেছি।"

শৈবাল দত্ত কাকাবাবু ও সন্তুর সারা গায়ে ভাল করে টর্চের আলো ফেলে দেখলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, ভেতরে আসুন। যা অবস্থা, এর মধ্যে কি আর ভদ্রতা-সভ্যতা বজায় রাখার উপায় আছে!"

তিনি বসবার ঘরের দরজা খুললেন। খালি-গায়ে লোকটি একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দিয়ে গেল। সোফায় বসার পর কাকাবাবু বললেন, "আমরা বাড়ি থেকে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে লোডশেডিং হল। যদি আর দশ মিনিট আগে হত, তা হলে আমার এই ভাইপোটি টিভি দেখতে পারত না, আমরাও জানতে পারতুম না যে, আপনার মেয়ে দেবলীনা হারিয়ে গেছে।"

শৈবাল দত্ত পা-জামা আর একটা বাটিকের পাঞ্জাবি পরে আছেন। পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়েস মনে হয়, মাথায় অল্প টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বার করে প্রথমে নিজে একটি ধরালেন, তারপর কাকাবাবুর দিকে প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিলেন।

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ, আমার চলে না। আমি প্রথমেই একটা কথা জানতে চাই, আপনার মেয়ে কি ইচ্ছে করে বা রাগ করে বাড়ি থেকে চলে

গেছে ? অথবা সে হারিয়ে গেছে বা কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ?”

“আপনারা কি পুলিশের লোক ?”

“আমার প্রশ্নটা অনেকটা সেই রকমই শোনাল, তাই না ? না, আমি পুলিশের লোক নই। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, এক সময়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি করতুম, আমার পায়ে অ্যাকসিডেন্ট হবার পর আর কিছু করি না, বাড়িতেই থাকি। আর এ হচ্ছে আমার ভাইপো সন্তু। গত সপ্তাহে একদিন আপনার মেয়ে দেবলীনা আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই দিনটা ছিল মঙ্গলবার।”

শৈবাল দত্ত বললেন, “খুকু আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ? সে আপনাকে চিনল কী করে ?”

কাকাবাবু বললেন, “কারুর কাছ থেকে আমার কথা শুনেছে-টুনেছে বোধহয়। আমাকে সে আগে কোনওদিন দেখেনি, আমার ঠিকানা জোগাড় করে সে একলাই চলে গিয়েছিল আমার কাছে।”

শৈবাল দত্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, “ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার মেয়ে আপনাকে চিনত না, আগে কখনও দেখেনি, তবু সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেল কেন ?”

সন্তু চুপ করে সব শুনছে। সে একটু অবাকও হচ্ছে। বেশির ভাগ লোকই কাকাবাবুর নাম শুনেই চিনতে পারে। অনেকেই নাম শোনামাত্র বলে ওঠে, ও আপনিই সেই বিখ্যাত কাকাবাবু ? আর এই ভদ্রলোক কিছুই খবর রাখেন না !

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, “আপনি শুনলে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, আমি এই খোঁড়া পা নিয়ে মাঝে-মাঝেই পাহাড়-পর্বতে যাই।”

“পাহাড়-পর্বতে বেড়াতে যান ?”

“ঠিক বেড়াতে নয়, একটা কিছু কাজ থাকে, অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়। আমার এই ভাইপোটিও আমার সঙ্গে থাকে। আপনার মেয়ে দেবলীনা এই সব কথা যেন কার কাছ থেকে শুনেছে। তাই সে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, পরের বারে সে-ও আমার সঙ্গে যাবে।”

“আমার মেয়ে আপনাকে চেনে না শোনে না, অথচ সে আপনার সঙ্গে পাহাড়ে যেতে চাইল, আমি এর মানে বুঝতে পারছি না। গতবারই তো আমি তাকে দার্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গেই তো সে যেতে পারে।”

“তা তো পারেই। তবু সে আমার কাছে গিয়ে ওই প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বাবা-মায়ের অনুমতি লাগবে না ? তাতে সে বলল, আমার বাবা আমার কোনও কাজে বাধা দেন না।”

“আমার মেয়ে এখন কোথায় আছে ? আপনাদের বাড়িতে ?”

“না, না...”

“এক সেকেন্ড দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি আসছি।”

শৈবাল দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চটির শব্দ শুনে বোঝা গেল তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছেন।

কাকাবাবু মুচকি হেসে সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভদ্দরলোক উঠে কোথায় গেলেন বল্ তো?"

সন্তু ভুরু কুঁচকে ভাববার চেষ্টা করল। কাকাবাবুই আবার বললেন, "কারুকে টেলিফোন করতে। খুব সম্ভবত টেলিফোনটা দোতলায়। উনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না।"

সন্তু বলল, "উনি যে তোমাকে চিনতে পারেননি। উনি কি কাগজ-টাগজও পড়েন না?"

কাকাবাবু কবজি উলটে ঘড়িটা দেখলেন। পৌনে ন'টা বাজে। এ-বাড়িতে অন্য লোকজনের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তা দিয়ে বিকট গর্জন করে একটা মোটরবাইক গেল।

শৈবাল দত্ত আবার নীচে নেমে এসে কাকে যেন হুকুম করলেন সদর দরজাটা বন্ধ করে দিতে, তারপর ঘরে ঢুকে খানিকটা উত্তেজিতভাবে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন বুঝতে পারছি না। আপনি কত টাকা চান?"

"টাকা? ওঃ হো-হো, আপনি কি ভেবেছেন..."

"বাঃ, আপনি আমার মেয়েকে পাহাড়-পর্বতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, তার জন্য খরচ লাগবে না? সেটা চাইতেই তো আপনি এসেছেন আমার কাছে?"

কাকাবাবু শৈবাল দত্তের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার রিভলভারটার লাইসেন্স আছে আশা করি?"

শৈবাল দত্ত একটু থতমত খেয়ে বললেন, "অ্যাঁ? হ্যাঁ, আছে।"

"হাতটা পকেট থেকে বার করুন। হঠাৎ আমাদের ওপর গুলি-টুলি চালিয়ে বসবেন না যেন! আপনার মেয়ে হারিয়ে গেছে, সেজন্য আপনি খুব অস্থির হয়ে আছেন, বুঝতে পারছি। তবু অনুরোধ করছি, একটুখানি শান্ত হয়ে বসে আমার কথা শুনুন।"

শৈবাল দত্ত কড়া গলায় বললেন, "আগে আপনি জবাব দিন, আমার মেয়ে আপনার কাছে গিয়েছিল কেন? আপনি তাকে পাহাড়-পর্বতে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়েছিলেনই বা কেন?"

কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "আমি তাকে লোভ দেখাব কেন? বরং আমি রাজি হলুম না বলেই তো সে রেগে গেল। আপনার মেয়ে বড্ড রাগী!"

"আপনি রাজি হননি?"

"একটি অচেনা মেয়ে এসে এ-রকম অদ্ভুত প্রস্তাব দিলে কেউ রাজি হয়?

তার বাবা-মায়ের মতটা তো অন্তত আগে জানা দরকার। তা ছাড়া আমার এখন বাইরে কোথাও যাবার কথাও নেই। এই সব শুনে আপনার মেয়ে এমন রেগে গেল যে, জুতো না পরেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল!"

এই কথা শুনে শৈবাল দত্তর মুখখানা বদলে গেল অনেকখানি। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "খুকু ছোটবেলা থেকেই বড্ড জেদি। রাগ করে অনেকবার খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়েছে।"

"ওর জুতোজোড়া আমরা সঙ্গে নিয়েই এসেছি। সন্তু, বার করে দে।"

এই সময় আলো জ্বলে উঠল।

শৈবাল দত্ত ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, খুকুরই জুতো। গত মাসে আমি বোম্বে থেকে এনেছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দেবলীনা আমাদের বাড়িতে মঙ্গলবার গিয়েছিল। সেইদিন থেকেই কি ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?"

শৈবাল দত্ত বললেন, "মঙ্গলবার? না, দাঁড়ান, আমি হায়দ্রাবাদ থেকে ফিরলুম কবে? মঙ্গলবার! মঙ্গলবার রাত্তিরে আমি ফিরেছি। বুধবার সকালেও আমি খুকুর সঙ্গে কথা বলেছি। বুধবার বিকেল থেকেই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না!"

বাইরে একটা জিপগাড়ি থামার আওয়াজ হল।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "পুলিশ।"

তারপর শৈবাল দত্তের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের সুরে বললেন, "বেশ তাড়াতাড়ি এসে গেছে তো! আপনার ফোন পাওয়ামাত্র ছুটে এসেছে।"

শৈবাল দত্ত লজ্জিতভাবে বললেন, "আমার একজন বিশেষ বন্ধু, তাকে আসবার জন্য টেলিফোন করেছিলুম..."

॥২॥

হালকা ঘি-রঙের হাওয়াই শার্ট আর সাদা প্যান্ট পরে যিনি ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখলে টেনিস খেলোয়াড় মনে হলেও আসলে তিনি পুলিশের একজন বড়কর্তা, তাঁর নাম ধ্রুব রায়।

"কী ব্যাপার, শৈবাল, তুমি কালপ্রিটকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছ?"

এই বলেই তিনি কাকাবাবুকে দেখে চমকে গেলেন। এগিয়ে এসে বললেন, "আরে, কাকাবাবু, আপনি এখানে!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বন্ধু আমাকেই কালপ্রিট ভেবেছিলেন!"

শৈবাল দত্ত ধ্রুব রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি এঁকে চেনো?"

ধ্রুব রায় হাসতে হাসতে বললেন, "আরে কাকাবাবুকে কে না চেনে? তোমাকে সেই আন্দামানের ঘটনাটা বলেছিলুম না, সেই যে জারোয়াদের দ্বীপে রাজা হয়েছিলেন একজন বৃদ্ধ বিপ্লবী! এঁর জন্যই তো সেই সব কিছু জানা

গিয়েছিল, ইনিই তো সেই রাজা রায়চৌধুরী !”

শৈবাল দত্ত বললেন, “আমি খুব দুঃখিত। মানে, ইনি অন্ধকারের মধ্যে এলেন, ভাল করে চেহারাটা দেখতে পাইনি, ওঁর কথাগুলোও ঠিক ধরতে পারছিলুম না, তাই আমার মনে হল উনি র‍্যানসাম চাইতে এসেছেন, আমার ওপর চাপ দিচ্ছেন।”

কাকাবাবু বললেন, “তোমার বন্ধুটি খুব সাবধানী। তোমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে নিজে পকেটে পিস্তল নিয়ে আমাদের পাহারা দিচ্ছিলেন, যাতে আমরা পালিয়ে না যাই !”

ধ্রুব রায় জানলার কাছে গিয়ে বাইরে কাকে যেন বললেন, “সব ঠিক আছে। তোমরা চলে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।”

তারপর ফিরে এসে বললেন, “খুকুকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে শৈবাল একেবারে দারুণ বিচলিত হয়ে আছে। আমি তো বলেছি, এত নার্ভাস হবার কিছু নেই, ও নিজেই ঠিক ফিরে আসবে। এই তো প্রথম নয়, আগেও তো এরকম চলে গিয়েছিল।”

কাকাবাবু বললেন, “আগেও চলে গিয়েছিল ?”

ধ্রুব রায় হালকাভাবে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাগ হলেই ও বাড়ি থেকে চলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। ওর মা তো নেই, বাবাও মেয়ের জন্য বেশি সময় দিতে পারে না। ওকে ঠিকমতন দেখাশুনো করার কেউ নেই, সেই জন্যেই, ফ্র্যাংকলি বলছি, শৈবালের সামনেই বলছি, মেয়েটা বেশ স্পয়েল্ট চাইল্ড হয়ে গেছে ! কারুর কথা শোনে না।”

শৈবাল দত্ত বললেন, “ওর জন্য তিন জন টিচার রেখেছি।”

ধ্রুব রায় বললেন, “আরে বাবা, টিচার রাখলেই কি ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় ? বাবা-মায়ের শিক্ষাটাই আসল। ওকে ছোটবেলায় একটু শাসন করা উচিত ছিল। এখন অবশ্য বড় হয়ে গেছে। কিন্তু জানেন, কাকাবাবু, মেয়েটা খুব ব্রিলিয়ান্ট ! এক্সট্রাঅর্ডিনারি। আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে ওর তুলনাই চলে না। যেমন লেখাপড়ায় মাথা, তেমনি ওর সাহস। ঠিকমতন চললে ও মেয়ে অনেক বড় কিছু হতে পারবে। তা আপনি এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন কী করে ?”

কাকাবাবু বললেন, “ওই দেবলীনা আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কোনও রকম ভূমিকা না করেই বলল, পরের অ্যাডভেঞ্চারে ও আমার সঙ্গে যেতে চায় !”

ধ্রুব রায় বললেন, “আপনার সঙ্গে যেতে আমাদেরই লোভ হয়। ওই বয়েসের ছেলেমেয়েদের তো হবেই। এবারে আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? আমায় নিয়ে চলুন !”

কাকাবাবু বললেন, “মেয়েটি সম্পর্কে তা হলে বিশেষ চিন্তা নেই বলছ ?

আমার একটু অপরাধ-বোধ হচ্ছিল। আমার সঙ্গে দেখা করতে গেল, তার পর থেকেই নিরুদ্দেশ, তাই ভাবছিলুম, আমিও বোধহয় কিছুটা দায়ী !"

ধ্রুব রায় বললেন, "না, না, না, ও ঠিক ফিরে আসবে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও কোনও বিপদে পড়বে না।"

"রাগ করে ও কোথায় গিয়ে থাকে ?"

"এক-একবার এক-এক জায়গায় যায়। এই তো সেবারে, তখন ওর বয়েস কত হবে, বড়জোর তেরো, একলা ট্রেনে টিকিট কেটে পাটনায় চলে গিয়েছিল।"

শৈবাল দত্ত বললেন, "কিন্তু এবারে ও কোথায় যাবে ? পাটনায় তো কেউ নেই, দুর্গাপুরেও যায়নি, আমি টেলিফোনে খবর নিয়েছি।"

ধ্রুব রায় বললেন, "কেন, ভিলাইতে ওর মামার বাড়ি যদি চলে যায় ? সেখানেই গেছে আমার ধারণা।"

"ওর মামা তো ভিলাইতে এখন থাকে না, আমেরিকা চলে গেছে !"

"তা হলে কলকাতাতেই ওর কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়িতে আছে নিশ্চয়ই। তুমি চিন্তা করো না, আমি লোক লাগিয়েছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এ-বাড়িতে আর-কেউ থাকে না ?"

শৈবাল দত্ত বললেন, "আমার স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন আগে। আমার এক পিসিমা আর তাঁর ছেলে থাকতেন আমার এখানে। পিসতুতো ভাইটি একটা চাকরি পেয়েছে দুর্গাপুরে। পিসিমা কয়েক দিনের জন্য সেখানে গেছেন। এই ক'দিন খুকু বলতে গেলে একাই ছিল। চাকরির কাজে আমাকে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই বাইরে যেতে হয়।"

ধ্রুব রায় বললেন, "এত বড় বাড়িতে একা-একা থাকতে কারুর ভাল লাগে ? মাথার মধ্যে নানারকম উদ্ভট চিন্তা তো আসবেই ! শৈবাল, তুমি এবারে মেয়ের দিকে একটু মনোযোগ দাও !"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা তা হলে এবার উঠি। চল্ রে, সন্তু !"

ওঁরা দু'জন কাকাবাবুদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বাইরে রাস্তায় দু'তিনটি ছেলে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, সে-দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ওদের মধ্যে তোর বন্ধু রানা আছে ?"

সন্তু বলল, "না তো !"

"আমি বড় রাস্তায় দাঁড়াচ্ছি, তুই গিয়ে রানার খোঁজ কর। সে দেবলীনা সম্পর্কে কী কী জানে, কেন সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এসব জেনে আসার চেষ্টা কর। দশ মিনিটের মধ্যে আসিস।"

কাকাবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এলেন বড় রাস্তার দিকে। এর মধ্যেই রাস্তা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে। কাকাবাবু একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন। তাঁর মনটা খারাপ লাগছে।

সন্তু একটু বাদেই ফিরে এল। সে বলল, "রানার বাড়ি ওই মেয়েটির বাড়ির পাশেই। কিন্তু রানার খুব জ্বর হয়েছে, ও ঘুমোচ্ছে, তাই কিছু জিজ্ঞেস করা গেল না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। এবারে দ্যাখ দেখি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় কি না!"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও সেখানে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তু সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

যদিও লোডশেডিং নেই, তবু রাস্তাটা বেশ অন্ধকার। দু'চারটে সাইকেল-রিকশা মাঝে-মাঝে বেল দিতে-দিতে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়েই চলেছে।

খানিকটা এগোতেই হঠাৎ ছায়ামূর্তির মতন তিনটি লোক ঘিরে ধরল ওদের। একজন চেপে ধরল সন্তুর কাঁধ, একজন একটা ছুরি বার করে কাকাবাবুর মুখের সামনে ধরল, অন্যজন হিসহিসিয়ে বলল, "কী আছে চটপট বার করো তো চাঁদু!"

কাকাবাবু লোক তিনটিকে দেখলেন। কারুরই বয়েস খুব বেশি না, পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে। খুব একটা গাঁট্টাগোট্টা চেহারাও নয়। তবে মুখে গুণ্ডা-গুণ্ডা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এত কম বয়েসে জেলে যাবার শখ হয়েছে বুঝি?"

ওদের একজন বলল, "এই বুড়ো, বেশি কথা নয়, বার করো, যা আছে বার করো!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছ থেকে কী-ই বা পাবে? আমি খোঁড়া মানুষ। আমার সঙ্গে রয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে। আমাদের ওপর জুলুম কোরো না। আমাদের ছেড়ে দাও!"

যার হাতে ছুরি সে বলল, "হাতে ঘড়ি তো রয়েছে, খোলো শিগগির।"

আর একজন বলল, "পকেটে মানিব্যাগও আছে। সব আমাদের চাই!"

কাকাবাবু বললেন, "এটা একটা সস্তার ঘড়ি, তাও অনেকদিনের পুরনো। নিয়ে তোমাদের বিশেষ কিছু লাভ হবে না!"

ছুরিওয়ালা ছেলেটি এবার ধমক দিয়ে বলল, "ভালয়-ভালয় দেবে, না পেট ফাঁসাব?"

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তা হলে নাও!"

পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করেই কাকাবাবু সেটা বেশ জোরে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তার উল্টোদিকে।

একজন বলল, "এটা কী হল? চালাকি?"

বলেই সে ছুটে গেল ব্যাগটা খুঁজবার জন্য। ছুরিওয়ালা ছেলেটি বলল, "আমার সঙ্গে চালাকি করলে জানে মেরে দেব।"

কাকাবাবু একবার সন্তুর চোখের দিকে তাকালেন, তারপর ঘড়িটি খুললেন আস্তে-আস্তে। ছুরিওয়ালা ছেলেটি সেটা হাত বাড়িয়ে নেবার আগেই কাকাবাবু সেটাকেও ছুঁড়ে দিলেন ওপরের দিকে।

গুণ্ডা দু'জন ওপরের দিকে তাকাতেই কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে ছুরিওয়ালার হাতটাতে আঘাত হানলেন। সন্তুও অন্য লোকটিকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ঘড়িটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করল। ঠিক পারল না। অন্ধকারে তো ভাল দেখা যাচ্ছে না, ঘড়িটা সন্তুর হাতে লেগে মাটিতে পড়ল। সন্তু ঘড়িটা তোলবার জন্য নিচু হতেই একজন তার পিঠের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল, সন্তু নিখুঁত ক্যারাটের কায়দায় সেই হাতটা চেপে ধরে তাকে আছাড় মারল সপাটে।

ছুরিটা পড়ে গেছে রাস্তায়। কাকাবাবু সেই লোকটির চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "তুমি ছুরিটা তোলার চেষ্টা করলেই আমি তোমার মাথাটা গুঁড়ো করে দেব। সেটা কি ভাল হবে?"

যে-লোকটা রাস্তার উলটো দিকে মানিব্যাগটা খুঁজতে গিয়েছিল, সে সেটা তুলে নিয়ে একবার এদিকে তাকাল। এদিকে এইসব কাণ্ড দেখে সে আর ফিরল না। চোঁ-চোঁ দৌড় মেরে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ছুরি তুলে যে ভয় দেখাচ্ছিল, তাকে কাকাবাবু হুকুম করলেন, "মাটিতে বসে পড়ো। কী সব বন্ধু তোমাদের, একজন তো একলা পালিয়ে গেল তোমাদের ফেলে!"

সন্তু যাকে আছাড় মেরেছে, সে এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে যে, উঠে বসে গোল-গোল চোখে তাকিয়ে আছে। একটা বাচ্চা ছেলের কাছে সে এরকম জব্দ হবে, কল্পনাই করতে পারেনি।

কাকাবাবু বললেন, "আমি তোমাদের প্রথমেই বারণ করেছিলুম, তখন শুনলে না। ওই যে দূরে একটা গাড়ি আসছে, ওই গাড়িটা থামিয়ে তোমাদের থানায় নিয়ে যাব! কিংবা, এখান থেকে কাছেই একটা গাড়িতে পুলিশের একজন বড়কর্তা বসে আছেন... !"

ওদের একজন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "স্যার, এবারকার মতন ছেড়ে দিন! এবারকার মতন মাপ করুন।"

কাকাবাবু বিরক্ত ভঙ্গি করে বললেন, "একটু আগে আমাকে বলেছিলে 'বুড়ো' আর 'তুমি', এখন হয়ে গেলুম 'স্যার' আর 'আপনি'। কাপুরুষ! নিরীহ লোকদের ওপর হামলা করার সময় লজ্জা নেই, ধরা পড়লেই অমনি কান্না!"

সন্তু ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে ওদের পাহারা দিচ্ছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, সন্তু, ওদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত নয়?"

একজন মরিয়া হয়ে ছুট লাগাল। অন্যজন উঠতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু

বললেন, "শোনো, তোমাদের মতন ছিঁচকে গুণ্ডাদের নিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। যাও, তোমাকেও ছেড়ে দিলাম। তবে, তোমার যে স্যাঙাত আমার মানিব্যাগটা নিয়ে পালাল, তার কাছ থেকে ওটা আমায় ফেরত দিতে পারবে ? ওর মধ্যে আমার ঠিকানা লেখা কার্ড আছে। ওর মধ্যে টাকাপয়সা বেশি নেই, কিন্তু ওই ব্যাগটা আমার পছন্দের।"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, দেব স্যার, নিশ্চয়ই দেব স্যার !"

কাকাবাবু বললেন, "মিথ্যে কথা বলতে তোমাদের মুখে আটকায় না তা জানি। হয়তো ফেরত দেবে না। তবে এইসব গুণ্ডামি বদমাইশি ছেড়ে যদি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে চাও, তবে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের কাজ যোগাড় করে দেব ! যাও !"

লোকটা চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল।

দূর থেকে যে গাড়িটা আসছিল, সেটা বেঁকে গেল ডানদিকের একটা রাস্তায়।

আবার হাঁটতে শুরু করে কাকাবাবু বললেন, "কী আশ্চর্য ব্যাপার। মাত্র রাত সাড়ে ন'টা এখন। এরই মধ্যে এত বড় রাস্তায় গুণ্ডার উপদ্রব। কলকাতা শহরটা কি নিউ ইয়র্ক কিংবা শিকাগো হয়ে গেল নাকি ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আপনার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে !"

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা নিয়ে বললেন, "ঘড়ির জন্য আমার অত মায়া নেই। এটা সারিয়ে নিলেই চলবে। আমার নাকের ডগায় কেউ ছুরি দেখালে বড্ড রাগ হয়।"

"কাকাবাবু, আমি কিন্তু ওদের ছুরিটা নিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছিস ! তোর একটা ছুরি লাভ হল। রেখে দে, পরে কাজ দেবে।"

দূর থেকে আবার একটা গাড়ি আসছে, এটা কি ট্যাক্সি হতে পারে ? অনেক সময় ট্যাক্সির ওপরের আলোটা জ্বলে না। কাকাবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

না, ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। ড্রাইভারের সিটে শুধু একজন লোক। গাড়িটা ওদের ছাড়িয়ে খানিকটা চলে যাবার পর হঠাৎ থেমে গেল। তারপর ব্যাক করে চলে এল ওদের কাছে।

গাড়ির চালক মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী না ? আরেঃ, আপনি এখানে কী করছেন ?"

কাকাবাবু লোকটিকে চিনতে পারলেন না। লোকটি মধ্যবয়স্ক, বেশ ভারী চেহারা, মুখে সরু দাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, "এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে... এখন ট্যাক্সি খুঁজছি।"

লোকটি বলল, "এত রাত্রে এদিকে তো ট্যাক্সি পাবেন না। কোথায়

যাবেন ? চলুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার অসুবিধে হবে। আমরা তো বাড়িতে যাব, আপনার বাড়ি কোন্ দিকে ?"

লোকটি বলল, "কোনও অসুবিধে নেই। উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। শুধু-শুধু বৃষ্টিতে ভিজবেন..."

লোকটি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে পীড়াপীড়ি করতে কাকাবাবু সন্তুকে নিয়ে উঠে পড়লেন গাড়িতে। ভদ্রতা করে তিনি বসলেন সামনের সিটে। সত্যি তখন বৃষ্টিটা জোর হয়ে এসেছে।

॥৩॥

একটুক্ষণ গাড়িটা চলার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বাড়ি কি এ পাড়ায় নাকি ?"

লোকটি বলল, "না, আমার বাড়ি এখানে নয়। এ পাড়ায় এসেছিলুম একটা কাজে। কী অদ্ভুত যোগাযোগ বলুন তো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

কাকাবাবু পেছনের সিটের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "এ আমার ভাইপো সন্তু।"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকেও তো চিনি !"

সন্তুও কিন্তু লোকটিকে কোথাও আগে দেখেছে কি না মনে করতে পারছে না। তবে গলার আওয়াজটা যেন একটু চেনা-চেনা লাগছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নামটা কী বলুন তো ? ঠিক মনে করতে পারছি না।"

লোকটি হা-হা শব্দে হেসে বলল, "আমার নাম মনে নেই তো ? ভাবুন, আর একটু ভাবুন, যদি মনে পড়ে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন। সন্তু চুপ।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি একটু আগে এসে পড়লে বেশ হত। তিনটে গুণ্ডা-মতন ছেলে আমাদের ওপর হামলা করতে এসেছিল।"

এই রকম কথা শুনলে সবাই জিজ্ঞেস করে, "তাই নাকি ? কী করেছিল ? তারপর কী হল ?"

কিন্তু এই গাড়ির চালকের সেরকম কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। সে অকারণে হা-হা করে হেসে উঠল।

সাউথ গড়িয়াহাট রোডে পড়ে গাড়িটা ডান দিকে বেঁকতেই কাকাবাবু বললেন, "আমার বাড়ি ওদিকে নয়। বাঁ দিকে যেতে হবে, ভবানীপুরের দিকে।"

লোকটি কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে বলল, "জানি, আপনার বাড়ি কোথায়। এখন একটু অন্য দিকেই চলুন না। আমার বাড়িতে

বসে একটা চা খেয়ে যাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন তো আর চা খাব না। আপনার বাড়িতে অন্য একদিন যাব!"

লোকটি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল হু-হু করে।

কাকাবাবু বললেন, "আরে, এ যে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। আমি এখন বাড়ি ফিরতে চাই। আপনার বাড়ি একেবারে উলটো দিকে দেখছি, আপনি বরং আমাদের এখানে নামিয়ে দিন। এখান থেকে ট্যাক্সি পেয়ে যাব।"

লোকটি বলল, "ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, চলুন না, চলুন না!"

কাকাবাবু এতক্ষণ উপকারী লোকটির সঙ্গে বিনীতভাবে কথা বলছিলেন, এবারে দৃঢ় গলায় বললেন, "আপনি এখানে গাড়ি থামিয়ে দিন!"

লোকটি খুব আলগাভাবে ডান দিকের ড্যাশ বোর্ড থেকে একটা রিভলভার বার করে বলল, "আশা করি এটা ব্যবহার করার দরকার হবে না। চুপ করে বসে থাকুন। আমার বাড়িতে চলুন। সেখানে আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া আছে।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কী ব্যাপার বল্ তো, সন্তু! আজ সন্ধে থেকেই খালি ছোরা-ছুরি আর রিভলভার দেখতে হচ্ছে!"

সন্তু পেছনের সিটে বসে আছে। লোকটি সন্তুকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি। সন্তুর কাছে যে একটা ছুরি আছে তা সে জানে না।

সন্তু বলল, "আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমাদের নামিয়ে দিন এখানে!"

লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "খোকা, চুপ করে বসে থাকো!"

সন্তু ছুরিটা বার করেই চেপে ধরল লোকটার ঘাড়ে। তারপর সে-ও হুকুমের সুরে বলল, "এক্ষুনি গাড়ি থামান। হাত সরাবার চেষ্টা করবেন না। তা হলেই আমি এটা বসিয়ে দেব ঘাড়ে।"

লোকটি একটুও ভয় না পেয়ে বরং অট্টহাসি করে উঠল। তারপর বলল, "এ ছেলেটা দেখছি সেই রকমই বিচ্ছু আছে। বদলায়নি একটুও। পকেটে আবার ছুরি নিয়ে ঘোরে। কত বড় ছুরি?"

কাকাবাবু বললেন, "ছুরিটা বেশ বড়ই। মানুষ মারা যায়।"

লোকটি বিদ্রূপের সুরে বলল, "একটা ছুরি থাকলেই বুঝি মানুষ মারা যায়? সবাই কি মানুষ মারতে পারে? তার জন্যও ট্রেনিং লাগে! এই খোকা, চালাও দেখি ছুরি, দেখি তুমি কেমন পারো!"

সন্তুর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। লোকটা যা বলল, সেই কথাগুলো সে আগে যেন কোথাও শুনেছে? কোথায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ত্রিপুরায়। জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা বাড়িতে। এই লোকটাই সেই 'রাজকুমার'!

স্টিয়ারিংয়ের ওপরেই লোকটির দুই হাত রাখা, এক হাতে রিভলভার। ও

হাত ওঠাবার আগেই সন্তু ওর ঘাড়ে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু হাত কাঁপছে। সত্যি-সত্যি কি একজন মানুষকে মেরে ফেলা যায় ?

সে আবার ভয় দেখাবার জন্য বলল, "শিগগির গাড়ি থামান, নইলে কিন্তু..." এই কথা বলার সময় তার গলাও কেঁপে গেল।

লোকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "বললুম তো গাড়ি থামাব না, তুই কী করতে পারিস দেখি !"

কাকাবাবু বললেন, "ছুরিটা সরিয়ে নে সন্তু। ইনি ভয় পাচ্ছেন না। ইনি যখন এত করে বলছেন, তখন এঁর বাড়িতে একটু চা খেয়েই আসা যাক। চা ছাড়া আমরা আর কিছু খাব না কিন্তু !"

সন্তু আশা করেছিল কাকাবাবু লোকটিকে অন্যমনস্ক করে দিয়ে কিছু একটা করবেন। কিন্তু কাকাবাবু সেরকম কিছুই করলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ও মশাই, আপনার বাড়ি আর কত দূরে ?"

লোকটি গম্ভীরভাবে বলল, "আর একটু দূর আছে।"

এই রাস্তা এখনও তেমন ফাঁকা নয়। বাস চলছে। বৃষ্টির মধ্যেও কিছু লোক হেঁটে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একটা চলন্ত গাড়ির ভেতরে যে রিভলভার আর ছুরির খেলা চলছে, তা কেউ বুঝতে পারছে না।

যাদবপুর পেরিয়ে গিয়ে একটা নির্জন জায়গার কাছাকাছি এসে গাড়িটা গতি কমিয়ে একেবারে থেমে গেল। লোকটি এবারে রিভলভারটি ডান হাতে উঁচিয়ে, মুখ ফিরিয়ে সন্তুকে বলল, "গাড়ি থামাতে বলেছিলি, এই তো থামালুম, এবারে তুই নেমে যা !"

কাকাবাবুর দিকে ফিরে বলল, "আপনি বসে থাকুন। আরও খানিকটা দূরে যেতে হবে।"

সন্তু বলল, "আমি একা নেমে যাব ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, তোকে আমার দরকার নেই। এখান থেকে বাস পেয়ে যাবি। বাসভাড়া না থাকে তো বল, আমি দিয়ে দিচ্ছি !"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুকে ছেড়ে আমি কিছুতেই একা যাব না।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই চলেই যা সন্তু। যতদূর মনে হচ্ছে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। বেশি রাত হলে দাদা-বউদি চিন্তা করবেন তোর জন্য।"

লোকটি কাষ্ঠহাসি দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, তা বেশ দেরি তো হবেই !"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আপনাকে ফেলে রেখে আমি একা ফিরে গেলে মা-বাবা আরও বেশি চিন্তা করবেন !"

লোকটি বলল, "নেমে পড়, নেমে পড়, দেরি হয়ে যাচ্ছে !"

"আমি কিছুতেই নামব না !"

"তবে ছুরিটা দে আমার কাছে। চুপ করে বসে থাকবি। একদম মুখ খুলবি না!

সন্তু তবু বলল, "কাকাবাবু, এই লোকটা হচ্ছে রাজকুমার ! সেই যে ত্রিপুরায় জঙ্গলগড়ের চাবি খোঁজার সময়..."

কাকাবাবু বললেন, "প্রথমটায় চিনতে পারিনি। তখন দাড়ি ছিল না, চেহারাটাও রোগা ছিল, তাই না ?"

লোকটি বলল, "চিনেছেন তা হলে ? কতদিন পর দেখা বলুন ? অনেক কথা জমে আছে, না ? তাই আপনাকে দেখে মনে হল, আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাই, খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করা যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, গল্প ভালই জমবে মনে হচ্ছে।"

রাজকুমার আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। তারপর কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। গড়িয়া পেরিয়ে আরও কিছুদূর যাবার পর গাড়িটা ঘুরে গেল ডান দিকে। এখানে একেবারে অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাস্তা। রাজকুমার এমনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যে, মনে হয় এদিককার পথঘাট তার বেশ ভালই চেনা।

মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে তাড়া করছে গাড়িটাকে। কাছাকাছি কোনও বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। পথটা গেছে এঁকেবেঁকে, হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে পাশে বড়-বড় পুকুর। গাড়িটা এত স্পিডে যাচ্ছে যে, হঠাৎ কোনও পুকুরে নেমে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

এক সময় গাড়িটা একটা বেশ বড় বাড়ির লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকুমার হর্ন বাজাল খুব জোরে-জোরে। শার্ট-পরা একজন লোক এসে খুলে দিল গেট।

কাকাবাবু বললেন, "অনেক দূর ! এখান থেকে রাত্তিরবেলা ফিরব কী করে ?"

রাজকুমার বলল, "আজ রাত্তিরেই যে ফিরতে হবে, তার কী মানে আছে ? এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?"

কাকাবাবু হঠাৎ ভুরু কোঁচকালেন। যেন অন্য কোনও কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে।

লোহার গেটের পরে একটা বাগান। এখানেও একটা বিরাট কুকুর ডেকে উঠল বুক কাঁপিয়ে। রাজকুমার দু'তিনবার শিস দিতেই নেকড়ে বাঘের মতন কুকুরটা তার পায়ের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

সন্তু নেমে দাঁড়িয়েছে, কাকাবাবু গাড়িতে বসেই রইলেন। রাজকুমার এসে বলল, "কী হল, নামুন।"

যেন একটা ঘোর ভেঙে কাকাবাবু বললেন, "ও, হ্যাঁ, নামছি।"

কাকাবাবু নেমে চারপাশটা দেখে বললেন, "বাঃ, বেশ বাড়িটা তো। আপনার নিজের নাকি ?"

রাজকুমার বলল, "প্রায় আমারই বলতে পারেন।"

সন্তু ভাবল, বাড়ি আবার 'প্রায় আমার' হয় কী করে ? বাড়ি কি বই যে অন্য

কারুর কাছ থেকে চেয়ে এনে ফেরত না দিলেই প্রায় নিজের হয়ে যায় ?

এত বড় বাড়িতে একটাও আলো জ্বলছে না।

রাজকুমার বলল, "লোডশেডিং মনে হচ্ছে। তিনতলায় উঠতে হবে, আপনার অসুবিধে হবে না তো, মিঃ রায়চৌধুরী ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "না, না, অসুবিধের কী আছে ? অন্ধকারে ক্রাচ নিয়ে তিনতলার সিঁড়ি ভাঙা, এ তো খুব আনন্দের ব্যাপার !"

রাজকুমার কার উদ্দেশে যেন বলল, "এই, একটা টর্চ নিয়ে আয়। সিঁড়িতে আলো দেখা !"

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে গিয়েও থমকে গিয়ে রাজকুমার বলল, "কিছু মনে করবেন না, মিঃ রায়চৌধুরী। একটা জিনিস চেক করে দেখতে চাই। আপনার হাত দুটো একবার ওপরে তুলুন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সঙ্গে কোনও অস্ত্র আছে কি না দেখতে চান তো ? কলকাতা শহরে সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরুবার সময় আমি বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না। অবশ্য এখন বুঝতে পারছি, সঙ্গে একটা কিছু রাখাই উচিত ছিল।"

রাজকুমার তবু কাকাবাবুর সারা শরীর থাবড়ে-থাবড়ে দেখল। তারপর বলল, "ঠিক আছে, চলুন।"

টর্চের আলোয় দেখা গেল ভেতরে একটা বেশ চওড়া, টানা বারান্দা। তার একপাশ দিয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি।

কাকাবাবু বললেন, "একতলায় ঘর নেই ? সেইখানে বসে গল্প-গুজব সেরে নিলে হয় না ?"

রাজকুমার এবারে বেশ কড়াভাবে বলল, "না, ওপরেই যেতে হবে। আপনার ভাইপো আগে-আগে চলুক, আপনি মাঝখানে, তারপর আমি।"

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চল্ রে, সন্তু, দেরি করে লাভ নেই।"

সন্তু তিনতলায় পৌঁছতেই অন্ধকারের মধ্যে একজন কেউ চেঁচিয়ে উঠল, "কৌন ? কৌন্ ?"

পেছন থেকে রাজকুমার বলল, "ঠিক আছে, টাইগার, আমি আছি। তুমি পাঁচ নম্বর ঘরটা খোলো। আলো নেই কেন ? কখন থেকে লোডশেডিং ?"

অন্ধকারের মধ্যেই টাইগার নামের লোকটি বলল, "লোডশেডিং নেহি। মালুম হচ্ছে কি লাইনমে কুছু গড়বড় হয়েছে !"

একটা তালা খোলার শব্দ হল। রাজকুমার টর্চের আলো ফেলে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, এগিয়ে যান, বাঁ দিকের তিন নম্বর দরজা। আপনারা দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ান। আমি বাইরে আছি। টাইগার, আমার ঘর থেকে টিউবলাইটটা নিয়ে এসো।"

টাইগার বলল, "আপনার ঘরের চাবি তো হামার কাছে না আছে।"

রাজকুমার বলল, "ও, হ্যাঁ, তাই তো। ঠিক আছে, আমিই নিয়ে আসছি। তুই দরজার বাইরে দাঁড়া। মিঃ রায়চৌধুরী, টাইগারকে ঘাঁটাতে যাবেন না যেন। ও বড্ড গোঁয়ার।"

মিশমিশে অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢুকে সন্তু হাতড়ে-হাতড়ে দেয়ালের কাছে গেল। তারপর সারা দেয়ালটা হাত বুলিয়ে দেখল। সে-দেয়ালে কোনও জানলা নেই। আর-এক দিকে যেতে সে কিসের সঙ্গে যেন ঠোক্কর খেল। হাত দিয়ে বুঝল, সেটা একটা খাট।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তুই তখন নেমে গেলেই পারতিস। বাড়ি পৌঁছে যেতিস এতক্ষণ।"

সন্তু বলল, "বাড়ি গিয়ে মা-বাবাকে কী বলতুম? একজন তোমাকে রিভলভার দেখিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, আর আমি পালিয়ে এলুম?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে কি এত সহজে ধরে আনা যায়? আমি অনেকটা ইচ্ছে করেই এসেছি। দেখাই যাক না এদের কাণ্ড-কারখানাটা কী।"

এবারে একটা টিউবলাইট হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল রাজকুমার। সেই আলোয় দেখা গেল, ঘরটা বেশ বড়, দু'পাশে দুটি খাট, মাঝখানে একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। ঘরে একটাও জানলা নেই, দেয়ালে সাদা-সাদা তুলোর মতন কী যেন লাগানো। বোঝা যায়, বিশেষভাবে ঘরটা তৈরি।

বাতিটা টেবিলের ওপর রেখে রাজকুমার বলল, "একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে খাটে বসলেন। কোনও জানলা নেই বলে ঘরটায় বেশ গরম। একটা পাখা আছে বটে, কিন্তু এখন বিদ্যুৎ নেই বলে সেটা চলছে না।

কাকাবাবুর বাঁ পায়ে একেবারেই শক্তি নেই, তবু তিনি সেই পায়ে গোলমতন একটা জুতো পরে থাকেন। ডান পায়ে স্বাভাবিক জুতো। তিনি জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বললেন, "তুইও জুতোমোজা খুলে ফ্যাল, সন্তু, রাত্তিরটা তো এখানেই থাকতে হবে মনে হচ্ছে।"

রাজকুমার ফিরে এসে বলল, "আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে এলুম। এবারে নিশ্চিন্তে বসে কথা বলা যাবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনাদের খাবার এসে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা কী খাব জিজ্ঞেস করলেন না তো? আমি রাত্তিরে রুটি খাই।"

রাজকুমার বলল, "ভাত আর রুটি দু'রকমই থাকবে। যেটা ইচ্ছে খাবেন। আর মাংস।"

কাকাবাবু বললেন, "মাংসতে যেন ঝাল না দেয়। ত্রিপুরার লোক বড্ড ঝাল খায়। আমি আজকাল ঝাল খেতে পারি না।"

রাজকুমার বলল, "না, না, একদম ঝাল নেই। এখানে ইওরোপিয়ান স্টাইলে রান্না হয়। স্টু-এর মতন।"

"সেই সঙ্গে খানিকটা স্যালাড।"

"হ্যাঁ, স্যালাড তো থাকবেই। আর যদি সুইট ডিশ কিছু চান..."

সন্তুর মনে হল কাকাবাবু যেন কোনও হোটেলে এসে খাবারের অর্ডার দিচ্ছেন। অথচ রাজকুমারের হাতে এখনও রিভলভার ধরা।

রাজকুমার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, "আপনাদের ডাব্‌ল বেডঘর দিয়েছি। থাকার কোনও অসুবিধেই হবে না। সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম আছে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন থাকতে হবে? ব্যবস্থা তো বেশ ভালই দেখছি।"

রাজকুমার বলল, "থাকুন না। আমি তো বলেছি, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।"

"ত্রিপুরা ছেড়ে এখন এখানেই থাকা হয় নাকি? জেল থেকে বেশ তাড়াতাড়িই ছেড়ে দিল তো।"

"হ্যাঁ, ইলেকশানের সময় ছাড়া পেয়ে গেলাম। ভেতরে কিছু কলকাঠিও নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। সেবারে খুব জব্দ করেছিলেন আমাদের।"

"তোমরা তো আমার কথা বিশ্বাসই করোনি। খুব গুপ্তধন-গুপ্তধন বলে লাফালে। শেষ পর্যন্ত জঙ্গলগড়ে গিয়ে দেখা গেল কিছুই নেই। মানে, টাকাপয়সা নেই, কিন্তু অন্য জিনিস ছিল, যার দাম তোমরা বুঝবে না।"

"সেবারে আমাদের হাত ফসকে খুব জোর পালিয়েছিলেন। আর আপনার ভাইপো এই ছেলেটা, ওঃ কী সাংঘাতিক বিচ্ছু!"

"কলকাতায় এখন কী করা হচ্ছে? ব্যবসা-ট্যবসা?"

"ঠিক ধরেছেন। অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসা করছি। চলছে বেশ ভালই। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাই ভাবলুম, পুরনো দিনের গল্প-টল্প করা যাক।"

"আমি আবার পুরনো গল্প একদম ভালবাসি না। আমার সঙ্গে কি হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, না অন্য কোনও ব্যবস্থা ছিল?"

"এসব জিনিস কি হঠাৎ হয়? আপনাকে রাস্তায় দেখলুম আর টপ করে তুলে নিয়ে এলুম? আপনি হচ্ছেন রাজা রায়চৌধুরী, অতি ধুরন্ধর ভি আই পি। আপনার জন্য অনেক রকম বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। বেশ কিছু টাকাও খরচ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রাজকুমারের মুখের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "শুধু আমার সঙ্গে গল্প করার জন্য এত ব্যাপার? টাকা খরচও করতে হয়েছে? কেন, আমাকে কি মেরে-টেরে ফেলার ইচ্ছে আছে নাকি তোমার?"

রাজকুমার হেসে বলল, "আরে না, না। ওসব কী বলছেন ? পুরনো শত্রুতা অত আমি মনে রাখি না। খুন-টুনের মধ্যে আমি এখন নেই। বললুম না, এখন আমি ব্যবসা করছি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে রাজকুমার বলল, "আচ্ছা, আবার কাল গল্প হবে। আজ আমি টায়ার্ড। তা ছাড়া খুব খিদেও পেয়ে গেছে। শুনুন, বাইরে টাইগার নামের লোকটি রাত্তিরে সব সময় থাকবে। ভুলেও কিন্তু ওকে ডাকবেন না। ও আমার কথা ছাড়া আর কারুর কথা শোনে না। কেউ ওকে কোনও কিছুর জন্য রিকোয়েস্ট করলে ও তার মাথায় ডাণ্ডা মারে ! ওর কাছে একটা রবারের ডাণ্ডা আছে। সেটা দিয়ে মারলে রক্ত বেরোয় না, কিন্তু লাগে ভীষণ !"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমিও টায়ার্ড, খাবারটা এলে খেয়ে শুয়ে পড়ব। টাইগারকে ডাকার দরকারই হবে না। আচ্ছা, একটা ব্যাপার জানার কৌতূহল হচ্ছে।"

রাজকুমার বলল, "কৌতূহল কক্ষনো চেপে রাখতে নেই। পেট ফুলে যায়। বলে ফেলুন, বলে ফেলুন !"

কাকাবাবু বললেন, "আজ সন্ধেবেলা যে আমি আনোয়ার শা রোডে আসব, সেটা তুমি জানলে কী করে ? আমার তো আসবার ঠিক ছিল না !"

রাজকুমার বলল, "ও, এই ব্যাপার ? এটা আর এমন শক্ত কী ? দিন দশেক ধরে আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখা হয়েছিল। আপনি তো মশাই আচ্ছা ঘরকুনো লোক। বাড়ি থেকে বেরুতেই চান না !"

"সকালবেলা একবার পার্কে ঘুরে আসতে যাই।"

"সে-সময় পার্কে অনেক লোক থাকে। তা ছাড়া, দিনের বেলা এসব কাজ হয় না।"

"ওই পার্কেই একবার একজন আমার পিঠে গুলি করেছিল !"

"না, না, আমি ওই সব গুলি-ফুলির মধ্যে নেই। মানে নেহাত দরকার না পড়লে...যেমন এখন আপনি পালাবার চেষ্টা করলে আমায় গুলি চালাতেই হবে। কিন্তু সেটা আশা করি আপনিও চাইবেন না, আমিও চাইব না।"

"না, না, পালাবার চেষ্টা করব কেন ? যখন যেতে ইচ্ছে হবে, তখন নিজেই চলে যাব, সেটাই তো ভাল, তাই না ?"

রাজকুমার অট্টহাসি করে উঠল। কাকাবাবুও হাসলেন। সন্তু ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই রকম বিপদের মধ্যেও কাকাবাবু ইয়ার্কির সুরে কথা বলছেন ! কাকাবাবুর যে কী উদ্দেশ্য সেটাই সে বুঝতে পারছে না।

কাকাবাবু আবার বললেন, "দিন-দশেক ধরে আমার বাড়ির সামনে লোক রেখেছিলে ? খুব গরজ দেখছি ? কী ব্যাপার ?"

রাজকুমার বলল, "হ্যাঁ, গরজ একটু ছিল বটে। আপনি সকালবেলা একবার পার্কে যান, আর সারাদিন বাড়িতেই বসে থাকেন। বেশ মুশকিলে পড়ে

গিয়েছিলুম। সেই জন্য আপনার জন্য একটা টোপ ফেলতে হল।"

"টোপ ?"

"এখন ওসব কথা থাক। আবার কাল সকালে গল্প হবে। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর ব্যাটারি-লাইটটা কিন্তু নিয়ে যাব।"

লোকটি দরজার একটা পাল্লা খুললে কাকাবাবু বললেন, "তুমি কিসের ব্যবসা করছ, সেটা তো বললে না ?"

"সেটা সিক্রেট ! পরে আস্তে-আস্তে সবই জানতে পারবেন। গুডনাইট মিঃ রায়চৌধুরী ! গুডনাইট সন্তু !"

॥ ৪ ॥

দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, "কী রে, সন্তু, কেমন বুঝছিস ?"

ঠিক ভয়ে নয়, দুশ্চিন্তায় সন্তুর মুখটা শুকিয়ে গেছে। জোর করে মুখে একটা ফ্যাকাসে হাসি ফুটিয়ে বলল, "লোকটা খুব সাংঘাতিক। কী রকম সাপের মতন তাকায় !"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওপর ওর খুব রাগ আছে। তোর ওপরেও আছে। আমাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়নি, অনেক প্ল্যান করে ধরে এনেছে। তার মানে, শুধু আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতেই চায় না, ওর অন্য কিছু প্ল্যান আছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, ও আমাদের গায়ে হাত তোলেনি একবারও। মারধোর করেনি।"

সন্তু বলল, "আমাদের বন্দী করে রেখে ওর কী লাভ ? তাও এই কলকাতা শহরে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সেইটাই তো জানতে হবে। এই জায়গাটা কোথায় বুঝতে পারছিস ? গড়িয়া ছাড়িয়ে এসে ডান দিকে বেঁকল। খুব সম্ভবত এটা বোড়ালের কাছাকাছি। বোড়ালের নাম শুনেছিস তো ? আগে এটা একটা গ্রাম ছিল। মনীষী রাজনারায়ণ বসু এখানে জন্মেছিলেন। এই বোড়াল গ্রামে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি' ফিল্মের শুটিং করেছিলেন। আমি সেই শুটিং দেখতে এসেছিলুম। সুতরাং এখান থেকে বেরুলে আমাদের রাস্তা খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না, কী বল্ ?"

সন্তু অবাক হয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবু এখান থেকে বেরুবার কথা ভাবছেন কী করে ? নীচের বাগানে একটা নেকড়ে বাঘের মতন কুকুর ঘুরছে। তিনতলায় গোরিলার মতন চেহারার একটা লোক পাহারা দিচ্ছে, তার নাম টাইগার। তার ওপর রয়েছে রাজকুমার। ঘরে একটাও জানলা নেই, এই রকম জায়গা থেকে বেরুবার কোনও উপায়ই তো সন্তু দেখতে পাচ্ছে না।

কাকাবাবু সন্তুর মুখের অবস্থা দেখে তার কাঁধ চাপড়ে বললেন, "কী রে, ঘাবড়ে গেলি নাকি ? হবে, হবে, একটা ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়ে যায় !"

সন্তু পাশের বাথরুমটার দরজা ঠেলে উঁকি মেরে দেখল। এমনিতে বেশ পরিষ্কার মনে হল, কিন্তু বাথরুমের জানলা নেই। জানলা একটা ছিল, স্টিলের পাত দিয়ে সেটা পাকাপাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সন্তু বলল, "বাথরুমের জানলাও বন্ধ !"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কী হয়েছে ? ওপরের দিকে চেয়ে দ্যাখ, ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি আছে, সাফোকেশন হবে না। জানলা থাকলেই বা কী হত, আমি খোঁড়া মানুষ, আমি কি আর জানলা ভেঙে, পাইপ বেয়ে পালাতে পারতুম !"

আলোটা তুলে নিয়ে সারা ঘর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে কাকাবাবু আবার বললেন, "এই ঘরেও আগে তিনটে জানলা ছিল, সেখানে দেয়াল গেঁথে দিয়েছে। দ্যাখ, দেয়ালের রঙের একটু তফাত আছে। তার মানে এই বন্দিশালার ব্যাপারটা নতুন। আমি একটা কথা ভাবছি, এ বাড়িতে কি আরও অনেক বন্দী আছে ? লোকটার কথাবার্তা শুনে যেন সেই রকমই মনে হল !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, রাজকুমার যে বলল, আপনার জন্য টোপ ফেলেছে, তার মানে কী ?"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "সেটাও তো বুঝলাম না রে ! আমি কি মাছ যে টোপ দেখলেই গিলে খাব ? লোকটা বড় চালাক-চালাক কথা বলতে শিখেছে।"

বাইরে খুব জোরে-জোরে কুকুরের ডাক আর একটা কোনও গাড়ির শব্দ শোনা গেল। খুব সম্ভবত মোটরবাইক।

কাকাবাবু দেয়ালের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, "দেয়ালগুলো সাউন্ডপ্রুফ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু খুব একটা সুবিধের হয়নি। এই তো বেশ শব্দ শোনা যাচ্ছে !"

সন্তু বলল, "দরজার গায়েও একটা গোল গর্ত রয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা বাইরে থেকে কথা বলবার জন্য।"

সন্তু কাছে গিয়ে গর্তটার গায়ে চোখ লাগিয়ে দেখল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ গর্তের ওপাশটা কিছু দিয়ে ঢাকা আছে এখন।

সন্তু সেই গর্তে মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "একটু জল চাই ! খাবার জল !"

কেউ কোনও উত্তর দিল না। জলও এল না।

কাকাবাবু খাটের ওপর এলিয়ে বসে বললেন, "যখন খাবার দেবে, তখন নিশ্চয়ই জল দেবে। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাক।"

খাটের ওপর শুধু একটা তোশক আর বালিশ পাতা। চাদর বা সুজনি-টুজনি

কিচ্ছু নেই। সন্তু খাটের ওপর চুপ করে বসে রইল। একটা ব্যাপারে তার অদ্ভুত লাগছে। বাইরে নানান জায়গায় গিয়ে সে আর কাকাবাবু অনেকবার ভয়ংকর-ভয়ংকর বিপদে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু কলকাতার মধ্যে কেউ তাদের এরকমভাবে বন্দী করে রাখবে, সেটা যেন এখনও বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না। কলকাতায় তাদের কত চেনাশুনো, পুলিশের বড়কর্তারা কাকাবাবুকে কত খাতির করে, অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না। একটা লোক তাদের গাড়িতে তুলে রিভলভার দেখিয়ে ধরে আনল, ব্যস ! এখন লোকটা ইচ্ছে করলেই তাদের মেরে ফেলতে পারে।

কাকাবাবু এখান থেকে উদ্ধার পাবার কী প্ল্যান করেছেন কে জানে। কিছুই তো বলছেন না !

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর হঠাৎ দরজার গায়ে গর্তটার ওপাশের ঢাকনা সরাবার শব্দ পাওয়া গেল। তারপর একজন বলল, "খানা আ গিয়া। তুম লোগ সামনের দেওয়াল সাঁটকে খাড়া হয়ে যাও। মাথার ওপর হাঁথ তুলো।"

কাকাবাবু বললেন, "যা বলছে সেটা শোনাই ভাল। নইলে খাবার দিতে দেরি করবে !"

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দরজার মুখোমুখি দেয়ালে গা সেঁটে দাঁড়িয়ে হাত তুললেন। সন্তুকেও দেখাদেখি তা-ই করতে হল। এই অবস্থাতেও সন্তুর মনে হল, তারা দু'জন যেন গৌর-নিতাই।

দরজাটা খুলে গেল আস্তে-আস্তে। প্রথমে ঢুকল একজন বেঁটেমতন লোক, তার হাতে খাবারের পাত্র। তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল টাইগার। বেঁটে লোকটির পেছনে রয়েছে বলেই তাকে অনেক বেশি লম্বা-চওড়া দেখাচ্ছে। তার মুখখানা তামাটে রঙের। ভারতবর্ষের ঠিক কোন্ অঞ্চলের লোক সে, তা বোঝা যাচ্ছে না !

খাবার-টাবারগুলো সাজিয়ে দেওয়া হলে পর কাকাবাবু বললেন, "জল কোথায় ? আমাদের জল লাগবে !"

বেঁটে লোকটি ভ্যাড়ভেড়ে গলায় বলল, "পাবে, পাবে সব পাবে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?"

ওইটুকু চেহারার একটা লোক কাকাবাবুর মতন মানুষকে 'তুমি, তুমি' বলে ধমকে কথা বলছে শুনে রাগে গা জ্বলে গেল সন্তুর। তার ইচ্ছে হল তক্ষুনি লোকটাকে একটা রদ্দা মারতে। কোনওক্রমে সে ইচ্ছেটা চেপে রাখল।

বেঁটে লোকটি আর একবার গিয়ে জল নিয়ে এল দু'গেলাস।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "রাত্তিরে যদি আমাদের আরও জল লাগে ?"

বেঁটে লোকটি বলল, "তখন বাথরুমের কলের জল খাবে ! এটা কি বাপের হোটেল পেয়েছ নাকি ? আবদার !"

সন্তু কাকাবাবুর দিকে তাকাল। কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসছেন।

টাইগার বলল, "আরে এ শন্তো, এত বাত কিসের। আব তুই যা!"

তারপর সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "খেয়ে লিন, তারপর মজেসে ঘুম মারুন। দেখবেন এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে। ই সব বাসনপত্র সব কাল সোকালে নিয়ে যাবে।"

সে আস্তে-আস্তে পিছিয়ে বাইরে বেরিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা।

রাজকুমার যা বলেছিল, খাবারটা মোটেই সে-রকম ভাল কিছু নয়। দুটো স্টিলের থালায় খানিকটা করে ভাত আর রুটি। দুটো ছোট্ট ছোট্ট টিনের বাটি, পাড়ার নাপিতেরা যে-রকম বাটিতে দাড়ি কামাবার জল নেয়, সেই রকম বাটিতে দু'এক টুকরো মাংস আর ঝোল, একটুখানি করে পেঁয়াজ আর গাজর মেশানো স্যালাড। আর একটা বাটিতে সাদা থকথকে মতন একটা জিনিস, সেটা বোধহয় পুডিং, সেটা একেবারে অখাদ্য।

কাকাবাবু সেই খাবারই বেশ মন দিয়ে খেলেন। তারপর বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বললেন, "এবারে শুয়ে পড় সন্তু! আর তো কিছু করবার নেই। কাল সকালে যা-হয় দেখা যাবে।"

সন্তু বলল, "রাজকুমার যে বলেছিল আলোটা নিয়ে যাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তাই বলেছিল বটে। এখন যদি না নিতে চায় তা হলে থাক।"

কাকাবাবু একটা হাই তুললেন।

দরজাটা খুলে গেল আবার। স্লিপিং সুট পরে ঘরে ঢুকল রাজকুমার। তার এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে টর্চ।

সে বলল, "ভাল করে খেয়েছেন তো। রান্না কেমন হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আলোটা নিয়ে যাও, আমার ঘুম পেয়ে গেছে।"

রাজকুমার বলল, "হ্যাঁ, ভাল করে খাবেন আর ঘুমোবেন। শরীরটা ঠিক রাখবেন। আপনার শরীর যদি খারাপ হয়, তা হলে খদ্দের চটে যাবে!"

খদ্দের শব্দটা শুনে সন্তু আর কাকাবাবু দু'জনেই অবাক হয়ে একসঙ্গে মুখ তুলে তাকাল।

রাজকুমার বলল, "বুঝতে পারলেন না তো! আপনাকে এত মেহনত করে ধরে আনলুম কেন? আমার একটা স্বার্থ আছে বুঝতেই পারছেন? আপনাকে আমি বিক্রি করে দেব।"

কাকাবাবু কৌতুকের সুরে বললেন, "বিক্রি? আমাকে? সাতচল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে, একটা পা খোঁড়া, আমার মতন একজন অপদার্থ মানুষকে কে কিনবে?"

রাজকুমার বলল, "সে আপনাকে ভাবতে হবে না। খদ্দের তৈরি আছে। ভাল দাম দেবে। সেইজন্যই তো আপনার যাতে অসুখ-বিসুখ না হয় সেটা

দেখা দরকার।”

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বলল, “এ-ছেলেটার জন্যও খদ্দের পাওয়া যাবে। আরব দেশে পাঠিয়ে দেব !”

কাকাবাবু বললেন, “এটাই তোমার ব্যবসা ? অর্ডার সাপ্লাই ?”

রাজকুমার ঠোঁট ফাঁক করে নিঃশব্দে হেসে বলল, “দেখলেন তো, বলে ফেললুম ? কোনও কথা পেটে চেপে রাখতে পারি না। হ্যাঁ, আজকাল এই ব্যবসাই করছি।”

কাকাবাবু বললেন, “একজন রাজার ছেলের পক্ষে চমৎকার ব্যবসা !”

রাজকুমার বলল, “তা যা দিনকাল পড়েছে, এখন বাঘে ঘাস খায় আর ব্রাহ্মণরাও জুতোর ব্যবসা করে। তবে কী জানেন, গোরু ছাগল বিক্রির চেয়ে মানুষ বিক্রির কাজটা অনেক সহজ। লাভও বেশি।”

টর্চটা পকেটে ভরে সে এক হাতে লণ্ঠনটা তুলে নিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, “যাঃ, আসল কথাটাই বলা হয়নি, যে-জন্য এলুম ! হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। আপনাকে তো এখন বাইরে বেরুতে হচ্ছে না, সুতরাং ক্রাচ দুটো এ-ঘরে রাখার দরকার নেই। ও দুটো আমি নিয়ে যাচ্ছি। ঘরের মধ্যে আপনি এমনিই চলাফেরা করতে পারবেন !”

কাকাবাবু বললেন, “ইচ্ছে হলে নিয়ে যেতে পারো। যথাসময়ে আবার আমাকে ফেরত দিও !”

রাজকুমার বলল, “হ্যাঁ, যথাসময়ে !”

রাজকুমার ক্রাচ দুটো নিজের বগলে চেপে পেছন ফেরা মাত্র সন্তু এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করল। সে বিদ্যুদ্বেগে মাটিতে শুয়ে পড়ে নিজের পা দুটো রাজকুমারের পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে কাঁচির মতন ফাঁক করে দিল। রাজকুমার দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল সামনে।

ব্যাপারটা দেখে কাকাবাবুও চমকে উঠলেন। রাজকুমারের হাত থেকে টিউব বাতিটা ছিটকে গেছে, ক্রাচ দুটোও পড়ে গেছে, কিন্তু রিভলভারটা সে ছাড়েনি।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, সে হাতটা একবার তুলতে পারলে আর নিষ্কৃতি নেই।

কাকাবাবু এঁটো স্টিলের থালা একটা তুলে নিয়ে সেই হাতটার ওপর মারলেন সজোরে। রিভলভারটা গড়িয়ে চলে গেল খাটের তলায়।

রাজকুমার রিভলভারটা উদ্ধার করার চেষ্টা করল না, মুখে আর হাতে চোট লাগা সত্ত্বেও সে মাথা ঠিক রেখেছে। সে গড়িয়ে চলে গেল দরজার দিকে। সন্তু সঙ্গে সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ে রিভলভারটা চেপে ধরে বলল, “পেয়েছি !”

ততক্ষণে রাজকুমার বেরিয়ে গেছে বাইরে। দড়াম করে শব্দ হল দরজাটা বন্ধ করার।

গোল গর্তটা দিয়ে রাজকুমার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “শয়তানের বাচ্চা,

আমার সঙ্গে চালাকি ? থাক আজ রাত্তিরটা, তারপর কাল সকালে দেখাব মজা তোদের ! রবারের ডাণ্ডার মার খেতে কেমন লাগে বুঝবি !”

কাকাবাবু স্থির হয়ে বসে আছেন। রাজকুমার থেমে যাওয়ার পর তিনি বললেন, “এ কী করলি, সন্তু ? ইশ ! এতে কী লাভ হল ?”

খাটের তলা থেকে রিভলভারটা নিয়ে বেরিয়ে আসার পর সন্তু ভেবেছিল, কাকাবাবু তার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করবেন। কিন্তু কাকাবাবুর কথার মধ্যে মৃদু ভর্ৎসনা শুনে সে ঘাবড়ে গেল।

সে কাঁচুমাচুভাবে বলল, “ওই লোকটা তোমার সঙ্গে খারাপভাবে কথা বলছিল, তাতেই আমার রাগ হয়ে গেল। আমি আর মেজাজটা ঠিক রাখতে পারলুম না !”

“ওটা কিসের প্যাঁচ ? কুংফু না ক্যারাটে ? প্যাঁচ শিখেছিস বলেই কি যখন-তখন সেটা দেখাতে হবে ?”

“ও তোমার নাকের সামনে সব সময় রিভলভারটা তুলে রেখেছিল কেন ?”

“এখন কী করবি ? এর পর তো ও রাইফেল-টাইফেল নিয়ে আসবে !”

“ওকে আমি এ-ঘরে আর ঢুকতেই দেব না !”

“এ-ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা যায় না। ওরা সব ব্যবস্থা করে রেখেছে, ওরা যখন-তখন ঢুকে পড়তে পারে। শোন, চোর-ডাকাতদের সামনে এসে কক্ষনো মাথা-গরম করতে নেই। ওদের সঙ্গে কি আমরা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে লড়াই করতে পারব ? তা পারব না। সব সময়েই ওদের শক্তি বেশি হয়। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হয় এই জায়গাটা দিয়ে।”

কাকাবাবু নিজের মাথায় দু'বার টোকা দিলেন।

সন্তু বলল, “আমি সারা রাত জেগে থাকব।”

কাকাবাবু একটা হাই তুলে বললেন, “দ্যাখ পারিস কি না !”

একজন কেউ হাই তুললেই কাছাকাছি অন্যজন হাই তোলে। সন্তু শুধু হাই তুলল না, সেই সঙ্গে তার চোখ বুজে এল।

“তুই-তো এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছিস দেখছি !”

সন্তু আচ্ছন্ন গলায় বলল, “না, আমি জেগে থাকব।”

তবু একটু পরেই আবার চোখ বুজে ফেলল সন্তু। মাথাটা ঝুঁকে এল। কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তাঁর নিজেরও চোখ টেনে আসছে। সন্তু এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়ছে কেন, এটা অস্বাভাবিক।

সন্তু অতি কষ্টে চোখ খুলে বলল, “আমার এ কী হচ্ছে ? আমি কিছুতেই চোখ চাইতে পারছি না। আমায় বিষ খাইয়েছে !”

কাকাবাবু বললেন, “আমারও তো একই অবস্থা দেখছি। খাবারের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। মানুষ বিক্রি করা যার ব্যবসা সে শুধু-শুধু বিষ খাইয়ে আমাদের মারবে কেন ?”

এর পর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা দু'জন ঘুমে ঢলে পড়ল। সন্তু মেঝেতে বসে ছিল, সে আর খাটেও উঠতে পারল না, শুয়ে পড়ল সেখানেই।

॥ ৫ ॥

ঘুম ভাঙার পর সন্তুর প্রথমেই মনে হল, বেঁচে আছি না মরে গেছি ?

চারদিকে মিশমিশে অন্ধকার। দিন না রাত্রি তা বোঝার উপায় নেই। কোথায় সে শুয়ে আছে ?

পাশ ফিরতে গিয়েই সন্তু টের পেল তার হাত আর পা বাঁধা। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

আস্তে-আস্তে তার আগেকার কথা মনে পড়ল। রিভলভারটা ? যাঃ, রাজকুমারের কাছ থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে কোনও লাভই হল না। যারা তার হাত-পা বেঁধেছে, তারা নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে গেছে ! এ-ঘরে যে একটা ব্যাটারির আলো ছিল, সেটাও নেই।

কাকাবাবু কোথায় ?

সন্তু অতি কষ্টে উঠে বসল। হাতদুটো পিঠের দিকে মুড়ে বেঁধেছে, তাই টনটন করছে কাঁধের কাছে। কাকাবাবু কোথায় ?

সন্তু কাকাবাবুর নাম ধরে ডাকতে গেল, কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না। তার মুখও বাঁধা।

কাকাবাবুও কি কাছাকাছি কোথাও এরকম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন ? এখনও ঘুম ভাঙেনি ? সন্তু কান খাড়া করল, কোনও নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কি না ! কোনও শব্দ নেই। সন্তুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। কাকাবাবু আর সে আলাদা হয়ে গেছে ? কাকাবাবু কি নিজেই কোথাও চলে গেছেন ? না, তা অসম্ভব !

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছে, তাও বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে। মাঝখানে কি গোটা একটা দিন কেটে গিয়ে আবার রাত এসে গেছে ?

কিছুই করবার নেই, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া।

প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হচ্ছে বিরাট লম্বা। সন্তু মনে-মনে এক দুই গুনতে লাগল। এতে তবু সময় কাটবে।

চার হাজার পর্যন্ত গোনার পর সন্তুর আর ধৈর্য রইল না। কেউ কি তা হলে আসবে না ? কিংবা রাজকুমারের লোকেরা তাকে একটা পাতাল-গুহায় ফেলে রেখে গেছে, এখান থেকে আর উদ্ধার পাবার আশা নেই ? কিংবা এই জায়গাটারই নাম নরক ?

আর একটা নতুন বিপদ দেখা দিল। সন্তুর দারুণ বাথরুম পেয়ে গেছে। হাত-পা বাঁধা, সে বাথরুমে যাবে কী করে ? এবারে সন্তুর ডাক ছেড়ে কান্নার

উপক্রম।

ঠিক এই সময় দরজা খুলে গিয়ে আলো ঢুকতেই সন্তু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে টাইগার। তার বিশাল চেহারা প্রায় পুরো দরজাটা ঢেকে দিয়েছে।

টাইগার বলল, "ঘুম ভাঙ্গিয়েসে? ওরে বাপ রে বাপ, কী ঘুম, কী ঘুম! হামি তিন-তিনবার এসে দেখে গেলাম! আভি আঁখ খুলেসে?"

টাইগার কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে এগিয়ে এল সন্তুর দিকে।

এতক্ষণ পর একজন মানুষকে দেখেই সন্তুর ভাল লেগেছিল। হঠাৎ আলোতে যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চোখটা ঠিক হতেই সে দেখল টাইগারের হাতে ছুরি। বাধা দেবার কোনও উপায় নেই। তা হলে এটাই কি তার শেষ মুহূর্ত?

টাইগার কিন্তু কাছে এসে সেই ছুরি দিয়ে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল সন্তুর হাত আর পায়ের বাঁধন। সন্তুর তখন শুধু একটাই চিন্তা। মুখের বাঁধন খোলার আগেই সে হাত দিয়ে বাথরুমের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে কাতর শব্দ করতে লাগল।

টাইগার হেসে বলল, "যাও, গোসল করকে আও!"

সেদিকে ছুটে যেতে যেতে সন্তু ভাবল, টাইগারের মতন ভাল মানুষ আর হয় না। সে একজন দেবদূত!

বাথরুমে ঢুকে সন্তু নিজেই খুলে ফেলল মুখের বাঁধনটা।

খানিকটা বাদে সন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে দেখল টাইগার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে। মুখে মিটিমিটি হাসি।

সে বলল, "আরে লেড়কা, তুই কাল হামার সাহেবকে লাথ মেরেছিস? সাহেবের হাঁথ থেকে তুই পিস্তল ছিনাকে লিয়েছিস? বা রে লেড়কা, বাঃ, তোর তাগত আছে।"

থাবার মতন হাত দিয়ে সে থাবড়ে দিল সন্তুর পিঠে।

শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এরকম প্রশংসা পেয়ে সন্তু খানিকটা লজ্জা পেয়ে গেল। টাইগার হয়তো ততটা শত্রুপক্ষ নয়, তার ব্যবহারে তো খারাপ কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাজকুমার মিথ্যেমিথ্যি ভয় দেখিয়েছিল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "টাইগারজি, আমার কাকাবাবু কোথায়?"

টাইগার বলল, "খোঁড়াবাবুকা তো খদ্দের মিলে গেল, তাই ঝটপট বিক্রি ভি হয়ে গেল। লেকিন তোমার তো খদ্দের আখুনো মেলেনি!"

"কাকাবাবু বিক্রি হয়ে গেছেন?"

"চলো, নীচে চলো। সাহেব তুমাকে বুলাচ্ছেন।"

"কাকাবাবু...কাকাবাবু যাবার সময় আমাকে কিছু বলে গেলেন না?"

"তুমি তো তখন ঘুমাচ্ছিলে! চলো, বাহার আও!"

নিশ্চয়ই খুব বেশি ডোজের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল তাকে। তাই মাথাটা এখনো টলছে। ঘরের বাইরে এসে সন্তু দেখল একটা বেশ টানা বারান্দা, সেখানে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে এখন। বারান্দার দু'পাশে তিনটে তিনটে ছ'টা ঘর, একেবারে শেষে একটা জানলা। সেই জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হয় সদ্য সন্ধে হয়েছে।

সন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাল মাঝরাত্তির থেকে সে আজ সন্ধে পর্যন্ত ঘুমিয়েছে? সকাল, দুপুর কিচ্ছু টের পায়নি? এরকম তার জীবনে হয়নি আগে।

কোণের আর-একটা ঘরের দরজা খোলা, বাকি সব বন্ধ। সেই ঘরগুলোতেও কি বিক্রির জন্য মানুষদের বন্দী করে রাখা হয়েছে?

টাইগার একটা টুল দেখিয়ে সন্তুকে বলল, "বৈঠ যাও!"

সেই টুলের পাশেই পড়ে রয়েছে একটা রবারের গদা। যা দিয়ে মারলে রক্ত বেরোয় না, কিন্তু সাংঘাতিক লাগে!

একটা দেয়াল-আলমারি থেকে টাইগার একগোছা দড়ি বার করতে করতে বলল, "সাহেব তুমাকে নীচে বুলিয়েছেন, গাড়ি ভি তৈয়ার। মনে তো হচ্ছে, তোমার খদ্দের মিলে গেল। দাও, হাঁথ বাড়াও!"

টাইগার আবার তার হাত বাঁধবে। আপত্তি করে কোনও লাভ নেই। কোনও রকম গোলমাল করার শক্তিও নেই এখন সন্তুর। সে বাধ্য ছেলের মতন বাড়িয়ে দিল তার হাত দুটো।

ঠিক আগের মতনই হাতদুটো পেছন দিকে মুড়ে খুব শক্ত করে বাঁধা হল। তারপর পা। মুখটা বাঁধা হবে একটা বড় স্কার্ফের মতন কাপড় দিয়ে। সেটা আনতেই সন্তু জিজ্ঞেস করল, "টাইগারজি, সত্যি আমাকে বিক্রি করে দেবে?"

টাইগার বলল, "হ্যাঁ! তুমার ভয় লাগছে নাকি? আরে লেড়কা, তোমার তাগত আছে, ভয় কী? আরব দেশে যাবে, বহোত রূপেয়া কামাবে, মাংস খাবে, খেজুর খাবে, ভাল থাকবে। এখানে কী আছে?"

এমন আদর করে সে বলছে কথাগুলো যেন সে সন্তুকে মামাবাড়ির দুধভাত খাওয়াতে পাঠাচ্ছে।

এরা তাকে আরব দেশে পাঠিয়ে দিতে চাইছে শুনে সন্তুর ভয় হচ্ছে না। কিন্তু কাকাবাবুকে আর তাকে আলাদা আলাদা জায়গায় পাঠানো হবে কি না, সেইটাই তার প্রধান চিন্তা।

পা বাঁধা অবস্থায় সন্তু হাঁটতে পারবে না। টাইগার অবলীলাক্রমে তাকে কাঁধে তুলে নিল। তারপর তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

একতলার উঠোনে আজ রয়েছে একটা স্টেশান ওয়াগান। তার সামনে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমার। বিশাল কুকুরটা তার পায়ে মাথা ঘষছে। রাজকুমারের কপালে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো।

টাইগার সন্তুকে নামিয়ে দিতেই রাজকুমার ধমকে জিজ্ঞেস করল, "এত দেরি হল কেন ? আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি !"

টাইগার বলল, "এ লেড়কা গোসল করতে গেল যে !"

সন্তুর সঙ্গে রাজকুমারের চোখাচোখি হতেই রাজকুমারের মুখটা রাগে বিকৃত হয়ে গেল। সে এগিয়ে আসতে-আসতে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "হারামজাদা ছেলে ! ইচ্ছে করছে এক্ষুনি শেষ করে দিই !"

কাছে এসে সে সন্তুর বাঁ গালে জ্বলন্ত সিগারেটটা চেপে ধরল।

সন্তুর চিৎকার করারও উপায় নেই। আগুনে পোড়ার জ্বালা অত্যন্ত সাংঘাতিক, তবু সন্তু চোখের জল আটকে রাখল। প্রাণপণে।

টাইগার এক টানে সন্তুকে সরিয়ে নিয়ে বলল, "দাম কমে যাবে ! খদ্দের কমতি দাম দেবে !"

রাজকুমার বলল, "নে, এটাকে গাড়িতে তোল !"

টাইগার সন্তুকে উঁচু করে তুলে স্টেশন-ওয়াগনটার মেঝেতে শুইয়ে দিল। সন্তু চমকে উঠে দেখল, আগে থেকেই সেখানে আর-একজনকে শোয়ানো আছে। কিন্তু কাকাবাবু নয়। সন্তুরই বয়েসি একটি মেয়ে, ফ্রক পরা।

বিদ্যুৎ-চমকের মতন সন্তুর মনে হল, দেবলীনা ?

রাজকুমার বলেছিল না যে কাকাবাবুর জন্য সে টোপ ফেলেছিল একটা ? এই-ই তা হলে সেই টোপ ! দেবলীনা কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, রাজকুমার নিজে কিংবা তার কোনও লোক সেটা লক্ষ্য করেছে। তারপর দেবলীনাকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়ে ভেবেছে, নিশ্চয়ই কাকাবাবু দেবলীনার বাড়িতে খোঁজ নিতে যাবেন। ঠিক তাই-ই হয়েছে। দেবলীনার ঠিকানা জানা ওদের পক্ষে শক্ত কিছুই না। কাজ হয়ে গেছে, ওরা এখন দেবলীনাকেও বিক্রি করে দেবে !

মেয়েটি হয় ঘুমিয়ে আছে, অথবা অজ্ঞান। একেবারে নড়াচড়া করছে না।

একটু বাদে রাজকুমার উঠে এল গাড়ির মধ্যে। গাড়ি চালাবে অন্য কেউ। রাজকুমার একটা সিটের ওপর বসে হুকুম দিল, "নাউ স্টার্ট।"

তারপর রাজকুমার তার জুতোসুদ্ধু পা'টা তুলে দিল সন্তুর বুকের ওপর।

একজন মানুষের পা আর কত ভারী হতে পারে ? সন্তুর মনে হচ্ছে, তার বুকের ওপর যেন একটা একশো কেজি ওজন চেপে আছে। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার। রাজকুমার এর পর আর একটু জোরে চাপ দিলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। অথচ বাধা দেবার কোনও উপায় নেই সন্তুর, সে অসহায়।

কাল রাত্তিরে রাজকুমারকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নেবার চেষ্টাটা খুব ভুলই হয়েছে তার। সবচেয়ে বড় ভুল, সে শুধু রিভলভারটাই কাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু তারপর কী ঘটবে বা ঘটতে পারে সেটা ভাবেনি। এরকম ভুলের জন্য তার প্রাণটাও চলে যেতে পারত !

সেই ঘটনার আগে রাজকুমার অন্তত মৌখিক কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি। শারীরিক অত্যাচারও করেনি। এখন সে শোধ তুলে নিচ্ছে।

গাড়ির জানলা দিয়ে যেটুকু দেখতে পাচ্ছে সন্তু, তাতে বুঝতে পারছে যে, তারা আবার শহরের মধ্যেই ঢুকছে। রাস্তায় আলো আছে, দু'পাশে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। তাদের অন্য কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না। কী সাহস এদের! সন্ধেবেলা কলকাতার পথে-পথে অজস্র লোক, কত গাড়ি, মোড়ে-মোড়ে পুলিশ, তারই মধ্যে দিয়ে এরা হাত-মুখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে দুটি ছেলেমেয়েকে। চম্বলের ডাকাতরাও বোধহয় এত দুঃসাহসী নয়।

রাজকুমার আবার গুনগুন করে কী একটা গান গাইছে!

গাড়িটা চলছে তো চলছেই, গোটা কলকাতা শহরটাকে একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলেছে মনে হয়। হয়তো সন্তুদের বাড়ির পাশ দিয়েও যাচ্ছে। অদ্ভুত, অদ্ভুত ব্যাপার! মা-বাবা এতক্ষণ কী করছেন কে জানে!

বুকের ওপর কষ্টটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। গালের ছ্যাঁকা-লাগা জায়গাটাতেও জ্বালা করছে। সন্তু পাশ ফেরার চেষ্টা করল, উপায় নেই। সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

গাড়িটা থামতেই সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। রাজকুমার নেমে গেল আগে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেউ এল না। সন্তুর মনে হল তারা দু'জন যেন মানুষ নয়, মালপত্র। অন্যদের সুবিধেমতন নামানো হবে।

একটু বাদে দু'জন লোক এসে ওদের নামাল। সন্তু দেখল গাড়িটা ঢুকে এসেছে একটা গ্যারাজের মধ্যে। গ্যারাজের পেছনে একটা ছোট দরজা। সেই দরজা দিয়ে ওদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হল দোতলায়। বাড়িটা বেশ পুরনো আমলের, সিঁড়িগুলো মার্বল পাথরের। ওপরের দালানেও সাদা-কালো চৌখুপ্পি পাথর বসানো।

একটা বেশ বড় ঘরে এনে ওদের শুইয়ে দেওয়া হল। সেই ঘরে গোটা চারেক জানলা, হাট করে খোলা। দুটো আলো জ্বলছে।

ধপধপে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবিপরা একজন মাঝবয়েসি লোক এসে ঢুকলেন ঘরে, হাতে একটা রুপো-বাঁধানো ছড়ি, ঠোঁটে পাতলা গোঁফ, মাথার কোঁকড়ানো চুলের মাঝখানে সিঁথি। আগেকার দিনের জমিদারদের মতন চেহারা।

তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে ওদের দেখলেন, তারপর তাঁর লোকদের হুকুম দিলেন, "এই, ছেলেমেয়ে দুটোর বাঁধন খুলে দে! এঃ, কী বিচ্ছিরিভাবে বেঁধেছে। ওদের কি চোখের চামড়া নেই? খুলে দে, খুলে দে!"

সন্তু বাঁধন-মুক্ত হয়ে উঠে বসে লোকটির দিকে চেয়ে রইল। তিনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, "কী, খিদে পেয়েছে? একটু বোসো, খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

ওঁকে দেখলে গুণ্ডা-বদমাশ মনে হয় না একটুও, বরং সম্ভ্রম জাগে। রাজকুমারের সঙ্গে এঁর কী সম্পর্ক?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমাদের এখানে ধরে এনেছে কেন ?"

ভদ্রলোক বললেন, "যা হয়েছে তা তো হয়ে গেছেই। আমার কাছে এসে পড়েছ, আর তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর সব কথা হবে।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন, অন্য লোক দুটিও বাইরে বেরিয়ে গেল, খোলা রয়ে গেল দরজাটা।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই গেল একটা জানলার ধারে। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। রাজকুমার তাদের এইখানে পৌঁছে দিল, এবারে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে নাকি ? তবে যে বলেছিল আরব দেশে পাঠাবে ? কাকাবাবুর কী হল ?

জানলার বাইরে একটা বাগান। সেখানে আলো নেই, ঘরের আলোতেই যেটুকু বোঝা যাচ্ছে। বাগানের শেষের দিকে একটা উঁচু পাঁচিল। বাগান দিয়ে দু'জন লোক হেঁটে গেল। এটা যেন একটা স্বাভাবিক বাড়ি, বন্দিশালা বলে মনে হবার কোনও কারণ নেই। ঘরের দরজা খোলা, সেখানে কোনও পাহারাও নেই।

উঃ উঃ শব্দ শুনে সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেবলীনা ছটফট করছে। তার জ্ঞান ফিরে আসছে।

সন্তু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারল। কাছাকাছি কারুকে দেখা যাচ্ছে না। দোতলায় অনেকগুলো ঘর। চওড়া বারান্দাটা ডান দিকে আর বাঁ দিকে বেঁকে গেছে।

সন্তু আবার ঘরের মধ্যেই ফিরে এল। এতটা স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে কোনও ফাঁক থাকতে পারে। অপেক্ষা করেই দেখা যাক।

দেবলীনা শরীরটা মোচড়াচ্ছে, কিন্তু চোখ খুলছে না। একবার সে ফিসফিস করে বলে উঠল, "জল, জল খাব !"

সন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও জলের পাত্র দেখতে পেল না। পাশেই বাথরুম রয়েছে। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার। কল খুলে একটা কাচের জগে করে খানিকটা জল এনে সে প্রথমে দেবলীনার চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিল।

দেবলীনা এবারে চোখ মেলে বলল, "কে ? আমাকে মারছ কেন ? আমায় মেরো না !"

সন্তু চুপ করে রইল।

দেবলীনা নিজের মুখে হাত বুলোল। মুখ ঘুরিয়ে সারা ঘরটা দেখল, তারপর বলল, "এই, আমার চশমা কোথায় ? চশমা দাও !"

সন্তু এবারেও কোনও উত্তর দিল না। সে বুঝতে পারছে, মেয়েটির এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

দেবলীনা বলল, "চুপ করে আছ কেন ? তুমি কে ? আমার চশমাটা দাও !"

সন্তু বলল, "তোমার চশমা আমার কাছে নেই। আমার নাম সন্তু !"

আর কোনও কথা হল না, এই সময় একটি লোক এল দু' প্লেট খাবার নিয়ে। টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ।

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে খাওয়াতে মন দিল। খিদের সময় তার শরীর দুর্বল হয়ে যায়, মাথাও ঠিক কাজ করে না।

লোকটি আবার ফিরে গিয়ে জল নিয়ে এল।

দেবলীনা খাবারে হাত দেয়নি, সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সন্তুর দিকে।

সন্তু বলল, "তোমার খিদে পায়নি ? খেয়ে নাও !"

দেবলীনা বলল, "তোমার নাম সন্তু ? মিথ্যে কথা ! তুমি এখানে এলে কী করে ? আমিই বা এখানে এলাম কী করে ?"

সন্তু বলল, "আগে খেয়ে নাও !"

"আমি ডিম খাই না ! আমি টোস্টও খাই না !"

"এখানে তুমি লুচি-মাংস কোথায় পাবে ?"

"আমার কিচ্ছু চাই না। তুমি আমার খাবারটা খেয়ে নাও !"

"তুমি সত্যি খাবে না ?"

"আমি আজেবাজে জায়গায় খাই না।"

সন্তু দ্বিধা করল না, নিজের প্লেটটা শেষ করে সে দেবলীনার খাবারও খেতে শুরু করে দিল। তার মনে হল, মেয়েরা বোধহয় বেশি খিদে সহ্য করতে পারে। তার মা মাঝে-মাঝেই সারাদিন উপোস করে থাকেন।

সন্তুর খাওয়া শেষ হয়নি, বারান্দায় শোনা গেল খট্‌খট্‌ শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুর শরীরে শিহরন হল। এই শব্দ তার খুব চেনা। কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ !

সত্যিই কাকাবাবু ! সন্তু হাত থেকে আধ-খাওয়া টোস্টটা ফেলে দিল।

কাকাবাবু এক্ষুনি স্নান করেছেন মনে হচ্ছে, তাঁর মাথার চুল ভিজে। তিনি একলাই ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে আর কোনও লোক নেই। তিনি ওদের দেখে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, "এই যে, তোরা এসে গেছিস ? কেমন আছ দেবলীনা ?"

সন্তু বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। সে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে কি স্বপ্ন দেখছে ? নাকি আগের ঘটনা সব দুঃস্বপ্ন ছিল, এখন তা কেটে গেছে ?

দেবলীনা সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইনি কে ?"

সন্তুর এবার সন্দেহ হল, এই মেয়েটা সত্যিই দেবলীনা তো ? কিংবা ওর মতন দেখতে অন্য কেউ ?

কাকাবাবু কাছে এসে একটি চেয়ারে বসলেন। তারপর সন্তুকে বললেন, আমাকে ভোরবেলা ঘুমের মধ্যে এখানে নিয়ে এসেছে, বুঝলি ? তাই তোকে জানিয়ে আসতে পারিনি। এখানে এসে জানতে পারলুম যে, দেবলীনাকেও

ওরা ধরে রেখেছে।"

দেবলীনা বলল, "আপনি কাকাবাবু ? আমি চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। আমার চশমাটা কোথায় গেল ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের বড্ড বেশি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। সেইজন্যই ওরকম হচ্ছে। একটু বাদে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার চশমাটা কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে ?"

এই সময় একটা জাহাজের ভোঁ বেজে উঠল। খুব কাছে। সন্তু চমকে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "এ-বাড়িটা গঙ্গার একেবারে পাশে। রাত্তিরের অন্ধকারে চুপিচুপি অনেক কিছু জাহাজে তুলে দিতে পারে এখান থেকে।"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "আমি বাড়ি যাব কখন ?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে থুতনিটা ঘষতে-ঘষতে বললেন, "তোমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে, না! দেখি, কী ব্যবস্থা করা যায়! দেবলীনা, তুমি আমার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে যে, আমি তোমায় কোনও অ্যাডভেঞ্চারে নিয়ে যেতে চাই কি না! আর দ্যাখো, তোমার জন্যই আমি আর সন্তু কী রকম এক অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়লুম। এরপর কী হয় কে জানে!"

এই সময় খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লোক এসে কাকাবাবুকে বলল, "বাবু আপনাকে ডাকছেন।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যেতে হবে ?"

লোকটি আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে বলল, "চার তলায়!"

কাকাবাবু মুখে বিরক্ত ভাব ফুটিয়ে বললেন, "আমার সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়, তা এরা কিছুতেই বুঝবে না! চলো, দেখি কী বলে!"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "আমিও যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এসো! তুমি এখানে একা-একা বসে থেকে কী করবে ? যদি চোখে ভাল দেখতে না পাও, তা হলে সন্তু তোমাকে ধরে নিয়ে আসবে।"

দেবলীনা বলল, "এখন অনেকটা দেখতে পাচ্ছি।"

খাকি পোশাক পরা লোকটি ঘরের বাইরে এসে বলল, "আপনাকে সিঁড়ি ভাঙতে হবে না। লিফ্‌ট আছে, এদিকে আসুন!"

কাকাবাবু বললেন, "এরকম পুরনো বাড়ি, তাতেও লিফ্‌ট! বেশ ভাল ব্যবস্থা তো!"

সন্তুও অবাক হয়ে গেল। বড়-বড় থামওয়ালা বাড়ি, শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, এখানেও লিফ্‌ট ?

দরজা খুলে লিফ্‌টে ঢুকে সন্তু আর একটা জিনিস দেখে অবাক হয়ে গেল।

লোকটি বলল চার তলায় যেতে হবে, কিন্তু সে বোতাম টিপল ছ' নম্বরের। আর লিফ্‌ট গিয়ে ছ' তলাতেই থামল।

কাকাবাবুও নিশ্চয়ই এটা লক্ষ করেছেন। তিনি তাকালেন একবার সন্তুর দিকে।

লিফ্‌ট থেকে নেমেই প্রথম যে ঘরটা চোখে পড়ল, সেখানে বসে আছে রাজকুমার আর টাইগার। রাজকুমার কায়দা করে সিগারেট টানছে। কাকাবাবু সেই ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ালেন।

খাকি পোশাক পরা লোকটা বলল, "এই ঘরে না, আপনি ডান পাশে চলুন। বাবু অন্য জায়গায় রয়েছেন।"

কাকাবাবু রাজকুমারের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "তুমি চলে যেও না, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

রাজকুমার বলল, "আমি চলে যাব? কেন? হা-হা-হা-হা!" সে একেবারে অট্টহাস্য করে উঠল।

॥৬॥

পাশের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখতে পাওয়া গেল গঙ্গা। নৌকোর ছোট-ছোট আলো। নীলচে আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘ।

হঠাৎ সন্তুর মনে হল, সে যেন কতদিন আকাশ দেখেনি! একটা জানলাহীন ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। তারপর হাত-পা-মুখ বেঁধে গাড়িতে করে কলকাতার একধার থেকে আর-একধারে নিয়ে আসা হয়েছে। যেন কলকাতাটাও একটা জঙ্গল বা মরুভূমি বা পাহাড়ের গুহা।

কিন্তু এই জায়গাটা মোটেই ছ'তলা উঁচু নয়। চারতলাই ঠিক। লিফ্‌টের বোতাম ওরকম কেন?

খাকি পোশাক পরা লোকটি যে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা ঠাকুরঘর। ভেতরে অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি ও মূর্তি, অনেক ফুল। একটা বাঘের চামড়ার আসনে বসে আছেন সেই ভদ্রলোক, কিন্তু এখন তাঁর সাজপোশাক অন্যরকম। তিনি পরে আছেন একটা টকটকে লাল রঙের কাপড়, খালি গায়ে সেই রঙেরই একটা চাদর জড়ানো। কপালে চন্দনের ফোঁটা।

তিনি চোখ বুজে পুজো করছিলেন। এতগুলো পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "এই যে রায়চৌধুরীসাহেব, আসুন! দেখুন, আপনার ভাইপো এসে গেছে, ওই মেয়েটিকেও আনিয়েছি, ওদের খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে দিয়েছি। তা হলে আমার কথা রেখেছি?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তা রেখেছেন!"

লোকটি বলল, "এবারে আপনার কাজ শুরু করে দিন। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে এখন কী করবেন? বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "তা মন্দ হয় না। ওরা আর শুধু-শুধু এখানে থেকে কী করবে ? সন্তু, তুই বাড়ি চলে যা !"

সন্তু বলল, "আমি একা ? আর তুমি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে !"

সন্তু বলল, "তা হলে আমি এখন যাব না। তোমার সঙ্গে যাব !"

দেবলীনা বলল, "আমিও যাব না, আমিও থাকব !"

কাকাবাবু বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠে বললেন "আজকালকার ছেলেমেয়েরা কী চালাক দেখেছেন ? ঠিক ধরে ফেলেছে আপনি যে ওদের বাড়ি পাঠাবার নাম করে অন্য কোথাও নিয়ে আটকে রাখবেন, তা ওরা ঠিক বুঝে গেছে।"

লোকটি অবাক হবার ভাব দেখিয়ে বলল, "কেন, কেন, আমায় অবিশ্বাস করছেন কেন ? বাচ্চা ছেলেমেয়ে, ওদের আটকে রেখে আমার কী লাভ ?"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, ওরা তত বাচ্চা নয়। বেশ সেয়ানা। এখান থেকে একবার বেরুতে পারলেই ওরা পুলিশ ডেকে এই বাড়ি খুঁজে বার করবে।"

"আমি কি ওদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা করেছি যে, পুলিশ ডাকবে ? আমি বরং ওই রাজকুমার ব্যাটার হাত থেকে ওদের ছাড়িয়ে এনেছি। কী বলো, খোকা-খুকুরা ?"

সন্তু চুপ করে রইল। দেবলীনার মুখ দেখে মনে হল, সে খুকু ডাক শুনে বেশ রেগে গেছে !

কাকাবাবু বললেন, "যাকগে, এবারে কাজের কথা বলুন।"

"বসুন। বসে-বসে কথা হোক। ওরাও যদি থাকতে চায় থাক।"

"আপনি আমার নাম জানেন, কিন্তু আপনার নাম তো জানা হল না। আগে আলাপ-পরিচয় হোক !"

"সে কী রায়চৌধুরীবাবু, আপনি এত অভিজ্ঞ লোক, আপনি আমায় চেনেন না ? এ-লাইনে আমাকে সবাই একডাকে চেনে। তিন পুরুষ ধরে আমাদের জাহাজের ব্যবসা !"

"আমি বেশিরভাগ কাজই করেছি বাইরে-বাইরে। কলকাতার এ-লাইনের লোকদের ভাল চিনি না। চেনা উচিত ছিল। তা, আপনার নামটা !"

"আমাকে সবাই মল্লিকবাবু বলে চেনে !"

"মল্লিকবাবু ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। আপনাকে চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আপনি তো বিখ্যাত লোক। তা আপনারা যমজ দু'ভাই না ? আপনি কোন্ জন, যোগেন না মাধব ?"

"আমার নাম যোগেন। আর আমার ছোট ভাই, মানে যে ঠিক আমার বারো মিনিট পরে জন্মেছে, তার নাম মাধব।"

"লাইনের লোকরা আপনাদের জগাই-মাধাই বলে। আপনাদের দু'জনকে দেখতে হুবহু এক রকম, তাই না?"

"রায়চৌধুরীবাবু, দয়া করে আমার সামনে ওই নাম উচ্চারণ করবেন না। আমাদের শত্রুপক্ষের ব্যাটাচ্ছেলেরা ওই নাম রটিয়েছে।"

"সে যাকগে। এবারে কাজের কথাটা বলুন।"

জগাই মল্লিক একবার আড়চোখে সন্তু আর দেবলীনার দিকে তাকাল। তারপর অখুশিভাবে বলল, "এইসব ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে এসব কাজের কথা আলোচনা করা কি ঠিক? বললুম, ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আমার নিজেরও এই বয়েসী ছেলেমেয়ে আছে।"

কাকাবাবু পরিহাসের সুরে বললেন, "ওরা বড় হচ্ছে! ওরা সব বুঝুক, শিখুক যে পৃথিবীটা কত শক্ত জায়গা! আপনার ছেলেমেয়েদের এসব শেখাচ্ছেন না? তারা বড় হয়ে আপনার কারবার বুঝে নেবে কী করে?"

"আমার ছেলেমেয়েদের আর এই কারবারে নামবার দরকার হবে না। আমি যা রেখে যাব, তাতেই তাদের তিন পুরুষ দিব্যি চলে যাবে!"

সন্তু আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। এই সব বাজে কথা শুনতে তার একটুও ভাল লাগছে না। এই জগাই মল্লিক নামে লোকটা কাকাবাবুকে দিয়ে কী কাজ করাতে চায়? এই লোকটাকে প্রথমে দেখে তার ভাল লোক মনে হয়েছিল!

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বলুন, মল্লিকবাবু।"

জগাই মল্লিক বলল, "ওই রাজকুমার নামে লোকটা আপনাকে ধরে নিয়ে আটকে রেখেছিল। আপনার জন্যে নাকি ভাল খদ্দের আছে। ইজিপ্টে কোন ব্যবসায়ীকে আপনি খুব শত্রু বানিয়েছেন, তাকে নাকি এক পিরামিডের তলায় আটকে রেখে আপনি খুব শাস্তি দিয়েছেন, সে আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকায় কিনতে চায়।"

কাকাবাবু ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন, "অ্যাঁ, মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা? আমার মাথার দাম এত সস্তা!"

এরকম অবস্থার মধ্যেও কাকাবাবুর কথা শুনে দেবলীনা ফিকফিক করে হেসে উঠল।

এতক্ষণে দেবলীনা সম্পর্কে সন্তু একটু সন্তুষ্ট হল। বিপদের মধ্যেও যে হাসতে পারে সে একেবারে এলেবেলে নয়।

দেবলীনার হাসি শুনে জগাই মল্লিক বলল, "চোপ! বেয়াদপি করবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "আহা, অন্যদিকে মন দিচ্ছেন কেন, আপনার কাজের কথাটা বলুন।"

পূজারীর বেশ ধরে, এত ঠাকুর-দেবতার সামনেও জগাই মল্লিক ফশ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল, তারপর পর পর দুটো বড় টান দিল।

কাকাবাবু বললেন, "শুনুন মল্লিকবাবু, এক সময়ে আমি খুব সিগার আর

পাইপ খেতুম। সে-সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন তামাকের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলুন!"

জগাই মল্লিক একেবারে হাঁ হয়ে নিষ্পলকভাবে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর দিকে। তারপর বলল, "আপনি বেড়ে লোক তো মশাই? এটা আপনার বাড়ি না আমার বাড়ি? আপনি বাঁচবেন কি মরবেন, সেটা নির্ভর করছে আমার ইচ্ছের ওপর। অথচ আপনি আমার ওপর হুকুম ঝাড়ছেন?"

কাকাবাবু ইয়ার্কির সুরে বললেন, "আহা, বাঁচা বা মরাটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা হল কাজ, সেই কাজের কথা বলুন। আমি তো আপনাকে হুকুম করিনি। সিগারেটের গন্ধ আমার সহ্য হয় না বলে আপনাকে অনুরোধ করলুম!"

সামনের কোষা-কুষির জলের মধ্যে সিগারেটটা ঠেসে নিভিয়ে দিয়ে রাগতভাবে জগাই মল্লিক বলল, "ঠিক আছে, কাজের কথাই হোক। ওই রাজকুমার ব্যাটা তো আপনাকে পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি করে ইজিপ্টে পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। মাঝপথে আমি খবর পেয়ে ভাবলুম, আরেঃ, আপনাকে তো আমারই খুব দরকার! আপনার মতন একজন মাথাওয়ালা লোক শুধু-শুধু ইজিপ্টে গিয়ে পচবেন কেন? আপনি আমার দু' একটা কাজ করে দেবেন, তারপর আমি আপনার ভরণপোষণ করব!"

কাকাবাবু মাথা নিচু করে অভিবাদনের ভঙ্গি করে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ!"

জগাই মল্লিক এতে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, "দেখুন মশাই, আমরা বনেদি বাঙালি, আমরা খাঁটি ভদ্রলোক। আমরা পারতপক্ষে ভায়োলেন্স পছন্দ করি না, আমরা গুণীর কদর বুঝি!"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে সুর পালটে বললেন, "আমি কিন্তু ততটা ভদ্রলোক নই। আমি অনেক সময় লোকদের মারধোর করি, রিভলভার দিয়ে ভয় দেখাই। সে-রকম সে-রকম বদমাশদের পুলিশের হাতেও ধরিয়ে দিই। যাকগে সে-সব কথা। তা রাজকুমার আমাকে এককথায় আপনার হাতে তুলে দিল?"

"এমনি-এমনি দেয়নি। আমি তিরিশ হাজার দর দিয়েছি। রাজকুমারের সঙ্গে আমার কিছু কাজ-কারবার আছে। ব্যবসার স্বার্থে ওকেও আমার কথা শুনতে হয়, আমাকেও ওর কথা শুনতে হয়।"

"কাজ-কারবার মানে রাজকুমার যখন মানুষ পাচার করে তখন আপনি সেই সব লোকদের গোপনে আরবমুখো জাহাজে তুলে দেন। আগে জানতুম এসব কাজ বোম্বে থেকেই হয়। কলকাতা থেকেও যে হয় তা আমার জানা ছিল না।"

"দেখুন রায়চৌধুরীবাবু, আমি চার্টার করা জাহাজে মাল পাঠাই। তা কেউ আলুর বস্তা পাঠাচ্ছে, না মশলা পাঠাচ্ছে, না জ্যান্ত মানুষ পাঠাচ্ছে, তা তো জানবার দরকার নেই আমার। ওরা যদি কাস্টম্‌স আর পুলিশকে ম্যানেজ

করতে পারে, তারপর আর আমার কী বলবার আছে ! আমার হল মাল পাঠানো নিয়ে কথা !"

কাকাবাবু বললেন, "তা তো বটেই, তা তো বটেই ! কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। রাজকুমারের সঙ্গে আপনার আমাকে নিয়ে বোঝাপড়া হয়ে যাবার পরেও রাজকুমার আর টাইগার ওইদিকের একটা ঘরে বসে আছে কেন ?"

"ওকে এখনও পেমেন্ট করিনি, তাই বসে আছে। ও কিছু না।"

"আমি যতদূর জানি, আপনাদের এ-লাইনের যা কাজ-কারবার সব মুখের কথায় বিশ্বাসের ওপর চলে। কেউ তো এরকম হাত পেতে নগদ টাকা নেবার জন্য বসে থাকে না ! ও কেন বসে আছে তা আমি জানি বোধহয় ! এবারে আসল সত্যি কথাটা বলে ফেলুন তো !"

"আরে, ছি, ছি, ছি ! আমি কি আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি ! আপনি আমার দু' একটা কাজ করে দেবেন, তার বদলে আপনাকে আমি মুক্তি দিয়ে দেব। আপনার এই ভাইপো-ভাইঝি সমেত !"

"উঁহু, এটা তো সত্যি কথা যে, আমি ছেলেমানুষ নই, জগাইবাবু !"

"জগাই নয়, যোগেন।"

"ওই একই হল। আমি জানি আপনার মনের ইচ্ছেটা কী। আপনি আমাকে দিয়ে আপনার জরুরি কাজ করিয়ে নেবেন আমাকে ছেড়ে দেবার লোভ দেখিয়ে। তারপর যে-ই আপনার কার্য-উদ্ধার হয়ে যাবে, অমনি হয় আপনি আমাকে রাজকুমারের হাতে তুলে দেবেন অথবা মেরে ফেলবেন। আপনার লাল রঙের কাপড়-টাপড় দেখে মনে হচ্ছে আপনি কালীসাধক। আপনি কি ভেবেছেন কালীঠাকুরের সামনে আমাদের বলি দেবেন ?"

"আরে ছি, ছি, ছি, কী যে বলেন ! ওসব চিন্তা আমার মাথাতেই আসেনি। আমি শুধু চাই..."

এমন সময় সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ হল। খাকি পোশাক-পরা লোকটি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, ঠিক ওই রকমই পোশাক-পরা অন্য দু'জন লোক দৌড়ে এল ঠাকুরঘরের কাছে। জুতো খুলে ভেতরে এসে জগাই মল্লিকের কানে কানে কী যেন বলতে লাগল।

জগাই মল্লিকের মুখের একটা রেখাও কাঁপল না। সে মন দিয়ে সব শুনে বলল, "যা, ঠিক আছে। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? ওদের নীচের জলসা-ঘরে বসা। খাতির-যত্ন কর। শরবত খেতে দে। তারপর আমি আসছি।"

সেই লোক দুটি চলে যাবার পর জগাই মল্লিক তীব্রভাবে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি কি পুলিশে খবর দিয়েছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু সুযোগ পেলাম কই ? আপনার লোক অনেক পরীক্ষা করে দেখেছে যে, আমার এই ক্রাচ-দুটোর মধ্যে কোনও

লুকোনো ট্রান্সমিটারও নেই, কোনও অস্ত্রও নেই।”

জগাই মল্লিক একটুক্ষণ চিন্তা করে বলল, “পুলিশ এমনি রুটিন চেকেও আসে মাঝে-মাঝে, বুঝলেন। নাম কো ওয়াস্তে। ওদেরও তো মাঝে-মাঝে রিপোর্ট দেখাতে হয়।”

কাকাবাবু বললেন, “তা তো বটেই ! তা তো বটেই !”

উঠে দাঁড়িয়ে জগাই মল্লিক বলল, “আগেও অনেকবার এসেছে, বুঝলেন ? আমাদের এই বাড়িটার ওপর শত্রুপক্ষের যে খুব নজর।”

“চমৎকার বাড়িখানা আপনার। দেখলে যে-কোনও লোকেরই লোভ হবে।”

“আপনাকে একটু গা তুলতে হচ্ছে যে, রায়চৌধুরীবাবু। বলা যায় না, পুলিশ হয়তো ওপরে উঠে এসে এ-ঘরেও উঁকিঝুঁকি মারতে পারে।”

“হ্যাঁ, কোনও অতি-উৎসাহী ছোকরা-অফিসার হলে সারা বাড়িটাই সার্চ করে দেখতে চাইবে হয়তো।”

“অবশ্য ঠাকুরঘরে ঢুকে বেশি কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করতে কোনও পুলিশই সাহস পায় না। পাপের ভয় আছে তো। যাই হোক, সাবধানের মার নেই কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের আমি একটু অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখতে চাই।”

একদিকের দেয়ালে একটা মস্ত বড় কালীঠাকুরের ছবি। জগাই মল্লিক সেটা নামিয়ে ফেলতে দেখা গেল, তার পেছনের দেয়ালে একটা কাঠের হ্যান্ডেল মতন লাগানো রয়েছে। জগাই মল্লিক সেই হ্যান্ডেলটা ধরে ঘোরাতে চেষ্টা করল। বেশ জোর দিয়েও কোনও কাজ হল না। তখন সে খাকি পোশাক-পরা লোকটিকে ডেকে বলল, “এই পল্টে, এদিকে এসে হাত লাগা তো !”

সেই লোকটি এসে খুব জোরে হ্যান্ডেল ঘোরাতেই দেয়ালটা খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। ওপাশে আর একটা ঘর আছে।

জগাই মল্লিক বলল, “ঢুকে পড়ুন, আপনারা ওখানে চটপট ঢুকে পড়ুন।”

দেবলীনা কেউ কিছু বোঝবার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল ঠাকুরঘর থেকে। তারপর বারান্দার রেলিং ধরে চিৎকার করে উঠল, “পুলিশ ! পু...”

বেশি চ্যাঁচাতে পারল না। কাছাকাছি অন্য লোক পাহারায় ছিল, সে ছুটে এসে মুখ চেপে ধরল দেবলীনার। তার এক হাতে খোলা তলোয়ার।

জগাই মল্লিকের মুখখানা রাগে বীভৎস হয়ে গেছে, সে বলল, “এই জন্যই আমি ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ-কারবার করি না ! এই, ওকে মারিস না, এদিকে নিয়ে আয়।”

দেবলীনা নিজেকে ছাড়াবার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু সেই লোকটার ভীমের মতন চেহারা। সে টানতে-টানতে দেবলীনাকে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

সন্তুও ভেবেছিল, নীচে যখন পুলিশ এসেছে তখন এই সুযোগে একটা

গোলমাল বাধিয়ে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তো ভাল। জগাই মল্লিকের হাতে কোনও অস্ত্রই নেই, তাকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়। কিন্তু সে একবার কাকাবাবুর দিকে তাকাতেই কাকাবাবু ঘাড় নেড়ে তাকে নিষেধ করলেন।

গোপন দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরের মধ্যে প্রথমে দেবলীনাকে ছুঁড়ে দেওয়া হল। তারপর কাকাবাবু আর সন্তুকেও ঠেলে-ঠেলে ঢোকানো হল। ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জগাই মল্লিক সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই দেখা গেল, সেই ঘরেও অনেক পাথরের মূর্তি আর ছোট-ছোট বাক্স রয়েছে।

জগাই মল্লিক বলল, "শুনুন, রায়চৌধুরীবাবু, কোনও রকম গণ্ডগোল করার চেষ্টা করলে আর এ-ঘর থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবেন না। সেরকম ব্যবস্থা করা আছে। এখান থেকে হাজার চ্যাঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। এই বিচ্ছুদুটোকে সামলান। এর পরের বার কিন্তু আমি আর দয়া-মায়া দেখাব না!"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাকে বোধহয় একবার নীচে যেতে হবে। ঠিক আছে, চলে যান, দয়া-মায়া নিয়ে এখন চিন্তা করতে হবে না!"

জগাই মল্লিক এক পা এগিয়ে এসে বলল, "ততক্ষণে আপনি একটা কাজ সেরে ফেলুন!"

এক কোণে কালো কাপড় দিয়ে কিছু একটা ঢাকা রয়েছে। সেই কালো কাপড়টা তুলে জগাই মল্লিক বলল, "এই দেখুন, চিনতে পারেন?"

কাকাবাবু বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠলেন। বললেন, "এতক্ষণে বুঝলুম, আমাকে ধরে রাখার জন্য আপনার এত গরজ কেন!"

দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে দুটি হুবহু একরকম কালো পাথরের মূর্তি। প্রায় দেড় হাত লম্বা। দুটো মূর্তিরই ডান দিকের কান ভাঙা!

কাকাবাবু বললেন, "দিনাজপুরের বিষ্ণুমূর্তি!"

জগাই মল্লিক বলল, "আপনারই আবিষ্কার, আপনি তো চিনবেনই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে..."

"দুটো ছিল না। একটা ছিল। বালুরঘাট মিউজিয়াম থেকে চুরি যায়।"

"যে চুরি করেছে সে কী সেয়ানা দেখুন! সঙ্গে-সঙ্গে একটি কপি বানিয়ে ফেলেছে। কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল ধরবার উপায় নেই। এখন দুটোই আমার হাতে এসে পড়েছে। আসলটার জন্য বিদেশের এক পার্টি অর্ডার দিয়ে রেখেছে, ভাল দাম দেবে। কিন্তু দুটোর মধ্যে কোনটা যে আসল সেটা বুঝতে পারছি না। জানেন তো, ফরেনে ভেজাল মাল পাঠালে ওরা কীরকম চটে যায়? নাম খারাপ হয়ে যায়? আমি সেরকম কারবার করি না!"

কাকাবাবু মূর্তি দুটোর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

জগাই মল্লিক বলল, "আপনার জিনিস, আপনি আসলটা বেছে দিন। তারপর আপনার ছুটি। ভেজালটা আমি বালুরঘাটে পাঠিয়ে দেব। মিউজিয়ামে ক'টা লোকই বা যায়, সেখানে আসল মূর্তি রইল না নকল রইল,

তাতে কিছু আসবে যাবে না ! চটপট কাজ শেষ করে ফেলুন। আমি পুলিশকে ভজিয়ে ফিরে আসছি !

॥ ৭ ॥

জগাই মল্লিক বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সন্তু দেখল, এ-ঘরের দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই।

কাকাবাবু বসে পড়ে দেবলীনার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "ইশ, কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে !"

দেবলীনা চোখ খুলে বলল, "আমার বেশি লাগেনি !"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। একটু ভুল হলেই এরা যখন-তখন মেরে ফেলতে পারে। নিজে থেকে কিছু করতে যাবে না। আমি যা বলব, তাই-ই শুনবে। সন্তু, তোকেও এই কথাটা বলে রাখছি !"

দেবলীনা বলল, "নীচে পুলিশ এসেছে, আপনারা সবাই মিলে চ্যাঁচালেন না কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কি কিছু লাভ হত ? পুলিশ মানেই তো সবাই ভাল নয় ? ঘুষখোর পুলিশও আছে। এরা টাকা পয়সা দিয়ে অনেক পুলিশকে হাত করে রাখে। সেরকম পুলিশ কেউ যদি জানতেও পারে যে আমরা এখানে বন্দী হয়ে আছি, তাও কিছু করবে না।"

দেবলীনা অবিশ্বাসের সুরে বলল, "পুলিশ ডাকাতদের ধরবে না ? তা হলে আমরা এখান থেকে বেরুব কী করে ?"

কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে দেবলীনার মাথার রক্ত মুছে দিতে-দিতে সন্তুকে বললেন, "তুই আমার একটা ক্রাচ দিয়ে এই ঘরের সব দেয়াল আর মেঝেটা ঠুকে-ঠুকে দ্যাখ তো। যে দেয়াল দিয়ে আমরা ঢুকলাম সেটা বাদ দিয়ে।"

সন্তু ঠিক বুঝতে না পেরেও একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে দেয়ালে ঠুকতে লাগল।

কাকাবাবু দেবলীনার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন কোনওরকমে। তারপর বললেন, "পুরনো আমলের বাড়ি। এতে যেমন আধুনিক লিফ্‌ট বসিয়েছে, ইলেকট্রিক আলো আছে, তেমনি আবার গুপ্ত কুঠুরিও রেখে দিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, এই ঘর থেকেও বেরুবার একটা রাস্তা আছে।"

সন্তু ঠুকে-ঠুকে কোথাও ফাঁপা শব্দ পেল না।

কাকাবাবু ঘরের চারপাশটা দেখলেন। এক কোণে অনেকগুলো মূর্তি আর ছোট-ছোট বাক্স রয়েছে, সেগুলো সরিয়ে ফেলে বললেন, "এইখানটা ঠুকে দ্যাখ তো !"

সন্তু এসে সেইখানে জোরে-জোরে ঠুকতেই ঠং ঠং শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "দেখলি ? তলাটা ফাঁকা। গুপ্ত কুঠুরি মানেই তা' যাওয়া-আসার দুটো ব্যবস্থা থাকবেই। ফাঁদে পড়ে গেলে পালাবার একটা থাকে।"

একটা চতুষ্কোণ দাগ রয়েছে মেঝের সেই জায়গাটায়। কিন্তু সেখানকার পাথরটা সরানো যাবে কী করে ? সন্তু অনেক টানাটানি করেও সুবিধে করতে পারল না।

কাকাবাবু বললেন, "অনেকদিন বোধহয় খোলা হয়নি। জ্যাম হয়ে গেছে। দেখি, আমি চেষ্টা করি, এটা খুলতেই হবে।"

তিনি প্রথমে ক্রাচ দিয়ে সেই রেখার চারপাশ ঠুকলেন। কোনও লাভ হল না। তারপর তিনি হাত দিয়ে টিপতে লাগলেন। চতুষ্কোণ রেখার একধারে একবার দু'হাতের তালু দিয়ে জোরে চাপ দিতেই আর একটা দিক উঁচু হয়ে উঠল।

পরিশ্রমে কাকাবাবুর কপালে ঘাম জমে গেছে। তবু তিনি খুশি হয়ে বললেন, "এইবার হয়েছে। তোরাও দু'দিকে ধর, এই পাথরটা টেনে তুলতে হবে।"

তিনজনে মিলে জোরে হ্যাঁচকা টান দিতেই একটা চৌকো পাথর খুলে বেরিয়ে এল। তার নীচে অন্ধকার গর্ত।

সন্তু তার মধ্যে হাত ঢোকাতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়া, আগে আমি দেখে নিই !"

তিনি তার মধ্যে ক্রাচটা ঢুকিয়ে দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম তাই-ই। একটা সিঁড়ি রয়েছে।"

সন্তু সেই সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য পা বাড়াতেই দেবলীনা বলল, "আমি আগে যাব !"

সন্তু বলল, "ছেলেমানুষি কোরো না ! আমাকে দেখতে দাও !"

দেবলীনা বলল, "মোটেই আমি ছেলেমানুষ নই। আমি বুঝি কিছু করব না ?"

সন্তু বলল, "এটা মেয়েদের কাজ নয়।"

"ইশ, ছেলেরা যা পারে, মেয়েরা বুঝি তা পারে না ? সব পারে। কাকাবাবু, আপনি ওকে বারণ করুন, আমি আগে যাব !"

কাকাবাবু বললেন, "তলায় কিন্তু অনেক রকম বিপদ থাকতে পারে।"

দেবলীনা বলল, "আপনি ওকে সেই বিপদের মধ্যে পাঠাচ্ছেন, তাহলে আমি কেন যাব না ? আমি যাবই যাব, আমি আগে যাব !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, যাও। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে নামবে। পায়ের তলায় কিছু না পেলে অন্য পা বাড়াবে না, সেখান থেকে ফিরে আসবে ! এই বাড়িটা গঙ্গার ধারেই। এমনও হতে পারে, এই সিঁড়িটা একেবারে

গঙ্গায় নেমে গেছে। তুমি ভাল সাঁতার জানো না, জলে নেমো না !”

“আর যদি সিঁড়ির নীচে কোনও লোক দাঁড়িয়ে থাকে ?”

“থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে ! যদি পুলিশ এই বাড়িটা ঘিরে ফেলে থাকে তা হলে তুমি পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে সব কথা খুলে বোলো ! আর যদি ওদের লোক থাকে, তবে সেটা তোমার...নিয়তি !”

“তবু আমি যাব !”

“খুব সাবধানে, অ্যাঁ ? দেবলীনা, তোমার কোনও বিপদ হলে আমাদের খুব কষ্ট হবে, মনে রেখো।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, ওকে বারণ করুন ! ও পারবে না !”

কাকাবাবু বললেন, “না, যেতে চাইছে যাক !”

দেবলীনা সেই গর্তের মধ্যে নেমে গেল। কাকাবাবু আর সন্তু দু'দিক থেকে ঝুঁকে ওকে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু একে তো অন্ধকার, তার ওপর সিঁড়িটা সম্ভবত খাড়া নয়, বেঁকে গেছে, তাই কিছুই দেখা গেল না।

কাকাবাবু মুখ তুলে বললেন, “এ-বাড়িটার অনেক রকম কায়দা। মাটির নীচে আরও দুটো তলা রয়েছে।”

সন্তু বলল, “লিফ্‌টে তাই ছ'টা বোতাম দেখলুম। বাইরের লোক তো ওই লিফ্‌ট দেখলেই বুঝে ফেলবে।”

“নীচের তলা দুটো সম্ভবত মাল-গুদাম। যেখানে সাধারণ জিনিস রাখা আছে। পুলিশ সন্দেহ করলে সেই দু'তলা খুঁজে দেখবে। ওপরে ঠাকুরঘরের পেছনেও যে আরও একটা ঘর আছে, সেটা মনে আসবে না। আগেকার দিনে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বড়লোকরা এইরকম ব্যবস্থা করে রাখত। এখন এরা নিজেরাই ডাকাত !”

“নীচে কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না !”

“আর একটু অপেক্ষা করে তোকেও যেতে হবে।”

“কাকাবাবু, এই বিষ্ণুমূর্তিটা আপনি গত বছর আবিষ্কার করেছিলেন না ?”

“হুঁ। আসল কষ্টিপাথরের তৈরি, ফোর্থ সেঞ্চুরির। অতি দামী জিনিস। বিদেশে এর দাম তো দশ-বারো লাখ টাকা হবেই ! আমি বলেছিলাম, মূর্তিটা কলকাতার মিউজিয়ামে রাখতে। কিন্তু বালুরঘাটের লোক দাবি তুলল, আমাদের জিনিস, আমরা দেব না, আমাদের মিউজিয়ামেই রাখব। সেখান থেকে তিন-চার মাসের মধ্যেই চুরি হয়ে গেল।”

“এখন এরা এই দামী মূর্তিটা বাইরে পাঠিয়ে দেবে !”

“প্রথম চোরটা অতি চালাক। সঙ্গে-সঙ্গে একটা কপি তৈরি করে ফেলেছে। এখন এরা আর আসলটা চিনতে পারছে না !”

এরা তো দুটোই বাইরে পাঠিয়ে দিলে পারে !”

পাগল নাকি ! বাইরের ক্রেতা যদি জানতে পারে যে, এই মূর্তির আরও

কপি আছে, তা হলে হু-হু করে দাম পড়ে যাবে।"

"কাকাবাবু, কোনও সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। আমি এবার যাব?"

"হ্যাঁ, সাবধানে নেমে দ্যাখ। মেয়েটি যেন বুঝতে না পারে যে, তুই ওকে সাহায্য করতে গেছিস।"

সন্তু প্রথমে পা দুটো গলিয়ে বলল, "সিঁড়ি বেশ চওড়া আছে, পড়ে যাবার ভয় নেই।"

তারপর সে নেমে গেল কয়েক ধাপ।

সন্তু অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কাকাবাবু নিজেও একটা পা গলিয়ে দেখে নিলেন। এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে তাঁরও অসুবিধে হবে না। কিন্তু তিনি নামলেন না।

তিনি মূর্তি দুটি পরীক্ষা করতে লাগলেন।

একটুক্ষণের মধ্যেই সুড়ঙ্গের মধ্যে শব্দ পেয়ে তিনি মুখ ফেরালেন। সন্তু উঠে এল, হুড়মুড়িয়ে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, "ওই মেয়েটা ফিরে আসছে। আমায় দেখতে পায়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই এপাশটায় এসে বোস।"

দেবলীনা মুখ বাড়াতেই কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর বললেন, "সত্যি সাহসী মেয়ে! কী দেখলে?"

দেবলীনা অনেকখানি সিঁড়ি একসঙ্গে উঠে এসেছে, একটু হাঁপাতে লাগল। তারপর ভাল করে দম নিয়ে বলল, "আমি দু'দিন কিছু খাইনি তো, তাই খুব দুর্বল হয়ে গেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ইশ, ছ'তলা সিঁড়ি ভাঙা তো সোজা কথা নয়। কেউ তোমায় দেখতে পায়নি তো?"

দেবলীনা বলল, "নামবার সময় কী যেন একটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। বোধহয় সাপ।"

"ইঁদুরও হতে পারে। তোমায় কামড়ায়নি তো?"

"না, কামড়ায়নি। সিঁড়ির দু'পাশের দেয়াল শ্যাওলায় ভর্তি, অনেকদিন কেউ যায়নি বোধহয়।"

"একদম নীচে পর্যন্ত গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ছ'তলায় নয়, তিনতলা। আমি গুনেছি। সেখানেই সিঁড়ি শেষ। তারপর একটা ছোট বারান্দা। সেই বারান্দার একপাশে একটা দরজা, সেটা বন্ধ।"

"সিঁড়িটা তা হলে মাটির তলা পর্যন্ত যায়নি। সেই বারান্দায় কী দেখলে?"

"কাছেই গঙ্গার জল চকচক করছে। ঢেউয়ের শব্দও শুনলুম। সেখানে কোনও লোক নেই মনে হল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "সেই বারান্দা ডিঙিয়ে নীচে নামা যায় না?"

দেবলীনা একটু ভেবে বলল, "হ্যাঁ, তা যেতে পারে। একটু লাফাতে হবে। ওটুকু আমিও লাফাতে পারব। কিন্তু...কিন্তু কাকাবাবু পারবেন কি ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার আর একটা পা-ও খোঁড়া হয়ে যাবে বলছ ? সে দেখা যাবে। তা হলে, ওখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে না ?"

"না, কোনও সাড়া-শব্দ নেই। ওদিকটায় বোধহয় কেউ আসে না। বারান্দার নীচে ঝোপঝাড় হয়ে আছে মনে হল। আমি উঁকি মেরে দেখেছি। চাঁদের আলোয় একটু-একটু দেখা যাচ্ছে।"

"বাঃ, দেবলীনা, ইউ হ্যাভ ডান্ আ ভেরি গুড জব ! এবারে তোমাতে আর সন্তুতে মিলে একটা কাজ করতে হবে।"

কাকাবাবু বিষ্ণুমূর্তি দুটোকে আবার পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "ইতিহাসে যার একটুখানি জ্ঞান আছে, সে-ই কোনটা আসল, কোনটা নকল চিনতে পারবে। কিন্তু চোর-ডাকাতদের তো সে বিদ্যেটুকুও থাকে না।"

একটা মূর্তি তিনি দু'হাতে উঁচু করে তুলে বললেন, "প্রচণ্ড ভারী। দ্যাখো তো, তোমরা দু'জনে এটা বয়ে নিয়ে যেতে পারো কি না !" তারপর বললেন, "না, না, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, দুটো হাত এনগেজ্ড থাকলে পড়ে যেতে পারিস। তাতে দারুণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সন্তু, তুই আর দেবলীনা আগে নেমে যা, তারপর আমি মূর্তিটা তোদের হাতে তুলে দিচ্ছি।"

সন্তু বলল, "এটা নীচে নিয়ে গিয়ে কী করব ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোরা এটাকে খুব সাবধানে নিয়ে যাবি। দেখিস, কিছুতেই যেন হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে না যায়। এসব জিনিস অমূল্য, শুধু টাকার দাম দিয়ে এর বিচার হয় না। দিনাজপুরের একটা ঢিবি খুঁড়ে এটা আবিষ্কার করার সময় আমাকে সাপে কামড়েছিল। সন্তু, তোর মনে আছে ?"

সন্তু বলল, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেবার আমার জ্বর হয়েছিল, আমি সঙ্গে যাইনি।"

"এই মূর্তিটা পাওয়ার জন্য আমায় প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। এটা আমার ভীষণ প্রিয়। এটা কেউ বিদেশে পাচার করবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। এটা যদি তোরা নামাতে গিয়ে ভেঙে ফেলিস, তা হলেও আমার বুক ফেটে যাবে !"

দেবলীনা বলল, "না, না, আমরা সাবধানে নামাব !"

কাকাবাবু বললেন, "এটাকে বারান্দা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে তলার গাছপালার ঝোপে ফেলে দিবি, তারপর তোরা দু'জনে বারান্দা ডিঙিয়ে নীচে নেমে এটাকে আবার গড়িয়ে ফেলে দিবি জলে।"

দেবলীনা বলল, "জলে ফেলে দেব ? কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের যদি পালাতে হয়, তা হলে এত বড় একটা ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে। জলে ফেলে দিলে নষ্ট হবে

না। পরে আবার খুঁজে বার করা সহজ হবে। আর দেরি কোরো না, নেমে পড়ো।"

দেবলীনা বলল, "আর আপনি ? আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে ? আপনি বরং আগে-আগে নামুন।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু পরে যাচ্ছি !"

সন্তু বলল, "পরে কেন ? আমরা একবার বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে পড়লে আপনার একলা নামতে অসুবিধে হবে।"

"কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। আমি ঠিক চলে যাব। এখানে আর কী কী চোরাই জিনিস আছে, আমাকে একবার দেখে নিতেই হবে। তোরা আর দেরি করিসনি। এগিয়ে পড় !"

দেবলীনা বলল, "না, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। এসব জিনিস আর দেখতে হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমি যা বলছি, তাই করো !"

সন্তুরও এই ব্যবস্থাটা পছন্দ হল না। তবু সে প্রতিবাদ করল না। নামতে শুরু করল। কাকাবাবু ওদের হাতে মূর্তিটা তুলে দিয়ে বললেন, "দেখো, খুব সাবধানে !"

॥ ৮ ॥

ওরা নেমে যাওয়ার পর কাকাবাবু অন্যান্য মূর্তি আর বাক্সগুলো খুলে দেখতে লাগলেন। বাক্সগুলো খোলা সহজ নয়। এক-একটা একেবারে সিল করা। কাকাবাবুর কাছে ছুরি-টুরি কিছু নেই। তিনি তাঁর সাঁড়াশির মতন শক্ত আঙুল দিয়ে সেগুলো খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কোনও বাক্সেই হিরে-জহরত নেই। রয়েছে গাঁজা, আফিমের মতন নিষিদ্ধ জিনিস। একটা চৌকো বাক্স অনেক কষ্টে খুলে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। তার মধ্যে রয়েছে একটা ছোট্ট মাথার খুলি। মনে হয় চার-পাঁচ বছরের কোনও বাচ্চার। কাকাবাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সাদা ধপধপে খুলিটার দিকে। বিদেশে এইসবও বিক্রি হয় ? পয়সার লোভে মানুষ কত হীন কাজই না করে !

কয়েকটা বাক্স শেষ পর্যন্ত খোলা গেল না।

মূর্তিগুলো বেশির ভাগই কোনও-কোনও মন্দিরের দেয়াল থেকে খুবলে আনা। বেশির ভাগই তেমন দামী নয়, তবে মন্দিরগুলোর সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে।

একটা যুগল-মূর্তি কাকাবাবু খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর সন্দেহ হল, সেটা ওড়িশার বিখ্যাত রাজারানী মন্দির থেকে চুরি করে আনা হয়েছে। তাহলে এটাও খুব দামী হবে। কিন্তু তিনি ঠিক নিঃসন্দেহ হতে

পারছেন না।

কাকাবাবু যেন ভুলেই গেলেন যে, কতখানি বিপদ তাঁদের ঘিরে ছিল এতক্ষণ। এখন একটা পালাবার রাস্তা পাওয়া গেছে। সন্তু আর দেবলীনা তাঁর জন্য নীচে অপেক্ষা করছে। তবু তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সেই যুগল-মূর্তিটা।

হঠাৎ খট্ করে একটা শব্দ হতেই তিনি চমকে উঠলেন।

দেয়ালের দরজাটা আবার খুলে গেছে। সেখান দিয়ে রাজকুমার ঢুকল, সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কাকাবাবু সাবধানে মূর্তিটা নামিয়ে রেখে হালকা গলায় বললেন, "আরে, কী ব্যাপার? এ তো দেখছি, বাঘ আর ছাগল এক খাঁচায়! জগাই মল্লিক কি তোমাকেও বন্দী করে ফেলল নাকি?"

রাজকুমার পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "আমায় আটকাবে জগাই মল্লিকের এমন সাহস আছে? ওই ব্যাটা ধ্রুব রায় নামে অফিসারটা এসে পড়েছে, সে ঠাকুরঘরে এসে প্রণাম করতে চায়, তাই আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ছাগলের খাঁচায় আসতে হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা ভালই হয়েছে। তুমি বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কাজের কথাগুলো সেরে নিই!"

রাজকুমার রিভলভারের নলে দু'বার ফুঁ দিয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে আমার আর কোনও কথা নেই, রায়চৌধুরী। তোমাকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। এখন তুমি জগাই মল্লিকের মাল। আর তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"বিক্রি করে দিয়েছ! টাকা-পয়সা পেয়ে গেছ?"

"সে-কথায় তোমার দরকার কী?"

"কিন্তু রাজকুমার, জগাই মল্লিক আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে বলেছে। আমাকে ছেড়ে দিলেই যে তোমার বিপদ। তোমার কী ব্যবসা তা-ও আমি জেনে গেছি, আর তোমার কাজ-কারবার যেখানে চলে সেই জায়গাটাও খুঁজে বার করা আমার পক্ষে শক্ত হবে না।"

"জগাই মল্লিক তোমাকে ছেড়ে দেবে? সে অত কাঁচা? হা-হা-হা-হা!" হঠাৎ হাসি থামিয়ে সে বলল, "ছেলেমেয়ে দুটো কোথায় গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই তো, কোথায় গেল, আমিও ওদের কথা ভাবছি!"

"বাজে কথা বোলো না। আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা কোরো না। ওদেরও এই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ও কী! ওখানে, ওখানে ওই গর্তটা..."

"ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ছেলেমেয়ে দুটো বাইরে একটু হাওয়া খেতে গেছে। এই জায়গাটা বড্ড বদ্ধ কি না!"

কাকাবাবু অনেকটা আড়াল করে বসে থাকলেও মেঝের চৌকো গর্তটা রাজকুমারের চোখে পড়ে গেছে। তার চোখ চকচক করে উঠল।

সে বলল, "বেরুবার পথ রয়েছে? তবু তুমি পালাওনি যে বড়? জায়গাটা সরু, তুমি গলতে পারোনি! সরে এসো, সরে এসো, আমি ঠিক গলে যাব।"

"দাঁড়াও, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আগে তোমার সঙ্গে কথাবার্তাগুলো হয়ে যাক!"

"আমার কোনও কথা নেই, সরে এসো।"

"আমার যে অনেক কথা আছে!"

"চালাকি করে সময় নষ্ট করছ? ছেলেমেয়েগুলোকে বাইরে পাঠিয়ে পুলিশে খবর দিতে চাও? আমি এক্ষুনি গিয়ে ওদের ধরে ফেলব!"

"এক্ষুনি তো তোমায় যেতে দেব না আমি!"

রাজকুমার রিভলভারের নলটা কাকাবাবুর কপালের সোজাসুজি তুলে হিংস্রভাবে বলল, "রায়চৌধুরী, আমি ঠিক দশ গুনব। তার মধ্যে সরে না গেলে..."

কাকাবাবু তার কথা শুনে নিজেই তখন গুণতে লাগলেন, "এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট-নয়-দশ!" তারপর হেসে হেসে বললেন, "কই, গুলি করলে না?"

রাজকুমার এক পা এগিয়ে এসে গলার আওয়াজে আগুন মিশিয়ে বলল, "তুমি কি ভাবছ আমি ছেলেখেলা করছি? তুমি যদি সরে না দাঁড়াও তা হলে তোমাকে আমি কুকুরের মতন গুলি করে মারব। জগাই মল্লিক কী বলবে তাও আমি পরোয়া করি না!"

"আমার কথা শেষ না হলে তোমাকে আমি যেতে দেব না বলছি তো!"

রাজকুমার সেফ্‌টি ক্যাচটা সরিয়ে ট্রিগার টিপল।

শুধু একটা খট্‌ করে আওয়াজ হল, গুলি বেরুল না।

কাকাবাবু এবার অট্টহাস করে উঠে বললেন, "দেখলে, দেখলে! আমার হচ্ছে চার্মড লাইফ, আমি গুলিগোলায় মরি না!"

রাজকুমার বিমূঢ়ভাবে হাতের রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে রইল। আরও কয়েকবার ট্রিগার টিপলেও খট্‌-খট্‌ শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "ওটা দিয়ে আর কিচ্ছু হবে না। ওই খেলনাটা এখন ফেলে দাও! কাল রাত্তিরে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে দিয়েছিলে। জ্ঞান হারাবার আগে আমি বুঝতে পেরেছিলুম রিভলভারটা তুমি আবার নিয়ে যাবে। তাই আমি গুলিগুলো সব সরিয়ে ফেলেছি। তুমি একবার চেক করেও দ্যাখোনি।"

রাজকুমার তখন সেই রিভলভারটাই কাকাবাবুর মাথার দিকে ছুঁড়ে মারবার জন্য হাত তুলতেই কাকাবাবু একটা ক্রাচ দিয়ে ঘুরিয়ে মারলেন তার হাতে।

রাজকুমারের হাত থেকে সেটা ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লেগে আবার মেঝেতে পড়ল।

রাজকুমার এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে তুলে নিল কাকাবাবুর আর একটা ক্রাচ।

কাকাবাবু বসে ছিলেন, এই সুযোগে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন দেয়াল ঘেঁষে। রাজকুমারের চোখে চোখ রেখে তিনি শান্তভাবে বললেন, "এখন আর ওটা নিয়ে তোমার কোনও লাভ নেই। শুধু শুধু আমার ক্রাচটা ভাঙবে। কোনওদিন লাঠিখেলা শিখেছ ? আমি শিখেছি।"

রাজকুমার দু'হাত দিয়ে ক্রাচটা তুলে খুব জোরে মারতে গেল কাকাবাবুর মাথা লক্ষ্য করে, কাকাবাবু খুব সহজেই নিজের ক্রাচটা তুলে সেটা আটকালেন।

তারপর চলল খটাখট লড়াই।

এই সময় তলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল সন্তু। রাজকুমার তার দিকে পেছন ফিরে রয়েছে, রাজকুমার তাকে দেখতে পেল না, কাকাবাবু দেখতে পেলেন। সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে মনস্থির করে ফেলল। অনেক পাথরের মূর্তি পড়ে আছে, তার একটা তুলে নিয়ে সে পেছন দিক থেকে রাজকুমারের মাথায় ঠুকে দেবে।

সন্তু এক লাফে ওপরে এসে একটা মূর্তি তুলে নিতেই কাকাবাবু বললেন, "তোকে কিছু করতে হবে না, এই দ্যাখ।"

এতক্ষণ কাকাবাবু যেন খেলা করছিলেন, এবারে তিনি বিদ্যুৎ গতিতে ক্রাচটা রাজকুমারের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে তার ঘাড়ে মারলেন।

'উফ্' শব্দ করে রাজকুমার মাটিতে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

কাকাবাবু তাতেই থামলেন না, তিনি আবার মারলেন তার পিঠে।

রাজকুমার বলে উঠল, "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে !"

কাকাবাবু এক টানে রাজকুমারের হাত থেকে অন্য ক্রাচটা কেড়ে নিয়ে সন্তুকে বললেন, "ওইখানে দ্যাখ কতকগুলো কাপড় পড়ে আছে, ওইগুলো দিয়ে ওর হাত আর পা বাঁধ তো !"

রাজকুমার টান-টান হয়ে শুয়ে পড়েছে। সন্তু দুটো টুকরো কাপড় নিয়ে বেশ সহজেই বেঁধে ফেলল তার হাত ও পা। রাজকুমার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, কোনও বাধা দিতে পারছে না। তার ঘাড়ে খুবই জোর লেগেছে।

কাকাবাবুর মুখখানা বদলে গেছে। অসম্ভব রাগে লাল লাল ছোপ পড়েছে তাঁর মুখে। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে তাঁর।

তিনি বললেন, "বার বার তিন বার। এর আগে ত্রিপুরায় তোমাকে দু'বার ক্ষমা করেছি। এবার আর তোমার ক্ষমা নেই। আমার কথা শোনার ধৈর্য ছিল না তোমার, না ? এবার শোনাচ্ছি !"

রাজকুমার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "উঃ, ভীষণ ব্যথা ! মরে যাচ্ছি ! মরে

যাচ্ছি !”

কাকাবাবু বললেন, “না, তুমি মরবে না, বেঁচে উঠবে ঠিকই। বাকি জীবন জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে না ? পুলিশ তোমাকে যা-ই শাস্তি দিক, আমি নিজে তোমাকে আলাদা শাস্তি দেব ! তুমি ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর অত্যাচার করো, তুমি মানুষ বিক্রি করো, তুমি সমাজে থাকার অযোগ্য।”

কাকাবাবু রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে গুলি বার করলেন। বললেন, “আগেই ওরা আমাকে সার্চ করেছে, তাই পরে আর পকেট দেখেনি। যাক্, এতক্ষণে একটা ভালমতন অস্ত্র পাওয়া গেল !”

কাকাবাবু গুলিগুলো রিভলভারে ভরে সন্তুকে বললেন, “তুই ওপরে উঠে এলি কেন ? মেয়েটাকে একা ফেলে এলি ?”

সন্তু বলল, “আপনার দেরি হচ্ছে দেখে...”

“তুই চলে যা নীচে।”

“এবারে আপনিও চলুন।”

“যাচ্ছি, একটু পরেই যাচ্ছি। আগে এই শয়তানটার সঙ্গে বোঝাপড়া করে যাই। ও যাতে জীবনে আর কোনওদিন কারুর ওপরে অত্যাচার করতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করে যাব।”

“আমি থাকি না একটুখানি। একসঙ্গে যাব !”

“না। তোকে এখানে থাকতে হবে না। দেবলীনাকে একা ফেলে এসেছিস, ও যদি ভয় পেয়ে যায় ? শিগগির যা !”

কাকাবাবুর হুকুম অগ্রাহ্য করতে পারে না বলে সন্তু গর্তটার মধ্যে নামল। কিন্তু বেশি দূর গেল না। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সে ভাবল, কাকাবাবু কি রাজকুমারকে গুলি করে একেবারে মেরে ফেলবেন নাকি ? সে কান খাড়া করে রইল।

কিন্তু গুলির শব্দের বদলে কিসের যেন ধপ-ধপ আওয়াজ হতে লাগল। আর রাজকুমার বিকট চিৎকার করে বলতে লাগল, “মরে গেলাম ! মরে গেলাম ! আর করব না, আর করব না, এবারকার মতন দয়া করুন !”

কাকাবাবু বললেন, “না, তোমায় দয়া করব না। যতই চ্যাঁচাও কেউ শুনতে পাবে না ! তুমি একটু আগেই আমাকে খুন করতে চাইছিলে না ?”

সন্তু কাকাবাবুর এত রাগ অনেকদিন দেখেনি। অথচ এর আগে সারাক্ষণ কাকাবাবু রাজকুমারের সঙ্গে ইয়ার্কির সুরে কথা বলছিলেন।

সন্তুর খুব কৌতূহল হচ্ছে কাকাবাবু ওকে কী শাস্তি দিচ্ছেন দেখবার জন্য। কিন্তু মাথা তুলতে সাহস করল না। ওপরের ধপাধপ আওয়াজটা থেমে গেল, কিন্তু রাজকুমারের কান্না চলতে লাগল।

হঠাৎ নীচের দিকে তাকাতেই সন্তুর বুক কেঁপে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে কে যেন

উঠে আসছে। সিঁড়িটা যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে টর্চের আলো।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তুর দুটো কথা মনে হল। টর্চের আলো নিয়ে যখন আসছে, তখন নিশ্চয়ই অন্য লোক। আর অন্য লোক যখন এই সিঁড়ির সন্ধান পেয়ে গেছে, তখন দেবলীনা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে!

দেরি করার সময় নেই, সন্তু তরতর করে ওপরে উঠে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, "কাকাবাবু, কেউ একজন আসছে! টর্চ নিয়ে!"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে রাজকুমারের মুখটা চেপে ধরে ওর চিৎকার বন্ধ করে দিলেন। সন্তুকে বললেন, "আর-একটা ন্যাকড়া নিয়ে আয়, ওর মুখটা বাঁধতে হবে। এটা আগেই করা উচিত ছিল।"

সন্তু আর-একটা কাপড় নিয়ে এল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রাজকুমারের মুখ বাঁধা হয়ে গেল। এরই মধ্যে সে দু'বার 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে ফেলল।

কাকাবাবু সুইচ অফ করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর মেঝের গর্তটার পাশে এসে বসলেন। সন্তুও বসল অন্য দিকে। অন্ধকার ফুঁড়ে টর্চের আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। কিন্তু যে লোকটি সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, সে থেমে গেছে এক জায়গায়।

এই ছোট চৌকো গর্ত দিয়ে একজনের বেশি একসঙ্গে উঠতে পারবে না। যে আসবে, তাকে আগে মাথাটা বাড়াতেই হবে। একটা মাত্র ডাণ্ডার বাড়ি মেরে তাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যায়।

সেই কথা বুঝেই ওই লোকটি আর উঠল না, দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন ওপর থেকেও কেউ নীচে নামতে গেলে লোকটা সহজেই তাকে কাবু করে ফেলবে!

লোকটি কোনও সাড়াশব্দও করছে না।

কাকাবাবু আর সন্তু নিঃশব্দে বসে রইল সেখানে। তারা ফাঁদে পড়ে গেছে। কিন্তু এই গর্তটার কাছে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। লোকটা যে-কোনও সময়ে ওপরে উঠে আসতে পারে।

সন্তুর খুব অনুতাপ হচ্ছে দেবলীনাকে একা ফেলে আসার জন্য। অবশ্য সন্তু যখন তাকে বলেছিল, আমি একটু কাকাবাবুকে দেখে আসি, তুমি এখানে একা থাকতে পারবে?—সে বলেছিল, হ্যাঁ, পারব।

নীচের লোকটা টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে। এখন একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে লোকটা হঠাৎ মাথা তুলতে পারে বলে কাকাবাবু তাঁর একটা ক্রাচ গর্তের মুখে আড়াআড়ি ভাবে রাখলেন।

তারপর এক-এক ঘণ্টার মতন লম্বা এক-একটা মিনিট কাটতে লাগল। কিছুই ঘটছে না। অসহ্য সেই প্রতীক্ষা! অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকতে-থাকতে যেন চোখ ব্যথা করে।

তারপর একসময় পেছনের দেয়ালে ঘর্ঘর শব্দ হল। ওদিকের দরজাটা খুলে

যাচ্ছে। কেউ ঢুকছে ওদিক থেকে। এবার দু'দিকেই শত্রু। কাকাবাবু ক্রাচটা সরিয়ে নিয়ে চৌকো পাথরটা গর্তে চাপা দিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। সন্তুর গা টিপে বুঝিয়ে দিলেন একেবারে চুপ করে থাকতে।

দরজাটা খোলার পর জগাই মল্লিক মুখ বাড়িয়ে বলল, "অল ক্লিয়ার। এবারে বেরিয়ে আসতে পারো। আর কিছু চিন্তা নেই। এ কী, ঘর অন্ধকার কেন ? রাজকুমার, রাজকুমার !"

কেউ কোনও সাড়া দিল না। শুধু রাজকুমারের মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরুল।

জগাই মল্লিক ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বলল, "এত ভয় যে, আলো নিভিয়ে আছ ? আমি থাকতে চিন্তার কী আছে ? ও রাজকুমার, ও রায়চৌধুরীবাবু !"

পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ হল।

দেয়াল হাতড়ে সুইচটা টিপে আলো জ্বেলেই সে আঁতকে উঠল।

কাকাবাবু তার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে আছেন।

শান্ত গলায় কাকাবাবু বললেন, "পাশার দান উলটে গেছে, জগাই মল্লিক। এবারে আমি হুকুম দেব !"

চট্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে জগাই মল্লিক বলল, "ওই পিস্তলটা বুঝি রাজকুমারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন ? ওটা একটা অপদার্থ ! কোনও কম্মের নয় ! যাকগে, ভালই হয়েছে। আপনি আমার দিকে ওটা উঁচিয়ে আছেন কেন ? আপনার সঙ্গে তো আমার কোনও ঝগড়া নেই ! আমি ওই ব্যাটার কাছ থেকে আপনাকে উদ্ধার করে এনেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "পেছনের দরজাটা খুলুন।"

জগাই মল্লিক পেছন ফিরে দ্বিতীয়বার অবাক হয়ে বলল, "আরেঃ, এ দরজাটা কে বন্ধ করল ?"

দেয়ালের গায়ে কিল মেরে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই খোল্, খোল্ ! এই পল্টু, এই ভোলা !"

কিন্তু এদিক থেকে কোনও আওয়াজই যায় না। কেউ দরজা খুলল না। খুব সম্ভবত জগাই মল্লিক একাই দরজা খুলে ঢুকেছে, তারপর দরজাটা নিজে-নিজেই বন্ধ হয়ে গেছে।

জগাই মল্লিক বলল, "যাকগে, একটু পরে ওরা কেউ এসে খুলে দেবে !"

কাকাবাবু বললেন, "যে-করেই হোক, এক্ষুনি দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করুন !"

"ও দরজা তো ভেতর থেকে খোলা যায় না !"

"কোনও গোপন উপায় নেই ?"

"না, তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? একটু বাদেই আমার কোনও লোক এসে খুলে দেবে। ওরা এখন নীচে পুলিশের লোকদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা

করছে! পুলিশ সার্চ করে কিছুই খুঁজে পায়নি। এ কী, আমার বিষ্ণুমূর্তি? মোটে একটা কেন?"

"সে-মূর্তি স্বর্গে ফিরে গেছে।"

"অ্যাঁ? আর সেই মেয়েটা?"

"সেই মেয়েটাকে আপনার লোক ঘাড় ধরে এই ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তার কপাল কেটে রক্ত বেরিয়েছিল, তবু আপনি কোনও কথা বলেননি।"

"মেয়েটা পুলিশ এসেছে শুনেই টিয়াপাখির মতন চ্যাঁচাতে গেল কেন?"

"আপনি বলেছিলেন, আপনার ওই বয়েসি ছেলেমেয়ে আছে। আপনার ছেলে বা মেয়েকে কেউ ওইরকমভাবে ছুঁড়ে দিলে আপনি সহ্য করতেন?"

"আহা, ওসব ছোটখাটো কথা এখন থাক না। আমার বিষ্ণুমূর্তি কোথায় গেল?"

"ওই মূর্তিটা উদ্ধার করতে গিয়ে আমায় সাপে কামড়েছিল। ওটা আপনার হয়ে গেল কী করে?"

"আমি দাম দিয়ে কিনেছি।"

"টাকা দিয়ে সবই কেনা যায়, না? মানুষও কেনা যায়!"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। একটু সরে এসে বললেন, "আপনার লোক এসে কতক্ষণে ঐ দরজা খুলবে, ততক্ষণ আমার ধৈর্য থাকবে না। তার আগেই আমার কাজ শুরু করতে হবে। ওই রাজকুমারের দিকে চেয়ে দেখুন। ওর দুটো বুড়ো আঙুল আমি জন্মের মতন থেঁতলে দিয়েছি। বুড়ো আঙুল না থাকলে কী হয় জানেন? যার বুড়ো আঙুল থাকে না সে কোনও অস্ত্র ধরতে পারে না। ও এখন হাত দিয়ে অন্য সব কাজই করতে পারবে, কিন্তু কোনওদিন আর ছুরি-ছোরা-বন্দুক ব্যবহার করতে পারবে না।"

রাজকুমার বড়-বড় চোখ মেলে চেয়ে আছে। এই সময় বুঁ-বুঁ শব্দ করে কিছু বলতে চাইল।

কাকাবাবু বললেন, "এখন আমি যা বলব, তার যদি একটুও নড়চড় হয়, তা হলে তোমারও ওই অবস্থা হবে জগাই মল্লিক!"

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "তুই ওই সিঁড়ির পাথরটা সরিয়ে দে!"

॥ ৯ ॥

জগাই মল্লিক দু'হাত তুলে বলল, "দাঁড়ান দাঁড়ান, রায়চৌধুরীবাবু, আগে আমার একটা কথা শুনুন! আমি কি আপনার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেছি। আপনার কী চাই বলুন!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি চাই, তুমি ওই সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নামবে!"

মেঝের গর্তটার দিকে তাকিয়ে জগাই মল্লিক যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস

করতে পারছে না। সে বিড়বিড় করে বলল, "সিঁড়ি, সিঁড়ি, ওটার কথা তো আমি নিজেই প্রায় ভুলে গেছলাম। দশ-বারো বচ্ছর ব্যবহার হয়নি। ওর মধ্যে সাপখোপ কী না কী আছে!"

কাকাবাবু বললেন, "সে-সব কিচ্ছু নেই। সিঁড়ির মাঝপথে রয়েছে একজন মানুষ। সে তোমার লোকও হতে পারে, পুলিশের লোকও হতে পারে। তুমি আগে-আগে নামবে। তোমার লোক যদি হয়, তুমি বলে দাও যেন গুলি-টুলি না চালায়। চালালে, তুমিই আগে মরবে!"

"ওখানে কে আছে, আমি তো জানি না!"

"তা হলে গিয়ে দেখতে হবে। চলো!"

"শুনুন, শুনুন! আগে যা হয়েছে, হয়েছে, সব ভুলে যান। সব ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে আর আপনার ভাইপো-ভাইঝিকে এক্ষুনি বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মা-কালীর নাম নিয়ে বলছি, আপনাদের গায়ে আর কেউ হাত ছোঁয়াবে না!"

"বিপদে পড়লেই যত রাজ্যের শয়তান-বদমাইশদের ধর্মের কথা মনে পড়ে। আর এক সেকেন্ড দেরি নয়। আর দেরি করলে প্রথমে তোমার দু'পায়ে গুলি করব, তারপর জোর করে ধাক্কা দিয়ে তোমাকে ওই সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দেব।"

জগাই মল্লিক অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। রাজকুমার আবার বুঁ বুঁ শব্দ করল মুখ দিয়ে।

কাকাবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি এইখানেই পড়ে থাকবে। কই জগাই মল্লিক, নামো!"

জগাই মল্লিক গর্তটার কাছে মুখ নিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "এই, নীচে কে আছিস? আমি বড়বাবু, আমি আসছি।"

তলা থেকে কোনও সাড়া এল না।

কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে বললেন, "আমি এটা দিয়েই কাজ চালাব, সন্তু তুই আর-একটা নিয়ে আয়। তুই আমার পেছন-পেছন আসবি।"

জগাই মল্লিক মোটাসোটা মানুষ, পুরো সিঁড়িটা তার শরীরে ঢেকে আছে। কাকাবাবু তার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে নামতে লাগলেন।

জগাই মল্লিক এক ধাপ করে নামছে, আর চেঁচিয়ে বলছে, "এই, কে আছিস, আমি বড়বাবু! আমি বড়বাবু!"

সিঁড়িটা যেখানে প্রথম বেঁকেছে, সেখানে সে থমকে দাঁড়াল।

কাকাবাবু বললেন, "থেমে লাভ নেই। আবার চেঁচিয়ে দ্যাখো, তোমার লোক আছে কি না। এগোতে তোমাকে হবেই!"

জগাই মল্লিক আবার চ্যাঁচাল। কোনও সাড়া এল না।

তারপর সে বাঁকের মুখে এক পা রাখতেই ওপাশ থেকে দুটো হাত বেরিয়ে

এসে তার গলা ধরে টেনে নিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

কাকাবাবু এক পা পিছিয়ে এলেন।

জগাই মল্লিকের ভয়ার্ত চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল একটা ভারী শরীর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। যে টেনে নিয়েছে, সে সিঁড়ি দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। গড়ানোর শব্দ আর চিৎকার দুটোই এক সঙ্গে থেমে গেল।

কাকাবাবু দৃঢ় গলায় বললেন, "ওপাশে কে? বাঁচতে চাও তো সরে যাও, নইলে আমি গুলি করব!"

এবারে একজন বলে উঠল, "হামার সাহেব কোথায় আছে? তুমাদের সাথে আছে?"

সন্তুর সর্বাঙ্গে একটা শিহরন খেলে গেল। এই গলার আওয়াজ তার চেনা। এ তো টাইগার নামে বিশাল চেহারার সেই লোকটা। টাইগার ওপরেই একটা ঘরে বসে ছিল। কখন নীচে নেমে গেছে, আর সিঁড়ির মুখটা খুঁজে পেয়েছে।

এই টাইগার কিন্তু সন্তুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। সে প্রভুভক্ত, সে তার সাহেবের খোঁজ নিতে এসেছে।

সন্তু কাকাবাবুর পিঠে হাত দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "টাইগারজি, তোমার সাহেব নেই। তুমি সরে যাও, আমাদের যেতে দাও! আমাদের সঙ্গে সত্যি রিভলভার আছে!"

ওপাশ থেকে টাইগার বলল, "হামার সাহেব মরে গেছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না, সে মরেনি। কিন্তু তার চাকরি আর তোমাকে করতে হবে না। তুমি যদি বাঁচতে চাও তো পালাও!"

টাইগার বলল, "সাহেবের জন্য হামি জান দেব, তবু ভাগব না!"

কাকাবাবু বললেন, "সাহেবের জন্য তোমাকে জান দিতে হবে না। তবে সাহেবের সঙ্গে যদি একসঙ্গে জেল খাটতে চাও, তবে থাকো।"

কাকাবাবু বুঝে গেছেন টাইগারের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই। ছুরি-টুরি থাকতে পারে। তিনি মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে টাইগারকে একপলক দেখে নিলেন। তারপর বললেন, "সময় নষ্ট কোরো না, এবার তোমার পায়ে গুলি চালাব! তুমি পিছু হটো!"

টাইগার কয়েকটা সিঁড়ি নেমে যেতেই কাকাবাবু চট করে বাঁক ঘুরে বললেন, "দাঁড়াও! আর এক পা নড়বে না! নড়লেই গুলি চালাব। শোনো, তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে বলো, আমাদের সঙ্গের মেয়েটি কোথায়? তার কোনও ক্ষতি হলে তোমায় শেষ করে দেব!"

টাইগার বলল, "সে লেড়কি নীচে আছে। ঠিক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আগে তাকে দেখতে চাই, তারপর তোমাকে ছাড়ব। এক পা এক পা করে নামো।"

কিন্তু টাইগার এবারে দৌড় মারার চেষ্টা করল। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাতেই সে আছড়ে পড়ল। সেইসঙ্গে সিঁড়িতে প্রচণ্ড শব্দ হল গুলির।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "ইচ্ছে করে ওর গায়ে গুলি করিনি, শুধু ওকে ভয় দেখিয়েছি, ও বোধহয় এতক্ষণ বিশ্বাস করছিল না।"

তারপর তিনি হেঁকে বললেন, "এই ওঠো, টাইগার। এক পা এক পা করে নামবে। দেবলীনা যদি ঠিকঠাক থাকে, তবে তোমার ছুটি। আর তা না-হলে এতে আরও যে-কটা গুলি আছে সব তোমার মগজে ভরে দেব!"

টাইগার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সাহেবের পিস্তল ছিনিয়ে নিয়েছেন। তবে হামার সাহেব খতম?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার সাহেবের কাজ-কারবার সব খতম। তোমাকে অন্য চাকরি খুঁজতে হবে, যদি পুলিশের হাতে ধরা না পড়ো!"

জগাই মল্লিকের দেহটা এক জায়গায় নিথর হয়ে পড়ে আছে। টাইগার তাকে ডিঙিয়ে নামল। কাকাবাবু তার কাছে এসে নিচু হয়ে ওর নাকটা খুঁজে সেখানে হাত রাখলেন।

তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নিশ্বাস পড়ছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ও থাক এখানে। এখন কিছু করা যাবে না।"

সিঁড়ি শেষ হয়ে যাবার পর যেখানে বারান্দা, সেখানে ভেতরের দিকে দরজা আছে একটা। সন্তু আগে এই দরজাটা বন্ধ দেখেছিল, এখনও বন্ধ। কিন্তু টাইগার সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোরে ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

এবারে টাইগার টর্চ জ্বেলে বলল, "ইধারে আসুন!"

সন্তু বুঝল, টাইগার তাদের মতন বারান্দা ডিঙিয়ে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসেনি। মাটির তলার জায়গাটায় ঘুরতে-ঘুরতে সে কোনওক্রমে এই দরজাটা খুঁজে পেয়েছে, তারপর দরজাটা খুলে কিংবা তালা ভেঙে সে দেখতে পেয়েছে সিঁড়িটা।

সেই ঘরের মধ্যে আবার একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সেটা নেমে গেছে মাটির নীচে। ফের একতলা নামবার পর আবার একটা দরজা। টাইগার এক হ্যাঁচকা টানে সেই দরজাটা খুলতেই বাইরের টাটকা হাওয়া নাকে এল।

এই জায়গাটা ওপরের বারান্দার ঠিক তলায়। এখানে আগাছার জঙ্গল হয়ে আছে, তাই বাইরে থেকে দরজাটা দেখতে পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

টাইগার সেই ঝোপের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে বলল, "ইয়ে দেখিয়ে। হামি ওকে মারিনি, কিছু বলিনি, কোনও লেড়কিকে আমি মারি না। লেকিন ও হামার হাঁথ কামড়ে দিয়েছে!"

একটা জলের পাইপের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দেবলীনা। তার মুখে একটা রুমাল গোঁজা। চোখ বন্ধ, ঘাড়টা হেলে গেছে একদিকে।

দেবলীনাকে ওই অবস্থায় দেখেই সন্তুর বুকটা কেঁপে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, দ্যাখ্ তো। ওর বাঁধন খুলে দে!"

সন্তু খুব সাবধানে ওর থুতনিটা ধরে উঁচু করে মুখ থেকে আগে দলা-পাকানো রুমালটা বার করল টেনে-টেনে। দেবলীনা চোখ মেলে তাকাল।

কাকাবাবু টাইগারকে বললেন, "তুমি এখন যেতে পারো। আর এ-সব কাজ কোরো না। তোমার গায়ে শক্তি আছে, অন্য অনেক কাজ পাবে। আর কখনও যদি তোমাকে কোনও বদমাশদের দলে দেখি, তা হলে কিন্তু আর ক্ষমা করব না।"

টাইগার অন্য কিছু বলল না, শুধু বলল, "টর্চটা আপনাদের লাগবে। এই নিন!"

টর্চটা সে কাকাবাবুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাঁধন খুলে দেবার পর দেবলীনা ছুটে এসে কাকাবাবুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল হু-হু করে। কাকাবাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যস, ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনও ভয় নেই। বাবাঃ, তুমি যা বিপদে ফেলেছিলে এবারে আমাদের। তোমার জন্যই তো এত সব কাণ্ড হল!"

দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ-ঘেউ করে।

কাকাবাবু বললেন, "এখানেও পাহারাদার কুকুর আছে? আমার কুকুর মারতে খারাপ লাগে। দেখা যাক কী হয়। তোরা দু'জনে আমার পেছন-পেছন আয়!"

খানিকটা এগোতেই একটা কুকুর ডাকতে-ডাকতে ছুটে এল এদিকে। কাকাবাবু রিভলভারটা ধরে রাখলেন। সন্তু মুখ দিয়ে শব্দ করল, "চুঃ, চুঃ!"

কুকুরটা থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দেখল। তারপর আবার দৌড়ে ফিরে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তেমন বিপজ্জনক নয়।"

বাড়ির পেছন দিকটা ঘুরে সামনের দিকটায় বাগানের কাছে আসতেই দেখা গেল পর পর দুটো জিপ-গাড়ি। বাগানে আলো জ্বলছে। গাড়ি দুটো সবে স্টার্ট নিয়েছে, একটা গাড়ির পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে যে-লোকটি হেসে-হেসে কথা বলছে, তাকে দেখে সন্তুর চোখ কপালে উঠে গেল।

জগাই মল্লিক!

কাকাবাবু চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, "ধ্রুব! ধ্রুব!"

পেছনের জিপটা থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, "কে? আমার নাম ধরে কে ডাকছে?"

কাকাবাবু আবার বললেন, "ধ্রুব, একটু শোনো!"

জিপ দুটো থেমে গেল।

কাকাবাবু সন্তু আর দেবলীনাকে বললেন, "তোমরা ওই গাছতলায় অন্ধকারে একটু লুকিয়ে থাকো। খানিকটা মজা করা যাক। সন্তু, ওই যে ওই লোকটাকে দেখছিস, ও কিন্তু জগাই মল্লিক নয়। তার যমজ ভাই মাধব মল্লিক।"

ধ্রুব রায় জিপ থেকে নেমে পড়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু কাছে এসে বললেন, "এই যে ধ্রুব, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

ধ্রুব রায় বললেন, "কাকাবাবু ? আপনি এখানে ? দু'দিন ধরে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ-মহল তোলপাড় !"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, "না, না, আমি নিজেই একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম !"

তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মাধব মল্লিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই তো মাধাই মল্লিক, তাই না ?"

লোকটি নীরস গলায় বলল, "মাধাই নয়, মাধব। আপনাকে তো চিনতে পারলুম না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি এমনিই একজন সাধারণ লোক। গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলুম, ভুল করে আপনাদের কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়েছি।"

তারপর ধ্রুব রায়কে বললেন, "তুমি এই মাধাই মল্লিকবাবুকে তোমার জিপে একটু উঠে বসতে বলো। উনি একটু অপেক্ষা করুন, ততক্ষণে তোমার সঙ্গে আমি একটা প্রাইভেট কথা সেরে নিই !"

মাধাই মল্লিক রেগে গিয়ে বলল, "কেন, আমায় জিপে উঠে বসতে হবে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "বসুন না ! শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন, জিপে উঠে বসুন বরং। এসো ধ্রুব !"

ধ্রুব রায় কাকাবাবুর ইঙ্গিতটা বুঝে একজন ইন্সপেক্টরের দিকে ইঙ্গিত করলেন মাধাই মল্লিকের ওপর নজর রাখবার জন্য।

তারপর কাকাবাবুর সঙ্গে হেঁটে এলেন খানিকটা।

বাগানের মাঝামাঝি এসে ধ্রুব রায় বললেন, "এবারে সব ব্যাপারটা খুলে বলুন !"

কাকাবাবু বললেন, "সে-সব পরে বলা যাবে। তার আগে একটা কথা। তুমি একবার আমার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে যাবে বলেছিলে না ?"

ধ্রুব বলল, "হ্যাঁ, তা তো বলেছিলাম..."

"এখানেই সেরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার শুরু করা যায়।"

"এখানে মানে এই বাড়ির মধ্যে ? আমরা তো একটা খবর পেয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছিলুম। সারা বাড়ি খুঁজে দেখা হল, সেরকম কিছুই নেই। মাটির তলায় কয়েকটা ঘর আছে অবশ্য, কিন্তু সেখানে শুধু সিমেন্টের বস্তা।"

কাকাবাবু বললেন, "এসো আমার সঙ্গে।"

হাঁটতে-হাঁটতে পেছনের দিকের সেই ছোট বারান্দাটার তলায় এসে বললেন, "এই যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা দরজা দেখছ, এটা ঠেলে ঢুকে গেলে একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দেখবে। সেটা দিয়ে উঠলে, এই মাথার ওপরে বারান্দাটার একদিকে আবার একটা গোপন সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্যাখো তো কিছু পাওয়া যায় কি না!"

ধ্রুব রায় বললেন, "আপনি আসবেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমি পরে আসছি। তুমি এগোও। এই নাও, টর্চটা নাও! সোজা একেবারে চারতলায় উঠে যাবে।"

ধ্রুব রায় সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করতেই কাকাবাবু বাগানের দিকে এগিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে সন্তু আর দেবলীনাকে ডাকলেন।

ওরা কাছে আসতেই কাকাবাবু বললেন, "ধ্রুবকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের আর সিঁড়ি ভাঙবার দরকার নেই, কী বল? ও ফিরে এসে দেবলীনাকে দেখে আবার অবাক হবে। ততক্ষণ আমরা গঙ্গার ধারে একটু বসি!"

সন্তু আর দেবলীনাকে দু'পাশে নিয়ে তিনি গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেলেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

ভয়ংকর সুন্দর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯২। পৃ. [৪] + ৯৬। মূল্য ১৫·০০।

প্রথম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

উৎসর্গ ॥ মুনুয়া, ডাকু, মিঠু, টুয়া, পুপ্‌লু, সোমা, টুংটাং, রুম্‌পা ও জিয়াকে আর একটু বড় হয়ে পড়বার জন্য।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ বিমল দাস।

সবুজ দ্বীপের রাজা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩। পৃ. ১২৮। মূল্য ২০·০০।

প্রথম সংস্করণ—মে ১৯৭৮।

উৎসর্গ ॥ পুপ্‌লুকে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ষষ্ঠ মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯২। পৃ. [৪] + ১৪১। মূল্য ২০·০০।

প্রথম সংস্করণ—মার্চ ১৯৮১।

উৎসর্গ ॥ টুটু অর্থাৎ সাত্যকি ভট্টাচার্যকে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ অনুপ রায়।

খালি জাহাজের রহস্য। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ১৯৯০। পৃ. ৯৬। মূল্য ১৫·০০।

প্রথম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

উৎসর্গ ॥ তিতি আর তাতারকে।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ জয়ন্ত ঘোষ।

মিশর-রহস্য। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯১। পৃ. ১১২। মূল্য ১৫·০০।
প্রথম সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৮৫।
উৎসর্গ ॥ শ্রীযুক্ত শতদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়-কে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ জয়ন্ত ঘোষ।
অঙ্গসজ্জা ॥ পরমেশ পুরকায়স্থ।

কলকাতার জঙ্গলে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৯১। পৃ. ৮৮। মূল্য ১৫·০০।
প্রথম সংস্করণ—বইমেলা ১৯৮৬।
উৎসর্গ ॥ কার্তিক ঘোষ প্রীতিভাজনেষু।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ॥ দেবাশিস দেব।

বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য চরিত্র কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরে কাকাবাবুর একটি পা ভাঙা, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন, কিন্তু অসাধারণ তাঁর মনোবল, অনমনীয় তাঁর দৃঢ়তা, অদম্য তাঁর সাহস। একইসঙ্গে প্রখর বিশ্লেষণশক্তি, প্রচুর পড়াশোনা। কত ধরনের রহস্যের যে জট খুলেছেন তিনি, মোকাবিলা করেছেন কত রকমের প্রতিকূল পরিস্থিতির, গিয়েছেন কত যে নতুন জায়গায়—তার ইয়ত্তা নেই। সঙ্গে কিশোর সন্তু ওরফে সুনন্দ, যে কিনা প্রতিটি অভিযানের সাক্ষী। ফেলুদার যেমন তোপসে, অনেকটা সেইরকমই কাকাবাবুর কাহিনীতে সন্তু।

সন্তু আর কাকাবাবুর দুর্ধর্ষ অভিযানের নানান কাহিনী নিয়েই দু-মলাটের মধ্যে এবার খণ্ডে-খণ্ডে 'কাকাবাবু সমগ্র'। এই প্রথম খণ্ডে ছ-ছটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। ভয়ংকর সুন্দর, সবুজ দ্বীপের রাজা, পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক, খালি জাহাজের রহস্য, মিশর রহস্য ও কলকাতার জঙ্গলে।

9 788172 152086